বিজ্ঞান জিনিসটি কী

ভেবে জানা ও দেখে জানার ইতিহাস

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

অনেকের কৌতূহল রয়েছে বিজ্ঞান জিনিসটি আসলে কী; যে জিনিসের এতোটাই করে দেখানোর ক্ষমতা, এতোটাই জানাবার ক্ষমতা। আমরা দেখবো এ ক্ষমতার সূত্রপাত মানুষের মস্তিষ্কে– বিজ্ঞান একেবারেই মানবিক। যুগে যুগে কিছু মানুষ এর চর্চা করেছেন, দেশ-কাল-পাত্রের সীমা ছাড়িয়ে তাঁদের বিজ্ঞান সমাজের পুঞ্জীভূত চিন্তার ও কাজের ফসল হলো বিজ্ঞান। আমরা এসবের কিছু কিছু সরাসরি দেখে তার পেছনের প্রেরণাটিকে বোঝার চেষ্টা করবো। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিজ্ঞান সমাজ কী ভাবে নিজেদের কাজের জন্য বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলো গড়ে তুলেছে তা লক্ষ্য করা। এই পদ্ধতিই বিজ্ঞানকে তার বিশেষ ক্ষমতা আর স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এই চিন্তা, কাজ, পদ্ধতি সব কিছুর মধ্যে যুক্তি-তর্ক, গ্রহণ-বর্জনের যে ধারাবাহিকতা প্রাচীন বিজ্ঞান থেকে চলে এসেছে তার মধ্যেই বিজ্ঞানের চরিত্রটি ধরা পড়ে। বইয়ের এই প্রথম খণ্ডে আমরা তাই বিজ্ঞানের পদ্ধতির ইতিহাসকে মূলসুর ধরে এগিয়েছি।

এতে 'ভেবে জানা' ও 'দেখে জানা' যেভাবে হাত ধরাধরি করে চলেছে সেটিই বিজ্ঞানকে শক্তিশালী করেছে। বিজ্ঞান যতটা না প্রকৃতি থেকে নেয়া জিনিস, প্রায় ততটাই বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক থেকে দেয়া জিনিস। ওখান থেকেই বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানের জন্য বৈশিষ্টগুলো নির্বাচন করে নিয়েছে– যৌক্তিক সমালোচনা ও সাক্ষ্য-প্রমাণের গুরুত্ব, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, সবার বিশ্ব-দৃষ্টি গড়া, পরিবর্তনের সুযোগ ইত্যাদি। বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা বোঝার চেষ্টা করবো বিজ্ঞানের যে সত্য তাকে সাফল্য এনে দেয়, সেটি আসলে কী রকমের সত্য।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বিজ্ঞান জিনিসটি কী

প্রথম খণ্ড

ভেবে জানা ও দেখে জানার ইতিহাস

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

উ|ৎ|স|র্গ

আমার প্রয়াত বড় বোন মমতাজ বেগমকে।

স্কুলে থাকতে যখনই নানা লোভে কাছেই তাঁর শ্বশুরবাড়িতে চলে গিয়েছি, তখনই আমাদেরকে মাতৃ-সম স্নেহে আগলে রাখা বড় বোনটি বাড়িতে আমার সখের 'বিজ্ঞান ল্যাবোরেটরির' কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। সম্প্রতি চলে যাবার আগের দিন পর্যন্ত আমাদের সবার প্রতি তাঁর আচরণটি ঠিক এই রকমই ছিল।

ভূমিকা

বিজ্ঞানের সাফল্য সবাইকে চমৎকৃত করে; তাই স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞানকে ঘিরে আমাদের অনেক কৌতূহল থাকে। বিজ্ঞান জিনিসটি কী এমন যে তার এত কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে? এ শুধু ম্যাজিকের মতো অদ্ভুত কিছু করে দেখাবার ক্ষমতা নয়, মানুষকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে বুঝতে দেবার ক্ষমতা যে সে কে, তার দুনিয়াটি কী, ওটি কেমন ভাবে কাজ করে। এই শেষের ক্ষমতাটির মূল্যও অসাধারণ। দূরবীন ইত্যাদি দিয়ে আরো ভালো করে দেখা, যন্ত্রপাতি সাজিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা, আর এসব থেকে থিওরি দেয়া, ফরমুলা দেয়া— তার থেকেই কি বিজ্ঞানের এত ক্ষমতা? এক্সপেরিমেন্টের পাত্রের ভেতরে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দেখা ঘটনা, কিংবা বিজ্ঞানীর মাথায় চিন্তা বা তাঁর কষা অংকের যে ফলাফল, তা বাইরের দুনিয়ায় এতটা লাগসই হতে যাবে কেন? এসব প্রশ্ন থেকেই বিজ্ঞান জিনিসটিকে সত্যিকার ভাবে চেনার এত আগ্রহ সবার মধ্যে। সে আগ্রহ কিছুটা মেটাবার জন্য দুই খণ্ডের এই বই।

বিজ্ঞানের স্বরূপকে ঠিক মতো ধরতে পারার মধ্যে বেশ কিছু বোঝার ব্যাপার আছে, দারুণ আনন্দের ব্যাপারও আছে। আনন্দের একটি কারণ হলো আমরা দেখবো বিজ্ঞান জিনিসটি একেবারেই মানবিক— এর যে ক্ষমতা এবং প্রেরণা তা কিছুটা মানুষের মস্তিষ্কেই আছে। যুগে যুগে কিছু মানুষ এই প্রেরণা নিয়ে বিজ্ঞানের কাজ করেছেন— প্রেরণাটি মনে হয় মানব প্রজাতির উন্মেষের কাল থেকেই ছিল। কাজেই বিজ্ঞানকে আর যাই হোক ধরা-ছোঁয়ার বাইরের একটি 'কালো বাক্স' মনে করার কোন কারণ নেই— এক ভাবে এটি আমাদের সবার মগজের মধ্যেই আছে। যাঁরা ওই বিশেষভাবে এর ওপর কাজ করেছেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে একটি বিজ্ঞান সমাজ গড়ে নিয়ে দেশ-কাল-পাত্রের সীমা ছাড়িয়ে একটি কর্মযজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞানের চর্চার সব নিয়ম কানুন এই বিজ্ঞান সমাজ ধীরে ধীরে নিজেই গড়ে তুলেছে— এ জন্যই বিজ্ঞান এতটা মানবিক। তাঁদের চিন্তার ও কাজের মুন্‌শিয়ানাগুলো আমাদেরকে চমৎকৃত করে। আনন্দের আর একটি কারণ ওই মুন্‌শিয়ানার মধ্যে।

বেড়াল জিনিসটি কী তা বুঝতে হলে চোখের সামনে অন্তত কয়েকটি বেড়ালকে ভালো করে দেখতে হয়। আমাদেরকেও তাই এখানে বিজ্ঞানীর

ভাবনাগুলোর ও কাজগুলোর কিছু কিছু জ্বলজ্যান্ত দেখার চেষ্টা করতে হয়েছে। সাহস করে তার ভেতরে ঢুকে বোঝার চেষ্টা করতে হয়েছে বিজ্ঞান কী বল্‌তে চায়, তার কাজগুলো আসলে কী রকমের। এর মধ্যে কিছু আছে যা আমাদের বোধশক্তির সঙ্গে সুন্দর মিলে যায়। আবার কিছু আছে যা বোধশক্তির কাছে খুব অদ্ভুত মনে হতে পারে; তারপরও বিজ্ঞানী কেন সেই অদ্ভুত জিনিসকে সত্য মনে করেন সেটিও বোঝার ব্যাপার আছে। অবশ্য আধুনিক চল্‌তি বিজ্ঞানের কোন এক জায়গায় হাত রেখে যদি বলি এটিই তো বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের পুরো চরিত্রটি কিন্তু তাতে ধরা পড়বেনা। কারণ যুক্তি-তর্ক, গ্রহণ-বর্জন ইত্যাদির ধারাবাহিকতায় একটু একটু করে বিজ্ঞান যেভাবে গড়ে উঠেছে সেখানেই রয়েছে তার চরিত্র, তার ক্ষমতার চাবিকাঠি। তাই বিজ্ঞানকে চিনতে হলে একেবারে গোড়া থেকে ইতিহাসের পটভূমিতে ওই চিন্তা, ওই কাজকে দেখতে হবে। অর্থাৎ 'বেড়ালকে' চিনতে হলে বেড়াল কেমন করে বেড়ে ওঠে তার চরিত্র লাভ করলো সেটি দেখতে হবে। আমরা সেটিই করেছি।

তবে যে দিকটিকে উপলক্ষ করে আমরা যুগে যুগে বিজ্ঞানীর ভাবনা ও তার কাজকে দেখার চেষ্টা করেছি সেটি হলো বিজ্ঞানের পদ্ধতি। বিজ্ঞানী তাঁর চিন্তাকে যত্রতত্র গড়াতে দেন্‌না— পদ্ধতির মাধ্যমে তাকে সুসংহত রাখেন। একই ভাবে নিজের কাজকেও যেনতেন ভাবে করার সুযোগ তাঁর নেই। এই পদ্ধতিই বিজ্ঞানকে তার স্বাতন্ত্র্য দেয়। যেমন এমনিতে কিছু দেখা আর বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ এক জিনিস নয়। তেমনি বিজ্ঞানে আনুমানিক তত্ত্ব খাড়া করা, এক্সপেরিমেন্টে তা যাচাই করা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এর মধ্যেই শামিল রয়েছে বার বার হতে দেখে তা চিরকাল হবে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া, কিংবা যুক্তি দিয়ে বা অংক কষে এক সিদ্ধান্ত থেকে আরেক সিদ্ধান্তে যাওয়া ইত্যাদি। প্রায়শ বিজ্ঞানীকে এ্যাবস্ট্রাকশন বা বিমূর্তকরণেরও শরণাপন্ন হতে হয়— জটিল ঘটনার বাহুল্যগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সুবিধার জন্য। বিজ্ঞান জিনিসটিকে চেনার জন্য এই পদ্ধতিগুলোকে বোঝা এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এক একটি পদ্ধতিকে দেখাতে গিয়েই বিজ্ঞানীর কোন কোন কাজের অবতারণা করেছি।

এই পদ্ধতিগুলো কোথা থেকে আসলো? আমরা দেখবো তাও ওই বিজ্ঞান সমাজই ঠিক করেছে— যুগে যুগে একটু একটু করে নিজেদের কাজের পদ্ধতি এ সমাজ নিজেই গড়ে নিয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে এগুলো তৈরি হয়েছে, জমেছে, বদলিয়েছে। শেষ পর্যন্ত যেভাবে বিজ্ঞানের পদ্ধতি উঠে এসেছে তা একেবারে পাথরে খোদাই করা অনড় কিছু থাকেনি। যেখানে সমস্যা সমাধানে মূল প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি সুবিধা করতে পারেনি, সেখানে নতুন পদ্ধতি এসেছে— যেমন সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে বিবেচনা করার পদ্ধতি। সেই

নতুন পদ্ধতি যখন সাফল্য এনে দিয়েছে তখন তাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে। পদ্ধতির মধ্যে এ ভাবে যতই নমনীয়তা থাকুক বিশিষ্ট সেই পদ্ধতিগুলো দেখেই, সাক্ষ্য-প্রমাণের ভঙ্গি দেখেই, সবাই বুঝতে পারে বিজ্ঞান জিনিসটি আর দশটি বিষয়ের মতো নয়, একে অন্য কিছুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যায়না।

হাজার হাজার বছর ধরে পুঞ্জীভূত হওয়ার ব্যাপারটিকে বিজ্ঞানের স্বরূপ বোঝার ক্ষেত্রে খুব কাজে আসে। ওই যে মানুষের মস্তিষ্কের বিজ্ঞানধর্মী প্রেরণা সেটি কী ভাবে একটি ব্যাপক চর্চায় রূপ নিলো তাকে আপাদমস্তক চিনতে হলে ওই পুঞ্জীভূত হবার ব্যাপারটিকেই অনুসরণ করা প্রয়োজন। সেখানে আগের তত্ত্বের ভালো-মন্দ পরের তত্ত্বের পথ করে দিয়েছে; সেখানে প্রথমে সংখ্যা আবিষ্কার তারপর যোগ-বিয়োগ, তারপর এক সময় ক্যালকুলাসের মতো উচ্চ গণিত— এভাবেই এগিয়েছে; পুরো গল্প না জানলে কিছুই বোঝা যায়না। ওখানে অতীতের কোন কিছু সেভাবে ফেলে দেয়া হয়নি; অভিজ্ঞতা ও উদ্ঘাটনগুলো তো পরে ধারাবাহিকভাবে কাজে লেগেছেই, এমনকি বাতিল করা তত্ত্বও কাজে এসেছে। কারণ সেগুলোও সৃষ্টি হয়েছে মস্তিষ্কের ওই একই বৈজ্ঞানিক প্রেরণায়। ব্যাপারটি পদ্ধতির ক্ষেত্রেও সত্য।

তাই বইয়ের এই খণ্ডে আমরা পদ্ধতির এই ইতিহাসকেই মূলসুর করেছি। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য আলামতগুলোও কীভাবে যুগে যুগে পুঞ্জীভূত হয়েছে তাও দেখার চেষ্টা করেছি। বিজ্ঞানীরা কী ভাবে বিশ্বজোড়া সহকর্মীদের নির্মম সমালোচনার মধ্য দিয়ে কাজ করেন, বিজ্ঞান কী ভাবে কোন কর্তৃপক্ষ বা কোন গরিষ্ঠ গণ-মতামতের ভিত্তিতে নয় বরং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কাজ করে এবং সে কারণে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই প্রায়শ বদলায়, মানুষের সঙ্গে বিজ্ঞানের কী নানাবিধ সম্পর্ক, বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি (বিশ্ব-দৃষ্টি) বিজ্ঞান কীভাবে যুগে যুগে সৃষ্টি করেছে— এ সবের মধ্যেই আমরা বিজ্ঞানের অন্য সেই আলামতগুলো দেখবো।

বইয়ের এই প্রথম খণ্ডের বাড়তি নাম হিসেবে আমরা বেছে নিয়েছি 'ভেবে জানা ও দেখে জানার ইতিহাস' এই কথাটিকে। যুক্তির মাধ্যমে চিন্তা করে বা গাণিতিক বিশ্লেষণে বিজ্ঞানী যে জ্ঞানের সন্ধান পান সেগুলো 'ভেবে জানার' পদ্ধতিতে পাওয়া। আর পর্যবেক্ষণে ও এক্সপেরিমেন্টে পাওয়া জ্ঞান হলো 'দেখে জানার' পদ্ধতিতে পাওয়া। বিজ্ঞানে কোন কিছু জানতে পারার এই প্রধান দুটি পদ্ধতি শুরুতে দ্বান্দ্বিকভাবে কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত উভয়ের মিলিত অনুসরণের মাধ্যমেই বিজ্ঞানে সাফল্য এসেছে এবং বিজ্ঞান জিনিসটি তার স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। শুধু ভেবে জানার চেষ্টা যদি চলতো তা হলে বিজ্ঞান চিরকাল দর্শনের মতো ভাবনা চিন্তার বিষয় হয়ে থাকতো। আর শুধু দেখে জানাতেই যদি বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে তা প্রকৃতির কাজের

একটি ধারা-বিবরণী হয়েই থাকতো বড় জোর। কিন্তু বিজ্ঞান এর কোনটিতেই পর্যবেশিত হয়নি, ভেবে জানা ও দেখে জানা এক সঙ্গে কাজ করেছে বলে। সেই প্রয়োজনে রক্ত-মাংসের বিজ্ঞানীকে তাঁর মস্তিষ্ক খাটিয়ে দেখা জিনিস থেকে নানা ধারণা উদ্ভাবন করতে হয়েছে, আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে গিয়ে সেগুলো যাচাই করতে হয়েছে। সেদিক থেকে বিজ্ঞান যতটা না প্রকৃতি থেকে নেয়া জিনিস, প্রায় ততটাই নিজের মস্তিষ্ক থেকে দেয়া জিনিস। ভেবে জানা ও দেখে জানার ইতিহাস থেকে তাই আমরা বিজ্ঞান জিনিসটিকে বেশ কিছুটা বুঝতে পারবো আশা করি।

বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে এই বোঝার চেষ্টাটি আমরা চালিয়ে যাব বৈজ্ঞানিক সত্যের স্বরূপটির খোঁজখবর করে। বিজ্ঞান যে দারুণ সফল হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সাফল্যের জন্য বৈজ্ঞানিক সত্যকে একেবারে অমোঘ পরম সত্যের রূপ নিতে হবে এমন কোন কথা নেই। স্বয়ং আইনস্টাইন বলেছেন— "আসল বাস্তবতার তুলনায় যদি বিজ্ঞানকে মাপি তা হলে সেটি অবোধ শিশু-সুলভ একটি ব্যাপার বৈ কিছু নয়; কিন্তু আমাদের কাছে এর চেয়ে মূল্যবান জিনিস আর কিছু নেই।" তা হলে বিজ্ঞানের সত্য কী রকম সত্য? তার সত্যের স্বরূপ না বুঝে আমরা কীভাবে বল্‌বো যে বিজ্ঞান জিনিসটি কী তা বুঝতে পেরেছি? দ্বিতীয় খণ্ডে বিজ্ঞানের মডেলে, গণিতে, এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলে, কম্পিউটার সিম্যুলেশনে ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন রূপের মধ্যে সত্যকে কতখানি কীভাবে খুঁজে পাই তা দেখার চেষ্টা করবো। এভাবে বিজ্ঞানের নানা দিকের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এই বইয়ের উভয় খণ্ডে আমরা বোঝার আশা রাখি বিজ্ঞান কী, এবং বিজ্ঞান কী নয়।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম
জানুয়ারি ২০১৯

সূচিপত্র

বিজ্ঞান একেবারেই মানবিক ১০
কেন দেখা, কেন মাপা ৬৪
ভেবে জানাটিই যখন মুখ্য ৯৭
জটিল তত্ত্বের ঘেরাটোপে ১৩৩
এক্সপেরিমেন্টমুখী প্রেরণা ১৬৫
তত্ত্বের জন্ম-মৃত্যু, তত্ত্বের জয় ১৯৪
চিরায়ত ধারণা ছাড়িয়ে বৈপ্লবিক তত্ত্ব ২১৬
বিজ্ঞান কেন এত সফল ২৫৫

বিজ্ঞান একেবারেই মানবিক

দশজনার কাছে বিজ্ঞান

যার অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞান যেভাবে এসেছে তিনি একে সেভাবেই দেখেন। বিজ্ঞানের চিত্র সাধারণ মানুষের কাছে সময়ের সাথে পাল্‌টিয়েছে। এক সময় একে ল্যাবোরেটরিতে দিন কাটানো অন্যমনস্ক উসকোখুশকো চেহারার বিজ্ঞানীর কাজ মনে করা হতো। এখন বিজ্ঞানকে মানুষ বরং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার মনে করে, যে প্রতিষ্ঠান অনেক চটপটে মানুষের কাজে, কথায়, এবং সৃজনশীলতায় ধন্য। কম্পিউটার কিংবা জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে বিজ্ঞানীরা কী ঢঙে কাজ করেন তারো একটি আবছা ধারণা সবার আছে। বিজ্ঞানীরা যে কথাবার্তা বলেন তার সবই সব মানুষের পছন্দ নাও হতে পারে। তবে একটি কথা অবশ্য মানতে হবে যে বিজ্ঞানকে সব মানুষ সমীহ করে। এর কারণ বিজ্ঞান কাজ করে; এটি যে কার্যকর এ কথা সবাই মানে। ভাবখানা এমন যে তার সব কথা মানতে আমার মন সায় না দিলেও তাকে অবজ্ঞা করার সুযোগ আমার নেই। সে যা বল্‌ছে তা প্রায়শ করে দেখাচ্ছে, এবং তার অনেকগুলোর প্রভাব আমার ওপর অবধারিত ভাবে আসছে। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাতে মন্দ কিছু হচ্ছে না।

বিজ্ঞানকে সবাই সমীহ করে, কিন্তু তার মধ্যে অনেকে দারুণ ভালও বাসে। এটি তাঁদেরকে চমৎকৃত করে, আনন্দিত করে, নিজের বিশ্ব-দৃষ্টি গড়তে সাহায্য করে। এভাবে কোন না কোন ভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে একটি মনের যোগাযোগ সবার হচ্ছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বিজ্ঞান জিনিসটি কী তা সবাই বোঝে। অল্প কথায় এক রকম পরিচয় দেয়া গেলেও আজ বিজ্ঞানের যে চেহারা তার সত্যিকার পরিচয়টি বেশ জটিল। তাই একে বুঝতে না পারার বা ভুল করে বোঝার ঘটনা অহরহ ঘটছে। বিজ্ঞানকে সমীহ যে সবাই করে তা বোঝা যায় যখন দেখি প্রত্যেকে নিজের বিষয়টিকে 'বৈজ্ঞানিক' বলে দাবী করে। এটি সব চেয়ে ভাল বোঝা যায় ব্যবসায়িক পণ্যের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে। পণ্যটির গুণাগুণ ল্যাবোরেটরির এ্যাপ্রন-পরা বিজ্ঞানীর মত দেখতে কাউকে দিয়ে বলাতে পারলে বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি হবে মনে করা হয়। কথাগুলো যদি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় তা হলে আরো ভাল। দৃশ্যের পটভূমিতে গবেষণাগারে যন্ত্রপাতির ছবি, বিজ্ঞান-ভবনের ছবি, কনফারেন্সের ছবি ইত্যাদি থাকলে তাও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ জুতসই হয়। শুধু পণ্য কেন, বিজ্ঞানের সঙ্গে কোন

সম্পর্ক নেই, বরং বিজ্ঞানের ঠিক উল্টা রকম ধারণা দেয় বা কাজ করে, এমন বিষয়কেও বিজ্ঞান বলে দাবী করতে অনেকের ক্লান্তি নেই। এজন্য বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সবার পরিচিত কিছু শব্দ ব্যবহার করে, ছবি ব্যবহার করে, এবং অন্য নানা ভাবে বিজ্ঞানের ভঙ্গিকে অনুকরণ করে এই দাবী প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়। উদ্দেশ্য সবক্ষেত্রে একটিই– বিজ্ঞানের ওপর মানুষের যে সাধারণ আস্থা তার সুযোগ নেয়া।

এই সব ক্ষেত্রে আশা করা হয় যে সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের প্রতীকগুলো দেখেই তাকে বৈজ্ঞানিক মনে করবে; ওই পোষাক, ল্যাবোরেটরি, যন্ত্রপাতি, শব্দাবলী, ভবন, ছবি, কনফারেন্স– এসব হলো সেই প্রতীক। অতীতে ফ্লাস্ক, টেষ্ট টিউব, মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি যেমন বিজ্ঞানের প্রতীক ছিল এও অনেকটা সে রকম। ওপরের এই প্রতীকগুলোকে সাধারণ মানুষ যখন দেখেন তখন তাঁরা হয়তো এর গভীরে যান্না। কিন্তু যাঁরা গভীরে যান, বা বিজ্ঞানীরা নিজেরাও যখন বিজ্ঞানের একটি পরিচয় পেতে চান, একটি সংজ্ঞা পেতে চান, তখন ওই প্রতীকে উল্লেখিত বিষয়গুলোকেও তাঁরা উপেক্ষা করেন্না। তাঁরাও গবেষণার পদ্ধতি ছাড়াও বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক দিকটির ওপর, প্রকাশনা বা কনফারেন্স ইত্যাদির মাধ্যমে সহকর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া ওপর, এবং সাধারণ সমাজের সঙ্গে সংযোগ রাখার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই বিজ্ঞানকে চিনে নেন, যা একটু পরই আমরা দেখবো।

সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের কাছ থেকে শুধু চাঞ্চল্যকর খবরই বেশি আশা করে– অন্য দশটি কাজের মত এও যে গতানুগতিক পরিশ্রমের কাজ, প্রত্যেক দিন সেখানে চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটেনা, সে কথাটি অনেক সময় মনে রাখেনা। আবিস্কারের পেছনে যে দীর্ঘ সময় ও প্রক্রিয়া জড়িত তার খোঁজ রাখেনা বলে অনেকের কাছে বিজ্ঞানকে হঠাৎ হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া ম্যাজিকের মত মনে হতে পারে। কিন্তু এই 'ম্যাজিকগুলোও' মানুষের মনে সাড়া জাগাবার প্রতিযোগিতায় বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনা। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে মনের মধ্যে বিজ্ঞানের যে চিত্র গাঁথা হয়ে আছে তা হয়তো আসছে প্রায়শ দেখা সিনেমা বা টেলিভিশন সিরিয়ালের কল্পকাহিনী থেকে। কারণ এগুলোর জনপ্রিয়তা সারা দুনিয়ার অনেক তুঙ্গে– আগেও ছিল, এখনো আছে।

উদাহরণ স্বরূপ 'জুরাসিক পার্ক' সিনেমাটির কথা বলতে পারি। আমাদের দেশেও দেখেছি অতীত যুগের ডাইনোসর এবং বর্তমান ডিএনএ গবেষণা সম্পর্কে সাধারণ্যে কতখানি ঔৎসুক্য ও মনে দাগ কাটার মত তথ্য স্পীলবার্গের

বিখ্যাত সিনেমা 'জুরাসিক পার্ক' থেকে যতটা এসেছে এতটা বৈজ্ঞানিক কোন উৎস থেকে আসেনি। জুরাসিক হলো ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে একটি কালের নাম যখন নানা রকম ডাইনোসরই ছিল পৃথিবীর প্রধান প্রাণী। ওই কাহিনীতে ১০ কোটি বছর প্রাচীন ডাইনোসরের ফসিল-রক্ত থেকে ডিএনএ উদ্ধার করে তা উটপাখির ডিম্বকোষে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তার আগে অবশ্য এর ওপর প্রয়োজনীয় জিন কারিগরি সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে উটপাখির ডিম ফুটে যা বেরুলো তা উটপাখি না হয়ে ডাইনোসরই হলো। এভাবে বিলুপ্ত ডাইনোসরকে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে এ যুগের পার্কে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে, তার সমস্ত মহিমায় ও হিংস্রতায়। এর মূল কিছু জিনিসে আভাষ হিসেবে সত্যিকার বিজ্ঞান থাকলেও এ কাহিনীর সঙ্গে আজকের সম্ভাব্য বিজ্ঞানের অমিল বিশাল। তা সত্ত্বেও বাহ্যিক মিলগুলোর কারণে সিনেমাটির কোটি কোটি দর্শকের মনে তাঁদের অজান্তেই এটিই বিজ্ঞানের স্থান নিয়ে নিয়েছে। ঠিক এমনি করে যাঁরা সপ্তার পর সপ্তা টেলিভিশনে সিরিয়াল সায়েন্স ফিকশন 'স্টার ট্র্যাক' উপভোগ করেছেন তাঁদের কাছে মহাজাগতিক বিজ্ঞানের ধারণা স্টার ট্র্যাকে আটকে যাওয়াটি খুবই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞানকে চাঞ্চল্যকর খবরে সীমাবদ্ধ করাতে আরো অবদান রাখে সাধারণ কিছু গণমাধ্যম। এরা পাঠক-নন্দিত হবার জন্য বিজ্ঞানের বিতর্ক-ওঠা বিষয়গুলোকে বেছে নেয়। বিজ্ঞানের সব রকম খবর যাঁরা রাখছেন তাঁদের জন্য এই বিতর্ক-ওঠা বিষয়গুলো স্বাভাবিক ভাবেই আসে, এবং তার প্রয়োজনও রয়েছে। কিন্তু গণমাধ্যমের কল্যাণে যাঁদের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংযোগই ঘটে শুধু বিতর্ক-ওঠা বিষয় হিসেবে তাঁরা বিজ্ঞান সম্পর্কে ভুল বার্তা পান। যেমন অনেক সময় জিন কারিগরির মূল বিষয়টি বা তার অগ্রগতি, অবদান ও সম্ভাবনাকে এড়িয়ে শুধু জিন-পরিবর্তিত খাদ্য নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেয়া হয়, এবং তাতেও বৈজ্ঞানিক তথ্যের চেয়ে আবেগপ্রধান বিষয়কে মুখ্য করা হয়। সেরকম হলে মানুষের পক্ষে ভুল বোঝাটি সহজ হয়, এবং বিজ্ঞানে আস্থা হারানোও সহজ হয়। তাছাড়া আগেই বলেছি নানা কারণে মানুষের নিজেরও আগে থেকে তৈরি হওয়া কিছু পছন্দ-অপছন্দ থাকে। এদিকে চলমান বিজ্ঞানে সব সময় কিছু রদবদল হচ্ছে, অনেক সময় আগের কোন গবেষণার ভুল দিকটিও আলোচিত হচ্ছে; কারণ ক্রমাগত এই সমালোচনাই হলো বিজ্ঞানের প্রাণ। এসব রদবদল বা ভুল সাধারণত প্রতিষ্ঠিত মূল তত্ত্বগুলোতে তেমন কোন ইতর-বিশেষ ঘটায় না। কিন্তু যাঁরা আগে থেকেই ওই তত্ত্বকে অপছন্দ করে আসছেন, তাঁরা এই

অগুরুত্বপূর্ণ ভুল দেখে নড়েচড়ে ওঠেন এবং তাঁদের অপছন্দটিতে আরো শক্ত হন। এ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই নকল বিজ্ঞানের খপ্পরে পড়েন। নকল বিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানের ছদ্মবেশ ধরে অবৈজ্ঞানিক বিষয়কে চালাবার চেষ্টা। সারা দুনিয়া জুড়ে এরকম অনেক ক্ষমতাশালী নকল বিজ্ঞান তৎপর রয়েছে। বিবর্তন তত্ত্ব, বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি সহ বিজ্ঞানের খুবই সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলো সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে এই তৎপরতা বেশ কাজে লাগানো হয়। কাজেই বিজ্ঞানকে স্পষ্ট ভাবে নকল বিজ্ঞান থেকে আলাদা করার কিছু দক্ষতা সব মানুষেরই থাকা দরকার।

বিজ্ঞানকে ধারাবাহিক ভাবে দেখতে না পারাও অনেক সময় একে ভুল করে চেনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিজ্ঞানের একটি বড় খবরকে এর আগের সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা মনে হতে পারে। এতে কেউ মুগ্ধ হতে পারেন, হকচকিয়ে যেতে পারেন, এমনকি হতাশও হতে পারেন। অথচ যদি জানা থাকতো যে বিষয়টির গোড়া অনেক অতীতে, সম্ভবত তখন থেকেই এ নিয়ে নানা রকম দোলাচল ছিল তা হলে বিষয়টিকে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখতে সুবিধা হতো। এই ধারাবাহিকতা বা বিজ্ঞানের ইতিহাস মানুষের সাধারণ ইতিহাসেরই অংশ। বিজ্ঞান জিনিসটি কী, বিজ্ঞান নিজের জন্য কী পদ্ধতি ঠিক করেছে, অন্যরা বিজ্ঞানকে কী চোখে দেখছে– এই ব্যাপারগুলোও কিন্তু সময়ের সঙ্গে ক্রমাগত বদলিয়েছে; সেটি হাজার বছরে যেমন, তেমনি বিশ-ত্রিশ বছরের অল্প সময়ে ব্যবধানেও বদলিয়েছে। ব্যক্তি-মানুষের ও সামাজিক মানুষের প্রেরণা-প্রবণতাগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে এই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করলে আমরা দেখবো বিজ্ঞান জিনিসটি একেবারেই মানবিক একটি জিনিস। যদিও এর কাজ প্রাকৃতিক বিশ্বকে জানা ও ব্যাখ্যা করা, সেটি কিন্তু একান্ত ভাবে মানুষের চোখ ও মানুষের চিন্তার ভেতর দিয়েই; তার জীবনকে মোটেই বাদ দিয়ে নয়। এখন তাকে ঘিরে যত যন্ত্র, যত কম্পিউটার থাকুক না কেন, বহু হাজার বছর আগে যেমন ছিল, তেমনি এখনো শেষ অবধি মানুষের মস্তিষ্কেই বিজ্ঞানের বাস।

বিজ্ঞানকে তাই একেবারে দূরের একটি কালো বাক্স মনে করে নিজকে এর থেকে গুটিয়ে রাখার কোন কারণ নেই; এর পেছনের প্রেরণাগুলো আমাদের দশজনার মস্তিষ্কে থাকা প্রেরণাগুলোর মতই। যুগের দাবীতে জবরজঙ্গ জটিলতার কারণে বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলোকে যাকে আমরা বলি 'গজদন্ত মিনার' এখন সে রকম মনে হতে পারে। কিন্তু যাদের মস্তিষ্কে বিজ্ঞান তার রূপ পাচ্ছে সেই মানুষগুলোর প্রেরণা কিন্তু সবার মত একই– হাজার হাজার বছরের বিজ্ঞানী বা সাধারণ

মানুষের মতই। কাজেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কোন যোগাযোগের মত বিজ্ঞান জিনিসটা যে কী তা অবশ্যই বোঝা যায়। তাই প্রতীকী ব্যাপারগুলোকে, বা কল্পকাহিনীর বাড়াবাড়িগুলোকে, বা হঠাৎ হঠাৎ চাঞ্চল্যকর খবরের বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করে ওই মানবিক যোগাযোগেই বিজ্ঞানকে চেনার চেষ্টা সবাই করতে পারে।

অভিজ্ঞজনার কাছে বিজ্ঞান

পদ্ধতি দিয়ে চেনাঃ

যাঁরা বিজ্ঞানী, অথবা যাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে ভাবেন, তাঁদের একটি চেষ্টা থাকে বিজ্ঞানকে অন্য দশটা বিষয়ের থেকে আলাদা করার উপায় নিয়ে। কী সেই জিনিসগুলো যা দেখে তাঁরা বুঝবেন যে এটি বিজ্ঞান, অন্য কিছু নয়। তাঁরা এমন কিছু বৈশিষ্ট খোঁজার চেষ্টা করেন যা দিয়ে বিজ্ঞানকে দেখামাত্র চেনা যায়– এ যেন 'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা' সেই প্রকৃত গোঁফটির খোঁজ করা। সমস্যা হলো কাজটি সব সময় সহজ হয়না, কারণ বিজ্ঞানকে চিনতে পারার ওই চিহ্নগুলোর সংখ্যা অনেক। আর বিজ্ঞান জিনিসটিও বহু রূপে প্রকাশ পায়, যার প্রত্যেকটির সব আলামত এক রকম নয়। সব রূপ মিলে বিজ্ঞান কাকে বলে জিজ্ঞেস করলে অভিজ্ঞরা এক এক জন এক এক দিক্‌কে গুরুত্ব দিয়ে প্রশ্নটির উত্তর দেবেন। তবে প্রায় সবাই একমত হবেন যে বিজ্ঞানের কিছু একেবারেই নিজস্ব পদ্ধতি আছে, আর ওই পদ্ধতিই তাকে চেনার সব চেয়ে ভাল উপায়। অবশ্য ওই পদ্ধতির মৌলিক ও মোটা দাগের বিষয়গুলো সব রকম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও খুঁটিনাটিতে তা সব সময় হয়না। তাই বিস্তারিত পদ্ধতিগুলো নানা বিজ্ঞানে আলাদা ভাবে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তবে আপাতত সেই মোটা দাগের পদ্ধতিকে আরো মোটা একটি রেখায় এক ঝলকে একবার দেখে ফেলি। অবশ্য মনে রাখতে হবে এগুলো সবই পূর্ণাঙ্গরূপে শুধু আধুনিক বিজ্ঞানে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতীতের বিজ্ঞানে এর সব উপাদান বিজ্ঞানীরা তখনো সৃষ্টি করে সারেননি বা অনুসরণ করেননি।

বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রকৃতির ঘটনাগুলো উদ্ঘাটন ও ব্যাখ্যা করার লক্ষ্য নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা লক্ষ্য করে এবং নিজের যৌক্তিক আন্দাজ থেকে ওটি সম্পর্কে একটি আনুমানিক তত্ত্ব (হাইপোথেসিস) বিজ্ঞানী খাড়া করেন। এই অনুমানটি যদি সত্য হতো তা হলে বাস্তব ক্ষেত্রে এর থেকে কী কী ধরনের পূর্বাভাষ আসতে পারতো সেগুলো যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়। যৌক্তিক

বিশ্লেষণটি প্রায়ই অংক কষার আকারেও করা হয়। এখন বাস্তব সাক্ষ্য- প্রমাণে ওই পূর্বাভাসগুলো যদি সত্যিকার জগতে দেখা যায়, যাচাই হয়, তা হলে বলতে হবে আনুমানিক তত্ত্বটি সঠিক; এটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হয়তো এই তত্ত্বই প্রকৃতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা হিসেবে গৃহীত হবে। আর যদি পূর্বাভাসগুলো বাস্তবে দেখা না যায় তা হলে এই অনুমানকে ভুল বলেই ধরে নিতে হয়। সেক্ষেত্রে নতুন অনুমান নিয়ে আবার পুরো পদ্ধতিটির পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

পূর্বাভাসগুলো বাস্তবের সঙ্গে মিলছে কিনা সেটি যাচাই হয় পর্যবেক্ষণ ও মাপজোকের মাধ্যমে যথেষ্ট উপাত্ত নিয়ে; অথবা এ সম্পর্কে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে অনুরূপ উপাত্ত সংগ্রহ করে। এই উপাত্তগুলো যদি পূর্বাভাসের সত্যতাকেই ফুটিয়ে তোলে তা হলেই অনুমানটি সফল বলে দাবী করা যায়। অবশ্য পদ্ধতির এই সরল বর্ণনার মধ্যে অনেক কথা বাকি থেকে যায়, যেমন আনুমানিক তত্ত্বটি কিসের কিসের ভিত্তিতে আসতে পারে, কী ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুমানের পূর্বাভাসগুলোকে যাচাই করার জন্য যথেষ্ট হবে, অনুমান থেকে পূর্বাভাসগুলো পাওয়ার প্রক্রিয়াগুলো কী রকম হবে, ইত্যাদি অনেক কিছু। এসবকে নানা দিক থেকে দেখার প্রচুর সুযোগ আছে, এবং তা নানা পর্যায়ে নানা ভাবে আমরা দেখবো। কিন্তু বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে এক ঝলকে এভাবে দেখে নেবার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে চেনার একটি ভাল উপায় আমরা পেয়ে যাই। সরল একটি উদাহরণ নিলে এটি আরো স্পষ্ট হবে।

প্রাচীন কাল থেকে বিজ্ঞানীদের মধ্যেই একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে সাধারণ জড় জিনিস থেকে ছোট ছোট প্রাণীর উদ্ভব হয়ে থাকে। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগে এসেও কোন কোন বিজ্ঞানী এতে বিশ্বাস করতেন; কাদা-ময়লা পানি যার মধ্যে শুরুতে কোন কীট দেখা যাচ্ছেনা তাতে কিছুদিন পর ক্ষুদ্র কীট হতে দেখিয়ে এটি তাঁরা প্রমাণের চেষ্টা করতেন। ও সময় ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তর অন্যান্য অধিকাংশ জীববিজ্ঞানীদের মত মনে করতেন এ কথাটি একেবারে ডাঁহা ভুল। তিনি ব্যাপারটি চূড়ান্তভাবে প্রমাণের জন্য ব্যবস্থা নেন। যাবতীয় অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর আনুমানিক তত্ত্বটি ছিল জড়বস্তু থেকে জীব জন্ম নিতে পারেনা, শুধু জীব থেকেই জীব জন্ম নিতে পারে। এ অনুমানটি থেকে যৌক্তিক নির্ণয়ে একটি পূর্বাভাস হলো যদি কোন পাত্রে সব জীব মেরে ফেলে ওখানে আর কোন নতুন জীব আসতে দেয়া না হয়, তা হলে এখানে জীবের খাদ্য থাকা এবং উপযুক্ত পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও কোন জীবের উৎপত্তি হবেনা।

এটি বাস্তবে যাচাই করার জন্য তিনি একটি এক্সপেরিমেন্ট করলেন ১৮৫৯ সালে। কয়েকটি ছোট ছোট কাচের ফ্লাক্স তিনি তৈরি করলেন যার ভেতর মাংসের স্বচ্ছ পুষ্টিকর শুরুয়া রেখে ফ্লাস্কের গলাটাকে খুব সরু খোলা মুখ একটি আঁকাবাকা কাচ নলের রূপ দিলেন। ওই কাচ নলটি নিচের দিকে নেমে U অক্ষরের মত বেঁকে আবার ওপরে দিকে উঠে গেছে– ফলে খোলা মুখ দিয়ে ফ্লাক্সে বাতাস ঢুকতে পারে বটে কিন্তু সেই বাতাসে ধূলির সঙ্গে থাকা কোন জীবাণু আসতে পারেনা বাঁকা জায়গায় আটকে যায় বলে। এবার পাস্তর ফ্লাস্কের শুরুয়াকে ভাল করে সেদ্ধ করে নিলেন যাতে আগে থেকে তাতে কোন জীবাণু থাকলে তা নিশ্চিত মরে যায়। এরপর এই ফ্লাস্ক দীর্ঘদিন জীবাণু-বান্ধব উত্তাপে রেখে দেয়া হলেও দেখা গেল শুরুয়াটি স্বচ্ছ রইলো, অর্থাৎ তাতে কোন জীবাণু জন্মেনি। পরে ফ্লাস্কটি একটু উল্টে নিলে অথবা ওই সরু গলাটি ভেঙ্গে দিলে অল্প সময়ের মধ্যে শুরুয়াটি ঘোলা হয়ে যেতে দেখা গেল। এই ফলাফলের স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো উল্টে দেয়াতে বাঁকা জায়গায় আটকানো জীবাণুগুলো শুরুয়াতে গিয়ে পড়তে পেরেছে। কাচের সরু বাঁকা গলা ভেঙ্গে দেয়াতেও জীবাণু সরাসরি শুরুয়াতে যেতে পেরেছে। উভয় ক্ষেত্রে পুষ্টিকর শুরুয়া পেয়ে ওই জীবাণু দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে তাকে ঘোলা করে ফেলেছে। অথচ আগে যখন বাইরের জীবাণু আসতে পারেনি তখন কোন জীবাণু ওই পুষ্টিকর মাধ্যম থেকে তৈরি হয়নি। পাস্তরের অনুমানের পূর্বাভাসটি এভাবে বাস্তবে যাচাই হলো। কাজেই অনুমানটি সঠিক, অর্থাৎ জড় থেকে জীব সৃষ্টির কোন প্রশ্ন ওঠেনা। অবশ্য পাস্তরের পর আরো ভাল এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে এই তত্ত্ব অনেকবার যাচাই হয়ে গেছে, আরো অনেক বেশি স্পষ্ট ভাবে।

খোলামেলা চরিত্র দিয়ে চেনাঃ

বিজ্ঞানের বড় পরিচয় তার পদ্ধতিতে আর সেখানে তার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট হলো এটি বাস্তবের সঙ্গে যাচাই করা জ্ঞান। কিন্তু আজকের বিজ্ঞানের আরো কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে যা দিয়ে বিজ্ঞানকে আলাদা করা যায়। যেমন বিজ্ঞানের খোলামেলা চরিত্র এবং সব সময় একই বিষয়ে চর্চাকারী অন্য বিজ্ঞানীদের কাছে তা পরীক্ষিত হবার সুযোগ থাকা। এর জন্য বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক রূপটি যেমন তার বৈশিষ্ট– বিজ্ঞানীদের সমিতি, একাডেমি, গবেষণা কেন্দ্র, জার্নাল, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্স উদ্যোগ ইত্যাদি, তেমনি ব্যক্তিগত পর্যায়েও অন্য বিজ্ঞানীর মতামত লাভটি তার বৈশিষ্ট।

আসলে আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সব কিছু মিলিয়ে একটি অত্যন্ত জীবন্ত 'বিজ্ঞান সমাজ' রয়েছে। কোন কাজকে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি পেতে এই সমাজেরই প্রাসঙ্গিক মোটামুটি সকলকে সে ব্যাপারে সম্মত থাকতে হয়– বিজ্ঞানের পদ্ধতির ব্যাপারগুলো বেশ সুনির্দিষ্ট বলে এই সম্মতির মধ্যে ভেদবুদ্ধির জায়গা সাধারণত থাকেনা, অন্তত শেষ পর্যন্ত থাকেনা। এই সম্মতিরও একটি নানামুখী প্রক্রিয়া আছে। যেমন আবিষ্কার মাত্রই স্বীকৃত বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশ করতে হয়। সেই জার্নাল আবার ওই সমাজ থেকেই বিষয়ের বেশ কয়েকজন পারদর্শীকে দায়িত্ব দেন ওই লেখাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করে মতামত ও পরামর্শ দেয়ার জন্য (পীয়ার রিভিউ)। গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্সের ক্ষেত্রেও মোটামুটি একই প্রক্রিয়া অনসরণ করা হয়। কনফারেন্সে উপস্থাপন ছাড়াও গুরুত্ব পায় বিভিন্ন দিকে ভুল-শুদ্ধ হওয়া নিয়ে অন্যদেরকে প্রশ্ন করার বা মন্তব্য করার সুযোগ দেয়া, এবং ওগুলোর যৌক্তিক উত্তর দিতে পারা।

আবিষ্কারের ওপর এই প্রকাশনা অথবা কনফারেন্সে এটি উপস্থাপনের পর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা নিজেদের একই গবেষণার প্রকাশনায় ওটির উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেছেন কিনা, করলেও একে শুদ্ধ ধরে নিয়ে করেছেন কিনা, সেটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কতজন এটি করেছেন, কীভাবে করেছেন, একটি আবিষ্কারের গুরুত্ব ও স্বীকৃতির ব্যাপারে সেটিও জরুরি। এর দ্বারা বোঝা যাবে তত্ত্বটি কত উৎসাহ সৃষ্টি করেছে ওই বিজ্ঞান সমাজে, কতটা ব্যবহৃত হচ্ছে, আরো কতগুলো নতুন কাজের ও তত্ত্বের জন্ম দিচ্ছে ইত্যাদি। গুরুত্বপূর্ণ সব বৈজ্ঞানিক কাজের ক্ষেত্রে এটি হতে হয়, এভাবেই বৈজ্ঞানিক উদ্ঘাটন ও তত্ত্বগুলো প্রতিষ্ঠা পায়। এর উল্টোটি হলে কাজটি হারিয়ে যায়, আর অন্যরা যদি সফলভাবে এতে মৌলিক ভুল ধরিয়ে দেয় সেটি বাতিল গণ্য হয়। আর এভাবেই বিজ্ঞানের আর একটি পরিচয় বলো বিজ্ঞান সমাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া কাজ হিসেবে। এ কারণেই বিজ্ঞানের ওপর কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব নেই। যদি কিছু থাকে সেটি পুরো বিজ্ঞানী সমাজের কর্তৃত্ব, কোন বিশেষ দেশের বিজ্ঞান সমাজের নয় দুনিয়াজোড়া বিজ্ঞান সমাজের। তারাই বলতে পারবে কোন্‌টি বিজ্ঞান, কোনটি নয়। একই কারণে বিজ্ঞানকে খোলামেলা থাকতে হয় সবার কাছে সব সময়; সবার পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকতে হয়। গোপন বিজ্ঞান বলে কিছু নেই, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে লুকিয়ে রাখার সুযোগও এতে নেই। বিজ্ঞানের এই দিকটিকে গুরুত্ব দেবার জন্য বিজ্ঞানকে বলা হয় 'পাবলিক নলেজ'। পারদর্শীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ পাবলিক হলেও এটি সারা বিশ্বজোড়া

পাবলিক– কোন দেশ বা গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বলে এর সদস্য সংখ্যা কম নয়।

বিজ্ঞানের এই খোলামেলা স্বরূপকে একটি বিখ্যাত আবিষ্কারের উদাহরণ দিয়ে কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করা যাক। ১৯৫০ এর দশকের শুরু থেকে ডিএনএ নিয়ে বিজ্ঞানীদের উৎসাহ অনেক বেড়ে গিয়েছিলো, কারণ ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছিলো যে ডিএনএ'র মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবনের কোড– যা প্রজন্মের পর প্রজন্মে জীবের মধ্যে সঞ্চারিত। ব্যাপারটি কীভাবে হয় তা বুঝতে হলে ডিএনএ'র গঠনটি জানা দরকার ছিল। তাই দুনিয়ার বেশ কিছু নামকরা ল্যাবরেটরিতে এই গঠন আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হয়েছিলো। ১৯৫২ সনের শেষের দিকে এ চেষ্টা যখন তুঙ্গে তখন এ প্রতিযোগিতায় এগিয়ে ছিলেন বৃটেনের দুটি বিজ্ঞানী গ্রুপ– ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রান্সিস ক্রিক ও জেম্‌স ওয়াটসনের সমন্বয়ে গ্রুপ; এবং লন্ডনে কিংস কলেজে মরিস উইলকিন্‌স, রোজালিন্ড ফ্রান্সিস (মহিলা বিজ্ঞানী) এবং অন্যদের গ্রুপ। এ সময় বিষয়টির ওপর আরো কাজ শুরু করেন আমেরিকার ক্যালটেকে তখনকার দুনিয়ার সেরা রসায়নবিদদের একজন লিনাস পলিং, ইতোমধ্যে প্রোটিনের গঠন আবিষ্কার করে যিনি অত্যন্ত খ্যাতি পেয়েছিলেন। এই তিনটি গ্রুপের মধ্যে কারা আগে এই রহস্য ভেদ করবে এ নিয়ে দারুণ প্রতিযোগিতা চল্‌ছিলো।

কিন্তু কাছাকাছি থাকা বৃটেনের দুটি বিজ্ঞানী গ্রুপ একই সঙ্গে সমস্যাটি নিয়ে সব অগ্রগতি পরস্পরের কাছ থেকে জানতে পারছিলেন। কনফারেন্সে তাঁরা অগ্রগতি তুলেও ধরছেন, একজনের উপস্থাপনায় প্রশ্ন করে অন্যরা আরো তথ্য জেনে নিয়েছেন। এভাবেই ওয়াটসন প্রতিযোগী গ্রুপের রোজালিন্ড ফ্রান্সিসের তোলা এক্স-রে ছবির দ্বারা উদ্ঘাটিত ডিএনএ কৃষ্টালের আবছা গঠনের প্রথম সাক্ষাত পান। এর থেকে দুই প্রতিযোগী বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও রোজালিন্ড উভয়ে একমত হয়েছিলেন যে ডিএনএ হেলিক্স (সর্পিল) আকৃতির হবে, কিন্তু ঠিক কী রকম হেলিক্স এ নিয়ে উভয়ের মতভেদ ছিল, তর্কও হয়েছে। লন্ডনে গেলে ক্যাম্ব্রিজের গ্রুপ অবশ্যই কিংস কলেজে গিয়ে ওখানকার গ্রুপের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে খেতে এর খুঁটিনাটি নিয়ে আলাপ করতেন। এভাবেই ওয়াটসন এক নজর দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন রোজালিন্ডের খুব পারদর্শিতার সাথে তোলা পরবর্তী একটি অনেক স্পষ্ট এক্সেরে ছবি– যেটি পেঁচানো দুটি হেলিক্সের আভাস দিচ্ছিলো।

নিজেদের কাজ করতে গিয়েই লিনাস পলিঙের প্রবন্ধগুলো তাঁর প্রতিযোগীরা ভাল করে পড়েছেন। এমন কি রাসায়নিক অণুর বন্ধন নিয়ে তাঁর লেখা পাঠ্যবইও, যা

সব স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদেরকেও পড়তে হয়। পলিঙই প্রথম প্রোটিন কৃষ্টালের এক্সরে ছবি থেকে প্রোটিনের হেলিক্স আকৃতি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি একটু তাড়াহুড়া করেই তিনটি হেলিক্স চেইন এবং তার বাইরে বের হয়ে থাকা শাখার ভিত্তিতে ডিএনএ অণুর গঠন খাড়া করে সেটি জার্নালে প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর প্রবল আস্থা তিনি ডিএনএ'র রহস্য ভেদ করেছেন। কিন্তু হায় শিগ্‌গির অন্যরা দেখিয়ে দিলেন যে পলিং এমন সাধারণ কিছু ভুল করেছেন যা তাঁর মত পণ্ডিতের হবার কথা নয়। ক্যাম্ব্রিজের অনেক তরুণতর দুই বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রিক পলিঙের প্রবন্ধটি পড়েই বুঝতে পেরেছিলেন গোলমালটি কোথায়। তাঁরা নতুন উৎসাহে তাঁদের দুই হেলিক্সের পেঁচানো গঠন ও সে দু'টির মাঝখানেই অন্য অংশগুলোর জায়গা হয়ে যাওয়ার মডেলটি নিয়ে কাজ করতে থাকলেন। বিশেষ করে টিনের পাত কেটে কেটে সেগুলোকে তার দিয়ে যুক্ত করে ওরকম অণুর বিরাট মডেল তৈরি ও তাতে খুঁটিনাটি মাপজোক করে, বেশ নিশ্চিতও হয়ে গেলেন এ নিয়ে। ভুল মেনেও পলিং কিন্তু তখনো মনে করছিলেন তাঁর দেয়া তিন চেইনের মূল গঠনটি ঠিক আছে। কিন্তু এর মধ্যে বৃটেনে ভ্রমণের সময় ক্যাম্ব্রিজে ওয়াটসনদের ল্যাবে আসলেন তাঁদের মডেলটি দেখতে। এভাবে টিন কেটে মডেল তৈরির কৌশলটিও পলিঙেরই সৃষ্টি। মডেলটি দেখামাত্র তিনি বুঝতে পারলেন তিনি এই দুই তরুণের কাছে (ওয়াটসনের বয়স তখন মাত্র ২৫ বছর) হেরে গেছেন, তাঁদের সাফল্যের উচ্ছসিত প্রশংসা করলেন। ওদিকে কিংস কলেজ থেকে উইলকিন্‌স ও রোজালিন্ড আসলেন। ওয়াটসন ও ক্রিকের মডেলটি ভাল করে দেখে তাঁদের বুঝতে দেরি হলো না যে মডেলটি একেবারেই ঠিক। রোজালিন্ড বিশেষ করে বুঝলেন তাঁর সঙ্গে হেলিক্স নিয়ে তর্কে ওয়াটসনের যুক্তিগুলোই ঠিক। তখনই সবার মধ্যে স্থির হয়ে গেল একটুও কাল বিলম্ব না করে ওয়াটসন ও ক্রিকের আবিষ্কার মাত্র এক পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধে বিখ্যাত 'নেচার' জার্নালে পাঠিয়ে দেয়া হবে; আর ওই জার্নালের একই সংখ্যার জন্য এক সঙ্গে পাঠানো হবে কিংস কলেজ গ্রুপের আর একটি প্রবন্ধ এতে উইলকিন্‌স, রোজালিন্ড ও অন্যদের অবদান নিয়ে।

সেই থেকে ওয়াটসন-ক্রিক ডিএনএ গঠন জীববিজ্ঞানে অসাধ্য সাধন করেছে। এর পর পরই এই বিষয়ের ওপর যে ব্যাপক গবেষণার সূত্রপত হয় তা ডিএনএ কোডের সর্বব্যাপ্ত জ্ঞান নিয়ে আজকের অণুজীব বিদ্যার (মলেক্যুলার বায়োলজি) আশ্চর্য জগতটি সৃষ্টি করেছে। অথচ লক্ষ্যনীয় যে যেই আবিষ্কারটি শতাব্দীর একটি সর্বসেরা আবিষ্কার হিসেবে বিবেচিত তা সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতার

মধ্যে অথচ খোলামেলা ভাবে, কত স্বাভাবিক ও বন্ধুসুলভ সহযোগিতার মধ্যে। এতে ঝানু বিশ্ব-বরেণ্য বিজ্ঞানী তরুণ নাম না জানা বিজ্ঞানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছেন, কিন্তু যেই মুহূর্তে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বুঝেছেন ওরাই ঠিক, পরাজয় মেনে নিয়ে তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এজন্যই বিজ্ঞানের একটি পরিচয় পাবলিক নলেজ হিসেবে।

পূঞ্জীভূত জ্ঞান দেখে চেনাঃ

যুগযুগ ধরে একটি জ্ঞানের ওপর আরেকটি জ্ঞান যোগ করে যে পূঞ্জীভূত জ্ঞান তৈরি হয় সেটিও বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট। যদিও অনেক তত্ত্ব পরে পরিবর্তিত হয়, বর্জিতও হয়, তবুও তার মধ্য থেকেও যা গ্রহণ করা গেছে তার পূঞ্জীভূত রূপটিই পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের কাজ করে। ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতাকে লক্ষ্য না করে হঠাৎ করে গজানো কিছু মনে করাতেই অনেক সময় আমরা বিজ্ঞানকে ভুল করে জানি। আজকের যে বিজ্ঞান তাতে শুধু আজকের বিজ্ঞানীদের অবদান নেই, বহু কালের এমনকি হাজার বছরের বহু বিজ্ঞানীর অবদান এতে আছে। বিশেষ করে বড় বড় প্রতিভাবানদের জ্ঞানের নির্যাসও এর মধ্যে জমা হয়েছে– সেসবের ওপর অনেকটা নির্ভর করেই আজকের আবিষ্কারটি আসতে পেরেছে। বিজ্ঞান এজন্যই এত সমৃদ্ধ, এতো কার্যকর। পুরানোদের সবার কাজ আজকের আমাদের জন্য এক রকম খোলা বই। সে জন্য যাঁরা বিজ্ঞানী হবেন তাঁদের জন্য তো বটেই অন্যরা যাঁরা বিজ্ঞানকে উপভোগ করতে চান তাঁদের জন্যও বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক পটভূমিগুলো জানা ও তার মর্মকে বুঝতে পারা দরকার, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলোরও বিবর্তনের ইতিহাস।

আমরা যদি বিজ্ঞানের প্রাচীনতম একটি বিষয় জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়টি নিই দেখবো এর জ্ঞানগুলো কীভাবে ইতিহাসের একবারে উষালগ্ন থেকেই পূঞ্জীভূত হয়েছে; এমনকি প্রাগৈতিহাসিক কালেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুখে মুখে তখনকার বিজ্ঞানীরা তা জেনে এসেছেন। লিখিত ইতিহাসের কালের একেবারে শুরু থেকেই অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে ব্যাবিলন এবং মিশরের আকাশ পর্যবেক্ষকরা জ্যোতিষ্কগুলোর গতিবিধির পরিমাপ করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এভাবে বিপুল পরিমাণ তথ্য তাঁরা তাঁদের ক্যাটালগ, পঞ্জিকা ও ক্যালেন্ডারে হাজার হাজার বছর ধরে রেখে গেছেন। পরে একই কাজ করেছেন প্রাচীন চীন ও ভারতের আকাশ পর্যবেক্ষকরা। গ্রীক বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগে দুই হাজার বছর আগে সেখানকার বিখ্যাত বিজ্ঞানীরাও মিশর বা ব্যাবিলনের আকাশ-

ক্যাটালগগুলো ব্যবহার করেছেন। এগুলো এতই নিখুঁত ছিল যে হাজার হাজার বছর ধরে জ্যোতিষ্কগুলোর গতিবিধি এবং মহাকাশের নানা ঘটনা (চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, দীর্ঘতম দিনে সূর্যোদয়ের অবস্থান ইত্যাদির মত) এর মাধ্যমে নিয়মিত ভবিষ্যদ্বাণী করা গেছে, চান্দ্র বছর ও সৌর বছরের মধ্যে সম্পর্ক স্থির করা গেছে। এই পুরো সময়ে নানা দেশে এগুলোর উন্নয়ন হয়েছে বটে কিন্তু হাজার বছরের পুঞ্জীভূত তথ্যের নির্ভুলতায় খুব বড় ব্যত্যয় হয়নি। এরই ভিত্তিতে গ্রীকদের পৃথিবীকেন্দ্রিক তত্ত্ব গড়ে ওঠেছে– বিশেষ করে টলেমির দেয়া অত্যন্ত বিশদ তত্ত্ব। পুরো মধ্যযুগের দেড় হাজার বছরে জ্যোতির্বিদ্যায় এর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে শুধু কিছু কিছু উন্নয়ন যুক্ত হয়েছে মাত্র। ৫০০ বছর আগে কোপারনিকাসের বৈপ্লবিক পরিবর্তন যখন সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের প্রবর্তন করলো, তাতেও প্রাচীন ধারণাগুলোর সব ত্যাগ করা হয়নি, প্রাচীন ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা তো নয়ই। পরে কেপলারের পর্যবেক্ষণের ফল ব্যবহার করে নিউটন বিশ্ব সম্পর্কে আজকের আধুনিক গাণিতিক ধারণাগুলো নিয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু প্রাচীন জ্ঞানের ভিত্তিতেই তা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক এসে কখনোই প্রাচীনকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেয়নি। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ যে সব সমস্যা মোকাবেলা করেছেন, যে হিসেব নিকেশের প্রবর্তন করেছেন, আজও তার অনেক কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চিন্তার ভেতরেই আছে। বিজ্ঞানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকমই হয়।

নতুন নতুন আইডিয়া সৃষ্টির মধ্যে চেনাঃ

বিজ্ঞানের আর একটি বড় বৈশিষ্ট এতে একটি আবিষ্কার নানা দিকে আরো বহু আবিষ্কারের উৎসমুখ হিসেবে কাজ করে। একটি আইডিয়ার সাফল্য এতে নতুন নতুন আইডিয়ার স্ফূরণ ঘটাতে পারে। বিজ্ঞানের একটি ভাল তত্ত্ব হতে গেলে তার মধ্যে এই গুণটি থাকতে হয়– যাতে করে সেটি বহু দুয়ার খুলে দেয়ার ভূমিকা নিতে পারে। এর মাধ্যমে আসে নতুন আইডিয়া , প্রকৃতির নতুন এলাকার পর্যবেক্ষণ, নতুন এক্সপেরিমেন্টের পরিকল্পনা ইত্যাদি। ফলে গবেষণা একটি বিন্দু থেকে নানা দিকে বিচ্ছুরিত হতে পারে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এভাবেই ক্রমাগত উর্বর হতে পেরেছে। বড় কিছু আবিষ্কার আমাদের মনোভঙ্গি এমনকি পুরো বিশ্ব-দৃষ্টিটিই বদলে দিতে পারে। ছোট আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও সেটি যে হয়না তা নয়, তবে সে ক্ষেত্রে শুধু ওই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা বিজ্ঞানীদের মনোভঙ্গিই পরিবর্তিত হয়। যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলো এটি সবার ক্ষেত্রেই করে।

নতুন আইডিয়ার উৎসমুখ হবার ব্যাপারটি বুঝতে একটি উদাহরণ দেয়া যাক। গত শতাব্দীর শুরুর দিকে জার্মান বিজ্ঞানী আলফ্রেড ভেগেনার কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমান করেন যে পৃথিবীর সব মহাদেশ কোটি কোটি বছর আগে পরস্পর একসঙ্গে একটি মহাদেশ ছিল– পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাদেশগুলো ক্রমাগত একে অপর থেকে সরে গেছে। এর মধ্যে তাঁর একটি সহজ পর্যবেক্ষণ ছিল মানচিত্রে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ দুটি বাচ্চাদের জিগ-স'-পাজ্‌লের মত কী সুন্দর একটির সঙ্গে আরেকটি ফিট হয়ে যায় তা দেখে। তাছাড়া তিনি এভাবে সংযুক্ত মহাদেশ দুটির সীমারেখার দুপাশের শিলাস্তর ইত্যাদিতেও মিল ও ধারাবাহিকতা দেখতে পেয়েছেন, সেটিও এক সময় উভয় মহাদেশের একসঙ্গে থাকার প্রমাণ। সে সময় ভূ-তত্ত্ববিদরা ভেগেনারের তত্ত্বটি গ্রহণ করেননি কারণ এই জগদ্দল মহাদেশগুলো কঠিন ভূত্বক ভেঙ্গে নানাদিক এগোবে সে রকম কোন শক্তির উপস্থিতি দেখা যাচ্ছিলনা। কিন্তু কয়েক দশকের মধ্যে এই ধারণাটিই শুধু গৃহীতই হয়নি নানা দিকে বহু নতুন চিন্তার জন্ম দিয়েছে। আগে মনে করা হতো ভূ-ত্বক ক্রমাগত ঠান্ডা হবার ফলে কুঁচকে গিয়ে পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে, ভূমি ওঠানামার মাধ্যমে মহাদেশগুলোর মধ্যে অস্থায়ী স্থল-সেতু তৈরির মাধ্যমে প্রাণী আদান প্রদান হতে পেরেছে, ইত্যাদি। ভেগেনারের ধারণাটির ফলে প্রচলিত এই তত্ত্বগুলো বড় ধরনের চিড় খায়।

অন্য দিকে আগে থেকে জানা ছিল যে ভূ-চৌম্বকত্বের ফলে পৃথিবীর শিলাগুলো চুম্বকত্ব লাভ করে। এসব চুম্বক-শিলাগুলোর মেরুর দিকগুলো সাধারণত এলোমেলো হবার এবং আটলান্টিক সমুদ্র তলে সেগুলোর দিক পর পর সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত হবার জরিপ থেকে উঠে আসে সম্পূর্ণ নতুন আইডিয়া। দেখা গেল সমুদ্র তলের ফাটল দিয়ে নিচের ম্যান্টেল অঞ্চলের গলিত লাভা সজোরে উঠে এসে দুই পাশের জায়গাকে দুই বিপরীত দিকে ধাক্কা দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভূ-ত্বকের বিভিন্ন টুকরাকে (প্লেইট) ক্রমে সরিয়ে দিয়েছে। বোঝা গেল এখানে টুকরার কিনারা যেমন পরস্পর থেকে সরে যাচ্ছে, অন্যত্র কিনারাগুলো একটির নিচে অন্যটি ঢুকে পড়ে নিচের ঘর্ষণের ফলে গলিত হয়ে সেখানে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করছে, ভূমিকম্প সৃষ্টি করছে (যেমন একদিকে জাপানে, ফিলিপাইনে, ইন্দোনেশিয়ায়; অন্য দিকে চিলিতে, পেরুতে)। আবার দুটি স্থল টুকরা যখন একটি গিয়ে অন্যটিকে ঠেলা দিচ্ছে সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে হিমালয় পর্বতমালার মত পর্বতশ্রেণী। মহাদেশগুলো কোটি কোটি বছর আগে কোথায় কী জলবায়ুতে ছিল তার জ্ঞান থেকে জানা গেলো ভূ-প্রকৃতির ও জীবজগতের প্রাচীন ইতিহাস।

চারিদিক থেকে গবেষণার এমন জোয়ারে শিগ্‌গির সৃষ্টি হলো প্লেইট টেকটোনিক নামক সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব যা ভূতত্ত্বের এতদিনের এতসব রহস্যকে একাই ব্যাখ্যা করে এই বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। ভেগেনারের একটি আইডিয়া এত কিছুর সৃষ্টি করতে পেরেছে।

বিজ্ঞান যে আবিষ্কারের বড় বড় ধাক্কা দিয়ে নিজের সম্পর্কেও বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিই মাঝে মাঝে বদলে দিতে পেরেছে সেটিও বেশ লক্ষ্যণীয়। বিজ্ঞানের এই ক্ষমতাটিও তার একটি বৈশিষ্ট। যেমন হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ বিজ্ঞানে যেই বিশ্ব-ছবিই তৈরি করেছে তাতেই পৃথিবীকে এবং নিজেদেরকে বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে দেখতে চেয়েছে। কোপারনিকাসের বৈপ্লবিক সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্ব-ছবি এসে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করে বিশ্বের অন্য দশটা জায়গার সঙ্গে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ফলে বহুকাল পরে এসে আজ সে অন্য জায়গায় বুদ্ধিমান প্রাণী খুঁজতেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাচ্ছে। আরো সাম্প্রতিক কালের আরেক বৈপ্লবিক তত্ত্বে ডারউইন দেখিয়েছেন পৃথিবীর অন্য সব জীবের সঙ্গে মানুষও বিবর্তিত হয়েছে একই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায়– সব জীবের উৎপত্তি একই মূল আদি জীব থেকে। ফলে অন্য গ্রহের থেকে পৃথিবীকে যেমন আমরা আলাদা ভাবতে আর পারিনি, অন্য প্রাণী থেকেও মানুষকে একেবারে আলাদা ভাবা আর সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটলে নিজের বিশ্ব-দৃষ্টিতে আবার কী বড় ধাক্কা আসে কে জানে। এসব বড় ধারণা পরিবর্তনের মধ্যে বিজ্ঞানীদের ভেতরে ছোট ছোট ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হরদম ঘটছে– এদের মাধ্যমেই বাস্তব বিশ্বের সঙ্গে মানুষ নিজের চিন্তাকে আরো সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে পারছে ক্রমাগত।

সামাজিক বিষয় হিসেবে চেনাঃ

বিজ্ঞানের আরো একটি বৈশিষ্টের কথা বলতে হবে যেটিতে সমাজের সব মানুষের একটি ভূমিকা রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বিজ্ঞান এই সাধারণ সমাজের ধার ধারেনা; কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা নয়। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের ওতোপ্রোতো সম্পর্কটি ঘটছে প্রযুক্তির মাধ্যমে। প্রযুক্তিগুলো এখন খুবই বিজ্ঞান-নির্ভর, আর প্রযুক্তিকে বাহন করে বিজ্ঞান আমাদের সবার জীবনে ঢুকে পড়তে পারছে– প্রযুক্তির ভালমন্দের জন্য বিজ্ঞান প্রশংসিত বা নিন্দিত হচ্ছে। কিন্তু অতীতেও বিজ্ঞানকে মানুষের কথা ভেবে কাজ করতে হয়েছে। যেমন হাজার হাজার বছর আগের তখনকার জ্ঞানীদের আকাশ

পর্যবেক্ষণকে নেহাৎ কৌতুহল ও পান্ডিত্যের কাজ মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তার বড় প্রেরণা এসেছিলো ক্যালেন্ডার, পঞ্জিকা ইত্যাদি তৈরি করতে– যার ওপর ভিত্তি করে সাধারণ মানুষের কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পেরেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু থেকে একে নানা ভাবে সাধারণ মানুষের কাজে লাগানোকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে– সেই ১৭০০ শতকে নিউটনের আমল থেকেই ইংল্যান্ডে রয়্যাল সোসাইটির কাজকর্ম দেখলে সেটি ভাল বোঝা যায়। এখন বিজ্ঞান ব্যয়বহুল হয়ে পড়ায় এই ব্যয় যোগাতে সমাজের সমর্থন আরো বেশি প্রয়োজন হচ্ছে– বিশেষ করে বিরল চিকিৎসা গবেষণা, মহাশূন্য গবেষণা, বিশ্ব-সৃষ্টি নিয়ে মৌলিক পদার্থবিদ্যার গবেষণা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তো বটেই। সমাজের কাছে বিজ্ঞানকে আসতে হয় বলে এর ওপর সমাজেরও এক রকম খবরদারি দেখা যায়। তাই মানব ভ্রূণ গবেষণা নিয়ে, জিন-পরিবর্তিত খাদ্য নিয়ে, বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা সব পর্যায়েই হয়ে থাকে। এটিও বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট; শুরু থেকে এখন অবধি এরকম সামাজিক সম্পর্কটি থাকতে অন্য অনেক জ্ঞান চর্চায় তেমন দেখা যায়না।

ওপরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট থেকে বিজ্ঞানের মধ্যে আবশ্যিক কিছু আলামত এসে পড়েছে। তার একটি হলো বিজ্ঞান শুধু সেই বিষয়েই কথা বলতে পারে যেগুলো বাস্তবে যাচাইযোগ্য, অন্তত যাচাইয়ের একটি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যার রয়েছে। যদি সেই সুযোগ না থাকে, যদি শুধু কোন কর্তৃপক্ষের দোহাই দিয়ে, বা কোন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের দোহাই দিয়ে কিছু গ্রহণ বা বর্জন করতে হয় তা হলে সেটি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হবেনা। আর একটি আলামত হলো বিজ্ঞানের মধ্যে একটি আভ্যন্তরীন সামঞ্জস্য থাকতে হয়, যে কোন স্ববিরোধিতা এতে এড়াতে হয়। আমাদের সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে, অন্য কোন চর্চার সঙ্গে তার বিরোধিতা থাকতে পারে– কিন্তু তার নিজের সঙ্গে নিজের তা থাকতে পারবেনা। আর এও মনে রাখতে হয় যে বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব কিন্তু সে সম্পর্কে শেষ কথা হতে পারেনা– তা সেটি যতই সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বই হোক না কেন। ভবিষ্যতে এই তত্ত্বেরও উন্নয়ন হতে পারে, পরিবর্তন হতে পারে, এমনকি বর্জনও ঘটতে পারে। কাজেই বৈজ্ঞানিক সত্যগুলোকে সব সময় আপাত সত্য হিসেবে নিতে হয়, চূড়ান্ত সত্য হিসেবে নয়। পরে আমরা দেখবো তা সত্ত্বেও এই সত্য কেন এত মূল্যবান। আসলে বিশ্ব-রহস্য অসম্ভব রকম জটিল জিনিস, বিজ্ঞান যে সাহস করে এটি জানার চেষ্টা করে তার পুরস্কারটি কম নয়। আইনস্টাইনের ভাষায় "আসল বাস্তবতার তুলনায় যদি বিজ্ঞানকে মাপি তা হলে সেটি অবোধ শিশু-

সুলভ একটি ব্যাপার বৈ কিছু নয়; কিন্তু আমাদের কাছে এর চেয়ে মূল্যবান জিনিস আর কিছু নেই।"

কাজ করে বলে চেনাঃ

বিজ্ঞান যে মানুষের সৃষ্টি, তার পরতে পরতে যে মানব চিন্তার বৈশিষ্টের ছাপ, তার কিছুটা ওপরে দেয়া বিজ্ঞানের নানা পরিচয়তেই ধরা পড়ে। ওই যে বিজ্ঞানের পদ্ধতি কী হওয়া উচিত তা যুগে যুগে বিজ্ঞানীরাই ঠিক করেছেন, বাইরে থেকে কোন কর্তৃপক্ষ এসে ঠিক করে দেয়নি। বড়জোর কেউ বলতে পারেন বিজ্ঞান সমাজ এটি ঠিক করেছে– তবে সেই সমাজতো শুধু বিজ্ঞানীদের নিয়েই। ওই যে বলা হলো বিজ্ঞানকে সব বিজ্ঞানীদের কাছে যাচাই করার জন্য উম্মুক্ত রাখতে হবে, সেও তো বিজ্ঞানীদের নিজেদের কাছেই। যখন বলি তার মধ্যে আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য থাকতে হবে; সেরকম আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য বজায় রেখে তো বিজ্ঞানের নামে যে কোন ধরনের কল্পকাহিনীও তৈরি করা সম্ভব, তা করবে কিনা সেটিতো ওই বিজ্ঞানীদেরই শাসনের ব্যাপার। আরো মজার ব্যাপার হলো পরে এক পর্যায়ে আমরা দেখবো বিজ্ঞানীরা সরল তত্ত্ব পছন্দ করেন, সেই তত্ত্বটি নান্দনিক আর গাণিতিক ভাবে সুন্দর হলে সেটিকেই সব চেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব মনে করেন তাঁরা। ভাল তত্ত্ব, ভাল বিজ্ঞান হবার এই শর্তটি তাঁরা কার্যক্ষেত্রে সব সময় ব্যবহার করেন। জটিল প্রকৃতির মধ্যে সরল ও সুন্দর নিয়ম আবিষ্কারের এই যে আকুতিটি সেটিতো প্রকৃতির নয়, বরং ওই মানুষ বিজ্ঞানীর আকুতি। কাজেই বলা যায় যে মানবিক গুণাবলী আরোপ করেই মানুষ বিজ্ঞানকে সাজিয়েছেন। এজন্য বিজ্ঞানের নানা সংজ্ঞা দেবার ঝামেলা এড়াবার জন্য, অনেকে সোজাসাপটা এমন কথা বলে দেন যে 'বিজ্ঞানী যা করেন, তাই বিজ্ঞান'।

তবে এভাবে যত যুক্তি দিয়ে বলা হোকনা কেন যে বিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানীদের খেয়াল, এই খেয়ালের একটি দারুণ বিশেষত্ব আছে– আর সেটি হলো বিজ্ঞান কাজ করে। এর মধ্যে অদ্ভুত একটি কার্যকারিতা আছে যাকে ভরসা করতেই হয়। এটি যা বলে তা করে দেখায়, এবং সেখান থেকে আরো অনেক কিছুই সৃষ্টি করে যেগুলোকেও আবার করে দেখায়, এভাবে চলতেই থাকে। আমাদের কাজ করে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়, জানার কৌতুহল মেটায়, আমাদেরকে একটি বিশ্ব-দৃষ্টির অধিকারী করে। একেবারেই মানবিক হয়েও এটিই বিজ্ঞানের ম্যাজিক।

পদ্ধতির দিকে আর একটু তাকাই

পদ্ধতি গৎবাঁধা নয়, সরল রৈখিকও নয়ঃ

আজকের দিনের বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে এক নিশ্বাসে যেভাবে বলা হয় তা এক ঝলকে আগে দেখেছি। এটি হলো সমস্যা নির্বাচন, আনুমানিক তত্ত্ব খাড়া করা, অনুমান থেকে যৌক্তিক ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়া, বাস্তব যাচাইয়ে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলে অনুমানটি তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করা, মিথ্যা হলে গ্রহণ না করা। এই যে সরল-রৈখিক পদ্ধতিটির কথা বলা হয় এর থেকে বিজ্ঞানের কাজের ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবে বিজ্ঞান এমন সোজা পথে কাজ করেনা। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বরং যাচাইয়ের মূল শর্তটি বজায় রেখে নানান্ পথে কাজ করে।

যেমন শুরুতে যে সমস্যা নির্বাচন দেখলাম অনেকে হয়তো সে রকম কোন সমস্যা থেকে কিছু শুরু করেনি, বরং নেহাৎ কাকতালীয় ভাবে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার অনুসন্ধান করতে গিয়ে এতে ঢুকতে হয়েছে তাঁকে। বিজ্ঞানের অনেক বড় আবিষ্কার এভাবে হয়েছে। প্রথম এন্টিবায়োটিক ওষুধ পেনিসিলিন ল্যাবোরেটরিতে জীবাণু কালচার করার গতানুগতিক কাজ করতে গিয়ে দৈবক্রমে আবিষ্কৃত হয়েছিলো। এর আবিষ্কর্তা আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালের একদিন লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর ল্যাবোরেটরিতে একটি পেট্রি ডিশে (জীবাণু বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিদ্রব্য রাখা ছোট প্লেইট) যে জীবাণু বাড়ছিলো তার একদিকে কিছু ছাতা (ছত্রাক) দেখা দিয়েছে। হয়তো বাতাস থেকে গিয়ে এ ছাতা পড়েছিলো যেভাবে আমাদের কাপড়চোপড়, ব্যাগে, বা জুতায় ছাতা পড়ে। কিন্তু অবাক হয়ে তিনি দেখলেন যেদিকে ছাতা পড়েছে সেদিকের জীবাণু মরে গিয়ে তাদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেছে। পরে আরো গবেষণায় এই পেনিসিলিয়াম নামক বিশেষ ছাতাটি থেকেই জীবাণুনাশক পেনিসিলিন পাওয়া গেছে; আরো পরে অন্যান্য ছত্রাক থেকে অন্যান্য এন্টিবায়োটিক। ব্যাপারটি একেবারে পুরো কাকতালীয়। ফ্লেমিং এর ল্যাবোরেটোরিটি যদি আর একটু সাফ-সুতরো হতো আবিষ্কারটি হয়তো তখন ঘটতোইনা।

আর একটি কাকতালীয় আবিষ্কারের কথা বলতে পারি মাইক্রোওয়েভ ওভেনের কাজ নিয়ে। ১৯৪৫ সালে পার্সি স্পেন্সার তাঁর রাডার কোম্পানীর ল্যাবোরেটরিতে মাইক্রোওয়েভ রাডার নিয়ে কাজ করছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শত্রু বিমান

উদ্ঘাটনের জন্য যে বিভিন্ন ধরনের রেডিয়ো তরঙ্গ রাডার হিসেবে ব্যবহৃত হতো তার মধ্যে মাইক্রোওয়েভ একটি। স্পেন্সার সেদিন ল্যাবে কাজ করতে গিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়লেন তাঁর শার্টের পকেটে রাখা একটি চকলেট বার গলে শার্টে দাগ লাগিয়ে একশা করে ফেলাতে। এতে কৌতুহলী হয়ে কিছু অনুসন্ধান চালিয়ে তিনি বুঝলেন যে ব্যাপারটি ঘটেছে ওই মাইক্রোওয়েভ রাডারের কারণে। সেটি বন্ধ থাকলে চকলেট শক্ত থাকছে, চালু অবস্থায় এর কাছে নিলে চকলেট গরম হয়ে গলে যাচ্ছে। ওখান থেকে গবেষণার শুরু। বোঝা গেল শুধু চকলেট নয়, অধিকাংশ খাবার এতে গরম হয়, আর তা হচ্ছে ওর মধ্যে পানি, চর্বি, চিনি ইত্যাদির অণুকে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ কাঁপায় বলে। এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জন্ম দিলো মাইক্রোওয়েভ ওভেন যা এখন মানুষের ঘরে ঘরে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দৈবক্রমে আবিষ্কারের এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সমস্যা আসে সুচিন্তিত ভাবে আগের কোন বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন থেকে, কোন নতুন জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে, অথবা বাস্তব কোন সমস্যা সমাধান করতে। গবেষণার শুরু যেমন বিভিন্ন কারণে হতে পারে, এর অন্যান্য পর্যায়েও নানা বিকল্প পথের সুযোগ আছে– এক এক ধরনের কাজে যার এক এক ধরনের বিকল্প কাজে লাগতে পারে। পারিপার্শ্বিক সব কিছুর বিবেচনায় বিজ্ঞানীর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো ঘটনার ব্যাখ্যায় একটি আনুমানিক তত্ত্ব খাড়া করা। শুধু ঘটনা দেখে গেলেই, বা এর ওপর একগাদা উপাত্ত সংগ্রহ করে গেলেই বিজ্ঞান এগুতে পারেনা। ওই উপাত্তের মধ্যে একটি প্যাটার্ন বা নিয়ম যদি লক্ষ্য করা যায় এবং তার ব্যাখ্যায় একটি অনুমান খাড়া করা যায় তবেই এগুতে পারে। অনুমানটি শুরু থেকে সঠিক পথে না হলে কানাগলিতে ঘোরার আশঙ্কা থাকে। ওপরের পেনিসিলিন বা মাইক্রোওয়েভ ওভেনের উদাহরণে কার্যকারণটি কিছুটা স্পষ্ট বলে সঠিক অনুমানে হয়তো খুব বেগ পেতে হয়নি।

কিন্তু ১৯৬৭ সনে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ছাত্রী জোসিলীন বেল দূর যে তারা থেকে রেডিও তরঙ্গ আসে সেগুলোর খোঁজ করছিলেন সেখান থেকে আসা তরঙ্গ রেকর্ড করে। একটি ক্ষেত্রে তিনি দেখলেন ক্রমাগত ১৩.৩ সেকেন্ড পর পর একটি স্পন্দনের মত সিগ্‌ন্যাল আসছে। ব্যাপারটি ব্যতিক্রমী; জোসিলীন বেল ও তাঁর শিক্ষক ও পিএইচডি সুপারভাইজার এন্টোনি হিউয়িশের প্রথম আনুমানিক তত্ত্বটি ছিল খুবই রোমাঞ্চকর। বাতিঘরের বাতি যে রকম ঠিক নির্দিষ্ট সময় পর পর যেভাবে দূর নাবিকের কাছে সিগন্যাল দিয়ে নিজের অস্থিত্ব

জানায় এও দূরের তারার জগতে কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর সিগন্যাল হতে পারে ভেবে তাঁরা প্রাথমিক ভাবে এগুলেন। এ সময় এরকম দূর বুদ্ধিমানের খোঁজে একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প চলছিল, কাজেই তা অস্বাভাবিক মনে হয়নি। ওই সিগন্যালটির উৎসের একটি নামও তাঁরা দিয়েছিলেন লিটল গ্রিন ম্যান– সংক্ষেপে এল জি এম। অবশ্য কিছু দিনের মধ্যে মহাকাশের অন্য অংশে এরকম সিগন্যালের আর একটি উৎস উদ্ঘাটিত হলে এই অনুমানটি আর টেকানো যায়নি।

তাঁদের পরবর্তী অনুমানটি অত্যন্ত সফল হয়েছিলো। কোন তারা যখন শক্তি ফুরিয়ে মরে যায় তখন তা নিজের ওপর ধসে পড়ে শুধু ভারী কণিকা নিউট্রনে তৈরি 'নিউট্রন তারায়' পরিণত হয়। একথাও তখন জানা ছিল যে সেগুলো অভাবনীয় রকমের ঘন ও ছোট হয়ে আসে। উচ্চ চৌম্বক শক্তি সম্পন্ন নিউট্রন তারা ঘূর্ণায়মান হলে তার থেকে রেডিও তরঙ্গ বিকীর্ণ হবার কথা। জোসিলীন বেল ও হিউয়িশ অনুমান করলেন যে একটি এরকম তারার ঘূর্ণনে যখনই বিকিরণটি পৃথিবী বরাবর হচ্ছে তখনই সিগ্ন্যালটি আসছে। অনুমানের যথার্থতা প্রমাণ করে তাঁরা 'পালসার' নামের সম্পূর্ণ নতুন এই জিনিস মহাশূন্যে আবিষ্কার করেন যা পরবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। জোসিলীন বেলের এ আবিষ্কারের পর পর তাঁর মুখেই এর কাহিনী শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে বৃটেনের সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের চা খাওয়ার ঘরে। ১৯৬৮ সালে তিনি ক্যাম্ব্রিজে ছাত্রত্ব শেষ করে ওখানে গবেষণার চাকরি নিয়েছেন, আমিও সেখানে বিভাগের গবেষণা-ছাত্র। এর ছয় বছর পর হিউয়িশ এ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান, জোসিলীনের বাদ পড়ার জন্য নোবেল কমিটি বেশ সমালোচিত হয়েছিলো।

অনুমান যে কোন্ দিক থেকে কী ভাবে মাথায় আসবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে আঁটঘাট বেঁধে যাবতীয় তথ্যের আলোকে এটি করতে হয়। অনেক সময় চট্ করে সাহসী অনুমানও অনেক বিজ্ঞানী করেন, যেমন ওই লিটল গ্রিন ম্যানের অনুমানটিতে করা হয়েছিলো– সফল হলে সেটি আরো দারুণ ব্যাপার হতো। ভেগেনার মানচিত্রকে জিগ্-স'-পাজলের মত ফিট হতে দেখে সাহসী অনুমান করেছিলেন যে মহাদেশগুলো চলাচল করছে। শেষ পর্যন্ত অনুমানটি সফল হয়েছিলো। কখনো কখনো একটি সাফল্য পরবর্তী গবেষণার অনুমানটিকে খুব সহজ করে দেয়। যেমন ওয়াটসন ও ক্রিক যখন দুই হেলিক্সে গড়া ডিএনএর গঠনটি আবিষ্কার করেন সেই গঠনটি দেখা মাত্র সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়েছে

ডিএনএ কীভাবে জীবের গুণাগুণের কোড ধারণ করে এবং তার প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে। যদিও এর খুঁটিনাটি আবিষ্কৃত হতে আরো সময় লেগেছে, কিন্তু তার জন্য অনুমান খাড়া করাটি ওই গঠন আবিষ্কারের ফলে খুব সহজ হয়ে গিয়েছিলো। অনুমান শুধু করলেই হলোনা সেটি এমন অনুমান হতে হবে যা বিশ্লেষণ করে যাচাইযোগ্য কিছু পূর্বাভাষ দেয়া সহজ হয়। কখনো কখনো সুনির্দিষ্ট ভাল অনুমান দূরে থাক্ কোন অনুমানই খুঁজে পাওয়া যায়না– সেক্ষেত্রে ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে।

ঘটনা-বর্ণনার তত্ত্ব বনাম পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বঃ

অনুমান-ভিত্তিক কোন তত্ত্ব খাড়া না করেও বিজ্ঞান গবেষণা সম্ভব, এবং তা প্রচুর হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে ঘটনার পেছনে কী কারণ, কী প্রক্রিয়া কাজ করছে তা জানা না গেলেও এতে ঘটনাটিতে কিসের ওপর কী নির্ভর করছে সেই নিয়মটি উদ্ঘাটিত হয় এক রকম তত্ত্বের আকারে। এ ধরনের তত্ত্বকে বলা হয় ঘটনা-বর্ণনার তত্ত্ব (ফিনোমেনোলজিক্যাল থিয়োরি)। এতে ঘটনাটির বিভিন্ন নিয়ামকের মধ্যে কোন পরস্পর-সম্পর্ক থাকলে তা খুঁজে বের করা হয় এবং সাধারণত কোন ফরমুলার আকারে তা প্রকাশ করা হয়। এদের মধ্যে যে নিয়ামকটি জানা থাকেনা, অন্যগুলোর থেকে ফরমুলা অনুসরণ করে সেটি পাওয়া যায়। ওই ভাবে ঘটনা-বর্ণনার তত্ত্বও বেশ কার্যকর হতে পারে, যদিও এতে ঘটনাটির সব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়না বলে বিজ্ঞানীদের মন এতে ভরে না। সুদূর অতীতে এক সময় বিজ্ঞানের প্রায় সব তত্ত্বই এরকম ছিল, এখনো তা সংখ্যায় কম নয়। যতদিন সব কিছু ব্যাখ্যা করে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছে না ততদিন এতেই কাজ চলে।

নিউটনের সমসাময়িক নাম করা বৃটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল বায়বীয় পদার্থের গুণাগুণ নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করার সময় এক্সপেরিমেন্টে যে উপাত্ত পেয়েছেন তাতে যে কোন গ্যাসের আয়তন ও তার চাপের মধ্যে একটি সম্পর্ক দেখতে পেয়েছেন। তিনি সেই সম্পর্কটিকে একটি ফরমুলায় আনতে পেরেছেন যাকে 'বয়েলের নিয়ম' বলা হয়। এতে দেখা যায় উত্তাপের কোন পরিবর্তন না হলে একই পরিমাণ গ্যাসের আয়তন বাড়লে গ্যাসটির চাপ সমানুপাতিক ভাবে কমে যায়। কেন কমবে তার কোন ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যায়না। কোন অনুমানও তার জন্য করা হয়নি। তবে তা সত্ত্বেও বাস্তব কাজে ব্যবহারের জন্য এটি বেশ উপযোগী একটি নিয়ম– যেমন বড় জায়গায় রাখা গ্যাসকে হঠাৎ ছোট জায়গায় সঙ্কুচিত করলে চাপ কী ভাবে বেড়ে যাবে তা নির্ণয় করতে। এটি একটি ঘটনা-

বর্ণনার তত্ত্ব। পরে গ্যাসের একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব আবিষ্কার হয়েছে যার নাম 'গ্যাসের গতি-ভিত্তিক তত্ত্ব'। এতে অনুমান করা হয়েছে যে গ্যাস অণু দিয়ে গঠিত এবং অণুগুলো সব সময় উত্তাপ অনুযায়ী ছুটাছুটি করছে। এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে আমরা দেখি গ্যাসের পাত্রের আয়তন বড় করলে ওই ছুটাছুটি করা অণুগুলোর যতগুলো আগে পাত্রের দেয়ালে গিয়ে আঘাত করতে পারতো তখন তার চেয়ে কম সংখ্যক অণু একই সঙ্গে আঘাত করতে পারবে। কাজেই তার চাপ সমানুপাতিক ভাবে কমে যাবে। এভাবে আমরা গতিভিত্তিক তত্ত্ব থেকে যুক্তির ভিত্তিতে বয়েলের তত্ত্বটি পেয়ে যাই। অনুমানটি এতে যাচাইও হলো। বয়েলের তত্ত্ব কেন কাজ করে তার ব্যাখ্যাও গতিভিত্তিক তত্ত্বে পেয়ে যাই। এ কারণেই গতিভিত্তিক তত্ত্ব একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব, বয়েলের তত্ত্ব তা নয়। পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব পাওয়ার আগে আরো অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনা-বর্ণনার তত্ত্ব দিয়েই কাজ সারতে হয়েছে। সেগুলো পরে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব পেতে সহায়কও হয়।

ভেবে জানাঃ

ভাল একটি অনুমান করতে পারলে যুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে (বিশেষ করে গাণিতিক যুক্তি বিস্তারে) সেখান থেকে নানা ভবিষ্যদ্বাণী বা সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভব হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় যৌক্তিক নির্ণয় (ডিডাকশন)। এটি অনেকটা যে কোন অংকের ফলাফল নির্ণয় করার মত, যেমন সমীকরণের সমাধান বের করার মত কাজ। ধাপে ধাপে অংক করে হয়তো আমরা ওই ফলাফলে পৌছি। এই দিক থেকে গণিত মাত্রই যৌক্তিক নির্ণয়। এভাবে নেয়া ভবিষ্যদ্বাণী বা সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়াটি পুরাপুরিই অনুমানটি সঠিক হবার ওপর নির্ভর করে। এ যেন জানা কিছু উপাত্তের ভিত্তিতে একটি কল্পিত প্রক্রিয়া খাড়া করলাম আর তাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তার থেকে কী কী ঘটতে পারে তা অংক করে অথবা যুক্তির মাধ্যমে নির্ণয় করে ফেল্‌লাম। এ সব কাজগুলো তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের কাজ। এই তাত্ত্বিক বিজ্ঞান আসলে গবেষণাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে। গণিতের যুক্তি এই সিদ্ধান্তগুলোকে এমন বিশ্বাসযোগ্য অবস্থায় নিয়ে আসতে পারে, এবং এর নানা অংশের মধ্যে এমন সব সামঞ্জস্য এনে দিতে পারে যে শুধু তার জোরেই ভাল অনুমান থেকে ভাল একটি তত্ত্ব খাড়া হয়ে যেতে পারে। গণিতের সমীকরণগুলো অনেক সময় অদ্ভুতরকম এক ধরনের বাস্তবতার ভাব নিজেই এনে দিতে পারে। এর ফলে বাইরের বাস্তবতার সঙ্গে যাচাইয়ের আগেই সেটি বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতার সৃষ্টি করে। এই পর্যায়ে অর্থাৎ

আনুমানিক তত্ত্ব খাড়া করা, তার থেকে নানা ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণীর যৌক্তিক নির্ণয়, এবং ওভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌছা– ইত্যাদি সব কাজ কিন্তু যুক্তির মাধ্যমে করা হচ্ছে। এর সবই আমাদের ভাবনার মধ্যে, বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়ার দায় সেখানে নেই। এভাবে জানার পদ্ধতিকে আমরা বলতে পারি যুক্তিতে জানা অর্থাৎ 'ভেবে জানা' (র‍্যাশনাল)। এক সময় বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ভেবে জানাকে অনেক বিজ্ঞানী বেশি গুরুত্ব দিতেন, এমনকি একমাত্র গুরুত্ব দিতেন।

পরে অবশ্য সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। শুধু ভেবে জানাতে বিজ্ঞান চলেনা। উদাহরণ স্বরূপ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অনেক তত্ত্ব গাণিতিক গুণে অভাবনীয় চমৎকার ভাবে খাড়া হয়েছে– যেমন আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরকম তত্ত্বেও নানা কিছু ঘটার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যতক্ষণ বাস্তব পর্যবেক্ষণ পরিমাপে বা এক্সপেরিমেন্টে যাচাই না হয়েছে তা তত্ত্ব হিসেবে পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। যে কোন তত্ত্ব ওভাবে যাচাই হবার পরই সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখনো অনেক তত্ত্ব গাণিতিক ভাবে চমৎকার রূপ নিয়েছে এবং যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে যাচাই হয়নি বলে তারা প্রতিষ্ঠিত নয়। যেমন পদার্থবিদ্যায় ষ্ট্রিং থিয়োরি নামে পরিচিত তত্ত্বটি দারুণ প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি করেছে, কিন্তু যাচাই হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে এমনো হতে পারে যে ওভাবে গাণিতিক বা যৌক্তিক নির্ণয়ে বেশ পাকাপোক্তভাবে খাড়া হয়ে যাওয়া তত্ত্বের পূর্বাভাষ যাচাই করার মত প্রযুক্তি বা পরিস্থিতি এ মুহূর্তে মোটেই নেই। সে ক্ষেত্রে তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হবেনা বটে, কিন্তু তাই বলে ভুল প্রতিপন্ন হয়ে বাতিলও হবেনা। এর ওপর ভিত্তি করে আরো তাত্ত্বিক গবেষণা চলতে পারে যা একে আরো শক্ত করবে বা পরিবর্তিত করবে; হয়তো ভবিষ্যতে এসব যাচাই হবার মত প্রযুক্তি ও পরিস্থিতি আসবে তখনই এটি পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত হবে। সাম্প্রতিক দুটি উদাহরণের মধ্যে দেখবো দেরীতে হলেও ব্যাপারটি ঘটতে পারে।

২০১৬ সালে অনেক আয়োজনের একটি এক্সপেরিমেন্টে অবশেষে মহাকর্ষ তরঙ্গ জিনিসটা উদ্ঘাটিত হয়েছে। এর ঠিক এক শত বছর আগে ১৯১৬ সালে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন যাতে তিনি গাণিতিক যৌক্তিক নির্ণয়ের মাধ্যমে মহাকর্ষ তরঙ্গের ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী যে স্থান-কালে মহাবিশ্ব গড়া যে কোন ভরযুক্ত জিনিসের উপস্থিতিতে ভাঁজযুক্ত বা বিকৃত আকৃতি লাভ করে। এই বিকৃতির মাধ্যমে তিনি মহাকর্ষকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর অনুমান থেকে এর সবই গাণিতিক ভাবে নির্ণিত হয়েছিলো। এর থেকে যে ভবিষ্যদ্বাণী এসেছে তার কিছু কিছু

তখনই বাস্তবে যাচাই হওয়াতে তত্ত্বটি তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু একটি খুঁত থেকে গিয়েছিলো তা হলো এর আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী মহাকর্ষ তরঙ্গ এই একশত বছরেও যাচাই হতে পারেনি উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে। এতে বলা হয়েছে বেশি ভরের বস্তুর ত্বরণে ওই স্থান-কালের বিকৃতিটি একটি তরঙ্গের আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং আলোর গতিতে চলবে। পানিকে কোথাও উথাল-পাতাল করলে দিঘীর পানিতে যে রকম পানির তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এও অনেকটা সে রকম। পৃথিবী থেকে বহু দূরে বড় কোন ভরে ওই উথাল-পাতাল হলে পৃথিবীতে আসতে আসতে তরঙ্গটি এত দুর্বল হয়ে যায় যে আমাদের কোন প্রযুক্তিতে তার উদ্ঘাটন সম্ভব হচ্ছিলনা। স্থান-কালের এই ভাঁজের তরঙ্গের ফলে ও সময় পৃথিবীর সব বস্তু এর তালে তালে ক্রমান্বয়ে লম্বা-বেঁটে হবার কথা। কিন্তু এটি এতই সামান্য পরিমাণে যে তা মাপার কোন পদ্ধতি এতদিন আমাদের ছিলনা। অবশেষে ২০১৬ সালে সেটি উদ্ঘাটিত হলে আইনষ্টাইনের তত্ত্বটি আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

অন্য উদাহরণটি হলো ২০১২ সালে আর একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও বহুদিনের বিপুল আয়োজনে করা এক্সপেরিমেন্টে হিগ্‌স বোসন নামক মৌলিক কণিকাটির উদ্ঘাটন। ১৯৬০ এর দশকে পিটার হিগ্‌স এবং আরো কয়েকজন বিজ্ঞানী তাত্ত্বিক গাণিতিক কাজের মাধ্যমে (ভেবে জানা) বিশেষ কিছু গুণ সম্পন্ন একটি মৌলিক কণিকার পূর্বাভাস দেন, যেটি ক্ষণস্থায়ী এবং যার উদ্ঘাটন অত্যন্ত কঠিন। মৌলিক কণিকাগুলো হলো বিশ্বের সকল বস্তুর ও শক্তির একান্ত মৌলিক ক্ষুদ্র একক যাদের দিয়ে বাকি সব গড়া। এর মধ্যে অনেকগুলোই ক্ষণস্থায়ী মাত্র। পরবর্তী ৫০ বছরে উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে হিগ্‌স বোসন নামে পরিচিত এই পূর্বাভাষ দেয়া কণিকাটি বাস্তবে ধরা পড়েনি। এর ফলে হিগ্‌সের আবিষ্কারটি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। অথচ ইতোমধ্যে যাবতীয় মৌলিক কণিকাগুলো নিয়ে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সার্বিক তত্ত্ব, যাকে স্ট্যান্ডার্ড মডেল বলা হয় সেটি সবিস্তারের খাড়া হয়েছে এবং তার নানা পূর্বাভাষ যাচাই হওয়াতে প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। এই স্ট্যান্ডার্ড মডেলের মধ্যে হিগ্‌স বোসন যথারীতি তাত্ত্বিক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিলো। ভেবে জানা এই জিনিসটাকে বিজ্ঞানীরা এক রকম বাস্তবের মতই মেনে নিচ্ছেন, অথচ তখনো তার বাস্তব অস্থিত্ব প্রমাণিত হয়নি। এই অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে এই হিগ্‌স বোসন উদ্ঘাটনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। অবশেষে সেটি সম্ভব হয়েছে ২০১২ সালের সেই এক্সপেরিমেন্টে। শুধু এই বাস্তব প্রমাণের অভাবে তাঁর তত্ত্ব ৫০ বছর ধরে যথেষ্ট নন্দিত হওয়া সত্ত্বেও

পিটার হিগ্‌স এর জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন মাত্র কণিকাটি উদ্ঘাটিত হবার পরের বছর ২০১৩ সালে। আধুনিক বিজ্ঞানে বাস্তব যাচাই ছাড়া গাণিতিক ভাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বও পূর্ণ স্বীকৃতি পায়না। বাংলাদেশে আমাদের জন্য হিগ্‌স বোসনের আবিষ্কার একটি বাড়তি আনন্দ এনে দিয়েছে কারণ এই কণিকার নামের সঙ্গে বোসন কথাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসুর নামটিকেই ধারণ করছে (বসু থেকে ইংরেজী কায়দায় বোস, সেখান থেকে বোসন)। বোসন গোষ্ঠির সব মৌলিক কণিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা কালীন তাঁর আবিষ্কৃত বিখ্যাত বোস-আইনস্টাইন ষ্টাটিসটিক্‌স দ্বারা পরিচালিত বলেই সেই কণিকাগুলোর এই নাম– হিগ্‌স বোসন সহ।

দেখে জানা:

বাস্তব যাচাইয়ের অভাব দীর্ঘ সময় ধরে এরকম স্বীকৃতির অভাবটিই দেখিয়ে দেয় যে আধুনিক বিজ্ঞানে শুধু ভেবে জানার মাধ্যমে কোন কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়না, তাতে যুক্তির বা গাণিতিক ধার যতই জোরালো থাকুক না কেন। এর জন্য দরকার যৌক্তিক ভাবে পাওয়া ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর বাস্তব যাচাই যাকে আমরা বলতে পারি 'দেখে জানা' (এম্পিরিক্যাল)। কারণ এই যাচাই শেষ পর্যন্ত আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে গ্রাহ্য হয়েই যাচাই– দেখে, শুনে, স্পর্শে, শুঁকে বা স্বাদ নিয়ে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখে। সেটি সরাসরিও হতে পারে, আবার সহায়তাকারী যন্ত্রপাতির মাধ্যমেও হতে পারে– যেমন অণুবীক্ষণে, দূরবীক্ষণে, বৈদ্যুতিক সিগন্যাল-ছবির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন ভাবে। এই দেখে জানার প্রক্রিয়ার মধ্যে এক্সপেরিমেন্টের কথাই বেশি বলা হয়। যদিও সেটিই সব চেয়ে ভাল প্রক্রিয়া, তবে তার অন্য নানা উপায়ও আছে। দেখে জানার সেই বিকল্পগুলো উপায়গুলোও ক্ষেত্র বিশেষে প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ ভাবে বাস্তব যাচাই অর্থাৎ দেখে জানার অর্থ হলো বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের মাধ্যমে প্রকৃতির কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করা অর্থাৎ দেখা। তাই তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি ধূমকেতু আকাশের যথাস্থানে যথাসময়ে এসেছে কিনা সেটি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ না থাকলেও সেটি দেখা যায়, তার অবস্থান গতিবিধি ইত্যাদির মাপজোক করা যায়– সে সব যদি ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে মেলে তা হলেই যথেষ্ট। অবশ্য বৈজ্ঞানিক ভাবে নিশ্চিত হবার জন্য একে বার বার দেখতে হবে, নানা জায়গা থেকে দেখতে, নানা পর্যবেক্ষক আলাদা ভাবে সেটি নিশ্চিত করবেন। তাছাড়া হ্যালির ধুমকেতুর মত কিছু যা

নির্দিষ্ট সময় পর পর আসার পূর্বাভাষ রয়েছে (৭৫ বছর পর পর) তা সময়ের ওই ব্যবধানে পর পর বহুবার দেখে নিশ্চিত হতে হয়েছে যে ভবিষ্যদ্বাণীটি ঠিকই ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীটি নিউটনের তত্ত্ব থেকে আসার ব্যাপারটি নিউটনের তত্ত্বগুলোকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ওই ৭৫ বছর পর পর সব ক্ষেত্রে একই বিজ্ঞানীরা দেখেননি– কিন্তু বিজ্ঞান সমাজ দেখেছে।

এর মধ্যে এবং যাবতীয় দেখে জানার মধ্যে বিজ্ঞানীরা একটি পদ্ধতি সব সময় ব্যবহার করেন। একে বলা যেতে পারে 'বার বার হতে দেখে সাধারণ সিদ্ধান্ত'– সংক্ষেপে বলার জন্য আমরা এর জন্য 'ইন্‌ডাকশন' শব্দটি ব্যবহার করবো। পৃথিবীর জন্মের পর থেকেই হয়তো হ্যালির ধূমকেতু এভাবেই নির্দিষ্ট সময় পর পৃথিবীর কাছে আসছে, ভবিষ্যতেও আসতে থাকবে। বিজ্ঞানীরা এর মধ্যে হ্যালির ভবিষ্যদ্বাণীর পর এ পর্যন্ত বছরগুলোতেই শুধু কয়েকবার এটি দেখেছেন। মাত্র এই কয়েকবার বার বার একই ভাবে হতে দেখে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এটি সব সময় এভাবেই এসেছে ও আসবে– এভাবেই দেখা যাবে। বার বার হতে দেখে তাঁদের মনে এতই আস্থা এসেছে যে তাঁরা সাধারণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যদিও এর সব বার তাঁরা দেখেননি, দেখা সম্ভবও ছিলনা। এটিই ইনডাকশন। এই ইনডাকশনের ওপর আস্থা আছে বলেই বিজ্ঞান কাজ করতে পারছে, নইলে পারতোনা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা ইনডাকশনের ওপর অত্যন্ত বেশি নির্ভর করি। পৃথিবীর সব সূর্যোদয় আমি দেখিনি, সব দেখবোওনা। কিন্তু জীবনকালে যতগুলো বার বার হতে দেখেছি তাতেই আমার স্থির সিদ্ধান্ত সূর্য সব সময় পূর্ব দিকেই ওঠছে এবং উঠবে। অন্য কেউ এর বিপরীত কিছু দেখেছে বলে সাক্ষ্য না দিলে আমার ইন্‌ডাকশন অক্ষুণ্ন থাকবে। যে ক'টি কাক আমি দেখেছি সেগুলো ব্যতিক্রমহীন ভাবে সব কালো হওয়াতে আমার সাধারণ সিদ্ধান্ত কাক মাত্রই কালো। এভাবেই বিজ্ঞানীরা বিশ্ব-নিয়ম খুঁজে পান– বিশ্বে সব না দেখে, যেটুকু বার বার দেখেছেন শুধু তার ভিত্তিতে।

এই যে ইনডাকশনে আস্থা তার স্বপক্ষে যৌক্তিক কোন অনিবার্যতা দেখানো সম্ভব হয়নি, যদিও দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা নানা ভাবে সে চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানীরা বুঝছেন যে ওই দার্শনিক সমস্যা এর মধ্যে আছে– বার বার ঘটলেই আবার যে ঘটবে সে নিশ্চয়তা কোথায় পাওয়া গেল? বার বার দেখা তো সব বার দেখা নয়। সব বার না দেখে নিশ্চিত হচ্ছি কী করে? কিন্তু সে জন্য তাঁরা পরোয়া করেননা। ইন্‌ডাকশনের ওপর আস্থা রেখেই যুগে যুগে বিজ্ঞান সম্ভব হয়েছে, এখনো হচ্ছে– সেই আস্থা রেখে বিজ্ঞান কখনো ঠকেনি। তবুও বিজ্ঞান যেহেতু

নিজের জন্য একটি নিখাদ যৌক্তিক বাতাবরণ চায় তাই এই ' ইন্ডাকশনের সমস্যা' নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা রয়েছে যার কিছু কিছু আমরা এ বইয়ের পরের খন্ডে দেখবো।

কিন্তু তার চেয়েও জরুরি সমস্যা ইন্ডাকশনের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে যদি ইন্ডাকশনে ভুল ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সাধারণত ইন্ডাকশনে একটি কাজ হলো দুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্কটি বার বার দেখে যেই সম্পর্ক নিয়ে সাধারণ ভাবে নিশ্চিত হয়ে যাওয়া। যেমন যতবার নিচু ঘনকালো মেঘ দেখা গেছে ততবার বৃষ্টি হয়েছে–এমনটিই বার বার দেখেছি। সেখান থেকে নিচু ঘন কালো মেঘের উপস্থিতির সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্কটি একটি বৈজ্ঞানিক নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– যার থেকে আমরা বৃষ্টির পূর্বাভাষ দিতে পারি। এটি একটি ইন্ডাকশন। এখন এরকম আরেকটি ইন্ডাকশন দেখা যাক অতীতে মিশরের কৃষকদের মধ্যে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহু কাল তাঁরা দেখেছেন একটি বিশেষ পরিযায়ী পাখি যখন স্বল্প সময়ের জন্য আসে তখনই গমের বীজ বোনার জন্য উপযুক্ত সময়। ওই পাখি আসামাত্র বীজ বুনলে বার বার ভাল ফসল পাওয়া গেছে। ফলে ইন্ডাকশনে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস এটি সব সময় হবে। পাখি আসা আর বীজ বপনের উপযুক্ততা এই দুইয়ের সম্পর্কটিকে তাঁরা বৈজ্ঞানিক নিয়ম মনে করতেন। কিন্তু কোন এক বছর থেকে দেখা গেল পাখিটি যখন এলো তখন বীজ বুনলে ফসল মার খাচ্ছে। এভাবে ফসল হারিয়ে তাঁরা ভীষণ বিপর্যয়ের সম্মূখীন হলেন। যেই ব্যাপারটি তাঁরা বুঝতে পারেননি তা হলো বীজ বপনের সময়টি আসলে উপযুক্ত হতো আবহাওয়ার উত্তাপটি উপযুক্ত হলে। পাখিটির আসার জন্য উপযুক্ত উত্তাপও ছিল এই একই উত্তাপ। দুটি মিলে যাওয়ায় উত্তাপের দিকে লক্ষ্য না করে তাঁরা দেখা সহজ বলে পাখি আসার দিকেই লক্ষ্য করেছেন এবং তাকেই ইন্ডাকশনে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু সেটি ছিল ভুল ইন্ডাকশন; আরো কিছু গবেষণা করলে, যেমন এক্সপেরিমেন্ট করতে পারলে, তাঁরা বুঝতেন যে আসলে পাখির আসার কারণে বীজ বপনের উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়না, সেটি হয় সঠিক উত্তাপের ফলে। তাই পাখির নিজের দেশে জলবায়ু পরিবর্তন হওয়াতে ঠিক সময় পাখি না আসলেও এদিকে বীজ বপনের উপযুক্ত উত্তাপ ঠিকই সৃষ্টি হয়ে শেষও হয়ে গেছে। পাখির ব্যাপারটি আসলে ছিল কাকতালীয়, সত্যিকার ইন্ডাকশন নয়। এর থেকে বড় ভুলকেও ইন্ডাকশন মনে হতে পারে যার যাকে কোনভাবেই বৈজ্ঞানিক বলা যায়না। ওরা হয়তো সিদ্ধান্তে আসলো এক অলুক্ষণে কালো প্যাঁচা ডেকেছে বলে পাখি ভুল সময়ে এসেছে, ফসল নষ্ট

হয়েছে। এরকম বিভিন্ন আকালের বছর কালো প্যাঁচা ডাকতে তারা দেখেছে। এটিকেই তারা ইন্ডাকশন বলে মেনে নিলো। কাজেই গভীরে না গিয়ে, পরীক্ষা না করে, কিছু একটা একসঙ্গে দেখাকে ইনডাকশন মনে করলে সেটি বিজ্ঞান হবেনা, মোটেই সত্যি হবেনা।

এভাবে গভীরে যাওয়ার সময় চেয়ে উপযুক্ত উপায় হলো এক্সপেরিমেন্ট করতে পারা। সেটি অবশ্য সব সময় সম্ভব হয়না, তখন গভীরে যাওয়ার অন্যান্য বিকল্প পদ্ধতিতে কাজটি সারতে হয়। দেখে জানার জন্য ইনডাকশন যেমন প্রয়োজন তেমনি এক্সপেরিমেন্ট অথবা অন্যান্য এই বিকল্প পদ্ধতিগুলোও প্রয়োজন। এক্সপেরিমেন্ট কথাটি আমরা বার বার বলছি, তারও মানে বুঝতে হবে। আসলে এটি হলো 'নিজের নিয়ন্ত্রিত আয়োজনে পর্যবেক্ষণ করা'। সাধারণ পর্যবেক্ষণে প্রকৃতিতে যা যেভাবে ঘটছে সেটি দেখেই আমাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমাদের দেখে জানাটি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এক্সপেরিমেন্টে আমরা দেখার আগে পরিস্থিতিকে যথাসম্ভব আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি। এর আয়োজনে আমরা যে বিষয়টির পরিবর্তনের সঙ্গে পর্যবেক্ষিত ঘটনাটি কীভাবে বদলায় তা জানতে চাই শুধু সে বিষয়টিকে পরিবর্তন হতে দিই। বাকি সব বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে স্থির রেখে দিই। একটি সরল উদাহরণ নিলে ব্যাপারটি ভাল বোঝা যাবে।

বয়েলের নিয়ম পাওয়ার সেই এক্সপেরিমেন্টটির কথা মনে করি। এখানে আমরা দেখে জানবো, পর্যবেক্ষণ করেই জানবো, কিন্তু তা করবো নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, তাতে নানা জিনিসের পরিবর্তন করার সুযোগ আমাদের থাকছে। আমরা এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসপূর্ণ পাত্রের আয়তন পরিবর্তন করে করে দেখতে চাই গ্যাসের চাপের কী পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের মধ্যে যদি কোন প্যাটার্ন দেখতে পাই (যেমন আয়তন বাড়লে চাপ সমানুপাতিক ভাবে কমে) তা হলে সেটিই একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম হবে। কিন্তু সমস্যা হলো গ্যাসের চাপ শুধু আয়তনের ওপর নির্ভর করেনা, এর উত্তাপের ওপরও করে। তাই আয়তন ও উত্তাপ দুটিই যদি পরিবর্তিত হতে থাকে তা হলে চাপের ওপর কোন্‌টির কী প্রভাব তা আমরা কোন দিনই জানতে পারবোনা। তাই এক্সপেরিমেন্টে উত্তাপকেও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারার ব্যবস্থা রাখি– যাতে উত্তাপকে সুবিধামত একটি মানে স্থির রাখতে পারি আগাগোড়া এক্সপেরিমেন্টের সময়। ওভাবে বিভিন্ন উত্তাপে স্থির রেখে এই একই এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি এটি দেখতে যে নিয়মটি সব উত্তাপের মধ্যে একই থাকে কিনা। এভাবে উত্তাপ ছাড়া

আরো যদি কিছু বিষয় থাকতো যেগুলোর ওপর চাপ নির্ভর করে সেগুলোকেও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতাম, স্থির রাখতাম। এ অবস্থায় আয়তন পরিবর্তন করে করে চাপের যে উপাত্তগুলো আমরা পেয়েছি তার শুদ্ধতা নিরূপন করে, সেগুলোর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে আমরা বয়েলের নিয়মটি পাই। কাজেই এক্সপেরিমেন্টে 'দেখে জানার' অর্থ হলো নিজের নিয়ন্ত্রিত আয়োজনে পর্যবেক্ষণ করা, উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং তার ব্যাখ্যা করা।

বয়েলের নিয়মের এই এক্সপেরিমেন্টের যে আয়োজন তা খুব সরল প্রকৃতির। কিন্তু এই একই নীতিতে অত্যন্ত জটিল ও বিশাল এক্সপেরিমেন্ট আয়োজনও আজকাল হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক বড় এক্সপেরিমেন্টের যে দুটি ওপরে উল্লেখ করেছি সেগুলোর একটু বিস্তারিত দেখলে বোঝা যাবে এক্সপেরিমেন্টে নিয়ন্ত্রিত আয়োজনকে আজকাল কতদূর যেতে হতে পারে। এর প্রথম এক্সপেরিমেন্টটি ২০১৬ সালের ওই মহাকর্ষ তরঙ্গ উদ্ঘাটনের জন্য আয়োজিত। বহু বছর ধরে এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য 'লিগো' (লেজার ইন্টারফেরোমেট্রিক গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটরি) নামের এক বিশাল ও অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছে। এর কাজ হলো দূর মহাকাশ থেকে মহাকর্ষ তরঙ্গের যেই অতি সামান্য রেশটুকু পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তা উদ্ঘাটন করতে পারা। এ তরঙ্গ এখানকার স্থান-কালে যে অতি সামান্য লম্বা বেঁটে হবার ঘটনা সৃষ্টি করবে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল রূপে সেটি ধরতে পারা। যন্ত্রটিতে দুটি নলের মত বাহু পরস্পর সমকোণে আছে যার প্রত্যেকটি ৪ কিলোমিটার লম্বা। এদের মধ্য দিয়ে লেজার আলোর সরু রেখা চলে গিয়ে আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে এক জায়গায় ফিরে পরস্পরের সঙ্গে মিলে ইন্টারফেরেন্স নামক প্রক্রিয়ায় সিগন্যালটি সৃষ্টি করে। মহাকর্ষ তরঙ্গের ফলে একদিকে স্থান-কালের প্রসারণে একটি বাহু অতি সামান্য লম্বা হবে, আর অন্য দিকে সংকোচনে অন্য বাহু সামান্য বেঁটে হবে। ফলে আয়নাগুলোর পরস্পর দূরত্বে অতি অতি সামান্য কমবেশি হবে। তরঙ্গের তালে তালে অদল বদলে এই কমবেশি হতে থাকবে। এর ফলে দুই বাহুর লেজার আলো ফিরে এসে সামান্য ভিন্নতর জায়গায় পরস্পরের উপর পড়বে বলে ইন্টারফেরেন্সের সিগন্যালটি বিশেষ কম্পনের রূপ নেবে।

যন্ত্রের সংবেদনশীলতাটাই হলো বড় কথা– যার অভাবে এতদিন এ কম্পন ধরা সম্ভব হচ্ছিলনা। আয়নাগুলোর ব্যবধান অন্য নানা কারণে সব সময় কমবেশি হচ্ছে যার মধ্যে আছে উত্তাপ তারতম্য, নলের আয়তনে ধীর পরিবর্তন, এমনকি চাঁদের অবস্থানও। ওইগুলো দূর না করতে পারলে আসল ঘটনা বোঝাই

যাবেনা। রিজোনেন্স বা অনুনাদ হবার অবস্থায় আয়নাকে ধরে রাখার জন্য কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা সারাক্ষণ কাজ করতে হচ্ছে। এমনকি ভূমিতে যে সামান্যতম কাঁপুনি তার প্রভাবকেও দূর করতে হবে। বাহুগুলো তৈরির সময় পৃথিবীর বক্রতার জন্য পর্যন্ত ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। তারপরও পাছে অন্য কোন ফাল্‌তু টানা-পোড়েনকে মহাকর্ষ তরঙ্গ বলে ভুল না করা হয় সে জন্য একই যন্ত্র হুবহু দুটি বানিয়ে একটিকে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রান্তে লুজিয়ানার লিভিংস্টোনে এবং আরেকটিকে উত্তর প্রান্তে ওয়াশিংটন স্টেটের হ্যানফোর্ডে স্থাপন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো একটিতে কম্পনের সিগন্যাল পাওয়ার অতি সামান্যক্ষণ পর (এক সেকেন্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ) অন্যটিতে হুবহু একই সিগন্যাল পেলে বুঝতে হবে মহাকর্ষ তরঙ্গ একে একে দুটি স্থানকে অতিক্রম করার সময় সিগন্যাল দুটি সৃষ্টি করেছে। এর গতি আলোর গতির সমান হবে। অন্য কোন কারণের ফলে এত দূরের দুই জায়গায় একই ফাল্‌তু সিগ্‌ন্যাল তৈরি হবার কথা নয়। দুনিয়ার ৮৬টি প্রতিষ্ঠানের ১০০০ জন পারদর্শী বিজ্ঞানী বহু বছর ধরে এই কাজে লেগেছিলেন– লিগো যন্ত্রের উন্নয়ন, এর নিখুঁত পরিমাপের ব্যবস্থা, এর থেকে পাওয়া নানা উপাত্তের বিশ্লেষণ ইত্যাদি কাজ। অবশেষে ২০১৬ সালে মহাকর্ষ তরঙ্গ ধরতে পারা গেছে এই যন্ত্রে, এবং তা একশ' বছর আগে আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত তত্ত্বকে প্রমাণ করেছে।

আগে উল্লেখিত অন্য এক্সপেরিমেন্টের আয়োজনটিও একই ভাবে দুর্দান্ত– ২০১২ সালে হিগ্‌স বোসন কণিকাটি উদ্ঘাটনের এক্সপেরিমেন্ট। এই ধরনের নতুন মৌলিক কণিকা উদ্ঘাটনের মত কঠিন কাজ করার জন্য সুইজারল্যান্ডের জেনেভা নগরের কাছে ফরাসী সীমান্তবর্তী জায়গার মাটির নিচে লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার (এল এইচ সি) নামের একটি বিশাল যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। এর ব্যয় ১০ বিলিয়ন ডলার ইউরোপের ধনী দেশগুলো সম্মিলিত ভাবে বহন করেছে, আর এতে কাজ করতে হচ্ছে দশ বারটি দেশের কয়েক হাজার বিজ্ঞানীকে। যন্ত্রের নামটির তাৎপর্য হলো এটি অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলিক কণিকাকে অত্যন্ত উচ্চ শক্তিতে পরস্পরের দিকে নিয়ে গিয়ে সংঘর্ষ ঘটাবার যন্ত্র। এরকম অসংখ্য সংঘর্ষ এখানে ঘটিয়ে মূল স্থায়ী কণিকার ভগ্নাবশেষের থেকে বহু রকম অস্থায়ী কণিকা সৃষ্টিই হলো উদ্দেশ্য। এমন সংঘর্ষের ঘটনায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতে হিগ্‌স বোসনের এমন একটি ভূমিকা থাকে যে তাতে হিগ্‌স বোসন দেখা যাওয়ার একটি সম্ভাবনা আছে। ওই যে অতি ক্ষুদ্র সময়ের জন্য এই কণিকাটি দেখা দিয়ে মিলিয়ে যাবে এর মধ্যে বিজ্ঞানী তাঁর উদ্ঘাটক যন্ত্র ও কম্পিউটারের সাহায্যে

তত্ত্বে পূর্বাভাস দেয়া আলামতগুলো থেকে হয়তো এটিকে চিনে নিতে পারবেন। এল এইচ সি যন্ত্রে ১৭ মাইল লম্বা বৃত্তাকার পথে মূল বড় কণিকাগুলোকে অত্যন্ত শক্তিশালী চুম্বকের শক্তি প্রয়োগ করে ক্রমাগত পরস্পর বিপরীত মুখে ঘোরাতে ঘোরাতে প্রচণ্ড বেগে নিয়ে গিয়ে তারপর সংঘর্ষ ঘটানো হয়। পুরো পথ নিখুঁত বায়ুশূন্য, সবকিছু অত্যন্ত সতর্ক ভাবে নিয়ন্ত্রিত। কণিকার উদ্ঘাটনের যন্ত্রগুলোও প্রযুক্তির এক চমকপ্রদ সৃষ্টি। সবকিছু মিলে ২০১২ সালের সেই দিনটিতে বিজ্ঞানীরা তাঁদের কম্পিউটারে এমন কিছু উপাত্ত পেয়েছেন যার ফলে তাঁরা হিগ্‌স বোসনকেই দেখতে পেয়েছেন বলে নিশ্চিত করতে পেরেছেন।

অবশ্য আজকের দিনেও সব এক্সপেরিমেন্টকেই যে এমন মহাযজ্ঞ হতে হবে তা কিন্তু নয়। আর তাছাড়া সব বাস্তব যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যে এক্সপেরিমেন্ট করা যাবেই এমনো কথা নেই। ইন্‌ডাকশনে ভুলের সম্ভাবনা এড়াতে এক্সপেরিমেন্টের অর্থাৎ এর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাগুলোর কোন তুলনা নেই। তবে এক্সপেরিমেন্ট সম্ভব না হলে অন্য ভাবেও তা করা যায়; এক্সপেরিমেন্টের বিকল্প পদ্ধতিতে বাস্তব যাচাই করা যায়। ওই বিকল্প পথেও উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয় এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার মধ্যে সঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

ভেগেনারের মহাদেশ সরে যাবার তত্ত্ব বা তার উত্তসূরী প্লেইট টেকটোনিক তত্ত্ব যেগুলো আমরা দেখেছি তা সার্বিক কোন এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে যাচাই হয়নি; বরং বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে হয়েছে। এর মধ্যে নানা মহাদেশের কিনারার শিলাস্তর, উদ্ভিদ, প্রাণীর মিল-অমিল; সমুদ্রতলে লাভা উদ্গীরণকারী ফাটলের পরীক্ষা, শিলার চৌম্বক দিকের পরীক্ষা; হিমালয় পর্বতে মাছের ফসিল প্রাপ্তি, আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে জমে থাকা প্রাচীন বরফের চিহ্ন প্রাপ্তি ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার পর্যবেক্ষণ রয়েছে। এতে যে বিপুল পরিমাণ উপাত্ত পাওয়া গেছে তার মাধ্যমেই যৌক্তিক ব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন এখন উপগ্রহের ছবিতে তো সরাসরি দেখাই যায় যে কী ভাবে নানা মহাদেশ একটু একটু করে পরস্পর থেকে সরে যাচ্ছে– বছরে যার পরিমাণ ইঞ্চি খানেকের বেশি নয়! অবশ্য এ সব পর্যবেক্ষণের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে শিলা, ফসিল ইত্যাদি নিয়ে ল্যাবোরেটরিতে নানা এক্সপেরিমেন্টও করা গেছে যেখানে প্রয়োজন এবং যেখানে সম্ভব। পর্যবেক্ষণের উপাত্তের ব্যাখ্যায়, ইনডাকশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল যেন না হয় তাতে বিভিন্ন সাক্ষ্যের পরস্পর সামঞ্জস্য ও যৌক্তিক সম্পর্কগুলোকে পরীক্ষা করে নানা সতর্কতা নেয়া হয়। গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ইন্‌ডাকশন অথবা এক্সপেরিমেন্ট– এগুলোই 'দেখে জানার' ক্ষেত্রে প্রধান পদ্ধতি।

আধুনিক কালে সংখ্যাতাত্ত্বিক উপায়েও তত্ত্বের বাস্তব যাচাই অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাচ্ছে। যেমন বক্ষ ক্যানসারের ঝুঁকি ধূমপানের ফলে বেড়ে যায় এমন একটি অনুমানকে যাচাই করার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণে ইনডাকশন অথবা এক্সপেরিমেন্ট কোনটিই সম্ভব হয় না, যথার্থও হয়না। তখন এরকম পদ্ধতির একটি সরল প্রয়োগে হয়তো ক্যানসার আক্রান্তদের মধ্যে থেকে দৈব চয়নে অর্থাৎ এলোমেলো ভাবে নির্বাচিত গোষ্ঠির নমুনা নিয়ে দেখা হয় তাদের মধ্যে ধূমপায়ী ও অধূমপায়ীদের অনুপাত কী রকম। দৈব চয়ন করার কারণ হলো যাতে বয়স, লিঙ্গ, জাতি, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির প্রভাবও যদি ক্যানসারের ঝুঁকি সৃষ্টির ওপর থাকে তবে তা কাটাকুটি হয়ে গিয়ে মূল অনুমানটির যাচাইয়ে পক্ষপাত সৃষ্টি করতে পারে না। এতে পাওয়া ফলাফলটি নির্ভরযোগ্য করার জন্য সংখ্যাতাত্ত্বিক গণিতের বিশেষ কিছু শক্তিশালী পদ্ধতি ব্যবহার এখানে সম্ভব হয়। এগুলো হিসেবে করে দেয় ওই ধূমপায়ী-অধূমপায়ীর অনুপাতটি কী রকম হলে অনুমানটির সত্যতা কতদূর হতে পারে।

বোঝা গেল যদিও বিজ্ঞানের পদ্ধতিটিই তাকে বিজ্ঞান হতে দেয় সে পদ্ধতি একেবারে এক নিশ্বাসে বলে ফেলার মত কিছু নয়– তার ব্যাপ্তি এবং শাখা-প্রশাখা অনেক। এই পদ্ধতি এক দিনে গড়ে ওঠেনি, ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীরা নিজেদের কাজ, নিজেদের মধ্যে অনেক ক্রিয়া-বিক্রিয়া, অনেক আলোচনা-সমালোচনায় এগুলোকে রূপ দিয়েছেন। বিজ্ঞানের মর্মকথা হলো জানা– প্রকৃতির সত্যকে জানা। বিজ্ঞানের বৈশিষ্টগুলো বোঝার জন্য এই 'জানার প্রশ্নগুলোকে' (এপিস্টেমোলজি) আমাদের সামনে আনতে হবে। এখানে আমরা দেখলাম 'ভেবে জানা' আর 'দেখে জানার' সংমিশ্রণে কীভাবে আজকের বিজ্ঞানের পদ্ধতি সুন্দর দাঁড়িয়ে গেছে। অতীতে সব সময় কিন্তু এরকম ছিলনা; তবে তখনো এই উপাদান দুটি কোন না কোন ভাবে বিজ্ঞানের পেছনে কাজ করেছে। কখনো একটি গুরুত্ব পেয়েছে, কখনো অন্যটি, কখনো উভয়েই। খুব সম্ভব আমাদের মানবিক প্রকৃতির মধ্যেই এগুলো আছে বলে এমনটি হয়েছে। ভেবে জানা ও দেখে জানার ইতিহাস বিজ্ঞানেরই ইতিহাস, হয়তো মানুষেরও।

আমরা সবাই আজন্ম বিজ্ঞানী

ছোট্ট শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা:

অনেক কিছু থেকে মনে হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রেরণা মানুষের মধ্যে বরাবর ছিল। এ সম্পর্কে একটি ধারণা হলো মানুষ হিসেবে বিবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণাটি

আমাদের পূর্বপুরুষদের মস্তিষ্কে গাঁথা হয়ে গিয়েছিলো। এই ধারণাটি গত বিশ ত্রিশ বছরে যথেষ্ট প্রবল হয়েছে মাত্র কয়েক মাস বয়সী শিশুদের ওপর সরল কিছু গবেষণায় তাদের মধ্যে বিজ্ঞানের কিছু সহজাত বুদ্ধি দেখতে পেয়ে। ওই বয়সে কারো কাছ থেকে কিছু শেখার বা কাউকে এ নিয়ে অনুকরণ করার সুযোগ ওই শিশুদের হয়নি। যে বুদ্ধিটুকু তারা দেখিয়েছে ধরেই নেয়া যায় যে তা জন্মের সময়েই ওরা ডিএনএ'র মাধ্যমে পেয়েছে এবং তা বিবর্তনের সৃষ্টি, শিক্ষার নয়। এ অনেকটা স্বভাব-কবিদের মত যারা সাহিত্য, কবিতা ইত্যাদি না শিখেই জন্মগত প্রতিভায় কবি হয়ে শুরু করে। এক্ষেত্রে তাই ওই শিশুদেরকে আমরা স্বভাব-বিজ্ঞানী বলতে পারি।

শিশুদের ওপর যে গবেষণাগুলোর কথা বলা হলো সেগুলো বিভিন্ন সময়ে নানা জায়গায় হলেও এদের প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট মিল আছে। প্রায় সবগুলোতে বিজ্ঞানের খুবই প্রাথমিক কিছু কিছু জিনিস শিশুকে দেখানো হয়– সত্যি সত্যি জিনিসও হতে পারে ভিডিয়োর মাধ্যমেও হতে পারে। ওগুলো শুদ্ধ করে দেখানো হয়, আবার ভুল করেও দেখানো হয়। প্রত্যেকবার লক্ষ্য করা যায় যে এতে শিশু হয়তো অবাক হয়ে আরো ভাল করে দেখতে চাচ্ছে, নয়তো গতানুগতিক ব্যাপার মনে করে নির্লিপ্ত থাকছে। এটি বোঝা যায় তার চোখের দিকে তাকিয়ে। এরকম গবেষকরা জানেন অবাক হলে শিশুর এক নাগাড়ে দৃষ্টি দিয়ে দেখার সময়টুকু অন্তত ২০% বেড়ে যায়। চোখের মণিও দৃশ্যটির দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। আর যদি নির্লিপ্ত থাকে তা হলে দেখার সময় কমে যায়, মণি এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়। বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা ভাবে বহু শিশুর ওপর একই পরীক্ষা করে দেখা গেছে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে শুদ্ধ ভাবে দেখালে শিশুরা বেশি দেখার আগ্রহ পায়না; কোন কিছুকে আগেই জানা এবং গতানুগতিক ভাবলে তার প্রতি যেমন অমনোযাগী ভাব হয় শিশুরও অনেকটা সেরকম হয়। কিন্তু ভুল ভাবে কিছু দেখালে, শিশু অবাক হয়, ভাল করে দেখে– যেন যা দেখছে ঠিক দেখছে কিনা বুঝে উঠতে। যদি এমন হয় তা হলে গবেষককে স্বীকার করে নিতে হয় যে বিজ্ঞানের বোধটি ইতোমধ্যেই শিশুর রয়েছে। আর তা যদি না হয়– শিশু এলোমেলোভাবে কখনো বেশিক্ষণ তাকায়, কখনো কম সময় তাকায় তা হলে সে রকম কিছু মনে করার কারণ থাকে না।

স্বভাব-গণিতবিদঃ

প্রথমে খুবই প্রাথমিক গণিতের কিছু বিষয় নিয়ে যে গবেষণা শিশুর ওপর হয়েছে সে সম্পর্কে বলা যাক। একটি গবেষণায় দু'মাসের শিশুকে একটি কার্ডের ওপর আঁকা কিছু রঙীন ফোটা দেখানো হয়েছে। একটি কার্ডে ৮টি ফোটা সুন্দর একটি ছকের আকারে সাজানো– এমন কার্ডই দেখানো হলো। আর একটি কার্ডে এরকম ১৬টি ফোটা আঁকা রয়েছে– তবে ফোটার সংখ্যা ছাড়া রঙে, ছকের আকৃতিতে বা অন্য কোন ভাবে এই দুই কার্ডের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শিশুকে ৮ ফোটার কার্ডটি বার বার দেখাতে দেখাতে মাঝখানে হঠাৎ করে যদি ১৬ ফোটার কার্ডটি দেখানো হয়, তাহলে দেখা গেছে যে ওই কার্ডটির ক্ষেত্রে তার তাকানোর সময় বেশি হয়। এতে মনে হয়েছে যে ফোটা বরাবরের মত ৮টি না হয়ে ১৬টি হওয়াটাই শিশুর অবাক হওয়া ও অধিক তাকানোর কারণ। এর মানে শিশু বেশি সংখ্যায় থাকা ও কম সংখ্যায় থাকার মধ্যে পার্থক্য করতে পারছে– যা একজন 'স্বভাব গণিতবিদের' লক্ষণ।

অবশ্য বলা যেতে পারে যে এক্ষেত্রে ফোটার সংখ্যা বদলে যাবার জন্য যে শিশু অবাক হয়েছে, ব্যাপারটি ঠিক গণিতের কারণে নাও হতে পারে। এটি যে গণিতের কারণেই তা বোঝা গেছে ফোটার সংখ্যা একই রেখে শুধু রঙ বদলিয়ে একই পরীক্ষাটি করে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় মাঝ পথে হঠাৎ অন্য রঙের কার্ড দেখে শিশু অবাক হয়নি। ওভাবে আকৃতি ইত্যাদি বদলালেও হয়নি, শুধু ফোটার সংখ্যা বদলানোতে হয়েছে। কাজেই বলতেই হয় যে সংখ্যার বেশকমটিই বিশেষ ভাবে শিশুর নজর কেড়েছে। আর সংখ্যা সম্পর্কে তার এই জ্ঞানটি জন্মগত, কারণ পারিপার্শ্বিকতা বা শিক্ষণের থেকে জানার সুযোগ তার ওই বয়সে হয়নি।

আরো অবাক হতে হয় যখন শিশুকে নিয়ে অন্য রকম গবেষণায় বোঝা যায় যে শিশুর ১ ও ২ এর মত খুব ছোট সংখ্যার ধারণা রয়েছে এবং যেগুলোর যোগ বা বিয়োগের ধারণাও। এমন একটি গবেষণায় দুমাসের শিশু দেখছে তার সামনে একটি হাত এসে মিকি মাউজ বা ওরকম কোন বড় একটি পুতুল রাখলো, আর শিশুকে দেখিয়েই একটি পর্দা দিয়ে পুতুলটিকে আড়াল করলো। এরপর হাতটি আর একটি ওই একই রকম পুতুল শিশুকে দেখালো এবং সেটিকেও ওই পর্দার আড়াল করলো।

এবার শিশুর সামনে থেকে পর্দাটি সরিয়ে নেয়া হলো। শিশু দেখতে পাচ্ছে ওখানে ২টি পুতুল রয়েছে। অংকটি এক্ষেত্রে শুদ্ধ– ১ আর ১ যোগ করে ২ হয়েছে। এর পরের বার একই পরীক্ষা করা হলো, কিন্তু পর্দার আড়ালে থাকার

সময় শিশুর অগোচরে একটি পুতুল সরিয়ে নেয়া হলো। এবার পর্দা সরালে শিশু দেখবে ১ আর ১ যোগ করে ১ হয়েছে– অংকটি এক্ষেত্রে ভুল। এরকম অনেক বার পরীক্ষাগুলো করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে শুদ্ধ অংক দেখলে শিশুর চোখে আগ্রহ ধরা পড়েনা, তাকানোর সময় কম হয় এবং চোখের মণিও কেন্দ্রীভূত হয়না। কিন্তু যখনই ভুল ফলাফল দেখতে পায় তখনই শিশু অবাক হয়, বেশিক্ষণ তাকায় এবং গভীরভাবে তাকায়– অর্থাৎ এটি যে তার প্রত্যাশিত নয় সেটি বোঝা যায়। এতে প্রমাণ হয় যে শিশু জন্মগত ভাবে ১ আর ২ এর মানেই শুধু বোঝেনা এগুলোর যোগ করাকেও বোঝে। একটু অন্য ভাবে করে বিয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি দেখা যায়। এত বেশি বার পরীক্ষায় এবং এত বেশি সংখ্যক শিশুর ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো দেখা গেছে যে শিশুকে জন্মগত ভাবে 'স্বভাব গণিতবিদ' না বলে উপায় নেই।

আরো একটি মজার ব্যাপার এ ধরনের পরীক্ষায় ধরা পড়ে। এটি হলো জন্মগত ভাবেই শিশু বোঝে যে দৃষ্টির আড়াল হলেই কোন বস্তুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়না। পর্দা সরালে সে যে আগের দুটি পুতুল পুনরায় দেখে অবাক হয়না সেটি তার প্রমাণ। বড়রা ঠেকে ঠেকে শিখতে পারে যে দৃষ্টির আড়ালেও বস্তু থেকে যায়, কিন্তু শিশুর সেই সুযোগ নেই। সে সহজাত ভাবে এটি জানে বলেই পরীক্ষাটি করা গেছে।

স্বভাব-পদার্থবিদঃ

এমনি ভাবে গত কয়েক দশক ধরে শিশুদের ওপর এমন সব পরীক্ষা হয়েছে যা প্রমাণ করেছে শিশু জন্মগত ভাবে এক একজন স্বভাব-পদার্থবিদও বটে। ওই যে দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়া সত্ত্বেও তার অস্তিত্ব প্রত্যাশা করা– এটিও কিন্তু পদার্থবিদ্যারই একটি জ্ঞান। এমনি ভাবে দু'মাস বয়সী একটি শিশুকে যদি দেখানো হয় যে একটি টেবিলের ওপরটার মত একটি ছোট তক্তা খাড়া কয়েকটি খুঁটির ওপর রয়েছে তখন তার দৃষ্টি থেকে বোঝা যায় যে অবাক হয়নি। কিন্তু যদি ওই তক্তাটিরই তলা থেকে খুঁটিগুলো সরিয়ে ফেলার পরও দেখে যে সেটি শূন্যে ওভাবেই আছে (যেমন অদৃশ্য সূতা থেকে ঝুলানোর কারণে), তা হলে সে ভীষণ অবাক হয় যা তার অধিক্ষণ তাকানো নিবদ্ধ দৃষ্টি থেকে বোঝা যায়। এতে বোঝা যায় যে জন্মগত ভাবে সে জানে যে কোন জিনিসের ওপর ভার না রাখতে পারলে একটি জিনিস শূন্যে থাকতে পারেনা, পড়ে যায়– যেটি কিনা পদার্থবিদ্যার জ্ঞান। একই ভাবে জন্মগত পদার্থবিদ্যার জ্ঞান খুঁজে পাওয়া গেছে পাঁচ মাস বয়সী

শিশুকে একটি দৃঢ় বস্তু দিয়ে সেটির প্রতি তার আচরণ লক্ষ্য করে। দেখা যায় সে এর আকৃতির স্থায়ীত্ব নিয়ে বেশ আস্থাশীল– এর ওপর নিশ্চিন্তে চাপ দেয়, ভর রাখে। কিন্তু তাকে যদি বালি বা পানির মত কোন জিনিস নাড়াচাড়া করতে দিই তা হলে সে ওই আস্থা দেখায়না– বেশ বুঝতে পারে যে জিনিসটা গড়িয়ে যাবে। অথচ এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মূখীন তাকে আগে কখনো হতে হয়নি, সহজাত পদার্থবিদ্যার জ্ঞান থেকেই সে এটি করতে পারছে। ছয় মাস বয়সী শিশুকে লক্ষ্য করে বোঝা গেছে যে সে বুঝতে পারে কে কাকে নাড়াচ্ছে। গতিশীল কিছু খোলামেলা অবস্থায় তার সামনে রাখলে সে গতির একটি কারণ খোঁজার চেষ্টা করে– গতিশীল বস্তুটির সংলগ্ন অন্য কোন বস্তু আছে কিনা যা তাকে নাড়াচ্ছে, কারণ এটি থাকাটিই সে আশা করে। এসব স্বভাব-পদার্থবিদের মত আচরণ।

অংকের সক্ষমতা দেখা জন্য যেভাবে শিশুকে কিছু দেখিয়ে তার দৃষ্টি লক্ষ্য করা হয়েছে ওভাবেও তার পদার্থবিদ্যা জ্ঞান বোঝা যায়। এমনি একটি পরীক্ষায় ছয় মাস বয়সী শিশুকে ভিডিয়ো পর্দায় দেখানো হয় যে একটি ফোটা কিংবা পতঙ্গের ছবি পর্দার ওপর এক কোণা থেকে পর্দা অতিক্রম করে যে কোন সরল বা বক্র পথে পর্দার অন্য কিনারা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। শিশুর তাকানোর সময় ও চোখের নিবদ্ধতার তুলনামূলক পরিমাণ বলে দেয় যে যে একে গতানুগতিক মনে করে। কিন্তু পরবর্তী ভিডিয়োতে সে দেখলো যে জিনিসটি আগের কোণা থেকে যাত্রা শুরু করেছে বটে কিন্তু পর্দার মাঝে অদৃশ্য হয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পর্দার অন্য কোন অংশে দেখা দিয়ে ভিন্ন পথে চল্‌ছে। এই যে চলার পথের নিরবিচ্ছিন্নতা বিনা কারণে ব্যাহত হলো এটি শিশুর দৃষ্টি এড়ায়না , এই অসম্ভব ব্যাপারটি দেখে যে খুব অবাক হয়। এর মানে হলো শিশু সহজাত ভাবেই জানে যে চলার পথ সব সময় নিরবিচ্ছিন্ন– যা কিনা পদার্থবিদ্যার নিয়ম। এমন পরীক্ষা বহুবার বহু শিশুর ওপর করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে এই ক্ষেত্রেও শিশু 'স্বভাব পদার্থবিদ'।

আট মাস বয়সে যে কোন শিশু এমন কিছু জিনিস আন্দাজ করতে পারে যে তার মধ্যে মৌলিক একটি পদার্থবিদ্যা জ্ঞান যে কাজ করছে এটি না ভেবে উপায় থাকেনা। যেমন বিভিন্ন আকৃতির কিছু দৃঢ় বস্তু যদি তাকে দেয়া হয় (যেমন প্লাষ্টিকের তৈরি নানা জিনিস) সে বুঝতে পারে কী রকম পজিশনে রাখলে বস্তুটি স্থিতিশীল থাকবে। টেবিলে কিনারায় নিয়ে গেলে ঠিক কী অবস্থায় থাকলে এটি টেবিল থেকে পড়ে যাওয়ার বেশি ঝুঁকিতে থাকে সেটিও সে বোঝে। এর মানে একটিই– পদার্থের ভরবিন্দুর ব্যাপারটি সে সহজাত ভাবে জানে। সেই ভরবিন্দুতে পদার্থের সব ভর জমা হয়ে রয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। ভরবিন্দু

যত টেবিলের কিনারার ভেতরের দিকে থাকে ততক্ষণ তার পড়ে যাওয়ার ভয় নেই– কিনারার বাইরে গেলেই শুধু পড়ে যাওয়ার কথা। আট মাস বয়সী শিশুর মাথায় যে পদার্থবিদ্যার এমন জ্ঞান লুকিয়ে থাকে সেটি রীতিমত অবাক করার মত।

স্বভাব-মনস্তত্ত্ববিদঃ

এবার আসা যাক স্বভাব-মনস্তত্ত্ববিদ হিসেবে শিশুর পারদর্শিতার কথায়। আমরা যদি একটি লক্ষ্য সাধন করতে গিয়ে বেশ বাধার সম্মূখীন হয়ে সে লক্ষ্য ত্যাগ করি, এবং পরে বাধাহীন ভাবে সেটি পাওয়া সুযোগ পাই তখন এই সুযোগ সাধারণত ছাড়িনা। যা পেতে অতীতে বেশি বাধা পেতে হয়নি বিনা বাধায় পাওয়া ক্ষেত্রে সেটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা নয়। মজার ব্যাপার হলো ১০ মাস বয়সী একটি শিশুও আমাদের কাছে এমন আচরণ প্রত্যাশা করে। এটি বোঝা যায় শিশুকে এই বিষয়টি নিয়ে কিছু কার্টুন ভিডিয়ো দেখিয়ে। প্রথম কার্টুন ভিডিয়োতে চরিত্রটি কিছু বাধার দেয়াল অতিক্রম করতে পারলেই শুধু তার কাম্য জিনিসটি পেতে পারে। প্রথম কাম্য জিনিসটি সে কম উঁচু দেয়াল অতিক্রম করেই পেয়ে যায়। এর পরের বার ওটিই যখন মাঝারি উচ্চতার দেয়াল অতিক্রম করে পেতে হয়, তখন সে এত পরিশ্রম করে ওটি পাওয়ার চেষ্টাই করেনা– স্পষ্টত ওটি তার কাছে ওই দেয়াল ডিঙ্গাবার মত মূল্যবান নয়। কিন্তু এর পর যে কাম্য জিনিসটি তার লক্ষ্য হয় সেটি আরো লোভনীয় বলে এর জন্য চরিত্রটি মাঝারি উচ্চতার দেয়াল ঠিকই অতিক্রম করলো। অবশ্য পরের বার দেয়া আরো বেশি উচ্চতার দেয়াল ডিঙ্গিয়ে এই একই কাম্য বস্তু পাওয়ার চেষ্টা আর করেনি। এরপর দৃশ্যপট বদলে গেল দুটি কাম্য বস্তুই তার সামনে– অথচ কোন দেয়াল নেই, সে বিনা বাধায় যে কোনটি নিতে পারে। কোন্‌টি নেবে? দুটি বিকল্প ভিডিয়োতে দুরকম দেখানো হলো– একটিতে প্রথম কাম্য বস্তুটি নিচ্ছে, অন্যটিতে দ্বিতীয়টি। প্রথমটির জন্য সে উচ্চতা পার হতে চায়নি, কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য চেয়েছে; কাজেই দ্বিতীয়টিই তার কাছে বেশি মূল্যবান। গবেষণায় দেখা গেছে অধিকাংশ শিশুই কার্টুন চরিত্রকে এই দ্বিতীয় মূল্যবান কাম্য বস্তুটি নিতে দেখলে বেশিক্ষণ তাকায়না, অবাক হয়না। কারণ এটিই সঠিক কাজ– এতে কম খরচে বেশি লাভ। অন্য রকম করতে দেখলে ওরা অবাক হয়, বেশিক্ষণ তাকায়।

গবেষণাটিতে ঠিক একই ব্যাপারটি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্টুন-চিত্র তৈরি করা হয়েছে। কোনটিতে বাধাটি দেয়ালের বদলে নানা ঢালের পাহাড়, কোনটিতে

নানা রকম চওড়া খাল যা পার হয়ে যেতে হবে। যদিও তিনটি ক্ষেত্রে ঘটনাগুলো ভিন্ন রকমের, সব ক'টিতে কাম্য বস্তু বাছাই করতে যেটিতে কম খরচে বেশি লাভ সেটিই কার্টুন চরিত্রের কাছে প্রত্যাশিত। শিশুরা সব ক'টিতে একই রকম মনোভাব দেখিয়েছে। মনে করা যায় শিশু ওই চরিত্রের মন পড়ার চেষ্টা করেছে– যে একজন স্বভাব-মনস্তত্ত্ববিদ।

স্বভাব-সংখ্যাতত্ত্ববিদঃ

আর এক ধরনের পরীক্ষায় এক বছর বয়সী শিশুদেরকে ভিডিয়োতে একটি বাক্সের ভেতরটা দেখানো হয়েছে যেখানে অনেকগুলো সাদা পিংপং বলের সঙ্গে অল্প কিছু লাল পিংপং বল আছে। এবার একটি হাত বাক্সটি ঝাঁকানি দিয়ে এর থেকে বার বার একটি করে বল বের করে। যদি এভাবে অনেক বার সাদা বল ওঠার সঙ্গে অল্প দু'একটি লাল বল বের হয় তা হলে শিশু অবাক হয়না। কিন্তু বার বার যদি শুধু লাল বল বের হতে থাকে এবং কালেভদ্রে সাদা তা হলে শিশু অবাক হয়, অধিক্ষণ তাকায়। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনা সম্পর্কে শিশুর একটি সহজাত জ্ঞান আছে, সে স্বভাব-সংখ্যাতত্ত্ববিদও বটে। জ্ঞানটি সহজাত এ জন্য যে সম্ভাবনার নিয়মগুলো অভিজ্ঞতা থেকে শেখার সুযোগ তার তখনো হয়নি।

স্বভাব-জীববিদঃ

জীব আর জড়ের পার্থক্য, এই দুইয়ের প্রত্যেকটি থেকে কী আচরণ আশা করা যায়, তা কি খুব ছোট শিশু জানে? হ্যাঁ জানে বৈ কি। একেবারে দুই তিন মাস বয়সী শিশুও উষ্ণতা, লম্বা লোম, নরম অনুভূতি নড়াচড়া ইত্যাদির মাধ্যমে বুঝতে পারে কোনটি একটি বেড়ালের বাচ্চা আর কোন্‌টি একটি খেলনা বিমান– যদিও এর কোনটিই আগে সে দেখেনি বা স্পর্শ করেনি। এটি বোঝা যায় যখন শিশু জীবকে বা জীবের মত হুবহু পুতুলকে তার খুব কাছে ঘনিষ্ঠতায় রাখতে পছন্দ করে। ৬ মাস বয়সী শিশু ভিডিয়োতে কারো কথার সঙ্গে তার ঠোঁট না মিল্‌লে অবাক হয়। ৮ মাস বয়সী শিশু সহজাত ভাবে জানে যে কোন প্রাণীর ভেতরটায়ও নানা কিছু আছে– ওটি শূন্য ফাঁপা জায়গা নয়। কাজেই তার তুলতুলে রোমশ পুতুল ভালুকের ভেতরটা যদি কখনো তার কাছে দৃশ্যমান হয় ছিড়ে যাওয়ার কারণে, আর দেখা যায় সেটি ফাঁপা সে খুব অবাক হয়; নরম অঙ্গ-প্রতঙ্গ এর ভেতর থাকলে অবাক হয়না। এগুলোর এ কোন সত্যিকার

অভিজ্ঞতা তার না থাকা সত্ত্বেও এমনটি হয়। এই সব স্বভাব-জীববিদ হবার লক্ষণ।

বয়স্করাও স্বভাব-বিজ্ঞানী:

এই যে খুব ছোট বয়সের শিশু স্বভাব-বিজ্ঞানীর মত নানা বিষয়ে কিছু মৌলিক সক্ষমতা দেখায় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সবের কী হয়? স্পষ্টত এই সক্ষমতা বাড়ে, যেমন স্কুলের লেখাপড়া করার ফলে আরো জটিলতর অংকে তার আয়ত্ত্বে আসে। অভিজ্ঞতা থেকেও ওই সহজাত বিষয়গুলো আরো পাকা হয়। কিন্তু বয়স্কের মধ্যেও এর অনেক কিছু আরো উচ্চতর পর্যায়ে সহজাত ভাবেই হয়েই থাকে। জন্মের সময় মস্তিষ্কে গাঁথা থাকার ফলে যেমনটি হয়েছিলো মস্তিষ্কের বিকাশের ফলে তার প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রে আরো উন্নত হয়– সেসব না শিখলেও, অভিজ্ঞতা না হলেও। তবে শেখা জিনিস থেকে এগুলো আলাদা করা কঠিন হয় বলে আমরা শিশুকে যেমন অনায়াসে স্বভাব-বিজ্ঞানী বলতে পারি, বয়স্ককে তা পারিনা। তবে গবেষণার মাধ্যমে বয়স্কেরও এই সহজাত বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়েছে।

পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এরকম একটি গবেষণার দিকে তাকানো যাক। এতে দেখা গেছে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা নির্বিশেষে যে কোন মানুষ কতগুলো কাজ সহজাত ভাবে করতে পারে। এতে আশপাশের পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে সেই মত কতগুলো ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। যেমন সামনে কোন কিছু দেখা মাত্র সে মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে এটি নাড়াতে তাকে কত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। সামনে যে বাধা আমি কী তার মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারবো নাকি পারবোনা (কাপড়ের পর্দা হলে পারবো, দেয়াল হলে পারবো না); ভারী দরজাটি খুলতে গেলে এর গোড়ায় কবজার কাছে ধাক্কা না দিয়ে মাঝখানে বা কিনারায় ধাক্কা দিলে বল কম লাগবে– এরকম আরো অনেক কিছু। গবেষকরা প্রমাণ করেছেন এগুলো বয়স্করা পদার্থবিদ্যায় লেখাপড়া না করেই, অভিজ্ঞতা থেকেও না শিখেই শুধু সহজাত ভাবে করতে পারে। শুধু তাই নয়, মস্তিষ্কের কোন্ অংশে এই সক্ষমতাগুলো গাঁথা রয়েছে তা তাঁরা ওরকম কাজগুলো করার সময় মস্তিষ্কের কোন্ অংশ উদ্দীপ্ত হয় তা লক্ষ্য করে নির্ণয় করেছেন। আজকাল রোগ নির্ণয়ের জন্য এম আর আই যন্ত্রে যেভাবে শরীরে যে কোন অংশে স্ক্যান করা যায়, প্রায় একই পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের স্ক্যান করে ওই সময়ের উদ্দীপ্ত অংশটি বের করা সম্ভব হয়। দেখা গেছে মস্তিষ্কের সামনের কোর্টেক্সে এবং তার ঠিক পেছনের অংশের একটি জায়গায়

এই স্বভাব-পদার্থবিদের সক্ষমতাগুলো গাঁথা আছে। বিবর্তনে আমাদের মস্তিষ্ক মোটামুটি বর্তমান অবস্থায় আসার পর থেকেই তাই আমরা এভাবে স্বভাব-পদার্থবিদ; আজকের আমরা যেমন, বহু হাজার বছর আগের গুহাবাসী মানুষরাও তেমনি। পদার্থবিদ্যার বাইরের বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতেও খুব সম্ভব তাই। সে জন্যই মনে করা হয় বিজ্ঞান মানুষের সমবয়সী।

ইতিহাসের আগে বিজ্ঞান

আন্দাজ করছি বটে যে বিজ্ঞান মানুষের সমবয়সী, কিন্তু হাতেনাতে খুব প্রাচীন মানুষের বিজ্ঞান চর্চা প্রমাণ করা কঠিন। মানুষের লিপি আবিষ্কার বেশি দিন আগে ঘটেনি– প্রথম লিপি মাত্র হাজার পাঁচেক বছর পুরানো। এর পরে পরের সময় বিজ্ঞানের কথা অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা লিখিত ভাবেই পেয়েছি– যেগুলো তাই বিজ্ঞানের লিখিত ইতিহাসের অংশ। মেসোপোটেমিয়া (বর্তমান ইরাক), মিশর, মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় আরো কিছু অঞ্চল, চীন, কিছু পরে গ্রীস, ভারত এসব জায়গার বিজ্ঞান-ইতিহাস তাই যে অন্তত ওই টুকু প্রাচীন সেকথা আমরা লিপির কারণে নিশ্চিত করে বলতে পারি। অন্যত্রও কোন কোন জায়গায় লিপির মত কিছু যে ছিল তা বোঝা যাচ্ছে যেমন দক্ষিণ আমেরিকার সভ্যতাগুলোতে, কিন্তু তার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি বলে তাতে বিজ্ঞানের ইতিহাস সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই লিখিত ইতিহাসের আগের অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক কালের বিজ্ঞান চর্চার কথা জানার উপায় খুব সীমাবদ্ধ। এর কারণ অতীতের মানুষের রেখে যাওয়া চিহ্ন এবং সামগ্রীর যেটুকু উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয় তাতে তার জীবনযাত্রার নানা পরিচয় মেলে, প্রযুক্তির এবং হাতিয়ারেরও পরিচয় মেলে, কিন্তু বিজ্ঞান-চর্চার পরিচয় মেলেনা। প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার কল্যাণে এসব চিহ্ন আমাদের কাছে দিন দিন আরো ভাল ভাবে উদ্ভাসিত হচ্ছে। কিন্তু এর অধিকাংশই বিজ্ঞানের নমুনা নয়– বিজ্ঞান থাকে মানুষের চিন্তায়, কৌতুহলে, পর্যবেক্ষণে, সমস্যা সমাধানে। ওরা লিখে না গেলে এসব এখন জানার উপায় নেই। তারপরও প্রত্নতাত্ত্বিক কোন কোন নমুনায় বিজ্ঞান-চিন্তার কিছু ছাপ থাকে, সে রকম কিছু কিছু আমরা একটু পর দেখবো।

আদিবাসী গোষ্ঠিতে বংশানুক্রমে পাওয়া বিজ্ঞানঃ

প্রাগৈতিহাসিক কাল সম্পর্কে জানার আর একটি উপায় হলো আজকের যারা নিজেদের আচার আচরণে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে অনেক কিছু বজায় রেখেছে

বলে মনে হচ্ছে তাদের দিকে লক্ষ্য করা। আজও পৃথিবীর অনেক জায়গায় মূলস্রোত থেকে বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন এরকম গোষ্ঠি আছে যাদের সম্পর্কে একথা বলা যায়। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় মনে হচ্ছে তাদের অনেক অভ্যাস সুদূর অতীতের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে চলে এসেছে। তার মধ্যে এমন কিছু কিছু জিনিসও আছে যেগুলোকে স্পষ্টত বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে পেতে হয়েছে। এগুলো অতীত থেকে শুরু করে একটু একটু করে আবিষ্কৃত হয়েছে; প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ওরা দেখে শিখেছে, শুনে শিখেছে, নিজেরাও চর্চার মাধ্যমে এর সঙ্গে যোগ করেছে।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের আদিবাসী 'সান্'দের কিছু সক্ষমতাকে আমরা এরকম প্রাচীনজাত বিজ্ঞান-সক্ষমতার একটি উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। বত্সোয়ানা, নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মরু অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জায়গায় এদের যাযাবর জীবন– তবে সব বৃহত্তর পরিবারেরই একটি নির্দিষ্ট ঘোরাঘুরির জায়গা রয়েছে। সম্পূর্ণ শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন হওয়াতে জীববিদ্যা ও প্রাণীর মনস্তত্ত্বের ওপর তাদের অদ্ভুত দখল দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ নানা প্রাণীর পায়ের চিহ্ন ওরা প্রায় বই পড়ার মত করে পড়তে পারে– ওইটুকু থেকে বেশ কিছু আগে হেঁটে যাওয়া প্রাণীটির পরিচয়, লিঙ্গ, বয়স, আহত না সুস্থ ইত্যাদি নানা তথ্য ওরা পেয়ে যায়। দীর্ঘ দিনের গভীর পর্যবেক্ষণ এবং পায়ের চিহ্নের প্রকৃতির সঙ্গে এক একটি তথ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেই এই জ্ঞান তাদের লাভ করতে হয়েছে– যা বিজ্ঞানের পদ্ধতির অংশ। আগে এ পথে চলে যাওয়া প্রাণীর তথ্য জানার প্রয়োজন ওদের বেশি কারণ সাধারণত তাদের তীর এতো জোরালো নয় যে প্রাণীকে তাৎক্ষণিক ভাবে মেরে ফেলতে পারে। ওরা বরং তীরের আগায় বিষ মাখিয়ে আহত প্রাণীটির মধ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে যা পুরাপুরি কার্যকর হতে ছোট হরিণের ক্ষেত্রে দু'তিন ঘন্টা থেকে একটি জিরাফের ক্ষেত্রে তিন দিনও লেগে যেতে পারে। এই পুরো সময় তাকে আহত প্রাণীটিকে অনুসরণ করে যেতে হয়। শিকারের প্রাণীর ইচ্ছা, গতিবিধি, লুকানোর কৌশল ইত্যাদিও তাদেরকে বুঝতে হয়েছে। ওরা বিষ তৈরি করে প্রধানত বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ ও কীট-পতঙ্গ থেকে– যেমন এক ধরনের লাল শুঁয়া পোকার দেহ থেকে ওরা অত্যন্ত তীব্রভাবে কার্যকর বিষ তৈরি করতে পারে। এসব উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে নিষ্কাশনের গবেষণা ছাড়া এ জ্ঞানকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসা অসম্ভব হতো।

প্রাণী-মনস্তত্ত্বের ওপর জ্ঞানকে যে কী কার্যকর ভাবে ব্যবহার করা যায় তার নমুনা হিসেবে আমরা পশ্চিম আফ্রিকার ফুলানি গোত্রের মানুষদের লক্ষ্য করতে পারি। ওরা যাযাবর গো-চারণজীবী– হাজার হাজার বছর ধরে এখানকার লম্বা শিং-

ওয়ালা গরুর পাল চরিয়ে জীবন ধারন করে আসছে। অল্প দু'একজন লোক কী ভাবে বড় এক দল উচ্ছৃঙ্খল পশুকে বাগে রেখে পথ চলে তা দেখার মত। গরুগুলোর উচ্ছৃঙ্খলতার মূলে রয়েছে কিছু শক্তিশালী ষাঁড় যারা গায়ের জোরে পালের গোদা হয়ে বসে; অন্যদের ওপর অকারণ চোটপাট করে বিশেষ করে যারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়ার ভয় আছে। ওই পালের গোদারাই খেয়ালখুশি মতো পুরো পালকে এদিক ওদিক পরিচালিত করার চেষ্টা করে। ফুলানিরা নিজেদের গবেষণায় এসব গরুর মনস্তত্ব বোঝার পর ওই ষাঁড়দের জায়গায় নিজেদেরকেই একই ভাবে পালের গোদা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে শিখেছে। তারাও একই ভাবে ওই গোদা ষাঁড়দের ওপর অকারণ চোটপাট করে 'তাদেরকে ভয় লাগিয়ে' অন্য নিরীহদের আস্থা অর্জন করে। একই সঙ্গে তারা দুর্বলদের– বিশেষ করে গাভী, বাছুর ইত্যাদির পিঠে হাত বুলিয়ে ও যত্ন করে পুরো পালকে বশে রেখেছে। এ সবের ফলে বাকি সব গরু ফুলানি রাখালদেরকেই পালের আসল গোদা বলে মেনে নিয়ে তাদেরকে সর্বত্র অনুসরণ করে।

গরু চারণ করে জীবিকা নির্বাহ করে এরকম আর একটি আফ্রিকান আদিবাসী গোষ্ঠি হলো মাসাই। এরা কেনিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার আরো কিছু অঞ্চলের বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে বড় গরুর পাল নিয়ে ঘোরে। সমুদ্র সমতলের নিম্ন ভূমি থেকে পাহাড়ি উচ্চ ভূমি পর্যন্ত মাসাইরা রয়েছে; সর্বত্র মাসাই এবং তাদের গরুর পাল যেন এক অভিন্ন সত্ত্বা। লক্ষ্য করার একটি বিষয় হলো নানা জায়গার মাসাইদের গরুর গায়ের রঙ বিচিত্র হয়ে থাকে– নিম্নাঞ্চলে তাদের গরুর রঙ সাদা থেকে হালকা, আবার উচ্চাঞ্চলে গাঢ় রঙের থেকে কালো। নিচের সমভূমি শুকনা মরুময় ঘাসের খোঁজে যত দীর্ঘ পথ হাঁটতে হয় গরু সহজেই ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে পড়ে। সুদূর অতীতে বহু বছরের পরীক্ষা নিরিক্ষায় মাসাইরা বুঝেছে যে হালকা রঙের গরু এ রকম পরিস্থিতি সইতে পারে বেশি, গাঢ় রঙেরগুলো তা পারেনা। আবার উচ্চ পাহাড়ি অঞ্চলের ক্ষেত্রে উত্তাপ কম গাঢ় রঙের গরু সেখানে বেশি সুবিধাজনক। আধুনিক পদার্থবিদ যা ল্যাবোরেটরিতে আবিষ্কার করেছে গাঢ় রঙের অধিক তাপ শোষণের ক্ষমতা– তা মাসাইরা শত শত বছরের নিজস্ব গবেষণায় তাই করেছে; ওটিও বিজ্ঞান। আসলে প্রাণীকে ঠিকমত চেনা নিয়ে যাদের জীবন-জীবিকা তাদেরকে এক রকমের বিজ্ঞান চর্চা প্রাণীদেরকে নিয়ে করতেই হয়েছে।

আধুনিক জীববিদ্যার শুরুতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুইডেনের বিজ্ঞানী কার্ল লিনিয়াস প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাজন করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয়

হয়ে রয়েছেন। তাঁর কাজটি সহজ ছিলনা, আজও আমরা সেটি অনুসরণ করছি। নিউগিণির একটি আদিবাসী গোষ্ঠি কী ভাবে সেখানকার সমৃদ্ধ পাখির বৈচিত্রকে নানা দলে ভাগ করে তা আজকের পাখি বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করেছেন। অবাক হয়ে তাঁরা দেখেছেন লিনিয়াসের নিয়ম অনুযায়ী এখন এরকম পাখিগুলোর যে শ্রেণী বিভাজন ওদেরটিও তার খুব কাছাকাছি। মনে হয় লিনিয়াস যে সব যুক্তিতে পাখির শ্রেণীকে সাজিয়েছিলেন নিউগিণির একেবারেই ভিন্ন জীবনযাত্রার আদিবাসীদের পূর্বপুরুষ সেই একই বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে নিজেদের মত করে একই কাজ করেছিলো।

বিচ্ছিন্ন এ আবিষ্কারগুলো যদিও ইতিহাসভুক্ত বিজ্ঞানের মত দেশে দেশে বিজ্ঞানীদের প্রয়াসকে ক্রম পূঞ্জীভূত করে সৃষ্টি হয়নি, তবুও এরা বিজ্ঞানের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। নৃতত্ত্ববিদ্যার গবেষণায় ধরা পড়ছে ওই প্রাচীন বিজ্ঞানীরা কীভাবে তাঁদের সাম্প্রতিক বংশধরদেরকেও নিজেদের আবিষ্কার দিয়ে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম দিকটায় অনেকগুলো দ্বীপপুঞ্জ মূল ভূখণ্ড বা অন্য বড় দ্বীপপুঞ্জ থেকে অনেক দূরে বিচ্ছিন্ন ভাবে রয়েছে। ওগুলোতে মানুষের বসত গড়ে ওঠার বয়স কিন্তু খুব বেশি নয়। ওখানকার মাইক্রোনেশিয়ান বলে পরিচিত আদিবাসীরা কী ভাবে হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে গিয়ে এখানে প্রথম মানব বসত করতে পেরেছিলো সে রহস্য তাদের বংশধরদের দেখে উদ্ঘাটিত হয়েছে। ইউরোপীয় আগন্তুকরা প্রথম যখন ওদেরকে দেখেন তখনো ওরা পূর্বপুরুষদের মতো সরু ছিপ নৌকার মত ছোট্ট নৌকায় একটানা সাড়ে চার হাজার মাইল পর্যন্ত সমুদ্র অতিক্রমে সক্ষম ছিল। কম্পাস ছাড়া দিনরাত সঠিক দিকে নৌকা চালিয়ে তারা ঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পারতো আকাশের তারা সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের কারণে। উদাহরণ স্বরূপ তারা জানতো সিরিয়াস বা স্বাতী নামের তারাটি আকাশে তার উচ্চতম অবস্থানের সময় ঠিক ফিজি দ্বীপের ওপরে থাকে– ফিজির দিকে যেতে হলে ওসময় ওই তারার অবস্থান দেখে দিক ঠিক করতে হবে। একই ভাবে আর্জটুরাস নামের তারাটি উচ্চতম অবস্থানে হাওয়াই দ্বীপের ওপরে থাকে। দীর্ঘকাল ধরে সূক্ষ্ম আকাশ পর্যবেক্ষণে এই জ্ঞান সৃষ্টি না করে বহু শত বছর আগে থেকে শুরু হওয়া এসব সমুদ্রযাত্রা সম্ভব হতো না।

এখানে যত রকমের উদাহরণ দেখলাম সব ক'টিতে বিজ্ঞান চর্চার স্পষ্ট আভাস আমরা দেখতে পারছি। ঘটনাগুলোর পেছনের কারণ হয়তো তারা বৈজ্ঞানিক ভাবে দিতে পারেনি, কাজ চালাবার মত ঘটনা-বর্ণনা ধরনের বিজ্ঞানেই তারা

সন্তুষ্ট ছিল একথা ঠিক। তাই বলে এসবের বৈজ্ঞানিক চরিত্রের কোন হানি হয়নি। এই সব কিছুর মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়– বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন কালের, এমনকি উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষরা অনেক ক্ষেত্রে একই রকম সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান চর্চা করেছে, পরস্পরের কোন কথা না জেনেই। যেমন মাইক্রোনেশিয়ানরা যেভাবে আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছে এবং সমুদ্রযাত্রায় সে জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছে, তার অনেক আগে সেখান থেকে অনেক দূরে মিশরে, মেসোপোটেমিয়ায়, চীনে, ভারতে মানুষ ঠিক একই ধরনের আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছে– নিজের নিজের সমস্যা সমাধানে তা কাজেও লাগিয়েছে। এর মানে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো নানা মানুষকে একই ভাবে ভাবিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে সে ভাবনায় একই ধরনের ফলও এসেছে। এই ব্যাপারটি দেখিয়ে দেয় বিজ্ঞান একেবারেই মানবিক, এটি মানুষের চিন্তায়, মানুষের মস্তিষ্কে পরিব্যপ্ত। আগেই বলেছি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো প্রযুক্তি চর্চা সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারলেও বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে সব সময় খোলাসা করে বলতে পারেনা; কিন্তু সেখান থেকেও বিজ্ঞানের এই মানবিকতার অন্তত কিছু পরিচয় আমরা পাই। এবার কয়েকটি ক্ষেত্রে সে রকম কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উদাহরণ দেখা যাক।

প্রত্নতত্ত্বে প্রাগৈতিহাসিক কৃষি বিজ্ঞানঃ

বর্তমান নানা গোষ্ঠির থেকে দেখে যা জানছি তাতে তাদের পূর্বপুরুষের প্রতিফলন দেখছি বলে আমরা ধরে নিচ্ছি। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বিজ্ঞানের আরো সরাসরি সাক্ষ্য দেয় প্রত্নতত্ত্ব– অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি তা দিতে পারছে। যেমন উত্তর আমেরিকার প্রাচীন শিকারি আদিবাসীরা মাত্র অল্প কয়েকজন মিলে শত শত বন্য মোষ বাইসনকে মেরে ফেলার নিদর্শন ওখানকার তথাকথিত বাইসন মৃত্যুপুরীতে পাওয়া গেছে। বাইসন মনস্তত্ত্ব ভাল করে গবেষণা করেছে বলেই তারা কৌশলে এদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে পাহাড়ের কিনারা থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করতে পেরেছে। কিন্তু এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ বছরের শিকারি-সংগ্রাহক জীবনের পর প্রথম কোন কোন জায়গায় যে কৃষি নির্ভর জীবনের উন্মেষ হয় তার প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনাগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু মানুষের জীবনের বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণেই গুরুত্বপূর্ণ নয় সেদিনের মানুষের দীর্ঘদিন ধরে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কৃষির উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে তার কারণেও বটে। কৃষিকে সম্ভব করার জন্য বন্য উদ্ভিদ ও বন্য প্রাণীকে পোষ মানিয়ে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে গৃহপালিততে পরিণত করতে হয়েছে।

এটি কীভাবে করা যায় সেই প্রক্রিয়াটি শত শত বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমেই সেদিনের মানুষকে উদ্ঘাটন করতে হয়েছিলো। প্রথমে ১২ হাজার বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যে, এবং এর পর স্বাধীন ভাবে অন্যান্য কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন জায়গায় মানুষ এই একই আবিষ্কার করেছিলো। কাজটি সহজ ছিলনা– এর জন্য পাকা জীববিদের মত বন্য বিভিন্ন প্রজাতি সম্পর্কে ভাল ভাবে জানতে হয়েছে। এভাবে তারা লক্ষ্য করেছে এদের গুণাগুণের সবগুলো এদের অধিকাংশ জাতে থাকলেও কিছু কিছু ব্যতিক্রমী জাতে মানুষের জন্য অধিক সুবিধাজনক কোন না কোন গুণ রয়েছে।

সেই ব্যতিক্রমী জাতগুলো বাছাই করে ওরা শুধু সেগুলোর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত প্রজনন ঘটিয়েছে। পরবর্তী প্রজন্ম থেকে অধিকতর সুবিধাজনকগুলো আবার বাছাই করে একই কাজ করেছে। এভাবে ফসলের মধ্যে ওরা বড় শস্য দানা, বড় গোছা, একসঙ্গে পাকা, পাকার পর নিজ থেকে ঝরে না যাওয়া, ইত্যাদি অনুকূল গুণ বেছে নিয়েছিলো। শত শত বছর ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্মে এভাবে আলাদা প্রজননের ফলে বন্য জাতের থেকে এদের জাতটিই বদলে গিয়েছিলো– পরিণত হয়েছে নতুন প্রজাতির শস্যে যা খাস করে কৃষিশস্য। এগুলো বন্য ভাবে জন্মাবার নয়– মানুষের তত্ত্বাবধানে বড় হবার মত। প্রথম যারা এ কাজ করেছিলো তারা গবেষণার মাধ্যমেই করেছিলো; এক ধরনের বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই কৃষিশস্যের বীজ তাদেরকে পেতে হয়েছিলো। তারা ওই বীজ রেখে গিয়েছিলো বলেই পরবর্তী মানুষ নিয়মিত ভাবে কৃষিজীবী হতে পেরেছে।

বন্য প্রাণীকে গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত করার ব্যাপারটিও একই ভাবে গবেষণার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। সে ক্ষেত্রে সেই ব্যতিক্রমী বন্য জাতগুলো বাছাই করা হয়েছে– যেগুলো নিরীহ, মানুষের সান্নিধ্য পছন্দ করে, একই রকম জাতের আরো প্রাণীর সঙ্গে নির্বিবাদে এক সঙ্গে থাকে– ইত্যাদি। এই বাছাই করা পশুর মধ্যেই শুধু প্রজনন ঘটিয়ে এবং বার বার বাছাই ও প্রজননের একাজ প্রজন্মের পর প্রজন্ম করে গিয়ে পাওয়া গেছে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির গৃহপালিত পশু– যেমন নেকড়ে থেকে পোষা কুকুর। এখন বুঝি নম্র স্বভাবের নেকড়ে বাছাই করতে গিয়ে পরবর্তী প্রজন্মে নম্র স্বভাবের সঙ্গে তাঁরা পেয়ে গিয়েছিলেন ভিন্ন অন্য আচরণ, ভিন্ন মুখাকৃতি, ভিন্নতর লোম বা লেজ– যা কুকুরকে নেকড়ের থেকে পৃথক করে তুলেছে। আজকে যাঁরা নতুন জাতের কুকুর বা নতুন জাতের কবুতর সৃষ্টি করার জন্য পরীক্ষা নিরিক্ষা করেন, বা যে কৃষিবিদ নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল, লোনা সহ্যক্ষম শস্য ইত্যাদি সৃষ্টির চেষ্টা করেন তাঁরাও একই

কাজ করেন। তাঁদের প্রক্রিয়া দেখেই আমরা জানি ১২ হাজার বছর আগের মানুষকে এই একই প্রক্রিয়া নিজ থেকে আবিষ্কার করতে হয়েছিলো নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনার তাগিদে– যার ফলে এর পর পর সম্ভব হয়েছে কৃষি, স্থায়ী বসত , খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রাম, নগর, সভ্যতা। প্রত্নতত্ত্বের কী নিদর্শন থেকে আমরা সেদিনের মানুষের কৃষি গবেষণার খবর পেলাম? এর কয়েকটি নমুনা দেখা যাক।

প্যালাস্টাইনের আইন-ই-মাল্লাহা নামক স্থানে খননে উদ্ঘাটিত হয়েছে প্রায় ১৩ হাজার বছর আগের একটি গ্রাম। সেখানে বিভিন্ন মৌসুমে মানুষের দ্বারা মারা ও খাওয়া পশুর হাড় দেখে বোঝা গেছে যে সব মৌসুমেই মানুষ সেখানে বসত করেছে– যা কিনা স্থায়ী আবাসের লক্ষণ। সেখানে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত যে শস্যের সংরক্ষিত রূপ পাওয়া গেছে তা কিন্তু বন্য গম– খুবই ছোট দানা, ছরায় অল্প দু'একটি করে। তবে সুন্দর পাথরের ধারালো কাস্তে বলে দিচ্ছে ওই বন্য শস্যই বাগানের মত করে লাগানো হয়েছে যা বাগান থেকে তোলা হয়েছে কাস্তে দিয়ে কেটে। এর আগেকার দিনের মত নানা জায়গায় একটি দুটি করে থাকা বন্য গমের থেকে বাড়ি মেরে শস্য ঝরিয়ে নিয়ে নয়। বোঝা যাচ্ছে শস্যকে নিজের আওতায় এনে কৃষির দিকে এক ধাপ এগিয়েছিলো ওরা। গম তখনো গৃহপালিত হয়নি তবুও গৃহে এনে বাগানে লাগানো হয়েছে বন্য গমকে– হয়তো কিছুটা বেছে বেছেও আনা হয়েছে। ওই বসতের কাছেই কবর আছে যার একটিতে পাওয়া গেছে মানুষের কঙ্কালের সঙ্গেই কুকুরের কঙ্কাল– খুব সম্ভব মানুষটিকে কবরে দেবার সময় তার প্রিয় পোষা কুকুরকেও সঙ্গে দেয়া হয়েছিলো। কবরে প্রিয় আসবাব, হাতিয়ার, অলঙ্কার ইত্যাদি সঙ্গে দেয়া মানুষের অনেক পুরানো রেওয়াজ। স্পষ্টত মানুষের প্রথম গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে নেকড়ে থেকে একটু একটু করে বহু প্রজন্মে বদলে পোষা কুকুর পাওয়া ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছিলো এই অঞ্চলে।

সিরিয়ার আবু হোরাইরা অঞ্চলে আবিস্কৃত ১২ হাজার বছর আগের গ্রামেও একই ভাবে বন্য শস্যের বাগানের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে বন্য শস্যের পরাগ রেণু ফসিলের মত সংরক্ষিত হয়েছে এবং তা এক এক জায়গায় এমন ঘন হয়ে আছে যে তা বনে থাকার মত নয় বরং বাগানের এক সঙ্গে চারা লাগানোর মত করে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো রাই শস্যটির এমন বীজের নিদর্শন এখানে পাওয়া যাচ্ছে যা ঠিক বন্য নয়, ইতোমধ্যেই কিছুটা পোষ মানানো হয়ে গেছে– আদি কৃষিবীজের একটি। ওই সিরিয়ারই মুরাবেট নামক অঞ্চলে খননে ১১ হাজার

বছর আগের একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে– যার সমতুল্য আশপাশের অন্যান্য জায়গাতেও দেখা গেছে। নাতুফিয়ান সংস্কৃতি নামে পরিচিত এর মধ্যে কৃষির স্পষ্ট প্রভাব দেখা গেছে– বন্য থেকে পরিবর্তিত ও উন্নত শস্যবীজের নিদর্শন ও কৃষি-হাতিয়ার উদ্ঘাটনে ব্যাপারটি ধরা পড়েছে। জর্দানের বাইধাতে ১০ হাজার বছর আগের উন্নত শস্যবীজ পাওয়াতে এ অঞ্চলে ওসময় কৃষির প্রতিষ্ঠা আরো ভাল প্রমাণিত হয়েছে। আরো নানা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের বোঝা গেছে যে বর্তমান সিরিয়া, ইরাক, প্যালেস্টাইন, জর্দান ও তুরস্কের কিছু জায়গা জুড়ে ইতোমধ্যে কৃষি চলে এসেছে যা রাই, গম, ও বার্লি ওই তিন শস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বন্যগুলোর তুলনায় এ শস্য অনেক পুষ্ট, এদের বিন্যাসও ঘন। মানচিত্রে অঞ্চলটি অনেকটা বাঁকা চাঁদের আকারের বলে একে 'উর্বর বাঁকা চাঁদ' বলা হয়। প্রায় একই সময়ে এখানে গৃহপালিত প্রজাতির কুকুর, ভেড়া ও ছাগলের হাড় আবিষ্কৃত হয়ে এই ক'টি পশুর পোষ মানাবার প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে এই হাড় বন্য ভেড়া বা ছাগল বা নেকড়ের নয়, বরং গৃহপালিত হবার প্রক্রিয়ায় পশুগুলোর অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাছাড়া বিশ্লেষণ আরো দেখাচ্ছে যে পশুগুলোকে মানুষের প্রতিপালনের প্রভাব ওই হাড়ের ওপর রয়েছে। এই সব ঘটতে পেরেছে মানুষের চেষ্টায়– প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক 'বিজ্ঞানীর' গবেষণার মাধ্যমে।

এরকম প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনাই আমাদেরকে বলে দিচ্ছে পরে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর কয়েকটি বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন ভাবে একেবারেই নিজেদের গবেষণায় কৃষি আবিষ্কৃত হয়েছিলো। কৃষির শস্য বা পোষার প্রাণী হয়তো আলাদা এবং নতুন– কিন্তু এদেরকে বন্য থেকে গৃহপালিত করার প্রক্রিয়াটি প্রত্যেক ক্ষেত্রে নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছে সেখানকার প্রাগৈতিহাসিক 'বিজ্ঞানীরা'। ওভাবে উত্তর আফ্রিকায় গরু এবং চীনে ধান ও শূকরকে প্রথম গৃহপালিত করার নিদর্শন পাওয়া গেছে। আদি কৃষির স্থান মধ্যপ্রাচ্য থেকে অনেক দূরে নিউগিণির কুক জলাভূমিতে প্রাচীন সেচ ব্যবস্থার একটি সুন্দর নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে ১০ হাজার বছর আগে কৃষির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ৭ হাজার বছর আগের সময়ের মধ্যে এখানেই প্রথম কচু, কলা, আখ এবং ইয়ামকে বন্য থেকে কৃষিফসলের প্রজাতিতে রূপ দেয়া হয়েছিলো বলে প্রমাণ মিলেছে। এরকম এক একটি উদ্ভিদের কোষে অতিক্ষুদ্র কিছু পাথুরে কণা (ফাইটোলিথ) থাকে যার কৃষ্টালরূপ থেকে এটি কোন্ উদ্ভিদ তা ধারণা করা যায়। হাজার হাজার বছরে উদ্ভিদটি নষ্ট হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু ওই পাথুরে কণা বয়ে গেছে পাথরের তৈরি নানা কৃষি-

হাতিয়ারের সঙ্গে অনুবীক্ষণে সেগুলোর আকৃতি দেখে বোঝা গেছে ওই কচু, কলা, আখ ও ইয়াম ছিল বন্য প্রজাতির নয়, ইতোমধ্যে পোষমানানো কৃষি প্রজাতির। স্থানীয় ভাবে এগুলোর বন্য রূপ পাওয়া যেতো বলেই সেখানকার অনুসন্ধানী মানুষের পক্ষে এদের রূপান্তর সম্ভব হয়েছিলো।

যদি চলে যাই আরো দূরে দক্ষিণ মেক্সিকোর ওহাকা অঞ্চলে গুইলা নাকুইজ পাহাড়ি গুহায় সেখানে মানুষ বাসের সব চেয়ে পুরানো নিদর্শন মিলেছে ৮ হাজার বছর আগের আর সেই সঙ্গে ওখানে অত্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়ায় নানা অনুকূল পরিবেশ সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে এখনকারই সম্প্রতি পোষ মানানো ভুট্টা, কুমড়া আর শিমের নমুনা। ভুট্টার ক্ষেত্রে ভুট্টার পুরো মোচা পাওয়া গেছে, কিন্তু সেদিনের সেই মোচা মাত্র ইঞ্চি দেড়েক লম্বা! কুমড়ার ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে কয়েকটি বীজসহ বাকলের একটুখানি অংশ। আর শিমের ক্ষেত্রে গোটা কয়েকটি দানা। পরীক্ষায় দেখা গেছে এই তিনটাই মানুষের পোষ মানানো প্রজাতি, বন্য প্রজাতি নয়। অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে বোঝা গেছে এই তিনটিই বন্য প্রজাতি থেকে পোষ মানানো হয়েছে, এখান থেকে খানিকটা উত্তরে মেক্সিকোতেই আরো দু'এক হাজার বছর আগে। সেখানে ভুট্টার বন্য রূপ তিয়োসান্তে এখনো পাওয়া যায়, যা কিনা একেবারেই খোলা ছোট দানা রূপে বিচ্ছিন্ন দু'একটির গুচ্ছে– মোটেই মোচার মত নয়। এখানকার প্রাগৈতিহাসিক বিজ্ঞানীরা এই তিনটি কৃষিশস্য উন্নয়নের মাধ্যমে শুধু এই অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ায়নি বরং এই তিন ফসলের ভিত্তিতে মেক্সিকোতে এবং মধ্য আমেরিকায় পর পর কয়েকটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী সভ্যতা গড়ে তোলার পথ করে দিয়েছিলো– ওলমেক, জাপোটেক, মায়া, আজটেক ইত্যাদি। এসব সভ্যতায় বিশেষ করে ভুট্টার অবদানটিকে বেশ উচ্চকিত করে তোলা হয়েছে– ভুট্টা দেবতা, ভুট্টা উৎসব; এগুলোর প্রতি উৎসর্গকৃত মূর্তি ইত্যাদি এর নিদর্শন।

ওখানে ভুট্টা নিয়ে যা হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকায় আলুর ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে– আলুর কৃষি-করণ বড় সভ্যতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। বলিভিয়া ও পেরুর সংযোগ স্থলে থাকা টিটিকাকা হ্রদের কাছাকাছি জায়গাগুলো প্রায় ৮ হাজার বছর আগে ও কাজটি হয়েছে। কাছে আন্দিজ পর্বতমালার উচ্চ ভূমিতে এখনো এক রকম বন্য আলু পাওয়া যায় যার সাইজ পূতির দানার চেয়ে বড় নয়। এরকম বন্য আলু থেকে আলুর যে কৃষি প্রজাতি ওখানে উদ্ভাবিত হয়েছিলো তার প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনা থেকে ব্যাপারগুলো জানা গেছে। বন্য আলুর অনেকগুলো ছিল তেতো, কৃষি-আলুর মধ্যেও তাই তেতো স্বাদ থেকে যাচ্ছিল। আন্দিজের উচ্চ

শীতল অঞ্চলে সেই অতীত বিজ্ঞানীরা আজকের ফ্রিজ-ড্রাইং পদ্ধতির মত উপায় উদ্ভাবন করেছিলো এই তেতো উপাদান দূর করার জন্য। এতে আন্দিজের অনেক উচ্চতায় দুর্গম শীতল অঞ্চলে জন্মানো আলুকে রাতে বাইরে মেলে রাখা হতো ঠান্ডায় জমে যাওয়ার জন্য। প্রত্যেক রাতের পর দিনে এই আলু গুড়িয়ে, পায়ে ক্রমাগত মাড়িয়ে ছিলকা ও ভেতরের আর্দ্রতা বের করে ফেলা হতো। এভাবে চার পাঁচ দিন করার পর পাহাড়ি ঝরণার পানিতে এর সব তেতো উপাদান ধুয়ে ফেলা হতো। শুকিয়ে দলা দলা করে এ আলু কয়েক বছর ধরে খাওয়ার উপযুক্ত রাখা যেতো। 'চুনো' নামে পরিচিত এই সংরক্ষিত আলু এখনো এ অঞ্চলে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এর প্রাচীন নিদর্শনও পাওয়া গেছে। আসলে দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্র এখন ভিন্ন স্বাদের জন্য চুনোর বেশ খ্যাতি রয়েছে।

অবশ্য সেই প্রথম আবিষ্কারের পর আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন উচ্চতায় শীতল, নীতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উপযুক্ত বিচিত্র আকার, আকৃতির, রঙের, স্বাদের আলু ওরা উদ্ভাবন করেছিলো আজকের পাকা কৃষি গবেষকদের মত সাধনায়– তেতো স্বাদ ও অন্যান্য বিরূপ প্রকৃতি এড়িয়ে। আলুর ফলন আন্দিজ অঞ্চলে পর পর বেশ কয়েকটি সমৃদ্ধ সভ্যতার পেছনে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে– যার সর্বশেষটি হলো ১৩০০ শতকে শুরু হয়ে ১৫০০ শতকের শেষে স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের হাতে ধ্বংস হওয়া ইন্কা সভ্যতা।

দরাজ আওয়াজ শোনার প্রাচীন ব্যবস্থা:

নানা কালে, নানা অঞ্চলে সমৃদ্ধি আর সভ্যতা সৃষ্টির পেছনে প্রাগৈতিহাসিক কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, অন্য বিজ্ঞানীদের কাজের নিদর্শনও আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব কিছু কিছু তুলে ধরতে পেরেছে। এসব গবেষণাও প্রয়োজনের তাগিদেই হয়েছিলো– কিন্তু সব প্রয়োজন ভরণ-পোষন নিয়ে ছিলনা। তেমনি একটি প্রয়োজন ছিল মন্দিরের পুরোহিত কিংবা রাজার গলার আওয়াজকে দরাজ করে তুলে শ্রোতাদের বিরাট সমাবেশকে মোহিত করে রাখা। প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রাচীন কিছু কিছু মন্দিরকে এরকম আশ্চর্যরকম শব্দগুণ সম্পন্ন করে তৈরি করা অবস্থায় পেয়েছেন যা একমাত্র আধুনিক পদার্থবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করে বর্তমান প্রকৌশলীরা সৃষ্টি করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ ভূমধ্যসাগরীয় ছোট দ্বীপরাষ্ট্র মালটায় ভূগর্ভে ৫ হাজার বছর পুরানো একটি বহু-কামরা বিশিষ্ট চূণাপাথরে তৈরি মন্দির পাওয়া গেছে যাকে বলা হয় হাইপোজিয়াম। এতে অনেকগুলো ডিম্বাকৃতি কামরা পর পর রয়েছে যার বিভিন্ন উচ্চতায় নানা রকম নলাকৃতি পথ

ভেতরে ঢুকে ও করিডর দিয়ে সংযুক্ত হয়ে একটি অলি-গলির জটিলতা সৃষ্টি করেছে। বড় কয়েকটি কামরার গম্বুজাকৃতি খিলান রয়েছে। এরকম একটি থেকে পুরুষ কণ্ঠে চাপা গলায় (১১০ হার্ৎস ফ্রিকোয়েন্সির কাছাকাছি) কথা বললে তা পুরো মন্দিরে এমন ভাবে অনুনাদিত ও শতগুণে বর্ধিত হয় যে এর যে কোন কক্ষে বা করিডরের মানুষ তা শুনে পরাবাস্তবিক একটি অভিজ্ঞতার সম্মূখীন হয়। সূক্ষ্ম গবেষণার পরীক্ষা নিরিক্ষা ছাড়া এমন কিছু তৈরি করা সেদিন অসম্ভব হতো। দক্ষিণ মেক্সিকোর মায়া সভ্যতার সময়কার (৫০০-৯০০ খৃষ্টাব্দ) একটি মন্দির চিচেন-ইৎসার বিশাল চত্বরে দুই কিনারায় দুটি স্থাপনার কাছে কথা বল্‌লে তা পুরো চত্বরের সর্বত্র থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। এখানেও সেই একই রকম গবেষণার প্রয়োজন হয়েছে তার নিজের মত করে। শব্দগুণের সব চেয়ে প্রাচীন মুনশিয়ানা ধরা পড়ে ৩৫ হাজার বছর আগের প্রাণীর সরু হাড়ে পর পর ছিদ্র করে তৈরি বাঁশিতে। ক্রোয়োশিয়ায় পাওয়া এ বাঁশিতে সুন্দর সুর তোলা সম্ভব হতো।

সম্ভব হতো মাথার খুলির অপারেশনঃ

প্রাগৈতিহাসিক কিছু শৈল্যবিদ্যার নমুনায় অত্যন্ত চমৎকৃত হয়। তা এই ভেবে যে মানব দেহের অভ্যন্তরের কথা ভালভাবে জেনে সেখানে নিখুঁত অস্ত্রোপচার করে রুগীকে সারিয়ে তুলতে কতখানি বৈজ্ঞানিক চর্চার প্রয়োজন হয়েছিলো, বিশেষ করে সে অস্ত্রোপচার যদি হয় মাথার খুলিতে। আর্মেনিয়ার একটি প্রত্নতাত্ত্বিক খননে দু'জন নারীর কঙ্কালে ঠিক এমনি অস্ত্রোপচারের নিদর্শন দেখা গেছে– যা করা হয়েছিলো ৪ হাজার বছর আগে। প্রথমটির খুলিতে আঘাতে সৃষ্ট সিকি ইঞ্চির মত একটি ছিদ্রকে মসৃণ করে নিয়ে হুবহু একই সাইজের পশু হাড়ের তৈরি ছিপি দিয়ে তা বন্ধ করা হয়েছে। ছিদ্রের কিনারায় গজানো হাড় পরীক্ষা করে এখন বোঝা যাচ্ছে যে এই নারী অস্ত্রোপচারের পর বহু বছর বেঁচেছিলেন। অন্য নারীর খুলিতেও বড় আঘাতের ক্ষত ছিল– তবে সেটি খুব সম্ভব ভোতা কোন কিছুর আঘাত হওয়াতে অল্প একটু জায়গায় খুলির দেয়ালের নিচের স্তরের হাড় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা হয়ে গিয়েছিলো। এক্ষেত্রে 'সার্জন' নিজেই জায়গাটিতে পরিস্কার একটি পুরো ছিদ্র করে ক্ষুদ্র টুকরাগুলো সরিয়ে ফেলেছেন। খুলির হাড়ের বৃদ্ধিতে ক্ষত বুজে যাওয়া দেখে এখন বোঝা যাচ্ছে এই নারী এরপর আরো অন্তত ১৪ বছর বেঁচেছিলেন। অস্ত্রোপচারে যে ছুরি ব্যবহার করা হয়েছিলো তাও পাওয়া গিয়েছে– এটি অবসিডিয়ান পাথরে তৈরি অত্যন্ত ধারালো ছুরি। অস্ত্রোপচারের

সময় অজ্ঞান করার জন্য কোন কিছু ব্যবহার করা হয়েছিলো কিনা, অথবা ক্ষত স্থানে প্রদাহ না হতে দেবার জন্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেদিনকার মত করে এই দুটি আবশ্যকীয় জিনিসও বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার আওতায় আসারই কথা; তেমন কিছু পরে প্রমাণিত হলে অবাক হবার কিছু নেই। মিশরে ৪,৬০০ বছর পুরানো এক ব্যক্তির মমির আভ্যন্তরীন পরীক্ষার জন্য যখন এক্সরে করা হয়েছে তখন ধরা পড়েছে যে জীবিত কালে ওই লোকের একটি পা ভেঙ্গে গিয়েছিলো। এর চিকিৎসা করতে গিয়ে প্রাগৈতিহাসিক সার্জন পায়ের রানের হাড় ও নিচের অংশের হাড়ের মাঝখানে ৯ ইঞ্চি লম্বা একটি ধাতব স্ক্রুর ব্যবহার করে উভয় অংশকে নিখুঁত ভাবে জুড়ে দিয়েছেন। আজকের যে অর্থোপেডিক সার্জনরা এ কাজ অহরহ করছেন তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে তাঁদের বিদ্যাটি অতি প্রাচীন।

চিত্রে ও স্থাপত্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানঃ

বিজ্ঞানের ইতিহাসের একেবারে শুরুতে দেশে দেশে যে কাজটি হয়েছে তা হলো আকাশ পর্যবেক্ষণ– জ্যোতির্বিদার চর্চা। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি লিপিবদ্ধ ইতিহাসের আগেও এ কাজ বিজ্ঞানীরা করতেন। কিন্তু যেহেতু লিপির অভাবে পর্যবেক্ষণের ফল গ্রহ নক্ষত্রের ক্যাটালগ হিসেবে আসতে পারেনি, তাই প্রাগৈতিহাসিক জ্যেতির্বিদদের চর্চার প্রত্যক্ষ কোন রেকর্ড আমাদের কাছে নেই। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদরা অন্য রকম কিছু রেকর্ড খুঁজে পেয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ ফ্রান্সের আব্রি ব্লানচার্ড নামক জায়গায় ৩০ হাজার বছর পুরানো একটি চওড়া পশু হাড় পাওয়া গেছে যাকে তখনকার মানুষ খোদাই করে চিত্র আঁকার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ওই চিত্রের সঙ্গে এক সারি খোদাই করা ছোট ছোট গর্ত এমন ভাবে রয়েছে যাতে প্রতি দিন একটু একটু করে চন্দ্রকলার বেড়ে ওঠে ওঠে পূর্ণিমা আসবে এবং এরপর ক্ষয় পেয়ে পেয়ে অমাবস্যা আসার একটি অবিকল বর্ণনা ফুটে ওঠেছে। প্রাচীন গুহা চিত্রেও এরকম আকাশ পর্যবেক্ষণের কিছু কিছু নমুনা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। যেমন ফ্রান্সের লাজাউ গুহায় ১৭ হাজার বছর আগে আঁকা শিকারের না প্রাণীর নানা চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাণীদেহের ছবির সঙ্গে মিল রেখেই ওর কোন কোনটিতে আকাশের তারার বিন্যাসকে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু ছবিতে বিশেষ করে দেখা যায় তারামন্ডলীর মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট 'কৃত্তিকাকে', যেটি 'সাত বোন' নামেও পরিচিত। এই তারামণ্ডলীটির একটি বৈশিষ্ট হলো এটি দিক নির্ণয়ের জন্য

ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া চন্দ্রকলার পরিবর্তনের সঙ্গে এই সাত বোনের স্থান পরিবর্তনের একটি সহজ সম্পর্ক রয়েছে যার মাধ্যমে চাঁদের বদলে একে দেখেই দিনের হিসেব রাখা যায়। লাজাউয়ের চিত্রে ছাড়াও ওই অঞ্চলের অন্যত্রও গুহাচিত্রে কৃত্তিকার নানা অবস্থানের ছবি লক্ষ্য করা গেছে– প্রায় ক্ষেত্রেই প্রাণীর ছবির সঙ্গে একেবারে মেশানো অবস্থার। হয়তো বা শিকারি মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই প্রাণীদের আনাগোণার দিন ও অনুসরণের দিক নির্ণয়ে কৃত্তিকার ব্যবহার করতো বলেই এই গুরুত্ব।

আকাশ পর্যবেক্ষণের সাক্ষ্য যে ওরা শুধু চিত্রের মাধ্যমে রেখেছে তা নয়। ওই লাজাউ গুহার যে মুখটিকে ওরা একেবারে আদিতে ব্যবহার করতো, দেখা গেছে যে বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যোদয়ের সময়ের আলো ঠিক ওই মুখ বরাবর এসে গুহার মধ্যে ঢোকে। কোন্ দিনটি সেই বিশেষ দিন? যে ক'টি দিনকে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা-প্রেমিক মানুষরা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করতো, এখনো করে, তাদের মধ্যে এটি একটি। গ্রীষ্মকালের প্রথম অর্ধেকে সূর্য একটু একটু করে উত্তরে সরতে থাকে (উত্তর গোলার্ধে), অর্থাৎ ঠিক পূর্ব দিকে উদয় না হয়ে প্রতিদিন একটু একটু বেশি উত্তর-পূর্ব দিকে ওঠে ও উত্তর-পশ্চিমে অস্ত যায়। একে আমরা বলি সূর্যের উত্তরায়ন। মধ্য-গ্রীষ্মের একটি দিন (এখন ২১ জুন) সূর্য এই উত্তরায়নের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়; আর এই দিনটি তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, এই দিনকে বলা যায় উত্তরায়নের শেষ দিন, দীর্ঘতম দিন (কারণ ওটি সব চেয়ে লম্বা দিন ও সব চেয়ে বেঁটে রাত) অথবা মধ্য-গ্রীষ্ম দিন। এরপর থেকে সূর্য ক্রমে দক্ষিণ দিকে সরতে থাকে। এমনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন আসে শীতের সময় (এখন ২২ ডিসেম্বর) যখন এর বিপরীতটি ঘটে– ওটি সূর্যের দক্ষিণায়নের শেষ দিন, দীর্ঘতম রাতের দিন, মধ্য-শীতের দিন। লাজাউয়ের বাসিন্দারা তাদের গুহামুখ করেছিল ঠিক মধ্য-গ্রীষ্মের দিনের সূর্যোদয়ের দিক বরাবর– যাতে বছরের ওই একদিন সূর্যোদয়ের আলো সোজা এসে গুহায় ঢুকে। স্পষ্টত ১৭ হাজার বছর আগের জ্যোতির্বিজ্ঞানী সূর্যের ওই গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং বিশেষ দিনটিকে চিহ্নিত করেছিলেন। খুব সম্ভব ওই মানুষদের বিশ্বাস, উৎসব ইত্যাদির সঙ্গে ওই ব্যাপারটি জড়িত ছিল, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ছাড়া ওটি সম্ভব হয়নি।

মজার ব্যাপার হলো প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যে দুনিয়ার নানা অঞ্চলে ওই গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর হিসেব রাখতো তার নানা সাক্ষ্য তারা রেখে গেছে– অনেক ক্ষেত্রে চিত্র অংকনে নয়, বরং রীতিমত তাদের স্থাপনায় ও স্থাপত্যে। মিশরের নাব্‌লা

প্লায়া নামক স্থানে ১০ হাজার বছর পুরানো এক অদ্ভুত পাথর বিন্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে প্রাচীন মানুষ অনেকগুলো বড় বড় পাথর খণ্ডকে প্রধানত বিশাল বৃত্তাকারে সাজিয়েছিল। এরকম বেশ কয়েকটি বৃত্ত এখনো ওভাবেই আছে; বৃত্তের ভেতরে অবশ্য আছে সরল রেখায় ও আরো কয়েক প্রকারে পাথর সন্নিবেশ। এখন দেখা যাচ্ছে যেভাবে তারা পাথর সাজিয়েছে তার সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার সম্পর্ক রয়েছে। যেমন কোন কোন সন্নিবেশে বৃত্তের পরিধির পাথর আর ভেতরের পাথর মিলে কোন কোন বিশেষ তারার দিগন্ত রেখায় উদিত হবার দিক নির্দেশ করছে। এমনকি আমরা যে তারামণ্ডলীকে বলি কালপুরুষ (ওরিয়োন) তার তারাগুলো মানবাকৃতি বিন্যাসে যে কোমরের বেল্টের মত সাজানো তিনটি তারা রয়েছে তার সঙ্গে একই সরল রেখায় রয়েছে নাব্‌লা প্লায়ার কিছু পাথর বিন্যাস– এমনটিই মনে করা হয়। পরবর্তী কালের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা গেছে কালপুরুষের একটি ধর্মীয় গুরুত্ব মিশরে বরাবর ছিল (বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব ছাড়াও) । দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের ষ্টোনহেঞ্জে বহু টন ওজনের বিশাল আকৃতি পাথর খন্ডের যে স্থাপনা প্রাচীনতম ৯ হাজার বছর আগের তার আনুসঙ্গিক কিছু পাথর বিন্যাসের দিকের সঙ্গে মধ্য-গ্রীষ্মের দিনের সূর্যোদয়ের দিক মেলে যায় এমনটি দেখা যায়। এ জন্য ওই দিনটিতে ওখানে রীতিমত উৎসব পালন করা হয়। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে রকমের প্রাচীনত্বের কথা আমরা বলছি সেই সময়ের মধ্যে আকাশের গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধিতে দীর্ঘমেয়াদী সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে যেগুলো পরে নিখুঁত হিসেবে বলে দেয়া গেছে। ওপরে দেয়া সূর্যোদয় বা তারা উদয়ের দিক প্রাচীন মানুষ যেখানে দেখেছিলো এখন ঠিক সেইখানে নেই– আজ আমরা তা ওভাবে দেখিনা। কিন্তু হিসেব করে বলে দিতে পারি ওরা কোথায় দেখেছিলো।

তবে মেক্সিকোর মায়া সভ্যতার জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে এ হিসেব দরকার হবেনা, কারণ ওটি খুব বেশি প্রাচীন কালের কথা নয়। যেমন এখানে চিচেন-ইৎসার যে মন্দিরের কথা এর শব্দগুণের প্রসঙ্গে বলেছি তার বয়স ৯০০ বছরের বেশি নয়। সেটি যখন নির্মাণ করা হয় তার বহু হাজার বছর আগে পৃথিবীর নানা জায়গার জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা তথ্য লিখিত আকারে বের হয়ে গেছে। কিন্তু মায়া সভ্যতা ওই ৯০০ বছর আগেও প্রাগৈতিহাসিক– ওখানে লিপি আসেনি, ওদের সঙ্গে পুরানো দুনিয়ার কারো তখনো কোন যোগাযোগও হয়নি। তাই ওই মন্দিরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে ছাপ আছে তাও একান্তই প্রাগৈতিহাসিক বিজ্ঞানীর কাজ– জ্ঞান সেখানে লেখাজোকায় পূঞ্জীভূত হতে পারেনি। চিচেন-ইৎসার একটি

ভবনের নির্মাণ দেখে মনে হয় আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্যই ওটি তৈরি হয়েছিলো। এজন্য এখন এর নাম দেয়া হয়েছে কারাকোল মানমন্দির। এর যে নজর-কাড়া উঁচু সিড়ি বহু ধাপে উপরে উঠে গেছে তার অভিমুখের সঙ্গে ভবনের প্রধান কিনারাগুলোর দিকগুলোর সামঞ্জস্য নেই। বরং বছরের দিন গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে শুক্র গ্রহ উত্তরে সরতে সরতে সব চেয়ে উত্তরের যে অবস্থান নেয় তার দিকের সঙ্গেই সিড়ির দিকের অভিমুখ। শুধু তাই নয় পুরো ভবনটিতে এমন সব আঙ্গিক রয়েছে যা দেখলে মনে হয় সেগুলো যেন এই শুক্র গ্রহকে অনুসরণের জন্যই তৈরি হয়েছে – যেটি সন্ধ্যায় 'সন্ধ্যা তারা' রূপে আর ভোরে 'শুক তারা' রূপে জ্বলজ্বল করে। কোন কারণে চিচেন-ইৎসার প্রাগৈতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ শুক্র গ্রহের ওপরেই বেশি কেন্দ্রীভূত ছিল।

সবই মানব প্রেরণার অংশঃ

প্রাগৈতিহাসিক বিজ্ঞানের এই সব কিছুর উল্লেখ শুধু একটি কথা বোঝাতেই করা হয়েছে– তা হলো মানুষ বরাবর বিজ্ঞানের কিছু কিছু চর্চার প্রতি যত্নবান ছিল অন্যান্য নানা আচরণে তারা যতই অবৈজ্ঞানিক হোক না কেন। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হয়তো ২০-৩০ হাজার বছর পেছনে গিয়ে থমকে যাচ্ছে, এর থেকে বেশি দিন আগেরগুলো আজ টিকে নাই। কিন্তু এর থেকে ধারণা করতে পারি যে বিজ্ঞান আরো আগেও ছিলো– হয়তোবা ওই কথাটিই ঠিক– বিজ্ঞান মানুষের সমবয়সী। পৃথিবীর নানা প্রান্তে এবং নানা কালে একই রকমের যে কঠিন চর্চাগুলো হতে দেখলাম তাকে মানব-প্রেরণা ছাড়া আর কী বলতে পারি। 'এটি বিজ্ঞানের যুগ' একথা বলে আমরা যদি বোঝাবার চেষ্টা করি বিজ্ঞান জিনিসটি শুধু হাল আমলের তা হলে ভুল করবো। বিজ্ঞানের ইতিহাস (লিপির মাধ্যমে) শুরু হবার পরের কালের বিজ্ঞানকে অবহেলা করার সুযোগ একেবারেই নেই, কারণ তাদের বিজ্ঞান চর্চা তো তাদের লেখায় বর্ণিত রয়েছে। এখন দেখছি প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্যও সেই সুযোগ নেই। হ্যাঁ লেখাজোকা না থাকাতে সেই বিজ্ঞান চর্চা কী ভাবে হয়েছিলো, কেন হয়েছিলো, কী পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছিল এসব জানার উপায় নেই। আমরা শুধু এর ফলাফলগুলো কিছুটা দেখছি, আর অন্য সবকিছু সামান্য আন্দাজ করতে পারছি মাত্র। এটি শুধু বলে দিচ্ছে বিজ্ঞান জিনিসটা একেবারেই মানবিক– তার কাহিনী মানব-কাহিনীর একেবারেই গভীরে।

তবে বিজ্ঞানকে সবদিক থেকে চিনতে হলে বিজ্ঞানের লিখিত বর্ণনা থেকে চিনতে হবে– সেটি আজকের বিজ্ঞান-প্রকাশনাগুলো থেকে যেমন, তেমনি বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকেও। শুধু আজকের বিজ্ঞানকেও যদি চিনতে চাই বুঝতে চাই, বিশেষ করে তার পদ্ধতিকে যদি মনে ধারণ করতে চাই তা হলেও মানুষ কী করে ধাপে ধাপে পদ্ধতিগুলো সন্নিবেশিত করেছে সেটি দেখতে হবে। এই কাজটির ধারাবাহিকতা ইতিহাস অনুসরণ করেই করতে হবে; আমরা তাই করবো।

কেন দেখা, কেন মাপা

আকাশমুখী প্রথম বিজ্ঞানীরা

পুরোহিতের বাড়তি কাজঃ

বিজ্ঞানী কথাটি আমরা বেশ ঢালাও ভাবে ব্যবহার করে চলেছি। দু'মাস বয়সী শিশুকেও বলেছি স্বভাব-বিজ্ঞানী, আবার প্রাগৈতিহাসিক কৃষি উদ্ভাবকদেরকেও, যাদের আসল পরিচয় আমাদের জানা নেই। যাদের বৈজ্ঞানিক কাজের লেখাজোকা আমাদের হাতে এসেছে তাদেরকেও যে খাস করে বিজ্ঞানী বলতে পারবো তাও নয়। কারণ আপাদমস্তক বিজ্ঞানীর খোঁজ পেতে হলে আমাদেরকে এখনকার প্রায় চারশ' বছরের মধ্যে চলে আসতে হবে। এর আগে হাজার হাজার বছরের যে বিজ্ঞান সেগুলো অন্য ধরনের মানুষের কাজ– যাঁরা জ্ঞানী-গুণী মানুষ হিসেবে পরিচিত, নিজেদের অন্য নানা কাজ রয়েছে; মনে হবে বিজ্ঞানটি তাঁদের বাড়তি কাজ। কিন্তু সেই বাড়তি কাজে তাঁরা যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা অবাক হবার মত। নিজেদের অন্য নানা কাজের সঙ্গে মিশিয়েই এসব করেছেন। আমরা এখন বৈজ্ঞানিক চরিত্রের কারণে কিছু কিছু কাজকে আলাদা করে দেখছি– তাঁরা নিজেরা হয়তো সেভাবে আলাদা করেননি। ইতিহাসের একেবারে শুরুর দিকে গিয়ে আজকের ইরাক আর মিশরে এমন যাঁদেরকে দেখি তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন মন্দিরের পুরোহিত। দেবদেবীর সন্তুষ্টি সাধনের অংশ হিসেবে তাঁরা প্রকৃতির নানা জিনিস জানার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে আকাশে চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারা এগুলোই তাঁদের আগ্রহের বস্তু ছিল– হয়তো এগুলোই দেবদেবীর সম্মান পেতো বলে।

তবে পুরোহিতের বিজ্ঞান চিন্তার আরো পার্থিব কারণও ছিলো। জনগণকে যে সব উপদেশ দিয়ে তাঁরা মুগ্ধ করতে চাইতেন তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাস দিয়ে এবং তা সত্য হতে দেখিয়ে সবাইকে চমৎকৃত করে দেয়াটাও অন্তর্ভূক্ত ছিল। ব্যাবিলনের সম্রাট কিংবা মিশরের ফেরাউনের মত শক্তিশালী শাসকরা তাঁদেরকে নিয়োজিত করতেন; প্রজাদের মধ্যে ধর্মভক্তি, রাজভক্তি ইত্যাদি জন্মানোর জন্য এরকম চমৎকৃত করা দরকার ছিল। তাছাড়া ওই জ্ঞানগুলো প্রজাদের বাস্তব উপকারেও আসতো। কৃষিজীবী এই প্রজারা জীবন ধারণের জন্য নদীতে জোয়ার ভাটা, বন্যা ইত্যাদির পানির ওপর নির্ভরশীল ছিল, আর তাদের জানতে হতো

উপযুক্ত মৌসুমের কথা– কখন বীজ লাগাবে, কখন ফসল কাটবে। এর জন্য চাঁদ-সূর্যের হিসেব জানাটা জরুরী ছিল। এরকম উপকারে আসা পরামর্শ ওরা পুরোহিতের কাছে যেমন চাইতো অন্য জ্ঞানীদের কাছেও চাইতো– যেমন যাঁরা রোগ সারাতেন, জ্ঞান-বৃদ্ধের মত উপদেশ দিতেন, এমনকি যাদু-বিদ্যা চর্চা করতেন তাঁদের কাছে। তাঁদের সবারই অন্তত কিছু কাজের সঙ্গে বিজ্ঞান যে জড়িয়ে ছিল এখন আমরা তা বুঝতে পারছি। অবশ্য তাঁদের সব কাজ যে বৈজ্ঞানিক ছিলনা তা বলাই বাহুল্য। যেমন যিনি চিকিৎসা করতেন তিনি অধিকাংশ সময় তা তুকতাক ঝাড়ফুক দিয়ে করতেন, তার মধ্যেই কিছু চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক ধরনের ছিল– কিছু রোগ নির্ণয়, ওষুধ, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি। অন্তত এরকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব পুরোহিত-বিজ্ঞানী, চিকিৎসক-বিজ্ঞানী কিংবা যাদুবিদ-বিজ্ঞানী দারুণ কাজ করেছেন, পরবর্তী বিজ্ঞানের জন্য দিশারীর কাজ করেছেন। জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে তো একথা অবশ্যই বলা যায়।

পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে এঁদের খবর আমরা জানি, কারণ তখন থেকেই মেসোপোটোমিয়া (প্রাচীন ইরাক) আর মিশর থেকে লেখাজোকা পাওয়া গেছে। ওসময়ের আলাদা আলাদা বিজ্ঞানীর তেমন কোন নাম পাওয়া যায়নি, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাঁদের কাজের খোঁজ পাওয়া গেছে। কিছু সময় পরের চীন ও ভারতেও প্রায় একই রকম চিত্র আমরা দেখেছি। মেসোপোটোমিয়ায় বিশেষ ভাবে অগ্রসর কাজ হয়েছে ব্যাবিলনে– ওখানকার আলাদা এই নগর রাষ্ট্রে। মিশর ও ব্যাবিলনের স্বর্ণযুগ যখন তুঙ্গে তখন ধীরে ধীরে উত্থান হয়েছে গ্রীসের– এখন থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে থেকে যার শুরু। ওখানে কিন্তু বিজ্ঞানীদের চেহারা বদলে গেছে– ওঁরা তখন আর পুরোহিত কিংবা যাদুবিদ নন্– তাঁরা সবাই দার্শনিক। গ্রীস ছিল দার্শনিক আর ভাবুকের দেশ; চিন্তার স্বাধীনতার দেশ। তাঁদের বৈজ্ঞানিক কাজের ওপরও সেই ভাবনা, সেই স্বাধীন চিন্তার প্রভাব পড়েছিলো। তবে লেখাজোকায় সবকিছুর শুরু করেছিলেন ওই ব্যাবিলন আর মিশরের পুরোহিত-বিজ্ঞানীরাই।

অন্তত বিজ্ঞানের খুব প্রাথমিক কিছু পদ্ধতির গোড়া-পত্তন যে তাঁরা করেছিলেন তা নিঃসন্দেহ। এর মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ, এবং সে সবের স্পষ্ট লিপিবদ্ধ করণ। শুধু তাই নয় এভাবে যে তথ্য তাঁরা পাচ্ছিলেন সেগুলোর মধ্যে কোন নিয়ম, কোন প্যাটার্ন দেখা যায় কিনা সেটি তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন। ওটিই তো বিজ্ঞানে আসল কাজ– ওই প্যাটার্ন আবিষ্কার করা। আর এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা একটি মস্ত বড় ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছিলেন। নিজেরাই প্রথম গণিত

(সংখ্যা) উদ্ভাবন করেছেন আর সে গণিতের নিয়মের সঙ্গে তাঁদের চোখে দেখা বিজ্ঞানের ব্যাপারগুলো জড়িত করে ওই প্যাটার্ন আবিষ্কারের কাজটিকে দারুণ একটি রূপ দিয়েছেন। তাঁদের চাঁদ-সূর্য পর্যবেক্ষণ তাই আর শুধু পর্যবেক্ষণই থাকলোনা, গণিতের সঙ্গে মিশে তা হয়ে পড়লো ক্যালেন্ডার অথবা পঞ্জিকা– যেখান থেকে তখনো পাওয়া গেছে, এখনো পাওয়া যাচ্ছে নানা গুরুত্বপূর্ণ দিনে গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী। সেই সঙ্গে সম্রাটের বিভিন্ন প্রজেক্টে সহায়তা দেয়াটাও কম বড় কাজ ছিলনা- যেমন ওই নিখুঁত স্থাপত্যের মন্দির কিংবা পিরামিড নির্মাণে। এর ডিজাইন থেকে শুরু করে নির্মাণ পর্যন্ত সব কিছুতে ওই গণিতের ব্যবহার ছাড়া খুব সুবিধা হতোনা।

পুরোহিত-বিজ্ঞানীদের মিশ্রকাজের মধ্যেই এভাবে আমরা বিজ্ঞানের আলামতগুলোকে লক্ষ্য করছি– সূক্ষ্ম পরিমাপ আর প্যাটার্ন আবিষ্কার তো বটেই, তারপর তার খোলামেলা প্রকাশ– সবার ব্যবহারের জন্য। যাদুবিদও এর চর্চা করেছেন বটে, কিন্তু তা যাদুবিদ্যার মত গোপন রাখার উপায় ছিলনা; এ নিয়ে পন্ডিতে পন্ডিতে মিল-অমিল হবার ব্যাপারে ছিল; সবাইকে সব কিছু জানতে হয়েছে। আর ব্যাবিলনের জ্ঞান শুধু ব্যাবিলনে সীমাবদ্ধ ছিল তাও মোটেই নয়। সেই তিন চার হাজার বছর আগেও দেখছি মিশরের ও ব্যাবিলনের কাজে পরস্পর প্রভাব। পরে গ্রীকরা মিশরীয়দের কাছে শিখছে পিরামিড তৈরিতে জ্যামিতির মোটা দাগের অংক– যে অংককে গ্রীকরা শিগ্‌গির আরো চমকপ্রদ ও আরো সর্বত্র প্রযোজ্য সাধারণ থিওরেমে পরিণত করেছিলেন। এ ভাবে ওদের জ্ঞান-বিজ্ঞান জানার জন্য কষ্ট করে ব্যাবিলনীয় লিপিও তাঁরা শিখে নিয়েছেন। ওদিকে একই সময় ভারতীয় পন্ডিতরা ব্যাবিলনের ও গ্রীসের জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্যাটালগ, ক্যালেন্ডার, পঞ্জিকাগুলোকে নিজের মত করে নিচ্ছিলেন। কাজেই খোলামেলা একটি বিজ্ঞানের আবহ অন্তত এখানটায় তখনই তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। এই বিজ্ঞানের সঙ্গে ছিলো মানুষের জীবনযাত্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; এমনকি মানুষের ভাগ্য গণনাকেও জড়িত করেছিলেন তাঁরা– যদিও সেটি বিজ্ঞান ছিলনা।

কাদার পাটায় বিজ্ঞান জার্নাল:

অবাক হবার কথা হলো ব্যাবিলনের বিজ্ঞান আর গণিত নিয়ে এই যে এত কথা তার সবই তাঁরা লিখে গেছেন কাদার ছোট ছোট পাটার ওপর- ওখানকার অন্য সব নথিপত্রের মত। হাতের তালুর ওপর রেখে লেখার ও পড়ার উপযুক্ত এই

পাটাকে বলা হয় ট্যাবলেট। কাদা নরম থাকা অবস্থায় এর ওপর বিশেষ আকৃতির কাঠির মাথা দিয়ে সীল মেরে মেরে তাদের লিপিটি লেখা হতো। সীলের আকৃতিটি ছিল একই– একটি তীরের অগ্রভাগের মত, অনেকটা ছেনির মত। আর এজন্য পুরো লিপিটিকেই বলা হয় কিউনিফরম যার মানে, 'ছেনি আকৃতির'। ওই তীরের মুখটি নানা দিকে করে ও নানা সংখ্যায় ব্যবহার করে নানা শব্দ, নানা সংখ্যা তৈরি হতো। রোদে শুকালে এ কাদার ট্যাবলেটগুলো শক্ত হয়ে যেতো ও ইরাকের শুষ্ক আবহাওয়ায় বেশ টিকেও থাকতো– অনেকগুলো আজ পাঁচ হাজার বছর পরও টিকে আছে। ওখানকার ভাষা ও এই কিউনিফরম লিপি ব্যাবিলন ও পুরো মেসোপোটেমিয়ার মানুষ তো বটেই সমসাময়িক প্রাচীন মিশর, গ্রীস, ভারত নানা জায়গার পণ্ডিতরাও শিখেছেন এবং ওই জ্ঞানকে ব্যবহারও করেছেন। তবে আধুনিক কালে বিশেষজ্ঞদেরকে এ লিপির অর্থ নানা কৌশলে পুনরুদ্ধার করতে হয়েছে।

প্রাচীন অনুবাদে ও সরাসরি পড়ে হাজার হাজার কিউনিফর্ম ট্যাবলেট থেকে জানা গেছে ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানের কয়েক হাজার বছরের অনেক কাজের খবর। যেমন ৯০০টি ট্যাবলেটের একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ নথি পাওয়া গেছে শুধু শুক্র গ্রহের উপর কিছু পর্যবেক্ষণের ফলাফল নিয়ে– এগুলোকে বলা হয় ভেনাস (শুক্র) ট্যাবলেট। পর্যবেক্ষণে কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তা যেমন এতে আছে, তেমনি রাতের পর রাত প্রায় ২১ বছর ধরে পর্যবেক্ষণের ফলগুলো রেকর্ড করা হয়েছে; কোন্‌দিন তারাটি আকাশের কোন্ জায়গায় উদিত হয়ে কোন্ জায়গায় কখন অস্ত গিয়েছিলো সেই রেকর্ড। আসলে কাজটি হাতে নেয়া হয়েছিলো একটি বড় প্রজেক্টের অংশ হিসেবে যা কিনা গ্রহ-তারার অবস্থান থেকে ভাগ্য গণনার সঙ্গে যুক্ত ছিলো। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক পর্যবেক্ষণগুলো কিন্তু খুবই সঠিক ছিল, তার পরিমাপে বৈজ্ঞানিক সতর্কতার অভাব ছিলনা। আরেকটি এরকম অক্ষত ট্যাবলেট-গুচ্ছ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে যাতে চাঁদ, সূর্য, গ্রহের গতিবিধির রেকর্ড আছে; চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ ছাড়াও সবচেয়ে লম্বা দিন, ছোট দিন, দিবা-রাত্রি সমান এমন দিন, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ আছে। এতে বিভিন্ন তারাকে নানা তারামণ্ডলীতে সাজানো হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে বছরের নানা সময়ে গ্রহগুলোর অবস্থানকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

একই সময়ে মিশরে প্রবর্তিত হয়েছিলো অন্য ধরনের লিপি যাকে বলা হচ্ছে হাইরোগ্লিফিক মানে ছবি-লিপি। নানা জিনিসের সরল ছবি দিয়ে এখানে নানা কিছু বোঝানো হতো– প্রায় হাজার খানেক ছবি-চিহ্ন এতে ব্যবহার করা হতো।

এর এক একটি যে জিনিসের ছবি তাকে যেমন প্রকাশ করতো, বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য জিনিসও প্রকাশ করতো, আমাদের ভাষার মত অর্থপূর্ণ শব্দের ধ্বনি সূচিত করে। মিশরীয় প্রাচীন ভাষা তাই এই লিপিতে লেখা যেতো। যে সময় মিশরে অন্যান্য ভাষারও চল্ হয়েছে তখন এরকম তিনটি ভাষার লিপিতে একই জিনিসের লেখা থেকে, জানা লিপির সঙ্গে অজানা হাইরোগ্লিফিকের তুলনা করে এই লিপিকে উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। এরপর থেকে হাইরোগ্লিফিকে লেখা অনেক নথিপত্র পড়ে প্রাচীন মিশরীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে বহু কিছু জানা সম্ভব হয়েছে।

হাইরোগ্লিফিক লিপি ওসময় লেখা হতো প্যাপিরাস নামে এক ধরনের অন্যরকম কাগজে। বেতের মত এক রকম উদ্ভিদের শাঁস ফালা ফালা করে কেটে সেই ফালাগুলো লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি ভাবে সাজিয়ে জুড়ে জুড়ে এই কাগজ তৈরি হতো। মিশরীয় বৈজ্ঞানিক নথিগুলোও ওই প্যাপিরাসে লেখা অবস্থায় পাওয়া গেছে। উদাহরণ স্বরূপ কার্লসবার্গ প্যাপিরাস নামে (এখন যেখানে সংরক্ষিত সে জায়গার নামে) পরিচিতি নথিগুলোর একটি অংশ চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। এখানে মানব দেহ সম্বন্ধে তাঁদের কিছু জ্ঞান, নানা রোগের লক্ষণ, সেগুলোর ওষুধ ইত্যাদির কথা আছে। ওষুধের কথা বলতে গিয়ে নানা রকম উদ্ভিদের এক রকমের একটি শ্রেণী বিভাজনও এতে আছে। এছাড়া এই প্যাপিরাসে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সেই সঙ্গে ভাগ্য গণনার জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রয়েছে। সব কিছুতেই কিন্তু তাঁদের গভীর পর্যবেক্ষণের ছাপ রয়েছে– তা সে রোগীকে পর্যবেক্ষণ, উদ্ভিদের পর্যবেক্ষণ কিংবা গ্রহ তারার পর্যবেক্ষণ যাইহোক। এর সব কাজে প্রচুর মুনশিয়ানা রয়েছে কারণ এগুলো প্রাচীন মিশরীয় অবদানের একেবারে প্রায় শেষের দিকের, খৃষ্টজন্মের শ'দুয়েক বছর পরের, যখন রোমানরা মিশরের কর্তৃপক্ষ। এর চেয়ে অনেক প্রাচীন প্যাপিরাসও পাওয়া গেছে বিজ্ঞান ও গণিতের ওপর নানা কাজের তথ্যসহ। এর মধ্যে রিন্ড প্যাপিরাস নামে (১৮ শতকে যিনি নথিগুলো আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর নামে) কিছু প্যাপিরাস মিশরীয় গণিতের অগ্রগতিকে তুলে ধরার কারণে বেশ খ্যাতি লাভ করেছে। এতে পাটিগণিতের এবং অ্যালজেব্রার কিছু সমস্যা ও সমাধান রয়েছে, ঠিক এখনকার অ্যালজেব্রা বলতে যে রকম বুঝি সে রকম না হলেও। এখনকার মত অ্যালজেব্রা অনেক পরে ভারতীয় ও আরবীয় গণিতবিদদের সৃষ্টি। এর জ্যামিতির অংশটিও বেশ চমৎকার– বিভিন্ন আকৃতির ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, এবং কিউব, সিলিন্ডার ও

পিরামিড আকৃতির ত্রিমাত্রিক জিনিসের (সলিড জ্যামিতি) আয়তনের জন্য ফরমুলা এতে রয়েছে।

দেখতে খুবই ভিন্ন এসব বিজ্ঞান জার্নাল হয় কাদার ওপর কাঠির সীলে গড়া লিপিতে অথবা ভিন্ন রকম কাগজে ছবির অক্ষরে লেখা। কিন্তু যারা সেই বহু হাজার বছর আগে বিজ্ঞানের চর্চা করেছিলেন তাঁদের সেই চর্চাই সরাসরি সেখানে দেখতে পাচ্ছি। তাঁদের নিজেদের লেখা বিস্তারিত রেকর্ড রয়েছে বলে ইতিহাসের প্রথম যুগে বিজ্ঞান কী ভাবে গড়ে ওঠেছিল, কেন গড়ে ওঠেছিলো, এসব ধারণা পেতে সুবিধা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণে চাঁদ-সূর্যের চলাচল, তার থেকে জীবন-সিদ্ধান্তঃ

ওসব জার্নালে যা দেখছি তাতে মনে হয় তাঁদের কাজের যে অংশগুলোকে আমরা এখন বিজ্ঞান রূপে চিহ্নিত করতে পারছি তাতে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করাটাই গুরুত্ব পেয়েছে। এ পর্যবেক্ষণ সাধারণ দেখা নয়, সূক্ষ্ম ভাবে দেখা এবং তাকে পরিমাপে এনে রেকর্ড করা। ধৈর্য ধরে লম্বা সময় ধরে এ কাজগুলো তাঁরা করে গেছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে দেখলে এর পেছনে কিছু উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁরা এর থেকে কিছু নিয়ম আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, যে নিয়মকে কাজে লাগানো যাবে। যখনই ব্যতিক্রমী কিছু দেখেছেন তখন পর্যবেক্ষণে আরো সতর্ক হয়েছেন। এই একটি ক্ষেত্র যেখানে নিজে যেভাবে দেখেছেন তাঁর মত সচেষ্ট অন্যরাও ওই একই জিনিস দেখেছেন কিনা, একই মাপ পেয়েছেন কিনা, সে ব্যাপারেও তাঁরা খুব সযত্ন। এই জন্যই তো সব কিছু রেকর্ড করে রাখতে তাঁদের এত আগ্রহ, অন্যেরা যাতে রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। ওই যে নিয়ম আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, তার সর্বজনীন স্বীকৃতির জন্য এসব দরকার ছিল। তা ছাড়াও নিয়ম জানা দরকার হয়ে পড়েছিলো ব্যবহারিক কাজে লাগার জন্য; তাই সবার জন্য কাজে লাগানোর একটি চাহিদা ও প্রত্যাশা তাঁদের মনে ছিল।

এই ব্যাপারগুলো সব চেয়ে বেশি দেখা গেছে আকাশ-পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে। সেটি করার পেছনে চাহিদা এসেছে রাজকার্য, ধর্মকর্ম এবং তার চেয়েও বেশি কৃষিকাজের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য দিনপঞ্জি পাওয়ার– যেটি কিনা এরকম প্রথম একটি ক্যালেন্ডারের চাহিদা। এর থেকে ওই পুরোহিত-বিজ্ঞানীরা বলে দিতে পারবেন কখন কী করতে হবে। একাজে এগিয়ে ছিলেন ব্যাবিলনের পুরোহিত-জ্যোতির্বিদরা। বহুকাল থেকেই সেখানে অনেকে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে

এসেছেন– মধ্যপ্রাচ্যের বৃষ্টিহীন মেঘহীন সারা বছরই প্রায় সমান দীর্ঘ রাতে সে রকম দেখা যুগে যুগে চল্‌ছিল। সেই দেখা থেকে তাঁরা জানতেন যে বিশাল অর্ধ-গোলাক-রূপী আকাশ সেখানে রয়েছে কিছু 'স্থির তারা' (তাঁদের ভাষায়), আর কিছু 'চলাচল করা তারা'। চলাচল করা তারাগুলোর মধ্যে দুটি বেশ বড়– চাঁদ আর সূর্য, বাকি পাঁচটা ওই স্থির তারার মতই ছোট (আজ যাদেরকে আমরা গ্রহ বলি)। সবগুলোরই দৈনিক আবর্তনটি স্পষ্ট– পূর্ব দিকে ওঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। কিন্তু তার অতিরিক্ত দীর্ঘমেয়াদী চলাচল রয়েছে চাঁদের আর সূর্যের– দিনের পর দিন একটু একটু সরে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি চলাচল রয়েছে ওই অন্য পাঁচটি চলাচল করা তারার। স্থির তারাগুলোর এ ধরনের চলাচল নেই, ওগুলো আকাশে স্থির থেকে যেন একটি সুস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে দিচ্ছে। শহরে যেমন স্থায়ী দালানকোঠার কাঠামো, এও যেন তেমনি। এদের পরিপ্রেক্ষিতে চলাচল করা তারাদের গতি বোঝা যায়। ওই স্থির তারার বিভিন্নটাকে সহজে চেনার জন্য যেখানে কটা তারা কাছাকাছি গুচ্ছ হয়ে আছে তারামণ্ডলী হিসেবে, তার মধ্যে ওরা যেন কাল্পনিক কোন ছবি দেখতে পেয়েছে– সাধারণত নিজ দেশের উপকথা থেকে নেয়া ছবি। সেভাবে তাদের নামও দিয়েছে ওরা।

ওই পুরোহিত-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের পর্যবেক্ষণে তারার চলাচলগুলো ভাল করে লক্ষ্য করেন। যেমন স্থির তারার কাঠামোর মধ্যে ঠিক যে জায়গায় একদিন চাঁদ উদয় হলো, প্রতিদিন উদয়ের জায়গা একটু একটু সরে সরে ২৭.৩ দিনে আবার একই জায়গায় উদয় হয়। তাঁরা এ সময়টুকুর নাম দিলেন তারা-মাস (সিডেরিয়াল মান্‌ত)– তারার পরিপ্রক্ষিতে ঘটছে বলে। আবার এক পূর্ণিমা থেকে পরের পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রকলা কমার বাড়ার যে সময় তাও প্রায় কাছাকাছি, তাকে বল্‌লেন চান্দ্রমাস (সিনোডিক মান্‌ত)- সেটি কিন্তু ২৯.৫ দিনে। এই দুইয়ের মিল-অমিল কেন হচ্ছে তখন তাঁরা জানতেননা; কিন্তু পরিমাপগুলো ছিল বেশ নিখুঁত। যেমন চান্দ্রমাসের সময়টি নির্ণয় করতে তাঁদের দুই মিনিটের বেশি ভুল হতোনা। একই ভাবে তাঁরা দেখলেন গরমের দিন সূর্য একটু একটু করে উত্তর দিকে যাচ্ছে, একটি সীমায় পৌঁছে আবার ফিরে দক্ষিণে, আবার উত্তরে। এভাবে একবার উত্তরায়নের শেষ সীমায় পৌঁছার দিন থেকে পুনরায় ওই শেষ সীমায় পৌঁছে সব সময় একই সংখ্যক দিন পর। সেটিকে তাঁরা নিখুঁত ভাবে সৌর বছর হিসেবে মাপলেন। এগুলো সাধারণ মানুষের দেখা নয়, পারদর্শী বিজ্ঞানীর দেখা। তাই আমাদের বিবেচনায় তাঁরা শুধু পুরোহিত নন্ পুরোহিত-বিজ্ঞানী। তাঁরা বছরের পর বছর একই জিনিসের ওপর তাঁদের পর্যবেক্ষণ

চালিয়েছেন। আসলে শত শত বছর ধরে তাঁদের এই পর্যবেক্ষণে তারা-ক্যাটালগগুলো ক্রমাগত উন্নত হয়েছে, সেই সঙ্গে এগুলো থেকে তাঁদের নেয়া সিদ্ধান্তগুলোও। এগুলো নেয়া হচ্ছিলো ইন্‌ডাকশন পদ্ধতিতে– বার বার ঘটতে দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

এই সব পর্যবেক্ষণ ও নিয়ম আবিষ্কারের একটি দুর্দান্ত ফল হলো প্রথম ক্যালেন্ডারের উদ্ভাবন। এটি পণ্ডিতদের জন্য তো বটেই, সর্বসাধারণের জন্যও খুবই উপকারী একটি জিনিস হলো– আমাদের বর্তমান ক্যালেন্ডারগুলো তারই সরাসরি উত্তরসূরী। চন্দ্রকলা আর চান্দ্রমাস ছিল ব্যাবিলনীয় ক্যালেন্ডারের ভিত্তি। যদিও আসলে এ মাস ২৯.৫ দিনের, একে ৩০ দিন ধরে নিয়ে তাঁরা ১২ মাস অর্থাৎ ৩৬০ দিনের বছর ঠিক করেছিলেন; কারণ এটি সৌরবছরের (৩৬৫ দিন) বেশ কাছাকাছি দৈর্ঘের। সপ্তাহের হিসেবটি এসেছিলো পূর্ণিমার চাঁদ ক্ষয় পেয়ে অর্ধবৃত্তে পরিণত হওয়া থেকে, ৭ দিনে। একই ভাবে অর্ধবৃত্ত থেকে অমাবস্যা তারপর বেড়ে আবার অর্ধবৃত্ত, আবার পূর্ণিমা। প্রায় একই সময় মিশরীয় পুরোহিত-জ্যোতির্বিদরা সৌরবছরের ভিত্তিতেই তাঁদের ক্যালেন্ডারকে দাঁড় করিয়েছিলেন। চীনে ও ভারতেও পরে তাই করা হয়েছিলো; সবক্ষেত্রেই ৩৬৫ দিনের সৌর ক্যালেন্ডার– তাকেই ১২ মাসে ভাগ করা। এতে একটি বড় সুবিধা ছিলো যা ব্যাবিলনের চান্দ্র ক্যালেন্ডারের ছিলনা। তা হলো বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে, বিশেষ করে বীজ বপন ও ফসল কাটার মৌসুমের সঙ্গে ক্যালেন্ডারের একটি সঙ্গতি– যাতে সেগুলো ঘুরে ঘুরে একই তারিখে আসে। কৃষিনির্ভর ওই দেশগুলোতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্যবিলনেও তাই ছিলো, তবুও ব্যবিলনীয় পণ্ডিতরা চান্দ্র ক্যালেন্ডার ত্যাগ করেননি। তাঁরা দীর্ঘকাল নানা পর্যবেক্ষণে ও হিসেব কষে চেষ্টা করেছেন চান্দ্রবছর ও সৌরবছরকে কোন ভাবে এক তালে আনা যায় কিনা। তাঁরা দেখলেন প্রতি ২৩৫টি চান্দ্রমাস যেখানে শেষ হয় ১৯টি সৌরবছর শেষ হতে তখন বাকি থাকে মাত্র ৭ মাস। তাই ১৯ বছরের মধ্যে কোন ভাবে এই ৭ মাস বন্টন করে দিতে পারলে চান্দ্র ও সৌর বছরের শুরু একদম মিলে যাবে ও মোটামুটি সমতালে থাকবে। স্থির হলো প্রতি ১৯ বছরে ৭টি বছর ১৩ মাসে হবে এবং বাকিগুলো ১২ মাসে হবে– কোন্‌গুলো ১৩ আর কোন্‌গুলো ১২ তাও রাজকীয় আদেশে ঠিক করে দেয়া হলো। এ যেন আমাদের বর্তমান ফেব্রুয়ারী মাস ৪ বছর পর একদিন বাড়ানোর মত অন্য রকম লীপ-ইয়ার।

১৯ বছরের এই চক্রটির আবিষ্কার ক্যালেন্ডারের বড় সংস্কার আনলো। পরে দেখা গেল ৭৬ বছরের চক্রকে বিবেচনা করলে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সমতালটি আরো নিখুঁত হয়। এভাবে ক্যালেন্ডারের সংস্কার হাজার বছর ধরে চলতেই থাকলো– চান্দ্র ও সৌর উভয় ক্যালেন্ডারে। প্রথমে ব্যাবিলনে, পরে গ্রীসে এবং অন্যত্র।

ক্যালেন্ডারের দরকার ছিল দৈনন্দিন কাজে– অমাবস্যা-পূর্ণিমা, জোয়ার-ভাটা, বানের দিন, ফসলের মৌসুম, ধর্মীয় ও সামাজিক পরব ইত্যাদি উদ্‌যাপন এমনিতরো নানা কাজে। জীবন-জীবিকার সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক। তাই ক্যালেন্ডারের একটি বড় রূপ পঞ্জিকারও (অ্যালমানেক) উদ্ভব হয়েছিলো। যেখানে নানা বিশেষ দিনের সব খুঁটিনাটি ভাল করে উল্লেখ করা যেতো। জীবন-জীবিকার বাস্তব প্রয়োজনের বাইরেও এই পঞ্জিকা আর তার উৎস আকাশের গ্রহ-তারার আরো একটি বড় সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো– তা হলো মানুষের বা রাজ্যের ভাগ্য গণনা। এখন যাকে আমরা জ্যোতিষবিদ্যা (অ্যাস্ট্রোলজি) নামে জ্যোতির্বিদ্যা (অ্যাস্ট্রোনমি) বা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বাইরে মনে করি বহু হাজার বছর তা ওর মধ্যেই ঢুকে ছিল– ওই দুইয়ে কোন পার্থক্য করা হতোনা। কাজেই ওই যে বলেছি বিজ্ঞানের সঙ্গে অবিজ্ঞান মিশে থেকেই বিজ্ঞানকে সেদিন এগোতে হয়েছে, এটি তার একটি বড় উদাহরণ। এক্ষেত্রে অবশ্য বিজ্ঞানের লাভ যে হয়নি তা নয়– পুরোহিত-বিজ্ঞানীদের এমন সযত্ন আকাশ পর্যবেক্ষণ ও তার হিসেব-নিকেষ করার অনেকটা প্রেরণা এসেছিলো ভাগ্যের ওপর এমন নির্ভরশীলতার কারণে।

খুব সম্ভব ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত হবার কারণে দুটি জটিল পর্যবেক্ষণ খুব গুরুত্ব পেয়েছিলো– চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ। ব্যাবিলনীয় জোতির্বিদরা বুঝতে পেরেছিলেন যে চাঁদ ও সূর্যের গতিবিধির ফলে পৃথিবী থেকে দেখা চাঁদ সূর্যকে ঢেকে ফেললে আংশিক বা পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হতে পারে, আবার চাঁদের ওপর সূর্যের আলো পৃথিবীর ছায়ার কারণে পড়তে না পারলে আংশিক বা পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হয়। এই ঘটনাগুলো কখন কখন ঘটবে তা তাঁরা ইনডাকশনের হিসেবে গতিবিধির যে নিয়ম দাঁড় করেছিলেন তার থেকেই হিসেব করে বলে দিতে পারতেন। এভাবে হঠাৎ সূর্য ঢেকে আঁধার নামবে, অথবা চাঁদ ঢেকে যাবে এমন নাটকীয় ঘটনার পূর্বাভাস দিতে পারা জনমনে পুরোহিত-বিজ্ঞানীর ওপর যে দারুণ ভক্তি ও আস্থার সৃষ্টি হতো তা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া এগুলোকে দারুণ অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করা হতো, তাই আগে থেকে জানা খুব জরুরী ছিল। রাজ্য জুড়ে এসব অমঙ্গল যেন

সম্রাটকে ছুঁতে না পারে এ জন্য গ্রহণের কিছু আগে থেকেই এক জন নকল সম্রাটকে আসীন করে আসল সম্রাট কিছু দিনের জন্য সরেও যেতেন। এভাবে পঞ্জিকায় লেখাই থাকতো কখন কী হবে? এ রীতিমত বিজ্ঞান চর্চার জয় জয়কার। শুধু কি তাই, একটি বিশেষ ধরনের সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ ও জায়গা থেকে হুবহু আবার কখন দেখা যাবে তারও পূর্বাভাস দেয়া গেলো। যেমন খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৩ অব্দের ১৮ই মে ঠিক যে ভাবে একটি সূর্যগ্রহণ ব্যাবিলন থেকে দেখা গেছে তাঁরা বলে দিতে পেরেছেন খৃষ্টপূর্ব ৫০৫ অব্দের ২৮ মে হুবহু ওরকম একটি সূর্যগ্রহণ হবে। ২২৩ চন্দ্র মাস (১৮ বছর ১১.৩ দিন) পর পর এমন হবার ব্যাপারটি হিসেব করে বের করা হয়েছিলো এবং তা সত্যি সত্যি ঘটেছেও। এই পুনরাবৃত্তিকে বলা হয়েছে সারোস চক্র। এমনি ভাগ্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক আছে মনে করে পুরোহিত-বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে আরো একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের উদ্ভাবন করেছেন।

তাঁরা লক্ষ্য করেছেন সূর্য যেন একটি কক্ষপথের রেখায় বছরে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে– যদিও দৈনিক আবর্তনের মত ব্যাপারটি এতটা স্পষ্ট নয়। একে বলা হলো ইকলিপটিক বা সূর্যরেখা। সূর্যরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে দুপাশে ৯ ডিগ্রি করে জায়গা নিয়ে যে বলয়টি তৈরি হয় একটি সড়কপথের মত, দেখা যায় শুধু সূর্য নয়, চাঁদ এবং অন্য পাঁচটি গ্রহ এর মধ্যে থেকেই পৃথিবীকে বছরে একবার পরিক্রমণ করছে। এই বলয়টিকে বলা হলো রাশিচক্র। বছরকে ১২ ভাগ করার মত এই রাশিচক্রকেও ৩০ ডিগ্রি করে এক এক ভাগে ভাগ করা হলো নানা তারামণ্ডলী দেখে যার সীমাগুলো চিহ্নিত করা যেতো। স্থানীয় উপকথার সঙ্গে মিল রেখে এর প্রত্যেকটি ভাগের এক একটি চিহ্নও দেয়া হলো রাশিচিহ্ন নামে। পরে যেগুলো মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা বৃশ্চিক ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়েছে। তখন সব কিছু স্থির করা হতো সূর্য কী ভাবে বিভিন্ন তারা মণ্ডলীর এলাকা দিয়ে ক্রমে রাশিচক্রে এগোচ্ছে তা দিয়ে। দেখা গেছে দীর্ঘ মেয়াদে শত শত বছরে এ সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণগুলো একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়েছে। এক সময় গিয়ে দেখা গেছে আগে যে তারামণ্ডলী একটি বিশেষ রাশিচিহ্নের ভেতরে ছিল, সেটি তার কিনারায় চলে গেছে। এ সবের কারণ বুঝতে জ্যোতির্বিদদের আরো অনেক দিন সময়ের দরকার হয়েছে। তবে রাশিচক্র যতটা না আজকের অর্থে বিজ্ঞানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তার চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে ভাগ্য গণনায়। ভাগ্য গণনার সঙ্গে রাশিচক্র বা সূর্যের পরিক্রমণের, গ্রহণ ইত্যাদির সম্পর্ক ছাড়াও যে বিশেষ বিশেষ তারার ও

তারামণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তা তো ভেনাস ট্যাবলেটের মত এতো যত্নে গড়ে তোলা নথি থেকেই টের পাচ্ছি।

দেশে দেশে কালে কালেঃ

মজার ব্যাপার হলো ব্যাবিলনে যা পাঁচ হাজার বছর আগে হয়েছে, তা একই সময়ে মিশরেও হয়েছে। সেখানে এসবের ধারাবাহিকতা সুন্দর মিশে গেছে গ্রীসের, চীনের, ভারতের আকাশ পর্যবেক্ষণ ও জ্যোতির্বিদ্যায়। এর সবই নথির আকারে কমবেশি এসেছে।

একেবারে প্রাচীন মিশরে আকাশ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তার মন্দির-পিরামিডের স্থাপত্যের সম্পর্কটি লক্ষণীয়। আবার প্রতি বছর নীলনদের বন্যার সময়টি মিশরের কৃষিজীবনের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে অনেক কিছু হয়েছে শুধু সেটিকে লক্ষ্য করে। পুরোহিত-বিজ্ঞানী ঠিক বলে দিতেন এই বন্যা আসবে মধ্য-গ্রীষ্মে সব চেয়ে দীর্ঘ দিনটির সময়ে। আর এ সময়ে সূর্যোদয়ের ঠিক আগে খুব জ্বলজ্বলে তারা লুব্ধক (সিরিয়াস) আকাশে উদিত হতো। এটি দেখা তাই সবার কাছে এত কাম্য ছিল যে মিশরের অনেক পিরামিড ও মন্দিরকে মধ্য-গ্রীষ্মের ওই দিনটিতে উত্তরায়নের শেষ সীমায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে অথবা লুব্ধক তারার উদয়ের সঙ্গে অভিমুখ করে নির্মাণ করা হয়েছে। যদিও আসলে নীলনদীর বন্যা হতো এ নদীর দক্ষিণ অংশের উজান অঞ্চলে এ সময়ের বৃষ্টিপাতের কারণে, তাঁরা কিন্তু এর কৃতিত্বটি দিতেন সূর্য-দেবতা রা'কে এবং ওই দিন যেই আইরিস দেবীর বিখ্যাত মূর্তির ঠিক মাথার ওপর দিয়ে লুব্ধক তারাটি উদয় হতো– সেই দেবীকে। তাই আকাশের ওই ঘটনাগুলোর পর্যবেক্ষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেকগুলো মন্দির আর ভবনের ছাদকে এমন ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে তা আকাশের নানা পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের সহায়ক হয়েছে, রাতের বিভিন্ন ঘন্টার সময় তা দেখে নির্ণয় করা গেছে। দিনের বেলায় সময় নির্ণয় করা হতো সূর্য-ঘড়িতে ছায়া দেখে। দিনের বার ঘন্টা, রাতের বার ঘন্টা তখনই ঠিক হয়ে গেছে।

মিশরের পাথরে গড়া মন্দির ও দালানগুলো খুবই স্থায়ী ব্যাপার– শত শত বছর, এমনকি হাজার হাজার বছর অনেকগুলো অক্ষয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু সূর্যের বা গ্রহ-তারার গতিবিধির সঙ্গে যে রকম সম্পর্ক স্থাপন করে সেগুলো তৈরি করা হয়েছিলো, কয়েক শ'বছর পরেই দেখা গেছে হুবহু সেই সম্পর্ক আর থাকছেনা, গ্রহ-তারাগুলো যেন একটু সরে সরে গিয়েছে। এভাবে পর্যবেক্ষণের যে ক্যাটালগগুলো বছরের পর বছর নির্ভুল তথ্য দিয়েছে সেখানেও গরমিল দেখা

যাচ্ছে। এর কারণটি ধরতে পেরেছিলেন বেশ কিছু পর গ্রীক বিজ্ঞানীরা– এ সবের গতিবিধিতে শত শত বছর ধরে অল্প কিছু দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন আবিষ্কার করে (প্রিসেশন)। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো হুবহু না মিল্‌লেও ওই ক্যাটালগগুলোকে কিন্তু কেউ পরিবর্তন করেননি– মিশরে বা ব্যাবিলনে; এতই আস্থা ছিল তাঁদের নিজেদের পর্যবেক্ষণের ওপর। ওভাবেই না মেলা ক্যাটালগগুলোই গ্রীকদের কাছে পৌছেছিল। এর ব্যবহারিক উপযোগিতা বেশ কিছু কমে গেলেও তাঁরা সবাই যতটুকু সম্ভব এগুলো ব্যবহার করেছেন। অবশেষে প্রিসেশন আবিষ্কার হলে এসব হিসেব করে সংশোধন করা গিয়েছিল– এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওই হাজার বছরে গড়ে ওঠা ক্যাটালগগুলো।

চীনের বিজ্ঞানীরাও আকাশ দেখাতে কম যাননা। তাঁদের তিন হাজার বছর আগের বইতে সুন্দর বর্ণনা রয়েছে 'ঝাঁটার আকৃতির ছড়ানো লেজ বিশিষ্ট একটি অদ্ভুত তারা' কী ভাবে আকাশে দেখা দিয়ে কিছু দিন পর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো সেই কথা। এটি কোন ধূমকেতুর প্রথম লিখিত বর্ণনা। সমসাময়িক অন্য একটি বর্ণনায় একটি নতুন উজ্জ্বল তারার হঠাৎ আকাশে দেখা যাওয়ার কথা বলা হয়েছে যা আরো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে ফেটে পড়ার মত দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। এখন আমরা বুঝি ওটি ছিল ইতিহাসে একটি সুপারনোভার প্রথম বর্ণনা। সুপারনোভা হলো মৃত তারা যেগুলো নিজের বিশাল ভারে নিজের ওপর ধসে পড়ার মাধ্যমে ওভাবে বিস্ফোরিত হয়। কাজেই চাঁদ-সূর্যের গতিবিধি নিয়ে ক্যালেন্ডার ইত্যাদিতে যেমন স্বাভাবিক ভাবে চীনে পৃথক অগ্রগতি হয়েছে, সর্বক্ষণ আকাশ পর্যবেক্ষণের ফলে ওই অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ঘটনাগুলোও সেখানকার জ্যোতির্বিদদের নজর এড়ায়নি।

আসলে দেশে দেশে কালে কালে যে আকাশ পর্যবেক্ষণ হয়েছে তাতে অপেক্ষাকৃত বিরল ঘটনার মধ্যেও একটি প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা ছিল। সে কারণেই চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণের মত ঘটনার পূর্বাভাস তাঁরা প্রায় নিখুঁত ভাবে দিতে পেরেছেন। মানুষের জীবন সেদিন ছিল খুবই অনিশ্চিত– জীবন-জীবিকা-যুদ্ধ-দুর্ঘটনা সবই ছিল এমনি অনিশ্চয়তার অংশ। হয়তো এই অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে আকাশে এক রকম নিয়মানুবর্তিতার আবিষ্কার তাঁদেরকে প্রচুর ভরসা দিয়েছিলো। হয়তো পর্যবেক্ষণে প্যাটার্ন খোঁজার চেষ্টা করে বিজ্ঞান চর্চার পেছনে এটিও একটি বড় কারণ ছিল।

যখন আকাশের গতিবিধি এতো মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছিলেন সব জায়গার সব বিজ্ঞানীরা, তাঁরা কিন্তু নিজেদের পৃথিবীটি সম্পর্কে যথেষ্ট ভুল

ধারণায় ছিলেন। সাদা দৃষ্টিতে সবার কাছে যেটি মনে হয় তেমনি ভাবে তাঁরা পৃথিবীকে চেপ্টা একটি পাটাতন মনে করতেন। যেমন ব্যাবিলনের পুরোহিত-বিজ্ঞানীরা তাঁদের দেশের উপকথা অনুযায়ী পৃথিবীকে মনে করতেন একটা চেপ্টা চাকতি হিসেবে, আর আকাশকে ভাবতেন তার ওপরে একটি অর্ধ-গোলক। তেমনি যার যার মত করে মিশর, পারস্য, চীন, গ্রীস, ভারত সব জায়গায় ওভাবে চেপ্টাই মনে করা হতো পৃথিবীকে। তবে গ্রীসে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দের পর থেকে গোলকাকৃতি পৃথিবীর ধারণাটি কারো কারো মধ্যে দেখা দেয়। আর খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের দিকে এই গোলকের ধারণাটিই মূল-স্রোত গ্রীক দার্শনিকরা মেনে নিয়েছিলেন। পুরো জ্যোতির্বিদ্যা তাঁদের কাছে ধরা পড়ে দুই গোলকের ছবিতে– একটি গোলক হলো পৃথিবী, এবং তাকে বেষ্টনকারী অন্য বিশাল গোলকটি হলো আকাশ-গোলক। পৃথিবী যে গোলক এই ধারণা গ্রীকরা পেয়েছিলেন তার নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে– যেমন চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের ওপর পৃথিবী যে গোল ছায়া পড়ে তার থেকে। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে কিছু তারা আছে যেগুলো মিশর থেকে দেখা যায় বটে কিন্তু গ্রীসের উত্তরাঞ্চল থেকে দেখা যায়না– যেটি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন পৃথিবীর বক্রতা দিয়ে। দক্ষিণ দিকে দূর-যাত্রার ভ্রমণকারীরা জানিয়েছেন যত দক্ষিণে তাঁরা এগিয়েছেন ততই ওদিকের তারামণ্ডলীগুলোকে একটু একটু বেশি ওপরে উদিত হতে দেখেছেন। এটিও বক্রতার লক্ষণ। বিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমি আর কয়েকশত বছর পরে লক্ষ্য করেছেন সমুদ্র পারে দূর থেকে আসা জাহাজের মাস্তুলের আগাটি প্রথম দেখা গিয়ে আরো কাছে এলে নিচের অংশগুলো ক্রমে ক্রমে দেখা যায়– পৃথিবীর বক্রতার এটি একটি চমৎকার সাক্ষ্য। তাঁর মোটামুটি সমসাময়িক গ্রীক বিজ্ঞানী ইরাটোসথেনিস এই গোলকাকৃতি পৃথিবীর পরিধিটিও নির্ণয় করেছেন– শুধু সূর্যের আলোতে একটি কাঠির ছায়া আর জ্যামিতির সূত্র ব্যবহার করে। আর এভাবে পাওয়া পরিধি আজকের আধুনিক মাপের থেকে খুব একটি ভিন্ন ছিলনা।

এতসবের পরও খোদ গ্রীসেই প্রচুর পণ্ডিত দীর্ঘকাল ধরে ছিলেন যাঁরা পৃথিবী যে গোল একথা মেনে নেন্‌নি– ভিন্ন ধারণাটি এতই গভীরভাবে গেড়ে ছিলো। সপ্তম খৃষ্টাব্দের দিকে এসে অবশ্য চেপ্টা পৃথিবীর ধারণা অন্তত বিজ্ঞানীদের মধ্যে আর ছিলনা। অন্যান্য দেশেও এমনটি হয়েছে। গ্রীক পণ্ডিত মেগাস্থিনিস ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর সংগৃহীত তথ্য দিতে গিয়ে খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে লিখেছেন যে ওখানে পৃথিবীর গোলকাকৃতির ধারণা প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিস ভারতে গ্রীক শাসক সেলুকাসের এবং পাটলিপুত্রের সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অধীনে

কাজ করেছেন। প্রায় ৫০০ খৃষ্টাব্দে লেখা ভারতীয় জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের বইয়ে পৃথিবীর গোলকাকৃতির সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে যে অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে থেকে ভারতীয়, গ্রীক, ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞান ও গণিতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ব্যাবিলনীয় ক্যালেন্ডারের প্রায় অনুরূপ ভারতীয় ক্যালেন্ডার তো আরো অনেক প্রাচীন– প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের প্রথম ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার বই 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষে' এই ক্যালেন্ডারের উল্লেখ আছে। মূলধারার ধারণার একেবারে বাইরে গিয়েও কিছু প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানী বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে ভিন্ন চিন্তা করেছেন। যেমন ইউরোপে বা অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠিত হবার এক হাজার বছর আগে আর্যভট্ট পৃথিবীর নিজের দৈনিক ঘূর্ণনের কথা বলেছেন– আকাশের সবকিছুর দৈনিক উদয়াস্তকে তিনি এভাবেই ব্যাখ্যা করেছিলেন। একটি বিষয়ে কিন্তু সবাই অসুবিধা বোধ করলেও তার সমাধানটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো ওই গ্রীসেই খৃষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দে। এটি হলো সেই প্রিসেশন যার কারণে প্রাচীন পর্যবেক্ষণের ক্যাটালগগুলো পরে বাস্তবের সঙ্গে পুরাপুরি মিল্‌ছিলোনা। ওখানে জ্যোতির্বিদ হিপারখাস লক্ষ্য করলেন মাত্র দেড়শ' বছর আগের দু'জন বেশ নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞানী টিমোখারিস আর এরিস্টিলাস শারদীয় দিবা-রাত্র সমান দিনটিতে একটি তারার যে অবস্থান পেয়েছিলেন তা বছরের সেই একই দিন এখন দেখলে তার থেকে ২ ডিগ্রি দূরে দেখা যায়। এটি ব্যাখ্যা করার জন্য হিপারখাসকে আকাশ গোলকের কিছু বাড়তি দীর্ঘমেয়াদী ঘূর্ণন কল্পনা করে নিতে হয়েছিলো। এখন অবশ্য আমরা জানি এটি ঘটে লাটিম ঘোরার সময় পৃথিবীর মহাকর্ষের আকর্ষণের কারণে এর অক্ষটি যে বৃত্তাকারে দিক পরিবর্তন করতে থাকে সেই একই ভাবে, যাকে প্রিসেশন বলা হয়। পৃথিবীর অক্ষের ক্ষেত্রেও খুব ধীর গতিতে এই পরিবর্তন ঘটে যার ফলে পৃথিবী থেকে দেখা ব্যাপারগুলোও একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। হিপারখাস অবশ্য পৃথিবীর নয় আকাশ-গোলকের বাড়তি ধীর ঘূর্ণনের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু ফলাফলের হিসেবটা একই ছিল। হিপারখাস যেভাবেই একে দেখুন, ব্যাপারটি ধরতে পারার কারণে ক্যাটালগগুলো সংশোধন করে নেয়া সম্ভব হয়েছে।

পরিমাপ রূপ পেলো সংখ্যায়

সংখ্যার শুরুঃ

মানুষ সব সময় একই জিনিসের বেশি থাকা আর কম থাকার মধ্যে পার্থক্য বুঝতো– একটি হরিণ শিকারের চেয়ে তিনটি হরিণ শিকার যে ভিন্ন এটি তারা বুঝতো। এমনি ভাবে তিনটি গাছ কিংবা দু'টা গুহা বলতে কী বোঝায় তাও তার না বুঝে উপায় ছিলনা– অন্তত এরকম ছোট ছোট সংখ্যক জিনিসের ক্ষেত্রে। কিন্তু যেটি তারা বুঝতোনা তা হলো তিনটি গাছ ও তিনটি হরিণের মধ্যে আদৌ 'তিন' নামক একটি ব্যাপার রয়েছে গাছ, হরিণ বা অন্য কিছু নির্বিশেষে যার নিজস্ব একটি অর্থ আছে। এটি বুঝতে মানুষের লক্ষ বছর লেগে গেছে; কৃষি-ভিত্তিক সমাজ ও বিজ্ঞানের দিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তাটি আসতে হয়েছে। আসলে ভেবে দেখলে বুঝবো ব্যাপারটি তেমন সোজা-সাপটা নয়। দুটি হরিণ, দুটি পাখি, দুটি দিন প্রত্যেকটি আলাদা জিনিস। এর মধ্যে শুধু দুইকে আবিষ্কার করতে পারাটি একটি বিমূর্ত চিন্তার ব্যাপার। এর জন্য হরিণ, পাখি, দিন সবকিছু ভুলে গিয়ে এখানে যে জিনিসটিকে বড় করে তোলা হচ্ছে সেই 'দুই' সংখ্যাটিকে শুধু রাখতে হবে– এভাবে 'বাহুল্য' বর্জন করে সরলীকরণ করে নেয়াটিই হলো বিমূর্ত করা। এটি সহজ কোন ব্যাপার ছিলনা।

তেমনি এক যে একটি সংখ্যা, এবং এটিই সব চেয়ে ছোট সংখ্যা সেটিও স্পষ্ট কিছু নয়– একটি খরগোসকে বোঝা যায়, কিন্তু এক সংখ্যাটিকে এত সহজে বোঝা যায় না, এটিই যে সংখ্যার প্রথমটি তা বুঝতে পারাও নয়। এই ব্যাপারটিকেও ধীরে ধীরে আলাদা করে বুঝতে হয়েছে। এর পর বুঝতে হয়েছে প্রতিটি সংখ্যার একটি পরের সংখ্যা আছে, আগেরটির সঙ্গে এক যোগ করে সেটি পাওয়া যায়। সংখ্যা হিসেবে আগেরটির যেসব গুণাগুণ রয়েছে, এই পরেরটিরও সেই একই গুণাগুণ রয়েছে অর্থাৎ ওটিও একটি সংখ্যা হবে যার সঙ্গে অন্য সংখ্যা যোগ করা যাবে, যার থেকে অন্য সংখ্যা বিয়োগ করা যাবে ইত্যাদি। এরকম পর পর এক যোগ করে বেশ কিছু সংখ্যা সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে এই সংখ্যা হবার গুণ থাকতে আদি গণিতবিদরা দেখেছেন। তাই ওখানে তাঁরা সেই ইনডাকশনের নিয়ম প্রয়োগ করেছেন– বার বার হতে দেখে সাধারণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া। কাজেই অল্প কিছু সংখ্যা তৈরি করেই গণিতবিদ মানুষ ধরে নিয়েছেন যে এভাবে তিনি যে কোন সংখ্যা তৈরি করতে পারবেন– যত বড়ই হোক, সেগুলোও সংখ্যাই হবে; যদিও সে সব সংখ্যা নিয়ে এখনো কেউ কাজ

করেননি। যোগ-বিয়োগের নিয়মগুলোও ওই ইন্ডাকশন থেকেই তাঁরা উদ্ভাবন করেছিলেন।

ব্যাবিলন বা মিশরের মত কৃষিভিত্তিক সমাজে কম সংখ্যক জিনিসের সঙ্গে বড় বড় সংখ্যক জিনিসের ব্যবহার এলো। হয়তো সে কারণে এখানেই আবিষ্কৃত হলো সেই আশ্চর্য জিনিস বিমূর্ত সংখ্যা ব্যবস্থা– বিশেষ কিছুর সঙ্গে জড়িত না হয়ে শুধু সংখ্যা নিয়ে ব্যবস্থা। সংখ্যা ব্যবস্থা যেন এভাবে নিজেই নিজের একটি প্রাণ পেলো– নিজের গতিতে এগিয়ে গেলো। সেভাবেই গণিতের সৃষ্টি। বাস্তব জীবনে গণিতের ব্যবহার আছে এ কথা ঠিক, কিন্তু সে নিজে বাস্তব প্রকৃতির অংশ নয়, সে নিজেই একটি পৃথক সত্ত্বা– যার উপস্থিতি মানুষের যুক্তি চিন্তায়।

সংখ্যা যখন বাস্তব জিনিসের থেকে স্বাধীনতা পেলো তখন শুধু তাকে লেখার জন্যই লিপির মধ্যে আলাদা চিহ্নের দরকার হলো। আগে হরিণের চিহ্ন দুইবার দিয়ে দুটি হরিণ বোঝাত, মানুষের চিহ্ন চারবার দিয়ে চারটি মানুষ বোঝাত; এখন আর তা চল্‌লোনা। যে চিহ্নটি দিয়ে ব্যাবিলনে কিউনিফর্ম লিপি লেখা হতো অর্থাৎ সেই তীরের অগ্রভাগ বা ছেনি আকৃতির চিহ্নটি নিচের দিকে মুখ করে এক বার সীল মেরে ১, পাশাপাশি দুটি দিয়ে ২, এভাবে ৯ পর্যন্ত লেখা হতো। তারপর ১০ এর জন্য তীরাগ্রটি পাশের দিকে করে শুধু একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হলো– এর দুটি দিয়ে ২০, তিনটি দিয়ে ৩০, এভাবে ৫০ পর্যন্ত। এর প্রত্যেকটির পাশে আগের ১ থেকে ৯ এর যেকোনটি দিয়ে ৫৯ পর্যন্ত বাকি সব সংখ্যা লিখে ফেলা যেতো। তারপর ৬০ লেখার জন্য আবার ১ এর চিহ্নটিই ব্যবহার করা হলো– অর্থাৎ নিম্নমুখী একটি তীরাগ্র। কিন্তু ১ এর সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবার জন্য একটি সর্ব ডানের প্রথম কলামে না লিখে এর বামে দ্বিতীয় কলামে লেখা হলো। এটিই আবার তৃতীয় কলামে লিখলে হয় ৩৬০০। স্পষ্টত এটি আমাদের বর্তমান ১০ ভিত্তিক সংখ্যা ব্যবস্থার মতই ছিল একটি ৬০ ভিত্তিক ব্যবস্থা। ১০ ভিত্তিকটিতে যেমন প্রথম কলামে ১ লিখলে হয় ১, দ্বিতীয় কলামে লিখলে ১০, তৃতীয়টিতে ১০০, তেমনি এখানে ১, ৬০, তারপর ৩৬০০। এই ৬০ ভিত্তিক সংখ্যার উপরেই যোগ-বিয়োগ-গুণ সব উদ্ভাবিত হয়েছিলো। গুণের নামতা লেখা কাদার ট্যাবলেট থেকেই তা বোঝা যায়, এবং অন্য রকম অংকের সারণি থেকেও। সেই সঙ্গে ভগ্নাংশের ধারণা ও তা লেখার নিয়মও এসেছে যথারীতি। এগুলো এক দিনে হয়নি, হয়েছে শত শত বছর ধরে ধীরে ধীরে, নানা গাণিতিক কৌশল উদ্ভাবন করে।

একটি প্রশ্ন হলো ব্যাবিলনের সেই আদি গণিতবিদরা ৬০ এর ভিত্তিতে সংখ্যা সৃষ্টি করতে গেলেন কেন? এর কারণ হলো প্রধানত যেসব কাজের জন্য তাঁরা সংখ্যা সৃষ্টি করেছিলেন তাতে সুবিধার জন্য। সে কারণ হলো জ্যোতির্বিদ্যার পরিমাপগুলোকে সংখ্যায় পরিণত করে নিয়ে তাদের হিসেব নিকেশ করা যা ক্যালেন্ডার, পঞ্জিকা ইত্যাদির জন্য সুবিধাজনক হয়। ওই আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যাপারগুলোতে ৩০, ১২, ১৫ এসব সংখ্যার খুব গুরুত্ব ছিল (মাসে দিনের সংখ্যা, বছরে মাসের, পক্ষে দিনের)। ৬০ কে এগুলোর সব কটি দিয়ে ভাগ করা যায়। তা ছাড়া ১ থেকে ৬ সব সংখ্যা দিয়েও যায়। সূর্য ইত্যাদির বছরে চক্রাকারে ঘোরার সঙ্গে ৩৬০ এর একটি সম্পর্ক থাকায়, আর আকাশে সব কিছু কোণের মাপ ডিগ্রির হিসেবে করা সুবিধাজনক বলে পুরো চক্রের কোণকে ৩৬০ ডিগ্রি ধরে নেয়াটাই সুবিধাজনক ছিল। সেখানেও ৬০ এর একটি স্থান রয়েছে। যদিও সব কিছুর জন্যই ওই ৬০ ভিত্তিক সংখ্যা ব্যবস্থা তাঁরা ব্যবহার করতেন, তবুও মনে হয় আকাশ পর্যবেক্ষণ, কোণ ও সময় মাপা এই ব্যবহারগুলোই তাঁদের মনে বেশি স্থান পেয়েছে। হাজার হলেও সংখ্যার ব্যবহার সবাই করলেও এর উদ্ভাবনটি ও উন্নয়নটি তো খুব সম্ভব ধরা ছিল ওই পুরোহিত-বিজ্ঞানী পণ্ডিতদের হাতেই।

গাণিতিক মডেলিঙের শুরুঃ

গণিত উদ্ভাবনটিই শুধু ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানের জন্য বড় কৃতিত্ব নয়, আর একটি দুর্দান্ত কৃতিত্ব হলো সেই গণিতকে বিজ্ঞানের মডেলে পরিণত করা। গণিতের মডেলে প্রকাশের সুযোগই বিজ্ঞানকে অনন্য করে তুলেছে, শেষ পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানে পরিণত করেছে; আর এরও শুরু সেই ব্যাবিলনে, এবং কিছুটা মিশরে। কোন জিনিসকে মডেলে প্রকাশ করা বা মডেলিং করার মানে হলো পরবর্তী কাজের ও বোঝার সুবিধার জন্য জিনিসটিকে তার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলো বজায় রেখে সরলতর কিছুতে প্রকাশ করা। যেমন পৃথিবীকে যখন আমরা ছোট একটি গ্লোবে প্রকাশ করি তখন পৃথিবীর অনেক জটিলতা বাদ দিয়ে এর গোলক চরিত্র ও এতে মহাদেশ ইত্যাদির অবস্থান দেখানোকেই গুরুত্ব দিই। এর ফলে পৃথিবীর মৌলিক স্বরূপ বুঝতে যেমন সুবিধা হয়, তেমনি সেগুলো নিয়ে কাজ করতে ও সমস্যা সমাধান করতে সুবিধা হয়। ঠিক এমনি ভাবে বিজ্ঞানের বাস্তব ঘটনাগুলোকে যেখানেই সম্ভব গণিতের সুন্দর, নিখুঁত রাশিগুলোতে প্রকাশ করাটাই এর গাণিতিক মডেলিং। একবার সেটি করার পর বিজ্ঞানের কাজগুলো

গণিতের কাজে পরিণত হয়, যেটি অংক কষার মত। সেই অংক কষাটি শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের চূড়ান্ত ফলগুলো দিতে পারে। এভাবে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের তথ্যগুলো নিয়ে এগিয়ে যে ফলগুলো বের করা যেতো তার থেকে অনেক সহজে ও যথার্থভাবে তা বের করা সম্ভব গণিতের নিজস্ব গতিতে এগিয়ে।

ব্যাবিলনীয়রা এই দারুণ সুযোগটি প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন নিজেরাই প্রথম গণিত সৃষ্টি করে; আর সেটি প্রধানত সংখ্যার মাধ্যমে। ধরা যাক বছরের দীর্ঘতম দিনের সূর্যোদয়ের দিকটি তাঁরা চিহ্নিত করলেন। তখন সেটি একটি কোণের হিসেবে সেই কোণের ডিগ্রিতে তাঁরা সংখ্যায় প্রকাশ করবেন। পুরো চারিদিক ঘোরা কোণকে তাঁরা ৩৬০ ডিগ্রি মাপ দিয়েছেন। সেই হিসেবে এই কোণটি কত? একটি তারা আকাশে কোথায় আছে, বা একটি তারা থেকে অন্য আরেকটি থেকে কত দূরত্বে তাও তাঁরা প্রকাশ করেছেন কোণের পরিমাপে– একটি সংখ্যায়। অন্য দিকে আকাশের 'সংখ্যা'গুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি হয়েছে ক্যালেন্ডারের সংখ্যাগুলো– তারিখগুলো, সপ্তাহগুলো, মাসগুলো, চন্দ্রকলার অনুসরণ সব কিছু। আকাশের বিষয়কে ক্যালেন্ডারের বিষয় করা গেছে ওই গণিত দিয়ে, গাণিতিক মডেলিঙের সাহায্যেই। এরপর উভয় বিষয় সম্পর্কেই আরো কিছু জানতে হলে এই গণিতের অংক কষেই তা সম্ভব হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে; যেমন অংক কষে পরবর্তী দীর্ঘতম দিন, দিবা-রাত্রির সমান হবার দিন, দীর্ঘতম রাত কখন আসবে তা; অথবা পরের সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ, তা আংশিক হবে না পূর্ণ হবে ইত্যাদি।

তাছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে যা করা যায়না তা করার জন্য গাণিতিক কৌশলের আশ্রয় নেয়া সম্ভব হলো। প্রথম দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে যত সরল মনে হয় দীর্ঘ কালের গভীর পর্যবেক্ষণে বোঝা যায় এটি এত সরল নয়। গাণিতিক মডেলিঙে কীভাবে একে সরল করে দেখা যায় তার একটি উদাহরণ নিই। ধীরে ধীরে পুরোহিত-বিজ্ঞানীরাও বুঝতে পেরেছিলেন চাঁদের পরিক্রমণ সব সময় একই বেগে চলেনা, কখনো দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়, আবার কখনো ধীর থেকে ধীরতর হয়। তাই এর গতি থেকে একেবারে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়। এজন্য হিসেব করার সময় আসল গতিকে ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা ওই গাণিতিক মডেলের মধ্যে। প্রথমে যা করা হলো তা হলো একটি সমান বেগের বদলে দুটি সমবেগের আরোপ করা হলো পর্যবেক্ষণ থেকে তথ্য নিয়ে। একটি অপেক্ষাকৃত দ্রুত, অন্যটি ধীর– কিন্তু এর কোনটির মধ্যে কোন ওঠানামা নেই সেভাবেই ধরে নেয়া হলো। যদিও আসল চাঁদে সব সময় বেগের বেশ ওঠানামা রয়েছে

গাণিতিক মডেলে ওঠানামাকে এভাবে সরল করে নেয়া হলো। এভাবে চন্দ্রকলা ইত্যাদির সময় আরো সঠিক ভাবে নির্ণয় করা হলো, কিন্তু এখনো নিখুঁত ভাবে নয়। এরপর মডেলকে আরো বাস্তবানুগ করা হলো; শুধু দুটি সমবেগের বদলে মনে করা হলো যে চাঁদের গতি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সমান পরিমাণে ধাপে ধাপে বেড়ে যাচ্ছে, আর উচ্চতম বেগে পৌঁছার পর আবার প্রতিদিন একই নির্দিষ্ট পরিমাণ ধাপে ধাপে কমে নিম্নতম হচ্ছে। ইতোমধ্যে ওখানকার গণিতবিদরা এই ব্যাপারটিকে সমান্তর প্রগতি (এ্যারিথমেটিক প্রগ্রেশন) হিসেবে দাঁড় করিয়ে একটি ধাপ কত করে করে কতগুলো ধাপে ঘটলে এর গতি কত হবে এসব গাণিতিক কৌশল বের করে ফেলেছিলেন। চাঁদের ক্ষেত্রে ওই প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করেই সহজে হিসেব করা গেলে। সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের ক্ষেত্রেও এরকম গতি পরিবর্তন হয় বলে একই মডেল তাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা গেলো। এটিও নিখুঁত নয়, তবে আসল ঘটনার আরো বেশি কাছাকাছি।

সহজ সংখ্যা ব্যবস্থা ও উচ্চতর গণিতঃ

যে সব অংকের কথা এ পর্যন্ত আমরা বলেছি সেগুলো সহজ অংক হবার কথা, কিন্তু সেকালে সেটি মোটেই তা হয়নি। সহজ না হবার কারণ ব্যাবিলনে, মিশরে এবং পরে গ্রীসে ও রোমান সাম্রাজ্যে সংখ্যা লেখার পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল হওয়াতে। আজকাল এভাবে সংখ্যা লেখার চল নাই বটে কিন্তু রোমান সংখ্যা I,V, X, L, C, M ইত্যাদি অক্ষর দিয়ে যেভাবে এখনো আমরা কোথাও কোথাও সামান্য ব্যবহার করি তার থেকেই বোঝা যায় কত ভয়ানক জটিল ছিল সেদিনের পদ্ধতি। একে সহজ করে দিয়েছিলেন মূলত প্রাচীন ভারতের গণিতবিদরা– ৬০০ থেকে ৭০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এতে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্য আলাদা চিহ্ন ব্যবহার করে তার সঙ্গে শূন্য এই সম্পূর্ণ নতুন সংখ্যাটি যোগ করা হয়েছিলো। সংখ্যা হিসেবে শূন্যের উদ্ভাবন ছিল একটি বিরাট ঘটনা– কারণ এটি শুধু সংখ্যা লিখনকে সহজ করেনি, গণিতের মধ্যে অনেক নতুন নতুন ধারণা নিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছে। সব মিলে এই নতুন সংখ্যা সিস্টেম সাধারণ যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের অংককে একেবারে শিশুরও করতে পারার উপযুক্ত করে সহজ করে দিয়েছিলো। এই পদ্ধতিটিই আরব বিজ্ঞানীরা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলো এবং এক পর্যায়ে তাঁদের মাধ্যমেই ইউরোপেও চালু হয়ে গিয়েছিলো– ভারতীয় সংখ্যা ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও এটি আরব সংখ্যা ব্যবস্থা (এরাবিক নিউমারাল) নামে বেশি পরিচিত।

সংখ্যা ব্যবস্থা সহজ না হলেও একেবারে শুরু থেকে, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে ব্যাবিলনের মত মিশরও এতে যথেষ্ট এগিয়ে গিয়েছিলো। কিছু কিছু প্রাচীন প্যাপিরাস নথি থেকে এসব জেনে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। তা ছাড়া তাদের মন্দির আর পিরামিড রচনায় এবং ক্যালেন্ডার তৈরিতে এর সরাসরি ব্যবহারও আমরা দেখেছি। এসব থেকে জেনেছি যে ব্যাবিলনে ও মিশরে গণিত শুধু সংখ্যা আর তার যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগে সীমাবদ্ধ ছিলনা। তাছাড়া যাকে বলা যায় উচ্চতর গণিত তার শুরুও সেখানেই হয়েছিলো ওই সংখ্যা উদ্ভাবনের ধারাবাহিকতায়। বর্গমূল বা ঘন মূল (কিউব রুট) বের করার পদ্ধতি আর ২ বা ৩ এর মত একটি সংখ্যার বর্গমূল যে বেয়াড়া রকমের একটি সংখ্যা হয় তা নিয়ে কাজ চালানোর মত সমস্যার গণিত তাঁদেরকে যেখানে টেনে নিয়ে গেছে সেখানেই তাঁরা একটি সমাধান বের করার চেষ্টা করেছেন। বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের মধ্যে যে নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে সেই ব্যাপারটি আবিষ্কার করে, যাকে এখন আমরা 'পাই' এই গ্রীক অক্ষর দিয়ে বোঝাই সেই বেয়াড়া সংখ্যাটিরও একটি কাজ চালাবার মত শুদ্ধ মান তাঁরা বের করেছেন।

অন্য দিকে জ্যামিতি এমন কি অ্যালজেব্রার মত বিষয়গুলোও তাঁরাই এক ভাবে সামনে এনেছেন। সত্যিকার অর্থে বর্তমানের মত অ্যালজেব্রা না হলেও তাঁরা সরল রৈখিক, বর্গ এবং ঘন সমীকরণের সমাধান করে মূল বের করতে পারার উপায়ও উদ্ভাবন করেছিলেন। বিভিন্ন আকৃতির জমির ক্ষেত্রফল বের করা, নানা ঘন আকৃতির স্থাপনা তৈরি– যেমন সিলিন্ডার, পিরামিড ইত্যাদি আকৃতির, ও তাদের আয়তন বের করা ইত্যাদি বাস্তব সমস্যা তাঁদেরকে সেগুলোর বাস্তব সমাধান করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। এটি তাঁরা করে করে ভুল করতে করতে এক রকম মোটা দাগের প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে খাড়া করেছিলেন। বিশ্লেষণমূলক প্রমাণের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে সেগুলো দাঁড় করিয়েছিলেন একথা বলা যাবেনা। কিন্তু এতেই চমৎকার কাজ চলে যেতো। যে কোন ত্রিভুজ বা যে কোন পিরামিডের জন্য ব্যবহারযোগ্য ফরমুলা বা থিওরেমের মত নয় বরং প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা মান বের করে সারণির আকারে সেগুলোর প্রত্যেকটি তাঁরা পরিবেশন করতেন, অথবা কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মের আকারে সেগুলো প্রকাশ করতেন। গাণিতিক যুক্তি বিস্তার বা বিশ্লেষণ এতে বড় একটা থাকাতোনা– এসব এসেছে আরো পরে গ্রীকদের মধ্যে। ব্যাবিলনীয় বা মিশরীয়রা এগুলো পেতেন তাঁদের চর্চা ও নানা ভাবে করে দেখার মাধ্যমে। একই ভাবে অনেকদিন পরেও

ভারতীয় পাটিগণিতে আর্যা বা শ্লোকের মত এসব সমাধান পাওয়ার উপায়গুলো বলা থাকতো, যা এখানে আধুনিককালে পর্যন্ত চালু ছিল।

ব্যাপারটির একটি উদাহরণ দেয়া যাক। গ্রীক দার্শনিক গণিতবিদ পিথাগোরাসের থিওরেম বলে পরিচিত জ্যামিতির উপপাদ্যটির সঙ্গে আমরা সবাই স্কুলে পরিচিত হয়েছি। এটি বলে সমকোণী ত্রিভুজে অতিভুজের ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অন্য দুই বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের যোগফলের সমান। গ্রীকরা যুক্তির সাহায্যে এটি প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু তার বেশ কিছু আগে থেকে মিশরীয় গণিতবিদরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর ফলাফলটি জানতেন– ওই যে বলেছি করে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে। যেমন তাঁরা জানতেন ৩,৪,৫ এই তিনটি সংখ্যার যে 'ত্রয়ী' তার মধ্যে ৫ কে অতিভুজ ধরলে বাকি দুটি বাহু হবে ৩ আর ৪। পিথাগোরাস থিওরেম থেকে এটি সবাই জানবে কারণ ৩ এর বর্গ ৯ এবং ৪ এর বর্গ ১৬ এর যোগফল ২৫ যা বাকি সংখ্যা ৫ এর বর্গের সমান। কিন্তু মিশরীয়রা পিথাগোরাসের বহু আগে এই ৩,৪,৫ এবং এরকম আরো কিছু ত্রয়ীর কথা জানতেন। আর তা ব্যবহার করে প্রথমে সঠিক সমকোণী ত্রিভুজ ও পরে তার থেকে আয়তক্ষেত্র বিশাল আকারে তৈরি করে তাঁদের নির্মাণ কাজে জ্যামিতিক সহায়তা পেতেন– যেমন পিরামিডের ভূমি রচনা করার কাজে। কাজেই গণিতের অনেক কিছুতে ব্যাবিলনে বা মিশরে এক ভাবে পৌঁছানো গেছে– এক একটি নানা ভাবে করতে করতে বের করে সারণিতে সাজিয়ে হাতের পাঁচের হিসেবের মত করে। আবার পরে গ্রীসে এগুলোতে অন্য ভাবে পৌঁছানো গেছে– আটঘাট বেঁধে বিশ্লেষণ ও প্রমাণের মাধ্যমে; যা আরো সর্বব্যাপ্ত ভাবে প্রযোজ্য হয়েছে। কিন্তু গণিতের মডেলকে বিজ্ঞানের কাজে লাগাতে কারো ত্রুটি হয়নি।

অতি সম্প্রতি একটি ব্যবিলনীয় কাদার ট্যাবলেট আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে কিছু গাণিতিক সারণি রয়েছে। এতে ৪টি কলাম ও ১৫টি সারণিতে বিভিন্ন রকম সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি, লম্ব ও অতিভুজের অনুপাত দেয়া আছে। এই অনুপাতগুলো আসলে ত্রিকোণমিতিতে বিভিন্ন কোণের যে সাইন, কোসাইন, ট্যানজেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তার বিকল্প। কাজেই এক ভাবে ত্রিকোণমিতির মত উচ্চতর গণিতের আদিরূপ ব্যাবিলনে ছিল এটিও মানতে হয়। আর এটি থাকার মানে হলো কোণ থেকে অন্যান্য নানা হিসেব পাওয়ার যে ব্যবহার ত্রিকোণমিতির মৌলিক কাজ, সেই বাস্তব ব্যবহার তখনই হতো। অবশ্য ব্যাবিলনে এবং পরে গ্রীসে অ্যালজেব্রা আর ত্রিকোণমিতির এক ধরনের সূচনা পর্ব ঘটলেও আধুনিক অর্থে এই দুটারই পত্তন হয়েছে ভারতে সপ্তম শতাব্দীর

দিকে। আর এর পর পর আরব গণিতবিদদের হাতেই এটি সম্পূর্ণ আধুনিক নিয়মবদ্ধ রূপ লাভ করেছে, যেখান থেকেই ইউরোপীয়রা পেয়েছে।

দেখার ও মাপার প্রথম কিছু যন্ত্র

আজ সর্বোচ্চ সূক্ষ্ম ক্ষমতার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ এবং হাবল স্পেস টেলিস্কোপের যুগে বাস করে স্মরণ করতে চাই নিজের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য মানুষের সেই প্রথম চেষ্টাগুলোকে। সেদিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানে সব দেখা ছিল খালি চোখে, কিন্তু তাই বলে একেবারে সহায়তাবিহীন ভাবে নয়। পর্যবেক্ষণে সূক্ষ্মতা ও নির্ভুলতা আনার চেষ্টায় সেই ৫ হাজার বছর আগের ব্যাবিলনীয় পুরোহিত-বিজ্ঞানীরাও সম্ভবমত যন্ত্রপাতির ব্যবহার করেছেন। অন্য সব কাজে হাতিয়ার ব্যবহারের মত এটিও হয়তো মানুষের স্বাভাবিক প্রেরণা ও ক্ষমতার অংশ ছিল। একেবারে প্রথম যুগেরগুলোর পর ব্যাবিলনে, মিশরে এবং আশপাশের বিজ্ঞান চর্চার অন্যান্য জায়গাগুলোতে এ যন্ত্রের আরো উন্নয়ন ঘটেছে ধারাবাহিক ভাবে। এ সব কিছুর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল মোটের ওপর একটিই– আকাশে জ্যেতিষ্কদের রাজ্যে তাঁরা একটি ছন্দিত আনাগোনার আভাস পাচ্ছিলেন। সূর্যের, চাঁদের, গ্রহের পরিক্রমণগুলো সঠিক ভাবে মাপজোক করে তাঁরা এই ছন্দটাকে নিখুঁতভাবে আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন। প্রথম যাঁরা এটি করেছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত ব্যবহারিক– ওই ছন্দটার সহায়তার নিজেদের জীবনেও একটি ছন্দ আনার চেষ্টা। পরে পরে অবশ্য এর সঙ্গে অনেক দার্শনিক কারণও যুক্ত হয়েছে। ছন্দগুলো আবিষ্কারে পর্যবেক্ষণটি ছিল অপরিহার্য, আর প্রয়োজন ছিল অংকের। অংক করে যে ছন্দ খুঁজে পেতো তাও আবার পর্যবেক্ষণেই আনতে হতো। দেখা যাক কী রকম ছিল ওই পর্যবেক্ষণের হাতিয়ারগুলো।

শরীরটাই মাপযন্ত্রঃ

আকাশের জ্যেতিষ্কটি দিগন্তরেখার কত ওপরে আছে, এটি জানার জন্য পুরোহিত-বিজ্ঞানী চোখের সামনে নিজের প্রসারিত হাতের কয়টা 'আঙ্গুল' ওপরে ওটি আছে সেখান থেকেই হয়তো একটি প্রাথমিক মাপ নিয়েছেন, চওড়ার দিকে আঙ্গুলগুলোর মোট প্রশস্ততার নিরিখে। প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের বুড়ো আঙ্গুলের চওড়া দিক, মুষ্টি, ছড়ানো আঙ্গুলের স্প্যান, কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগ (হাত), ইত্যাদিও একই ভাবে ব্যবহার করা গেছে। আসলে ওই

অবস্থানকে মাপতে হয়েছে কৌণিক মাপ ডিগ্রিতে– ওটি দিগন্তরেখার কত ডিগ্রি ওপরে আছে, অথবা দুটি তারার মধ্যে কৌণিক দূরত্ব কত? আকাশে কৌণিক মাপই সুবিধাজনক– সব কিছু যে বৃত্তাকারে ঘুরছে। মানুষে মানুষে আঙ্গুলের, মুষ্টির সাইজে একটু তফাত তো হবেই, তবুও বয়স্ক সব মানুষের জন্য একটি গড়পড়তা হিসেবে ছিল– যেমন বুড়ো আঙ্গুলের চওড়ায় কৌণিক মাপ ২.৫ ডিগ্রি, মুষ্টির ৯ ডিগ্রি, ছড়ানো আঙ্গুলের স্প্যানের ২২ ডিগ্রি, তেমনি অন্যান্যগুলো।

শরীরের অঙ্গের ব্যবহার চট্ করে মাপের একটি ধারণা দিতে পারতো, কিন্তু এর ওপর বেশি ভরসা করা যায়না। ক্যাটালগে আনুষ্ঠানিক ভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য আরেকটু ভাল কিছু চাই। ব্যাবিলনে জ্যেতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণ সবার আগে হয়েছে, সব চেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু এরকম ব্যবহৃত কোন প্রাচীন যন্ত্রের নিদর্শন সেখানে পাওয়া যায়নি, এমনকি সেখানকার কিউনিফর্ম লিপির লেখাজোকাতেও যন্ত্রপাতির বর্ণনা আসেনি। অন্যদিকে সমসাময়িক মিশর থেকে এই দুটি উৎস থেকেই কিছু কিছু জানা গেছে, মন্দিরে-পিরামিডে তাঁদের আঁকা ছবি থেকেও। শরীরের অঙ্গের মত করেই একটি প্রমাণ সাইজের কাঠের টুকরা ব্যবহার করার বুদ্ধিটি তাঁদের মাথায় এসেছিলো। যেমন দুটি তারার মাঝখানে কৌণিক দূরত্ব বের করার জন্য তাঁরা এরকম একটি সুনির্দিষ্ট মাপের কাঠের টুকরা প্রসারিত হাতে চোখের সামনে ধরে দেখতেন তারা দুটি টুকরার দুই কিনারা বরাবর আছে কিনা। যে প্রশস্ততার কাঠের সঙ্গে এটি হতো সেটিতে লিখে রাখা হিসাব করা ডিগ্রির মাপ ওর থেকেই পাওয়া যেতো। এভাবে পূর্ণ চাঁদের ব্যাসের কৌণিক মাপ পাওয়ার জন্য তাঁরা ১১ ইঞ্চি ব্যাসের একটি চাকতি ব্যবহার করতেন চোখের সামনে নির্দিষ্ট দূরত্বে ধরলে যেটি দিয়ে চাঁদ হুবহু ঢাকা পড়তো। এভাবেই তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে এটি বছরের কিছু কিছু সময়ে মাত্র হচ্ছে, অন্য সময় হয়তো চোখের থেকে একই দূরত্বে হুবহু ঢাকা পড়ার জন্য ১১ ইঞ্চির বদলে ১২ ইঞ্চি ব্যাসের চাকতির দরকার হচ্ছে। দূরত্ব বদলের কারণে চাঁদ যে ছোট বড় দেখাচ্ছে সেটি যন্ত্রবিহীন ভাবে যতটা না বোঝা যেতো এভাবে একেবারে মাপজোক করে স্পষ্ট বোঝা গেছে। সূর্যের বড় ছোট হওয়ার মাপও তাঁরা এভাবে নিয়েছেন, তবে সরাসরি তাকানো যায়না বলে সেটি নিয়েছেন পানির মধ্যে সূর্যের প্রতিফলনের বিপরীতে।

কৃত্রিম দিগন্তঃ

দিগন্তরেখার ওপরে উঠে বা নিচে গিয়ে একটি জ্যোতিষ্ক উদিত হয় বা অস্ত যায়। ঠিক কোন্ দিকে এ ঘটনাগুলো ঘটেছে নিশ্চিত করতে দিগন্তরেখাটিকে ঠিক ভাবে চিহ্নিত করা চাই। উঁচুনিচু ভূমি বা গাছগাছড়া পূর্ণ জায়গায় এটি করা কঠিন। তাই প্রাচীন পর্যবেক্ষক নিজের জন্য একটি কৃত্রিম দিগন্তরেখা অনেক সময় তৈরি করে নিতেন। জিনিসটি ছোট একটি বৃত্তাকার দেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়, পর্যবেক্ষক যার ঠিক কেন্দ্রে থাকতেন। এই দেয়ালে সঠিক দিকগুলো চিহ্নিত করে রাখা হতো। যেমন উত্তর দিকটি নির্ণয় করতে হলে যে কোন দিন যে কোন জ্যোতিষ্কের উদয়ের স্থানটি এবং অস্ত যাওয়ার স্থানটি চিহ্নিত করে এটি করা যায়। এই দুটি স্থান বৃত্তের কেন্দ্রের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করবে তার সমদ্বিখন্ডক রেখাটিই উত্তর-দক্ষিণ রেখা। এই কৃত্রিম দিগন্তের ওপরেই দীর্ঘতম দিনের সূর্যোদয়ের স্থান, দীর্ঘতম রাত্রির আগের সূর্যোদয়ের স্থান, অথবা সমান দিবারাত্রির সূর্যোদয়ের স্থান ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ দিকগুলো চিহ্নিত করা যায়, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

ওসময় পর পর দিনগুলোতে সূর্যোদয়ের স্থানটি এত সামান্য পরিবর্তন হয় যে ঠিক কোন্ দিন সূর্য তার উত্তরায়ন বা দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় পৌঁছালো, তা পর্যবেক্ষণ থেকে বের করা খুব কঠিন। সমান দিবা-রাত্রির দিনটি বের করা আরো কঠিন। তাই পর্যবেক্ষণকে যথাসম্ভব সূক্ষ্ম করার জন্য একেবারে খালি চোখে না তাকিয়ে একটি সরু ফাঁপা নলের মধ্য দিয়ে দেখা হতো– অনেকটা লেন্স বিহীন একটি দূরবীনের মত– যাকে বলা যায় দর্শন-নল। প্রাচীন বর্ণনায় এর কথা পাওয়া গেছে। ভোর হবার ঠিক আগে বা সন্ধ্যার ঠিক পর গোধূলি আলোতে কোন তারাকে বা গ্রহকে দেখতে এই দর্শন-নল বিশেষ উপযোগী হতো বাইরের বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী আলোকে দৃষ্টিপথে আসতে না দিয়ে। নলটিকে কখনো একটি স্থাপনার সঙ্গে আটকিয়ে একটি তারার দিকে তাক করে স্থির রাখা হতো। সেক্ষেত্রে তারাটি দেখার জন্য অল্প কিছু মাত্র সময় পাওয়া যেতো কারণ দৈনিক আবর্তনের কারণে শিগগির এটি নলের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাবে। শুধু একটি তারার ক্ষেত্রে এটি হতো না, তারাটিকে সব সময় দেখা যেতো– সেটি ধ্রুবতারা। মজার ব্যাপার হলো আজকে আমাদের যে ধ্রুবতারা, সেদিন সেটি তা ছিলনা, তখনকার সময়ে ঠিক উত্তর দিকে স্থির থাকা অন্য কোন তারাকে ধ্রুবতারা হিসেবে দেখা যেতো।

জলঘড়িঃ

মিশরের কারনাক মন্দিরে খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের একটি জলঘড়ি পাওয়া গেছে যা এমন ঘড়ির মধ্যে প্রাচীনতম। এরকম জলঘড়ি জ্যোতির্বিদ্যার পরিমাপেও ব্যবহার করা হতো। এতে একটি ওপর অন্য একটি দুটি পাত্র থাকতো যাতে ওপরেরটা সব সময় পানি দিয়ে ভর্তি করে রাখা হতো আর এর তলার একটি ছোট ছিদ্র দিয়ে পানি অনবরত নিচেরটাতে পড়তো। নিচেরটার ওপর দাগ কাটা থাকতো যা দেখে সময় বলা যেতো। নিচের পাত্রটি পূর্ণ হয়ে যাওয়া মাত্র হুবহু একই রকম আরেকটি পাত্র ওটির স্থানে স্থাপন করা হতো। এভাবে কতবার পাত্র পূর্ণ হয়েছে সেটিও সময়ের একটি পরিমাপ দিতো।

ঠিক এরকম একটি জলঘড়ি দিয়েই পরে গ্রীক জ্যেতির্বিদরা আবিষ্কার করেছিলেন যে সূর্যের ব্যাস তার কক্ষপথের পরিধির $\frac{১}{৭২০}$। পূর্বদিগন্তে সূর্যের কিনারাটি দেখা দেয়া মাত্রই ঘড়িটি চালু করে দেয়া হয়েছিলো। নিচের পাত্রকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে সূর্য পুরোটা পুরাপুরি দিগন্ত রেখার ওপরে উঠে আসার সময়ের মধ্যে এটি পূর্ণ হয়ে যেতো এবং এর বদলে নতুন একটি সমান পাত্র সেখানে রাখা হতো। সূর্য ওঠার পরও এভাবে পাত্র বদলিয়ে বদলিয়ে ঘড়ির কাজ চলতেই থাকতো– ওই সারা দিন এবং তারপর সারা রাত যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য আবার দিগন্তরেখার ওপর পুরো উঠে আসছে। দেখা গেছে এই সময়ের মধ্যে নিচের পাত্রকে ৭২০ বার ভর্তি হতে হয়। পরে সূর্যের ব্যাস যখন গ্রীকরা অন্য ভাবে বের করতে পেরেছেন, এই জলঘড়ির হিসেব থেকে তখন সূর্যের কক্ষপথের পরিধি ও সেখান থেকে সূর্যের দূরত্ব বের করা গেছে।

সূর্যঘড়ির কাঁটাঃ

প্রাচীন মিশরে তো বটেই জ্যোতির্বদ্যার চর্চার দেশে দেশে সূর্যঘড়ির কাঁটা হিসেবে বা আরো নানা কাজে নোমন নামক একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি যেখান থেকে অন্য কিছু পাওয়া যায়নি সেই ব্যাবিলনেও এটি পাওয়া গেছে। একটি সমতল পাটাতনের ওপর লম্ব ভাবে থাকা একটি কাঠিই হলো সব চেয়ে সরল নমোন। বাইরে রাখলে এর ছায়া দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে ও দৈর্ঘে পাটাতনের দাগ কাটা জায়গায় পড়ে, ও তা দেখে সময় নির্ণয় করা যায়। একই দাগ অবশ্য সব মৌসুমে একই সময় দেবেনা, কারণ সূর্যের পরিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ায় পরিবর্তন ঘটে।

সূর্যঘড়ি হিসেবে ছাড়াও জ্যোতির্বিদ্যায় নোমনের আরো চমকপ্রদ ব্যবহার ছিল। উদাহরণ স্বরূপ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করার সময় হলো ঠিক স্থানীয় মধ্যাহ্নের সময়– সূর্য যখন দিনের সব চেয়ে উঁচু স্থানে থাকে। ঠিক এই সময় কাঠির ছায়া দিনের মধ্যে সব চেয়ে ছোট হয় এবং তা ঠিক উত্তর-দক্ষিণ বরাবর হয়। এই মধ্যাহ্নের ঠিক সময়টি নির্ণয় করা সহজ নয় কারণ এর কাছাকাছি সময়ে এক ঘন্টায়ও সূর্য এক ডিগ্রির বেশি স্থান পরিবর্তন করেনা। উত্তর দিকটি আরো নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব সকালে নমোনের একটি ছায়া ও বিকেলে আরেকটি ছায়া দেখে নির্দিষ্ট করে রাখা। এখন এই দুটির মধ্যেকার কোণের সমদ্বিখণ্ডক বরাবর উত্তর-দক্ষিণ হবে। মধ্যাহ্নের সব ছায়ার মধ্যে দীর্ঘতম দিনেরটি সব চেয়ে ছোট হয় এবং হ্রস্বতম দিনেরটি সব চেয়ে লম্বা হয়। কাজেই ও সময় দুটির কাছাকাছি দিনে পর পর দিনগুলোতে ছায়ার দৈর্ঘ লক্ষ্য করে দীর্ঘতম এবং হ্রস্বতম দিনগুলো নির্ণয় সম্ভব ছিল। কিন্তু ওই দিনগুলোতে দিনের সঙ্গে ছায়ার পরিবর্তন এত কম যে বুঝতে পারা মুশকিল। ফলে দীর্ঘতম দিনটি হয়তো এদিক ওদিক চার পাঁচ দিন ভুল হয়ে যেতো।

পৃথিবী যে গোলকাকার এটি আবিষ্কৃত হবার পর নমোন দিয়ে আর একটি কাজ করা গেলো। তা হলো সূর্যের পরিক্রমণের কক্ষপথটির তল পৃথিবীর বিষূব তলের সঙ্গে যে কোণ তৈরি করে সেটি নির্ণয়। একে হতে হবে দীর্ঘতম দিনে মধ্যাহ্নের ছায়া আর সব চেয়ে ছোট দিনটিতে মধ্যাহ্নের ছায়া এই দুইয়ের মাঝের কোণের অর্ধেক। নমোনের ছায়া দেখে বোঝা গেছে যে ওই দুই ছায়ার কোণটি ৪৭ ডিগ্রি। তাই সূর্যের কক্ষপথের সঙ্গে বিষূব তলের কোণটি ২৩$\frac{১}{২}$ ডিগ্রি। বহু পরে বোঝা গেছে আসলে পৃথিবীর দৈনিক ঘূর্ণনের অক্ষটি এভাবেই পৃথিবী-কক্ষের তলের সঙ্গে এই কোণে কাৎ হয়ে আছে। নমোন দিয়ে দিবারাত্রি সমানের দিন দুটিকেও নির্ণয় করা যায়। এর জন্য দরকার হলো বছরের সব চেয়ে দীর্ঘ দিনের মধ্যাহ্নে নমোনের ছায়া এবং সব চেয়ে ছোট দিনের মধ্যাহ্নের নমোনের ছায়া এই দুইয়ের মধ্যের কোণের সমদ্বিখণ্ডক রেখাটি নির্ণয় করে রাখা। বছরে যেই দিন দুটিতে মধ্যাহ্নের ছায়ার অগ্রভাগ এই রেখাটিকে এসে ছোঁবে ওগুলোই সমান দিবা-রাত্রির দিন।

প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের কাছে যেসব মাপজোক খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার অনেকগুলোতে নমোনের ব্যবহার দেখলাম। এ জন্যই এই সাধারণ জিনিসটি এতো জনপ্রিয় ছিল– হাজার হাজার বছর ধরে। প্রাচীন মিশরে এর নাম ছিল

মেরাখিফ। অনেক জায়গায় ভূমির ওপর স্থায়ী ভাবে নমোন কাঁটা দাঁড়িয়ে থাকলেও মেরাখিফ কিন্তু হতো বহনযোগ্য প্রকৃতির, নিজের পাটাতনটি তার নিজের সঙ্গেই থাকতো, যে কোন জায়গায় নিয়ে ব্যবহার করা যেতো।

এসবেরই ধারাবাহিকতায়ঃ

নমোনের মত যন্ত্র হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে নানা সভ্যতায়। প্রাচীন ভারতীয় জ্যেতির্বিদ্যায় এগুলো পরের দিকে বিশাল সব স্থাপনায় রূপ লাভ করেছ। এগুলো 'শঙ্কু যন্ত্র' এবং 'ছায়া যন্ত্র' ইত্যাদি নামে নানা আকৃতির নানা রূপ লাভ করেছে। সেই ঐতিহ্যে আরো পরে রাজা জয়সিংহের উদ্যোগে জয়পুরে, উজ্জয়নে, বেনারসে আর দিল্লীর কেন্দ্রস্থলে যন্তর মন্তরে এই বিশাল যন্ত্রগুলো স্থান পেয়েছে। 'ফলক যন্ত্র' নামে আরেকটি যন্ত্র ওই মিশরীয় কাঠের টুকরাই পরিবর্তিত রূপ যা কৌণিক দূরত্ব মাপতে ব্যবহৃত হতো।

গ্রীক বিজ্ঞানে বিশেষ করে খৃষ্টজন্মের দু'এক শতাব্দী আগে থেকে সেখানে জ্যেতির্বিদরা আরো ফলপ্রসূ নানা যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন প্রধানত আকাশ পর্যবেক্ষণে এবং ভূমি জরীপের কাজেও। থিওডেলাইট এর মধ্যে প্রধান একটি। দূরবীনের মত ব্যবহার করে একটি ফাঁপা দর্শন-নলটি লক্ষ্যবস্তু তারাটির দিকে তাক করে ভূমি সমান্তরাল ডায়ালে এবং ভূমির সঙ্গে খাড়া ডায়ালে এর কৌণিক অবস্থান মাপা হতো। ডায়াল ভূমি সমান্তরাল (লেভেল) হয়েছে কিনা বোঝার জন্য এর সঙ্গে U আকৃতির নলে তরল রেখে দেখা হতো ওটির দুই বাহুতে তরল একই সমতলে আছে কিনা। কোয়াড্রেন্ট নামে আরেকটি গ্রীক যন্ত্র খুব জনপ্রিয় ছিল; তা আসলে একটি বৃত্তের চার ভাগের এক ভাগ আকৃতির একটি ডায়াল (সেজন্যই এই নাম)। এর বক্রাকার কিনারায় ডিগ্রির দাগ কাটা থাকতো। এর দুটি সরল কিনারার একটায় সমান্তরালে দর্শন-নলটি ফিট করা থাকতো– ওটি দিয়ে তারাটি তাক করা হতো। কোয়াড্রেন্টের কেন্দ্র বিন্দু থেকে একটি ওলম দড়ি ডায়াল ঘোঁষে ঝুলে থাকতো– দেয়াল তৈরির সময় রাজমিস্ত্রিরা যে ওলম দড়ি ব্যবহার করে সে রকম। ওলম দড়ির সূতা ওই ডিগ্রি দাগের যেটির ওপর দিয়ে ঝুলতো তার থেকে তারাটির কৌণিক উচ্চতা পাওয়া যেতো। যেমন ধ্রুবতারার কৌণিক উচ্চতা থেকে জায়গাটির অক্ষাংশ পাওয়া যেতো– পরবর্তীকালের সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের মত।

গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার স্বর্ণযুগে জটিলতর কিছু কিছু যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়েছিলো যা দিয়ে সূক্ষ্মতর সব পরিমাপ করা যেতো। এগুলোর বর্ণনা ভাল পাওয়া গেছে

বিখ্যাত জ্যেতির্বিদ টলেমির বইয়ে। 'আর্কিমিডিসের যন্ত্র' নামে পরিচিত একটি যন্ত্র ছিল দুই মিটার লম্বা একটি কাঠির মত কাঠির ওপর আগে-পিছে করে নড়াচড়া করতে পারার মতো কিছু পিন। এর মধ্যে কোনটিতে চোখ রাখা হতো, কোনটির সঙ্গে একটি চাকতি থাকতো যা আগে পিছে করে চাঁদ, তারা সূর্য যা দেখছি তা ঠিক ঢেকে দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতো। এরকম যন্ত্রের ব্যবহার করে সর্বনিম্ন আধ ডিগ্রি পর্যন্ত কৌণিক দূরত্ব মাপতে পারাতে চাঁদ-সূর্য এসবের দূরত্ব নির্ণয়েও সক্ষম হয়েছিলেন গ্রীক বিজ্ঞানীরা। আর একটি বেশ জমকালো যন্ত্র ছিল আরমিলারি গোলক নামের। এতে পুরো আকাশ-গোলকের একটি প্রতিনিধিত্ব থাকতো অনেকগুলো রিং বা বলয়ের আকারে। এর কোনটি আকাশ-গোলকের বিষূব রেখা, কোনটি সূর্যের পরিক্রমণ পথ, কোনটি রাশিচক্র চিহ্নিত করে, ওই গোলকের কর্কট ক্রান্তি চক্র, মকর ক্রান্তি চক্র ইত্যাদি। প্রত্যেকটি অন্যগুলোর সঙ্গে সঠিক কৌণিক দূরত্বে থাকতো। পুরো গোলকের মাঝখানে থাকতো ভূগোলক– কারণ ওসময় তো পৃথিবীকেই সব কিছুর কেন্দ্রে হলে বিবেচনা করা হতো। রিংগুলোর ওপর নানা নির্দেশক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসল আকাশের পরিস্থিতিগুলো এখানে সৃষ্টি করা যেতো, পরিমাপও করা যেতো। এর জন্য গোলকের দিকগুলো ও কোণ আসল জায়গার দিক ও কোণের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হতো।

কাছের পর্যবেক্ষণ

প্রাচীন চিকিৎসায় বিজ্ঞানঃ

প্রাচীন চিকিৎসায় বিজ্ঞানের জায়গাটি খুব বড় ছিলনা, বড় জায়গাটি ছিল তুকতাক, ঝাড়ফুক ইত্যাদির। এর মধ্যেই বিজ্ঞান আস্তে আস্তে জায়গা করে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও আকাশ পর্যবেক্ষণের বাইরে কাছের যে পর্যবেক্ষণ তার মধ্যে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে এই চিকিৎসার জন্য শরীর পর্যবেক্ষণ ও ওষুধের জন্য উদ্ভিদ-গাছগাছালির পর্যবেক্ষণ। প্রাচীন মিশরের চিকিৎসা নিয়ে যে কিছু হাইরোগ্লিফিক লিপি পাওয়া গেছে তা থেকে এসবই দেখা যায়। এতে রোগ সৃষ্টিকারী ভূতপ্রেত তাড়াবার জন্য ব্যবস্থাপত্র আছে, আবার রোগীর শরীর কী ভাবে পরীক্ষা করতে হবে, কী যত্ন, কী ওষুধ দিতে হবে তাও আছে।

কোন কোন চিকিৎসাপত্র আবার বিশেষ ধরনের কাজে। যেমন একটি হলো ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত– গর্ভাবস্থায় করণীয় যাবতীয় পরামর্শ আছে সেখানে। কোন কোনটি একেবারে হবু চিকিৎসকদের জন্য পাঠ্যবইয়ের মত। এসব

হাইরোগ্লিফিক ছাড়াও সেদিনের চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে অল্প বিস্তর জানার আরো উৎস রয়েছে– যেমন মন্দিরে, পিরামিডে পাওয়া চিত্র থেকে। সংরক্ষিত মৃতদেহ মমিগুলোর ওপর এক্সরে, ক্যাটস্ক্যান ইত্যাদি করে ওগুলোর অভ্যন্তর সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি জানা গেছে। তাতে জীবদ্দশায় ওদের অসুখ ও চিকিৎসা সম্পর্কেও কিছু কিছু ধারণা পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞানের দিকটায় রোগ নির্ণয়ে শারীরিক পর্যবেক্ষণের ব্যাপারটি ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করতে দেখা গেছে। চিকিৎসকরা বুঝতেন শরীরের মধ্যে বাতাস, পানি, রক্ত ইত্যাদি পরিবহনের জন্য নানা রকম নল রয়েছে। এ নলের মাঝে চলাচলে ব্যাঘাত অসুখের কারণ মনে করা হতো, আর চিকিৎসা হলো সেই ব্যাঘাত দূর করা। নলের মধ্যে চলাচল অব্যাহত রাখার জন্যই ওষুধ দেয়া হতো। শরীরের কিছু কিছু জিনিস মাপার ব্যাপার ছিল যেমন নাড়ির স্পন্দন হার। এর সঙ্গে হৃৎপিন্ডের সুস্বাস্থ্যের যে একটি সম্পর্ক আছে তা তাঁরা বুঝতেন। সত্যিকার বৈচিত্র ছিল ওই যাবতীয় ওষুধের ক্ষেত্রে– মলম, পাচন, সালসা, কুলি করার তরল, নিশ্বাসে নেয়া ধোঁয়া ইত্যাদি কত কি। আর এগুলোর উৎসের মধ্যে উদ্ভিদই প্রধান। উদ্ভিদ ছাড়াও ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হতো কিছু কিছু প্রাণিজ এবং ধাতব জিনিস। ব্যাবিলনীয় একটি কিউনিফর্ম ট্যাবলেটে কিডনি রোগের চিকিৎসার একটি বর্ণনা পাওয়া গেছে এবং এর ওষুধ তৈরির বিস্তারিত। ব্রোঞ্জের সরু নল মূত্রনালীর মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে কিডনিতে সরাসরি এই ওষুধ প্রয়োগ করতে হতো। আবার একই সঙ্গে খাওয়ার যে ওষুধ তাতে চার পাঁচ রকমের রাসায়নিক পদার্থের নাম উল্লেখ আছে যা বিভিন্ন উদ্ভিদ, খনিজ ও উটপাখির ডিম থেকে আসতো। এ সবকে বিশেষ রকম মদ জাতীয় পানীয়তে কয়েক দিন ডুবিয়ে রেখে ওষুধ তৈরি হতো, এবং বেদানার রসে মিশিয়ে তা ক্রমাগত খেতে দেয়া হতো। ওষুধ তৈরির ব্যাপারটিই প্রায় ক্ষেত্রেই বেশ জটিল হতো। এর কতখানি সত্যিকার কার্যকারিতার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভুত আর কতখানি নানা বিশ্বাসের থেকে উদ্ভুত তা জানার উপায় নেই।

তবে নি:সন্দেহে চিকিৎসাবিদ্যা তখন থেকেই প্রকৃতিবিদ্যার আরো কিছু ব্যাপক পর্যবেক্ষণকে উৎসাহিত করেছিলো– সেগুলো হলো উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ, প্রাণী পর্যবেক্ষণ এবং নানা খনিজ, ধাতু ও রাসায়নিক দ্রব্য পর্যবেক্ষণ। এরই ধারাবাহিকতায় পরে গ্রীক বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর ব্যাপক জরিপ ও শ্রেণী বিভাজনের কাজ চালিয়েছেন।

প্রাণীর ওপর পর্যবেক্ষণঃ

বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল বিজ্ঞানের হাতেকলমে অনুসন্ধানে তাঁর সেরা কাজটি দেখিয়েছে প্রাণীর জরিপে। আজ থেকে ২,৩৫০ বছর আগে পুরো দুটি বছর তিনি গ্রীসের লেসবোস দ্বীপের প্রাণিজগতের বাস্তব অনুসন্ধানে কাটিয়েছেন– খুবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এক একটি প্রাণীর ওপর পর্যবেক্ষণে। এদের মধ্যে সামুদ্রিক প্রাণীই বেশি– সাধারণ নানা মাছ যে রকম তেমনি ইলেকট্রিক ফিশ, এঙ্গলার ফিশের মতো ব্যতিক্রমীরাও রয়েছে। সেই সঙ্গে মাছ ছাড়াও কাট্‌ল ফিশ, অক্টোপাস, নটিলাস ইত্যাদিও রয়েছে। এরিস্টোটলই প্রথম ধরতে পারেন যে তিমি, ডলফিন এগুলো মোটেই মাছ নয়, বরং স্তন্যপায়ী প্রাণী। অক্টোপাসের পা'গুলো ভাল মতো পরীক্ষা করে তিনি বুঝতে পারেন যে এর মধ্যে একটি পায়ের সঙ্গে প্রজনন ক্রিয়ার সরাসরি সম্পর্ক আছে, যদিও এর পুরো ভূমিকাটি তিনি বুঝতে পারেননি। ও সময় ব্যাপারটি অন্য বিশেষজ্ঞরা উড়িয়ে দিলেও আধুনিক কালে বিষয়টি পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে। হাঙ্গর জাতীয় প্রাণী ডগফিশের যে ব্যতিক্রমী ব্যাপারের জন্য তাকে 'ওভোভিপেরাস' প্রাণী বলা হয় তাও এরিস্টোটল উদ্ঘাটন করেছেন। এতে ডিম মায়ের পেটে থেকে যায় এবং ভ্রূণ যথারীতি নাড়ির মাধ্যমে ফুলের (প্ল্যাজেন্টা) সঙ্গে যুক্ত থাকে, কিন্তু স্তন্যপায়ীদের মত মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেনা। ডাঙার প্রাণীদের মধ্যেও এরিস্টোটল অনেক নতুন উদ্ঘাটন ঘটাতে পেরেছেন মনোযোগী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। যেমন গরুর মত জাবরকাটা প্রাণীগুলোর পাকস্থলীতে যে চারটি কুঠুরি থাকে সেটি তাঁরই আবিষ্কার।

এরিস্টোটলকে ইতিহাসের প্রথম সার্থক প্রাণী শ্রেণী বিভাজনকারী বলা যায়। শ্রেণী বিভাজন যে জীববিদ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে সেই উপলব্ধিটাও খুব সম্ভব তাঁরই প্রথম– যা আধুনিক জীববিদ্যায় বিশেষভাবে স্বীকৃত। তিনি যে বিষয়গুলোকে শ্রেণীভুক্ত করার ক্ষেত্রে বিবেচনার মধ্যে এনেছিলেন সেগুলোর মধ্যে ছিল প্রাণীটি কি রক্তময় নাকি রক্তহীন, তার আত্মাটির কী চিন্তাশক্তি আছে কি নেই, তার কি সংবেদনশীলতা আছে নাকি নেই, ইত্যাদি। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে পদার্থে গরম, ঠান্ডা, ভেজা, শুষ্ক ইত্যাদি কল্পিত সব গুণ আরোপ করেছেন এক্ষেত্রেও তার কিছু ছায়া দেখা যায়। তবে প্রায় দুই হাজার বছর ধরে এরিস্টোটলের শ্রেণী বিভাজনই স্বীকৃত ছিল, এর আধুনিক রূপটি আসার আগে পর্যন্ত।

যদিও এরিস্টোটলের জীববিদ্যার অনেক কিছুই শুদ্ধ পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে, কিন্তু অনেক কিছুতেই আবার তিনি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন– এবং তার অনেকখানি একেবারেই ভুল ছিল। তিনি মনে করতেন খাদ্যের একটি অংশ রক্তে পরিণত হয় এবং বাকিটা বর্জ্যে। রক্ত থেকেই পরে তা দিয়ে মাংস, হাড়, চর্বি ও শুক্র তৈরি হয়। খাদ্য যে 'আগুনের' অংশ আছে তার থেকে শরীরে উত্তাপ তৈরি হয়, কিন্তু রক্ত ও হৃৎপিণ্ডের দ্বারা ফুসফুস বড় হওয়ার মাধ্যমে সেই উত্তাপ আবার কমে আসে– স্বাভাবিক হয়। তিনি মনে করতেন পঞ্চ ইন্দ্রিয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী শরীরে প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা নেয় হৃৎপিণ্ড– এই ব্যাপারে তিনি মস্তিষ্ককে বিবেচনা করেননি। সন্তানের জন্ম প্রক্রিয়ায় তিনি পুরুষের শুক্রকে ঠিক মত ধরতে পারলেও নারীর অংশটি তাঁর মতে আসে মাসিকের স্রাবে আসা রক্ত থেকে। শুক্র ওই মাসিকের রক্তকে জমিয়ে ভ্রূণের সৃষ্টি করে। ভ্রূণের প্রাণশক্তির পুরোটাই ওই শুক্ররস থেকেই আসে। এগুলো একেবারেই ভুল কথা।

দেখা গেছে যে সব ক্ষেত্রে এরিস্টোটল নিজে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন সেখানে প্রাণীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, খুবই ব্যতিক্রমী বিষয় তিনি আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু সেখানেই অন্যের কথার ওপর নির্ভর করেছেন, যেমন পেশা-জীবি জেলে, মধু সংগ্রাহকদের বর্ণনার ওপর অথবা দূরদেশে ভ্রমণকারীদের কাহিনীর ওপর– সেখানেই তিনি কল্পিত তত্ত্ব দিয়েছেন এবং ভুল করেছেন। তবে এরিস্টোটলের মত প্রভাবশালী দার্শনিকের মতামত হওয়াতে এই ভুলগুলো অনেকদিন বিজ্ঞানীদেরকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিলো। পরে দেখবো বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর বিভ্রান্তি আরো বেশি অনর্থ ঘটিয়েছে। অন্তত প্রাণীবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর পর্যাবেক্ষণের পদ্ধতিটি যে খুব বিজ্ঞানসম্মত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় 'প্রাণীর সৃষ্টি' বইয়ে মুরগির ডিমে ভ্রূণের সঞ্চার ও গড়ে ওঠা সম্পর্কে তাঁর কাজের বর্ণনা থেকে। তিনি ডিম নিষিক্ত হবার পর থেকে প্রত্যেকটি পর্যায়ে দিনের পর দিন বয়স অনুযায়ী এক একটি ডিম ভেঙ্গে ভেতরটা পরীক্ষা করে গেছেন। লক্ষ্য করেছেন এর মধ্যে কখন রক্তনালী এসেছে, হৃৎপিন্ড এসে তার স্পন্দন শুরু হয়েছে ইত্যাদি। ভ্রূণের ভেতরের পরীক্ষাটি তিনি অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করেছেন, লক্ষ্য করেছেন সেই ভ্রূণ কীভাবে বাচ্চায় পরিণত হচ্ছে। অন্য ক্ষেত্রেও কার্যকারণ সম্পর্ক থেকেও প্রাণী সম্পর্কে কিছু সাধারণ সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে শুদ্ধ ছিল এমন কয়েকটি হলো বিচিত্র রকমের প্রাণীর মধ্যে যেগুলো যত বড় তাদের প্রতিবার দেয়া সন্তানের সংখ্যা কম হয়, সারা জীবনে দেয়া মোট সন্তানের সংখ্যাও তাদের কম হয়। যেমন হাতির

ক্ষেত্রে এই উভয় সংখ্যা খুব কম, ইঁদুরের ক্ষেত্রে অনেক বেশি। বড় প্রাণীর আয়ুষ্কাল বেশি হয়। যারা বেশিদিন বাঁচেনা তারাই সন্তান বেশি রেখে যায়।

উদ্ভিদের ওপর পর্যবেক্ষণঃ

এরিস্টোটলের প্রায় সমসাময়িক গ্রীক দার্শনিক থিওফ্রেস্টাস উদ্ভিদবিদ্যার আদি পথিকৃৎ বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হতে পেরেছেন– এতে তাঁর ব্যাপক পর্যবেক্ষণের কারণে। এই ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের পরিচয় রয়েছে তাঁর বহু খণ্ডে লেখা দুটি গ্রন্থে– একটির নাম 'উদ্ভিদের ওপর অনুসন্ধান' আর অন্যটির নাম 'উদ্ভিদের কার্যকারণ'। প্রথম গ্রন্থে যাবতীয় উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাজনের চেষ্টা করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে অবয়ব, জন্মানোর প্রক্রিয়া, প্রাপ্তি স্থান, ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ আকার, উপকারী ব্যবহার ইত্যাদির ভিত্তিতে। গুল্ম, লতা, ঝোপ, বৃক্ষ ইত্যাদি মোটা দাগে বিভক্ত করে এর শুরু। এতে পুরো উদ্ভিদ জগতটাকে কিছু নিয়মের মধ্যে আনার চেষ্টা আছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি উদ্ভিদের বাস্তব ব্যবহারগুলোর দিকে বেশি নজর রাখা হয়েছে– কী ভাবে সেগুলো কৃষি, বন রক্ষা, বাগান রচনা ইত্যাদির আওতায় আসছে। স্থানীয় উদ্ভিদের ওপর গবেষণা তাঁর জন্য সহজ হয়েছে। কিন্তু তা ছাড়াও অনেক উদ্ভিদকে তিনি তাঁর নিজের সৃষ্ট বোটানিক্যাল গার্ডেনে গড়ে তুলেছেন, পর্যবেক্ষণের আওতায় আনতে পেরেছেন। এর বাইরেও তিনি অন্যান্য দেশের, দূরদূরান্তের উদ্ভিদের তথ্য সংগ্রহ করেছেন পর্যটকদের কাছ থেকে। আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে যাঁরা ভারত পর্যন্ত নতুন নতুন দেশে গিয়ে পরে ফিরে এসেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে বট, তুলা, গোলমরিচ, দারুচিনি ইত্যাদি একেবারে বিজাতীয় উদ্ভিদ সম্পর্কে তথ্য পেয়েছেন।

তাঁর অনুসন্ধানের পদ্ধতি এরিস্টোটলের থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন ছিল। তিনি উপকারী কাজে লাগাবার জন্য উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ গুণের উদ্ঘাটনেই বেশি মনোযোগী ছিলেন। পর্যবেক্ষণে যা স্পষ্ট নয় কল্পনা থেকে তার ওপর তত্ত্ব দিতে তিনি উৎসাহী ছিলেন না। নিজের শিক্ষক এরিস্টোটল শ্রেণীভুক্ত করার যে নিয়ম চালু করেছিলেন তিনি সেটিকে মেনে নিয়েই কাজ করার চেষ্টা করেছেন। অথচ উদ্ভিদের আত্মা আছে কি নেই এরিস্টোটলের এ ধরনের বিতর্কে তিনি ঢুকতে চাননি, কারণ তাঁর মতে এ নিয়ে তাঁর হাতে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। এরকম স্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণবিহীন বিষয়গুলো তিনি ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের ওপর ছেড়ে দিতে চেয়েছেন। যে সব বিষয়ে এরিস্টোটল বা অন্য বিজ্ঞানীদের খুব জোর

মতবাদ ছিল সেখানে তিনি তাঁর বিকল্প কিছু মত কোন কোন ক্ষেত্রে দিয়েছেন তবে সে সম্পর্কে জেদ না করে প্রশ্নগুলোর নিরসণটি ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন একটি মতবাদ প্রচলিত ছিল কোন কোন উদ্ভিদ আগের কোন বীজ বা অন্য উৎস ছাড়া নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে। আর একটি মতবাদ ছিল এক উদ্ভিদ অন্য উদ্ভিদে পরিণত হতে পারে। এই দুই ব্যাপারেই তাঁর সন্দেহ ছিল বলে তিনি ওগুলোর সম্পর্কে কিছু বিকল্প ব্যাখ্যা দিয়ে চূড়ান্ত রায়টি পরের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এদিক থেকে তাঁর মনোভঙ্গিটি ও পদ্ধতিটি আধুনিক বিজ্ঞানের বেশি কাছে ছিল। অল্প পর্যবেক্ষণে বেশি মতবাদ দেয়ার ব্যাপারে তিনি তাঁর সতর্কতা বজায় রেখেছিলেন। তিনি যে নিজেও প্রচুর ভুল করেননি তা নয়। তাঁর পর্যবেক্ষণের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। হয়তো সাধারণ একটি ম্যাগনিফাইং লেন্স হাতে থাকলেই তাঁর অনেক ভুল এড়ানো যেতো।

থিওফ্রেস্টাসের কালের বহু আগে থেকেই গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে অনুমান থেকে যুক্তি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্ব দেয়াটি অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছিল, গভীর পর্যবেক্ষণে সিদ্ধান্তে আসাটি এত গুরুত্ব পাচ্ছিলনা। এ অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল আরো হাজার বছর ধরে গ্রীসে ও অন্যত্র। তাতে সর্বত্র বিজ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞান আসতে দেরি হয়েছে। কিন্তু থিওফ্রেস্টাস অন্তত জীববিদ্যার ক্ষেত্রে এই বিষয়ে একজন বড় ব্যতিক্রম ছিলেন। তবে এও ঠিক যে তাঁর সমসাময়িক গ্রীক বিজ্ঞানীদের যুক্তি ও তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে তোলা নতুন পথ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত জরুরী উপাদান নিয়ে এসেছিলো যার অভাবেও আধুনিক বিজ্ঞান আসতে পারতোনা।

ভেবে জানাটিই যখন মুখ্য

আইডিয়া নিয়ে গণিত ও বিজ্ঞান

যা দেখছি সত্য নয়, আইডিয়াই সত্যঃ

খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ নাগাদ থেকে ৪০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় গ্রীকরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় উচ্চাঙ্গের সব সৃষ্টির কাজ করে গেছে। ওসময় গ্রীসে যাঁরা এসব করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দার্শনিক, যাঁদের দু'একজনের সাক্ষাৎ আমরা ইতোমধ্যে এই বইয়ে পেয়েছি। ওখানে বিজ্ঞান ও গণিতের চর্চাও করে গেছেন ওই দার্শনিকরাই। তাঁরা মূলত ভাবুক মানুষ, তাই বিজ্ঞানের কাজেও ভেবে জানাটিই তাঁদের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। দার্শনিক হিসেবে অনেক সময় তাঁরা বিজ্ঞান-বহির্ভূত বিষয়েও তাঁদের চিন্তাকে নিয়ে গেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ভাবনাগুলো প্রাকৃতিক জগতের অনুসন্ধানের বিষয়ে সেখানে তাঁরা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণের সীমারেখা টেনেছেন। তাঁদের হাতে এই পদ্ধতিগুলোর উন্নয়নের বিষয়টিও লক্ষ্য করার মত। এই সব কিছুতে গ্রীকদের চর্চার অবসানের পরও আরো অন্তত হাজার বছরের বিজ্ঞান-চিন্তায় তাঁরা অবিচ্ছেদ্য প্রভাব রেখে গেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু পর্যন্ত তারই ধারাবাহিক প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ন ছিল, এমনকি তার পরেও। কিন্তু শুরু থেকেই তাঁদের চিন্তায় যে প্রবণতাটি দেখা গেছে, তা হলো বাস্তব ধরাছোঁয়ার জিনিসের ওপর কম গুরুত্ব দিয়ে এ সবের যে আইডিয়া বা কল্পিত আদর্শ রূপ তার ওপর গুরুত্ব দেয়া।

এই আইডিয়ার ব্যাপারটির আদি সূত্র খুঁজতে গিয়ে আমরা খৃষ্টপূর্ব ৫৩০ অব্দ কালীন গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসের সন্ধান পাই। এই সেই পিথাগোরাস যাঁর নামের থিওরেম আমরা স্কুলের জ্যামিতিতে পড়েছি। দক্ষিণ ইতালীর গ্রীক অঞ্চলে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে পিথাগোরাস রীতিমত একটি গোষ্ঠি গড়ে তুলেছিলেন বিশেষ একটি মতবাদ প্রচারের জন্য। সেই মতবাদের মূল কথা হলো সংখ্যাই সব কিছুর মর্মকথা– বিশুদ্ধ সংখ্যা, বিশেষ কোন কিছুর সংখ্যা নয়। এই যে সংখ্যা এবং তা নিয়ে যে গণিত তা ধরাছোঁয়ার জিনিস নয়, বরং বিমূর্ত কিছু আইডিয়া। তিনি বলতেন বিশ্বের সব কিছু সংখ্যার সৃষ্টি; এমনকি ছন্দ, সুর তাও। তিনি দেখিয়েছেন সঙ্গীতের সারেগামা স্কেলে যে কোন দুটি খাদের

পারস্পরিক অনুপাত যদি ছোট পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হয় তা হলে সেই দুইয়ের মিলিত ধ্বনি সুরেলা হয়, অন্যথায় বেসুরো হয়। যেহেতু যে কোন জোড় সংখ্যাকে ক্রমাগত ২ দিয়ে ভাগ করে শেষ পর্যন্ত একটি বেজোড় সংখ্যা পাওয়া যায়, তাই তিনি বলতেন জোড় সংখ্যার এমন একটি ব্যাপ্তিগুণ আছে যা বেজোড় সংখ্যায় নেই। এ দিয়ে তিনি জগতে ব্যাপ্তি ও ব্যাপ্তিহীনতার বৈপরীত্বের সঙ্গে সংখ্যার সম্পর্ক দেখাতেন।

পিথাগোরাস ও তাঁর অনুসারীরা সংখ্যার মধ্যে, এবং সেই সুবাদে বিমূর্ত আইডিয়ার মধ্যে, বিশ্বের ছন্দকে দেখতে পেতেন। তবে একেও ব্যাপ্তি ও ব্যাপ্তিহীনতার মত নানা বৈপরীত্বের মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলতে গিয়ে জটিলতায় পড়তে হয়। সংখ্যার মধ্যে এমন জটিলতা তাঁরা আবিষ্কার করেছেন যেমন $\sqrt{২}$ অর্থাৎ দুইয়ের বর্গমূল নিলে তার মান ১.৪১৪২১৩৫.. এভাবে অসীম ভাবে চলতেই থাকে। তাঁরা দেখালেন এটি অমূলদ সংখ্যা, কারণ একে সাধারণ কোন দুটি সংখ্যার অনুপাতে ধারণ করা যায়না। অথচ এর একটি বাস্তব অস্থিত্ব আছে। পিথাগোরাসের থিওরেমে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন দুটি বাহুই যদি ১ একক লম্বা হয় তা হলে তার অতিভুজটি হবে $\sqrt{২}$ একক লম্বা। অর্থাৎ অতিভুজের দৈর্ঘের মত একটি বাস্তব পরিমাপযোগ্য জিনিস এই অমূলদ সংখ্যা, অথচ সংখ্যা হিসেবে তার আচরণ রহস্যজনক। এরকম অনেক অমূলদ (ইররেশনাল বা অযৌক্তিক) সংখ্যার সন্ধান তাঁরা দিয়েছেন। পিথাগোরাসের কাছে এটি আইডিয়ার জগতের জটিলতাগুলোরই প্রতিচ্ছবি।

বাস্তব জগত নয়, আইডিয়ার জগতটাই যে আসল জগত এমন দর্শনকে খুব ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আরো কিছু পরের (খৃষ্টপূর্ব ৪৩০ অব্দ নাগাদ) বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। সমকালীন অন্য অনেক দার্শনিকের মত তাঁর সামনেও প্রশ্ন ছিলো কেমন করে জানা সম্ভব হয়। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্লেটো দুনিয়ার সব জিনিসকে দুভাবে ভাগ করেছিলেন– যা দেখা যায়, আর যা বোঝা যায়। তিনি এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে দেখা যাওয়া জিনিস কোন জ্ঞান দেয় না; দেখে কোন জিনিস জানা সম্ভব নয় কারণ আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভুল তথ্য দেয়। শুধু যা নিজ থেকে বোঝা যায় সেগুলোই জ্ঞান দেয়, সেগুলোকেই তিনি বিমূর্ত আইডিয়া বল্‌ছেন। আসলে প্লেটো এবং তাঁর অনুসারী ও আলোচকরা এদেরকে ‘ফর্‌ম’ বা গুণ বলতেই বেশি পছন্দ করতেন। এই ফর্‌ম হলো জগতের সব কিছুর বিমূর্ত সারাৎসার– ধরাছোঁয়ার জিনিস হিসেবে নয়, আইডিয়া বা আদর্শ হিসেবে এরা আছে। আমরা যুক্তির মাধ্যমে এক বক্তব্য থেকে আর

এক বক্তব্য যেভাবে নির্ণয় করতে পারি সেই 'যৌক্তিক নির্ণয়ের' মধ্যে অদ্ভুত একটি অমোঘ নিশ্চয়তা আছে, যা দেখার মধ্যে নেই। দেখে জানায় ভুল হতেই পারে, কিন্তু যুক্তিতে যা পাই তা হ্যাঁ বা না এর মত একেবারেই নিশ্চিত। জ্যামিতির উপপাদ্য প্রমাণের মধ্যেও আমরা এরকম যৌক্তিক নির্ণয় দেখি। ফর্মের জ্ঞানের নিশ্চয়তাটাও অনেকটা সে রকম। কাজেই প্লেটোর কাছে জানার পদ্ধতি হিসেবে এই যৌক্তিক নির্ণয় ও গণিতই একমাত্র গ্রহণযোগ্য– দেখা বা ধরাছোঁয়ার ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়। এভাবে প্লেটো গ্রীক দর্শনে ভেবে জানাকে, দেখে জানার ওপরে স্থান দিয়ে, বস্তুর ফর্মকে ধরাছোঁয়ার বস্তুর ওপরে স্থান দিয়ে যা প্রবর্তন করলেন তাকে আইডিয়ালিস্ট দর্শন বলা হয়। প্লেটো সব বিষয়ের ওপরেই এটি প্রয়োগ করেছেন– যেমন তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। শরীর-সম্পর্ক বিহীন 'প্লেটোনিক ভালবাসা' ধারণাটির উৎপত্তিও এভাবেই।

কিন্তু বিজ্ঞানতো প্রকৃতির বাস্তব জিনিসগুলোকেই জানতে চায়– কাজেই কোন কোন বিজ্ঞানধর্মী দার্শনিক তখনই এ নিয়ে আপত্তি তুলেছেন, যাঁদের মধ্যে প্লেটোর বিখ্যাত ছাত্র এরিস্টোট্‌ল অন্যতম। পরবর্তী কালে বিজ্ঞান খুব স্পষ্ট ভাবেই হাতেকলমে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে সব জ্ঞানকে যাচাই করে নেবার ওপর আরো অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে– বিশেষ করে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখার ওপর। সে সব বিবেচনা করলে প্লেটো এবং তাঁর অনুসারীদের আইডিয়ালিস্ট মতবাদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশি প্রাসঙ্গিক হবার কথা নয়। কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে এটি আগাগোড়াই প্রাসঙ্গিক ছিল এবং আছে। গণিত যে উপাদানগুলো নিয়ে কাজ করে সেই সংখ্যা, রেখা, রাশি ইত্যাদির কোন বাস্তব অস্থিত্ব নেই, ওগুলো আইডিয়া জগতের জিনিস, এমনটিই অধিকাংশ গণিতবিদ মনে করেন; যদিও অনেকে ওগুলো পরোক্ষ ভাবে বাস্তব ভিত্তিকও মনে করেন।

গণিতের সঙ্গে যেহেতু বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সেই সূত্রে ওই গ্রীক দার্শনিকরা আইডিয়া আর যুক্তিকে বিজ্ঞানেরও মূল উপজীব্য করতে চেয়েছেন। এমনকি এরিস্টোট্‌ল প্রমুখ যাঁরা বাস্তবে যাচাই করাটাকে জরুরী বল্‌ছিলেন তাঁরাও কার্যত যুক্তি প্রয়োগের ওপরেই জোর দিচ্ছিলেন। হাজার বছর পর সেই পরিস্থিতিটি ধীরে ধীরে কমে গিয়েছিলো বটে কিন্তু আইডিয়ালিস্ট দর্শনের প্রভাব বিজ্ঞানে বরাবর কিছু থেকেই গেছে। একেবারে সাম্প্রতিক পদার্থবিদ্যার কিছু কিছু দিককেও এভাবে দেখা যেতে পারে। তত্ত্ব এখানে বিমূর্ত ধারণা আর সমীকরণ-সর্বস্ব হয়ে ওঠেছে মনে হতে পারে– তার কারবার যতটা না বাস্তব

জগতের সঙ্গে তার চেয়ে বেশি গাণিতিক আইডিয়া জগতের সঙ্গে। তবে এটি ঠিক যে প্লেটোর ধ্যানধারণা অতীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য সব সময় সুখকর হয়নি, আজকের বিজ্ঞান কেমন করে এলো তা বুঝতে বিজ্ঞানের ওপর এর প্রভাবকে না চিনে উপায় নেই।

প্লেটোর বক্তব্যগুলো আরো একটু কাছে গিয়ে দেখা যাক। ফর্ম বলতে তিনি কী বোঝাতেন? যে সব জিনিস আমরা বস্তু বা ব্যক্তির সম্পর্কে প্রযোজ্য কোন গুণাগুণ হিসেবে জানি– সেই অস্তিত্ব, একতা, বড়ত্ব, ভালত্ব, সমতা, পার্থক্য, পরিবর্তন ইত্যাদি– সেসবই তাঁর কাছে ফর্ম। কিন্তু তাঁর চিন্তার বৈশিষ্টটা হলো এই ফর্মের সঙ্গে এগুলোকে যাদের গুণ মনে করছি সেই ধরাছোঁয়া জিনিসের বিস্তর ফারাক। তাঁর কাছে এই ফর্মই সত্য, ওই ধরাছোঁয়ার জিনিস সত্য নয়। ওই ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে দেখা জিনিস এই ফর্মের অলীক ছায়া মাত্র, জ্ঞানের ক্ষেত্রে যা একেবারে গুরুত্বহীন। আইডিয়ালিস্ট মতে বিশ্বাসীরা মনে করেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই বাস্তব জিনিসগুলোকে দেখে-ধরে-ছুঁয়ে অভিজ্ঞতায় আনার চেষ্টাটাই বরং জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করার মত। তা হলে দার্শনিক-বিজ্ঞানী তাঁর জ্ঞান যে শুদ্ধ তা কেমন ভাবে বুঝবেন? এর আইডিয়ালিস্ট উত্তর হলো তিনি তাঁর আত্মা দিয়ে সহজাতভাবেই ফর্মের স্বরূপটি বুঝতে পারবেন– যুক্তি সেখানে তাঁর সহায়। এ যেন মনশ্চক্ষে ধরতে পারার প্রকৃত জ্ঞান। দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই সেটি তিনি খুঁজে পাবেন।

যাঁরা দার্শনিক নন্, সাধারণ মানুষ, জগত সম্পর্কে তাঁদের ধারণা বোঝাবার জন্য প্লেটোর একটি রূপক গল্প খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। ওই সাধারণ মানুষদেরকে তিনি তুলনা করেছেন হাত-পা বাঁধা বন্দীর সঙ্গে, যারা তাদের বন্দী-দশার কারণে চিরকাল শুধু গুহার দেয়ালের দিকে মুখ করে থাকতে বাধ্য– ডানে-বামে-পেছনে তাকানোর সুযোগ তাদের নেই। তাদের পেছনে পুতুল- নাচিয়ে তার পুতুলনাচ দেখাচ্ছে এবং তারো পেছনে একটি আগুন জ্বলছে। এই আসল পুতুল-নাচিয়ে বা পুতুলকে দেখার সুযোগ বন্দীদের নেই, তারা শুধু ওসবের ছায়া গুহার দেয়ালে দেখছে। এই ছায়াকেই তারা আসল জিনিস মনে করে, এবং নিজেদের মধ্যে এমন ভাবে কথা বলে যেন আসল পুতুলনাচের কথাই বলছে। যদি বন্দীদের বাঁধন খুলে দেয়া হয়, তবেই তারা আসল জিনিস দেখতে পাবে। প্লেটোর রূপকে সেটিই হবে নিজেদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে দার্শনিকে উন্নীত হওয়া, এবং মনশ্চক্ষে আসল ফর্মগুলোকে জানতে পারা।

আদি এটমিক থিওরিঃ

এটমিক থিওরি আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অংশ, কিন্তু এটমের ধারণাটি অনেক প্রাচীন। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লিউসিপাস ও ডেমোক্রিটাস এই দু'জন গ্রীক দার্শনিক সর্বপ্রথম এটমের ধারণা নিয়ে একটি তত্ত্ব দেন। অনেকে অবশ্য মনে করেন ডেমোক্রিটাস একাই কাজটি করেছিলেন। এই থিওরির প্রসঙ্গটি এখানে আনছি তার কারণ এর প্রবক্তরা মনে করতেন যে এটি সম্পূর্ণ মনশ্চক্ষের আইডিয়া থেকে যুক্তি দিয়েই তাঁরা দিয়েছেন, এর সঙ্গে বাহ্যিক অভিজ্ঞতার বা দেখে জানার কোন সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে আধুনিক যে এটমিক থিওরি তাতে এটমকে সরাসরি না দেখতে পেলেও অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্টের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই তা অনুমান করা হয়েছে এবং সে অনুমানকে আরো এক্সপেরিমেন্টে বাস্তবে যাচাই করা হয়েছে। তাই ডেমোক্রিটাসের এটমিক থিওরির সঙ্গে আজকের এটমিক থিওরির বিস্তর পার্থক্য। আমরা গ্রীক যুগের 'ভেবে জানার' প্রবণতার একটি উদাহরণ হিসেবে একে নিতে পারি। যাঁরা সে সময় ওই এটমিক থিওরির বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরাও মোটের ওপর এই 'ভেবে জানার' ওপরেই নির্ভর করেছেন। ডেমোক্রিটাস নিজে ওই আইডিয়ালিস্ট মতবাদে এতটাই দীক্ষিত ছিলেন যে তিনি একবার নিজের চোখদুটিকে নিজেই অন্ধ করে দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কথা হলো অন্ধ হলে চোখে দেখা জিনিসের বিভ্রান্তিগুলো তাঁর প্রকৃত জানাকে আর ব্যাহত করতে পারবেনা!

ডেমোক্রিটাসের এটমিক থিওরির মূল কথা হলো কোন জিনিসকে যদি আমরা ক্রমাগত বিভক্ত করতে থাকি শেষ পর্যন্ত সেটি এমন সব ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হবে যাকে আর বিভক্ত করা সম্ভব নয়। ওই ক্ষুদ্র অংশগুলোকে তাই তিনি নাম দিলেন এটম, গ্রীক ভাষায় যে শব্দটির অর্থ হলো যাকে কাটা যায়না। সব জিনিসই এরকম এটমের সমাহারে গঠিত। এটম শুধু অবিভাজ্য নয়, একে ধ্বংসও করা যায়না। প্রকৃত অস্থিত্বের প্রশ্ন উঠলে শুধু এই এটমেরই অস্থিত্ব আছে। এরা একের সঙ্গে এক জড়ো হয়ে যা গড়ে তা মানব দেহই হোক কিংবা গাছ, পাথর, মেঘই হোক– সেগুলোর কিন্তু আলাদা করে কোন বাস্তব অস্থিত্ব নেই, সেগুলো এটমে গড়া নানা ফর্‌ম। এসব তৈরিতে এটম যখন জড়ো হয় তখন বিভিন্ন এটমের মাঝখানে থাকে শূন্যস্থান (ভ্যাকুয়াম বা ভয়েড); শূন্যস্থানের মধ্যেই এটমের সমাবেশ ঘটে। শূন্যস্থানে থাকা এটমগুলোর এরকম বিভিন্ন জিনিসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যে বিন্যাস সেগুলোই আসলে ফর্‌ম। শূন্যস্থান নিজে কিন্তু অসীম ও সর্ব-ব্যাপ্ত। এটমের নিজের অবশ্য আকৃতি ও আয়তন আছে, যা নানা এটমের

ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে। আগেই বলেছি ডেমোক্রিটাস একরকম সহজাত জ্ঞান হিসেবে এটমিক থিওরির এই ব্যাপারগুলো খাড়া করেছেন, এর স্বপক্ষে যুক্তি দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু হাতেকলমে কোন প্রমাণ দেবার চেষ্টা করেননি। অন্য অনেক দার্শনিক এ যুক্তি মেনে নিয়ে এটমিক থিওরিতে আস্থা রেখেছেন, কিন্তু অনেকে আবার রাখেননি। তাঁরা যুক্তি দিয়েই ডেমোক্রিটাসের যুক্তিকে খন্ডন করে এটমিক থিওরিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁরাও বিরোধিতাটি হাতেকলমে প্রমাণের চেষ্টা করেননি– বিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্যে যে তখন যৌক্তিক নির্ণয়টিই মুখ্য ছিল।

যাঁরা ডেমোক্রিটাসের এটমিক থিওরির বিরোধিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর চেয়েও কড়া আইডিয়া-পন্থী ছিলেন– যেমন স্বয়ং প্লেটো। ডেমোক্রিটাস অন্তত এটমের বাস্তব অস্থিত্ব স্বীকার করেছিলেন, এটমে গড়া জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে তা না করলেও। প্লেটো কিন্তু এরকম এটমই সব কিছুর মৌল এমন কথা মানতে রাজী নন্ কারণ তাঁর মতে মৌল হবার দাবীদার হলো বিমূর্ত ফর্ম- কোন বাস্তব কিছু নয়। আর সব চেয়ে বিমূর্ত ফর্ম দিতে পারে জ্যামিতি। অন্য অনেক দার্শনিকের মত প্লেটো মনে করতেন সব কিছু চারটি মৌলিক জিনিসে গড়া– মাটি, পানি, বাতাস আর আগুন। তাঁর মতে এগুলোর প্রত্যেকটি আসলে এক একটি জ্যামিতিক ঘন-আকৃতি (সলিড ফিগার), এক একটি ফর্ম। ব্যাবিলনের আমল থেকেই গণিতবিদরা নানা রকম ঘন-আকৃতির সঙ্গে শুধু পরিচিতই ছিলেন না সেগুলোর আয়তন ইত্যাদি বের করার পদ্ধতিও এক এক ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন।

প্লেটো এক একটি মৌলকে এক একটি সুসম জ্যামিতিক ঘন-আকৃতি হবার যুক্তি দিলেন। যেমন তাঁর মতে মাটি আসলে বাস্তব কিছু নয় এর সব অনন্যতা আসে এর ফর্ম থেকে যা কিনা একটি কিউবের বিমূর্ত জ্যামিতিক আকৃতি। সেরকম পানির জন্য অন্য একটি, এবং বাতাস ও আগুনের জন্যও। এই বিমূর্ত চার রকমের ফর্ম কাজ করছে চারটি মৌল রূপে এবং তার থেকেই পুরো পার্থিব জগত। ওখানে এটমের মত বাস্তব জিনিসের জায়গা কোথায়? এটমিক থিওরির অন্য বিরোধীরা অবশ্য এত সোজাসাপ্টা ভাবে এটি উড়িয়ে দিলেন না, আরো বিস্তারিত যুক্তি দিলেন সে কথায় একটু পরে আসছি।

ডেমোক্রিটাস এটমিক থিওরিটি দিয়েছিলেন আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ গ্রীক দার্শনিক পার্মেনাইডের তত্ত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে– এমনটিই অনেকে মনে করেন। পার্মেনাইডের তত্ত্বটি ছিল কোন কিছুই পরিবর্তিত হতে পারেনা। এ তত্ত্বের

পেছনে পার্মেনাইডের যুক্তি ছিল পরিবর্তনকে যদি মেনে নিই তা হলে 'যা নেই' তাকে বলতে হয় 'আছে', অথবা বলতে হয় 'হবে'। এর অর্থ হলো শূন্য থেকে কোন কিছুর সৃষ্টি– যেটি একটি উদ্ভট ব্যাপার। কাজেই মূল কথাটিই ভুল– আসলে কোন কিছুর কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। ডেমোক্রিটাস এমন তত্ত্ব মানতে রাজি ছিলেন না। এর বিপরীত চিন্তা করতে গিয়েই অবিভাজ্য ও অবিনাশী এটমের ধারণাটি তাঁর কাছে এসেছে। তিনি দেখালেন যে পরিবর্তন শূন্য থেকে হতে হবে এমন কোন কথা নেই। সবকিছুর অবিভাজ্য ও অবিনাশী এটম সব সময় মজুদ রয়েছে– সেগুলোর বিন্যাস বদলে নিয়ে পরিবর্তন সব সময় হতে পারে; আর ডেমোক্রিটাসের এটমিক থিওরি অনুযায়ী তা এভাবেই হয়ে থাকে। কোন পরিবর্তন হতে পারেনা এমন অবান্তর যুক্তির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি উপস্থাপিত করা যেমন এই থিওরির একটি কৃতিত্ব, তেমনি বস্তুজগতের একটি শক্ত ভিত্তিও অনেকে এর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু এর সমালোচকরাও ছিলেন খুবই কৃতী দার্শনিক।

তঁদের মধ্যে এই এটমিক থিওরির সব চেয়ে কড়া সমালোচক এরিস্টোট্‌লের মতে কোন জিনিস অসীম ভাবে বিভক্ত না হতে পারার কোন কারণ নেই– একটি পর্যায়ে এটমে এসে বিভাজনটি হঠাৎ থেমে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠেনা। তাছাড়া এরিস্টোট্‌ল যুক্তি দিয়েছেন যে প্রকৃতি শূন্যস্থানকে এড়িয়ে চলে, যেখানেই শূন্যস্থান হবার উপক্রম হবে, বস্তু এসে সেখানটিই দখল হয়ে যাবে। কাজেই এটমিক থিওরির এটম ও শূন্যস্থান উভয়কেই তিনি নাকচ করে দিয়েছেন। এরিস্টোট্‌লের আর একটি সমালোচনা ছিল ডেমোক্রিটাস এটমের বিন্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে এটমের গতির অবতারণা করেছেন। কিন্তু এই গতি কীভাবে সৃষ্টি হয় তার কোন ব্যাখ্যা তিনি দেননি। এক্ষেত্রে এটমিক থিওরির পরবর্তী আরেকজন প্রবক্তা গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাসের জবাব হলো সব এটমের সঙ্গে এর অন্তর্নিহিত একটি আদি গতি রয়েছে। কাজেই শূন্যস্থানের মধ্যে এটম সব সময় নিজস্ব গতিতে গতিশীল, এই গতিতে থেকেই এরা পরস্পর ঠোকাঠুকি করতে করতে নিজেদের নানা বিন্যাস সৃষ্টি করতে থাকে।

বিরোধীদের আর একটি সমালোচনাও ছিল বেশ জুতসই। ডেমোক্রিটাসের মতে বিভিন্ন এটমের বিভিন্ন আকার ও আকৃতি আছে। সমালোচকরা বল্‌লেন তাই যদি থাকে তাহলে এটমের বিভিন্ন তলও আছে। একে অন্যের সঙ্গে সংলগ্ন হবার সময় এই তলগুলোর একটিতেই এই সংলগ্নতা ঘটে, অন্যগুলোতে ঘটেনা। এর মানে এটমের এভাবে সংলগ্ন ও অসংলগ্ন একাধিক অংশ আছে– এ সব বিভিন্ন

অংশে তাহলে এটি বিভক্ত হতে পারবেনা কেন? এপিকিউরাস এরও একটি জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন বিভিন্ন অংশ আছে এই যুক্তিতে এটমকে যে ভাগ করা যায়, এমন একটি ধারণা করাই যায়। এদিক থেকে এটম ধারণাগত ভাবে বিভাজ্য। কিন্তু একটি ন্যূনতম রূপ লাভ করার পর বাস্তব এটম আর বিভাজ্য থাকেনা। এভাবে ধারণাগত ও বাস্তব বিভাজনের মধ্যে পার্থক্যের রেখা টেনে এপিকিউরাস এটমকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা দেখবো হাজার বছর পরেও এসব যুক্তিসঙ্গত কিনা তা নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত ছিলো– এবং তা গ্রীসে নয়।

গতি বাস্তবে সম্ভব, কিন্তু কূটাভাসে অসম্ভব কেনঃ

খৃষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের দিকে একজন গ্রীক দার্শনিক জেনো কতগুলো অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করে বিজ্ঞান ও গণিতে একটি ঝড় তুলেছিলেন। প্রথম দর্শনে মনে হবে জেনো এগুলো এক রকম মজা করে খেলাচ্ছলে তুলেছেন, অথবা অনেকে হয়তো মনে করবেন তিনি স্পষ্ট জানা বিষয়ের বিরোধিতা করে অনর্থক কুতর্ক তুলছেন। কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই সে রকম ছিলনা। তিনি যুক্তির মাধ্যমে দেখাচ্ছিলেন যে কোন কিছুর গতি সম্ভব নয়– এমন সব গতি যেগুলো আমরা সব সময় ঘটতে দেখছি। বাস্তবে দেখছি, অথচ যুক্তি বলছে তা সম্ভব নয় এমন পরিস্থিতি সবাইকে ভাবিয়ে তোলে বৈকি। এরকম পরিস্থিতিকে বলা হয় প্যারাডক্স বা কূটাভাস। জেনোর প্যারাডক্সগুলোর সুরাহা করতে হলে হয় দেখাতে হবে যে তাঁর যুক্তিতে ভুল আছে, অথবা স্বীকার করতে হবে যা ঘট্‌ছে বলে দেখছি তা সত্যি নয়। এই সুরাহা না করা পর্যন্ত দার্শনিকরা ও বিজ্ঞানীরা শান্তি পাচ্ছিলেননা। নানা পণ্ডিত নানা ভাবে চেষ্টা করেছেন সুরাহা করতে, সন্তোষজনক সুরাহা তখন হয়নি, এর পরেও অনেক দিন হয়নি, হয়েছে আধুনিক গণিতের কল্যাণে উনবিংশ শতাব্দীতে এসে– জেনোর প্রায় আড়াই হাজার বছর পর। জেনোর প্যারাডক্সকে এখানে একটু বিস্তারিত আনার কারণ হলো দেখাতে চাই যে শুধু যুক্তিই বিজ্ঞানের বিষয় নিরসণে যথেষ্ট নয়।

গতি নিয়ে এই কূটাভাস তোলার পেছনে জেনোর একটি উদ্দেশ্য ছিল। ওই সময়েই দার্শনিক পারমেনাইড বলছিলেন কোন কিছুর পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাঁর কথাকে অনেকে উদ্ভট বলে বিদ্রূপ করছিলেন। জেনো কিন্তু পারমেনাইডের ভক্ত ছিলেন, এবং পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিগুলোকে গুরুত্ব দিতেন। তাই তিনি দেখাতে চাচ্ছিলেন যে ধরনের যুক্তি দেখিয়ে পারমেনাইডের মতবাদকে উদ্ভট

বলা হচ্ছে সেই একই ধরনের যুক্তিতে পারমেনাইড-বিরোধীদের যুক্তিকেও উদ্ভট প্রতিপন্ন করা যায়। তিনি বল্‌লেন তুমি দেখিয়েছ পারমেনাইড যা ধরে নিয়ে তাঁর যুক্তিকে এগোতে দিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত ওটি ধরে নেয়া যায়না বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। আমি দেখাবো তুমি যেই গতিকে ধরে নিয়ে যুক্তি দিচ্ছ সেটিই বলে দিচ্ছে যে অসীম সময়ের প্রয়োজন হবে বলে সেই গতিই সম্ভব নয়। কাজেই ওরকম উদ্ভটতার যুক্তি দেখাতে যেওনা। উদ্দেশ্য যাই থাক্, তাঁর প্যারাডক্স যে হাজার বছর ধরে ভাবাবে, এটি হয়তো জেনো নিজেই বুঝতে পারেননি।

গল্পের আকারে তিনটি পৃথক পরিস্থিতি বর্ণনা করে জেনো তাঁর যুক্তিগুলো উপস্থাপন করেছিলেন। প্রথমটিকে বলা হয় 'ডাইকোটমি', আমরা বলতে পারি 'আধাপথ'। এতে গল্পটি হলো গ্রীক উপকথার মহাদৌড়বিদ নারী আটলান্টা দৌড়ে তাঁর লক্ষ্যস্থলের দিকে যাচ্ছেন। কিন্তু জেনো আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার আগে তাঁকে এর পুরা দূরত্বের আধাআধি জায়গার স্থানটিকে অতিক্রম করতে হবে। সেই আধাপথের স্থানটিতে পৌঁছাবার আগে তারও যে অর্ধেক পথ সেই জায়গায় গিয়ে পৌছতে হবে– অর্থাৎ মূল দূরত্বের $\frac{১}{৪}$ ভাগ পার হওয়ার স্থানে; তারপর তারও আধাপথে অর্থাৎ মূল দূরত্বের $\frac{১}{৮}$ ভাগ স্থানে। এমনি করে করে প্রত্যেক পর্যায়ে অর্ধেক অর্ধেক করে ওভাবে অসীম সংখ্যক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হবে– যত ছোট অর্ধেকেই আসুন না কেন তারও যে আবার অর্ধেক আছে। এভাবে তাঁকে শুরু থেকেই অসীম সংখ্যক ক্ষুদ্র অথচ সসীম স্থান অতিক্রম করতে হবে। এরকম অসীম সংখ্যক স্থান অতিক্রম করতে অসীম সময়ের প্রয়োজন হবে, সসীম সময়ে তা করা সম্ভব নয়। এর মানে কোন দূরত্বই কেউ সসীম সময়ে অতিক্রম করতে পারবেনা– অতএব গতি সম্ভব নয়।

যুক্তিটিকে অকাট্যই মনে হয়, অথচ গতি অসম্ভব একথা কী করে বলা যায়? যে কেউ যে দৌড় দিয়ে সম্ভাব্য লক্ষ্য স্থলে পৌঁছতে পারে এতো সবার দেখা ব্যাপার। তাই সমসাময়িক অনেক দার্শনিক এ যুক্তিতে ফাঁকফোকর বের করার চেষ্টায় লেগে গিয়েছিলেন। যেমন এ নিয়ে এরিস্টোট্‌ল বল্‌লেন 'অসীম' কথাটি আসলে দুরকম হতে পারে। এক রকম হলো 'ধারণাগত অসীম' বা 'সম্ভাব্য অসীম'– এতে আমরা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশগুলোকে যতই অসীমের দিকে নেবো এতই তা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে নিরবিচ্ছিন্নতায় রূপ নেবে– সেক্ষেত্রে গতির কোন সমস্যা হয়না। আর এক রকম অসীম হলো 'সত্যিকার অসীম'–

এতে দুটি ক্ষুদ্র অংশ যতই ক্ষুদ্র হোকনা কেন তাদের মধ্যে একটুখানি হলেও ফাঁকা জায়গা থাকবে। তা যদি হতো তা হলে জেনোর যুক্তি ঠিক হতো। কিন্তু এরিস্টোট্‌ল অসীমকে ধারণাগত ব্যাপার মনে করেন। এরিস্টোট্‌লের চিন্তায় জগত হলো নিরবিচ্ছিন্ন জগত, যে কারণে তিনি এটমকে বিশ্বাস করতেন না ওরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলে। অবশ্য অসীম নিয়ে এরকম দু'রকমের কথা আধুনিক গণিত অন্তত মানেনা।

আমরা দেখেছি অনেকে মনে করেন ডেমোক্রিটাসের এটমিক থিওরি এসেছিলো জেনোর প্যারাডক্সের একটি সুরাহা হিসেবে। এটমিক থিওরি বলছে জেনোর সেই 'অসীম' সংখ্যক ক্ষুদ্র স্থান আসলে নেই। আসলে যা আছে তা হলো 'সসীম' সংখ্যক এটমের স্থান– এটম যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন তার সংখ্যা কিন্তু সসীম। কাজেই গতি মানে সসীম সময়ে সসীম সংখ্যক স্থান অতিক্রম করা, জেনোর ধারণা মত অসীম সংখ্যক স্থান নয়। অতএব গতিকে যুক্তিসঙ্গত করতে গেলে এটমিক থিওরি দরকার। আসলে এসব কোন সুরাহাই খুব সন্তোষজনক ছিলনা। জেনোর প্যারাডক্সের সত্যিকার সুরাহা করেছেন আধুনিক গণিতবিদ ক্যান্টর। তিনি গাণিতিক ভাবে প্রমাণ কচ্ছেন অসীম সংখ্যক ক্রমাগত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের যোগফল দিব্যি সসীম সংখ্যা হতে পারে। কাজেই দৌড়ে সসীম সেই যোগফল (স্থান) অতিক্রম করার মধ্যে কোন প্যারাডক্স নেই।

জেনোর দ্বিতীয় প্যারাডক্সের নাম 'অ্যাকিলী'। অ্যাকিলী হলেন গ্রীক মহাকাব্যের বিখ্যাত বীর। জেনোর গল্পে তিনি একটি কচ্ছপকে দৌড়ে ধরার চেষ্টা করছেন। অবশ্যই অ্যাকিলী অনায়াসে কচ্ছপ যেখানে ছিল সেখানে পৌঁছে যান। কিন্তু হায় এখন তো কচ্ছপ আর সেখানে নেই, অতি ধীর কচ্ছপ-গতিতে হলেও সে ওখান থেকে সামান্য এগিয়ে গেছে। তাই আকিলীকে এই বাড়তি সামান্য দূরত্বটুকুও অতিক্রম করতে হবে। তিনি তা করবেন, কিন্তু এতক্ষণে যে কচ্ছপ আরো খানিকটা এগিয়ে গেছে, হোক্‌না যতই সামান্য। এভাবে আকিলী সর্বশেষ অতি সামান্য দূরত্ব যখন অতিক্রম করবেন, কচ্ছপ ইতোমধ্যে অতি অতি সামান্য হলেও আরো কিছুটা এগিয়েছে। এভাবে অসীম ভাবে চলতে থাকবে, অসীম সংখ্যক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ধাপে অ্যাকিলীকে এগোতে হবে কচ্ছপকে ধরতে; তার মানে আকিলী কখনোই কচ্ছপকে ধরতে পারবেনা। সমস্যাটি আসলে একই রকমের– সসীম সময়ে অসীম সংখ্যক স্থান অতিক্রমের অসম্ভাব্যতা। সুরাহাটিও তাই একই ভাবে জটিল।

জেনোর তৃতীয় প্যারাডক্সের নাম 'তীর'। এতে একটি তীর ছোঁড়া হয়েছে এবং তা গতি পাওয়ার চেষ্টা করছে। স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে প্রথম যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মুহূর্তটির মধ্য দিয়ে তীরকে চলতে হবে সে মুহূর্তে কী হচ্ছে জেনো বোঝার চেষ্টা করলেন। তর্কের খাতিরে তিনি ধরে নিলেন যে তীরটি ওই ক্ষুদ্রতম মুহূর্তটির মধ্যে একটু সামান্য স্থান এগিয়ে গেছে। তা হলে ওই মুহূর্তের মধ্যেই থাকবে ওই স্থানের শুরুতে থাকার সময়টি এবং এরপর ওই স্থানের শেষ প্রান্তে থাকার সময়টি। এর মানে ওই ক্ষুদ্রতম মুহূর্তেরও অন্তত দুটি অংশ আছে বলে আমরা বুঝতে পারছি– কাজেই ওকে অন্তত দুই ভাগ করা সম্ভব– অর্থাৎ ওটি ক্ষুদ্রতম মুহূর্ত ছিলনা, এরও চেয়েও ছোট ক্ষুদ্র মুহূর্তের মধ্য দিয়ে তীরকে আগে যেতে হবে। কিন্তু তীরকে যদি চলতে হয় তা হলে এই নতুন ক্ষুদ্রতর মুহূর্তের ক্ষেত্রেও একই হবে, তার মধ্যে আরো ক্ষুদ্র মুহূর্ত থাকবে। আমরা এভাবে মুহূর্তকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এমন ক্ষুদ্র মুহূর্ত পেয়ে যাব যার মধ্যে তীরের চলার উপায় আর থাকেনা। এর পরের মুহূর্তগুলোর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একই দাঁড়াবে বলে তীর সেখানেও চলতে পারবেনা। কাজেই প্রথম মুহূর্তে এবং এর পরের কোন মুহূর্তে নড়তে না পেরে তীর কখনোই চলবেনা– তীরের গতি সম্ভব নয়।

তীরকে এভাবে নিশ্চলতার হাত থেকে রক্ষার জন্য যে সব সমাধান দেয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো তীর অসীমভাবে ক্ষুদ্র মুহূর্তের 'ভেতরে' চলমান হয়না, বরং তার গতি চলমান থাকে ওরকম দুটি মুহূর্তের মধ্যবর্তী সসীম ফাঁকা সময়ে। তীরকে যুক্তিতে সচল করতে এই সমাধান বা অন্য কোন সমাধান খুব সন্তোষজনক ছিলনা। আধুনিক গণিত ক্যান্টরের সেই প্রমাণ দিয়ে জেনোর সব ক'টি প্যারাডক্সের সুরাহা করেছে একথা সত্যি, কিন্তু সেটি কার্যকর হয় যদি গণিতের উপাদানগুলো অর্থাৎ সংখ্যা, রেখা ইত্যাদি এবং বাস্তব জগতের উপাদানগুলো অর্থাৎ স্থান, কাল ইত্যাদি একই জাতের জিনিস হয়। তা হলে গণিতের মাধ্যমে ওই নিরসণ বিজ্ঞানের জেনোর প্যারাডক্স নিরসণে কাজে আসে। কিন্তু গণিতের সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্ককে নানা ভাবে দেখার সুযোগ আছে, যা আমরা এই বইয়ের পরের খণ্ডে কিছুটা দেখবো। সেক্ষেত্রে জেনোর প্যারাডক্স এখনো কিছু কিছু অর্থে প্যারাডক্সই থেকে যাচ্ছে।

জ্যামিতির বিজ্ঞান

আমাদের সেই স্কুলের জ্যামিতিঃ

আমরা দুনিয়ার নানা দেশের অসংখ্য মানুষ হয়তো স্কুলের ষষ্ট-সপ্তম শ্রেণীতে প্রথম জ্যামিতির উপপাদ্য প্রমাণ করার কথা মনে করতে পারবো। মজার কথা হলো এটিই বোধ হয় গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শ্রেষ্ঠ অবদানের সঙ্গে আমাদের সবার একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়। স্কুলের বইয়ে ওই উপপাদ্যগুলো এবং তার প্রমাণগুলো প্রায় হুবহু এসেছে গ্রীক গণিতবিদ ইউক্লিডের বহু খণ্ডে রচিত বিখ্যাত গণিতের বই *ইলিমেন্ট* থেকে। খৃষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দের দিকে ইউক্লিড এই গ্রন্থটা রচনা করেছিলেন, কিন্তু এতে তারো বহু আগের নানা গ্রীক গণিতবিদের কাজগুলোও স্থান পেয়েছে তাঁর অনবদ্য সম্পাদনায়। একটি ধারাবাহিক ভঙ্গিতে তিনি একটির পর একটি উপপাদ্যগুলো শুধু যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করে গেছেন। এতে পরেরগুলো প্রমাণে প্রয়োজনে আগের কোন কোনটির প্রমাণিত সিদ্ধান্তকে তিনি ব্যবহার করেছেন। প্রমাণের যুক্তিগুলোও নানা রকম, কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষুরধার যুক্তি। যেমন তাঁর ব্যবহৃত এক ধরনের যুক্তিকে বলা হয়েছে 'রিডাকশিয়ো এ্যাড অ্যাবসার্ডুম' যার মানে হলো 'বিপরীতটাকে উদ্ভট প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে'। এতে তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে যা প্রমাণ করতে চাচ্ছি তা সত্য নয়। তখন যুক্তিধারায় দেখানো যায় যে এর থেকে উদ্ভট এক সিদ্ধান্তের জন্ম হচ্ছে, যা যৌক্তিক ভাবে সম্ভব নয়। কাজেই তর্কের খাতিরে যে ধরে নিয়েছিলাম উপপাদ্য বিষয়টি ঠিক নয়, ওই ধরে নেয়াটি ভুল ছিল। অর্থাৎ উপপাদ্যটি ঠিক, সেটিই প্রমাণিত হলো। ইউক্লিডের এই উপপাদ্যগুলো যুক্তিতে জানার, বা ভেবে জানার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণগুলোর অন্যতম।

স্কুলের জ্যামিতি থেকে স্মরণ করা যায় যে এসব উপপাদ্যের প্রথমটিও প্রমাণের আগে, অর্থাৎ সবার আগে, অল্প কিছু বিষয়কে স্বতসিদ্ধ হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে। ওগুলো এমন জিনিস যে দেখলেই বুঝা যায় স্পষ্টত সঠিক, কিন্তু কায়দা করে প্রমাণের কোন উপায় নেই। তাই ইউক্লিড এ ক'টি সত্যকে স্বতসিদ্ধ অর্থাৎ আপনাতেই প্রমাণিত ধরে নিয়েছেন। এমনি স্বতসিদ্ধের একটি উদাহরণ হলো: 'ক' যদি 'খ' এর সমান হয় এবং 'ক' যদি 'গ' এরও সমান হয়, তাহলে খ ও গ সমান। তিনি অবশ্য এরকম স্বতসিদ্ধ জিনিস যত কম সংখ্যক রাখা যায় সে চেষ্টা করেছেন। উপপাদ্য প্রমাণে ওই স্বতসিদ্ধগুলো ছাড়া আর কোন কিছুকেই যুক্তি ছাড়া মেনে নেয়া হয়নি। যেমন তিনি একটি উপপাদ্যে প্রমাণ করেছেন দুটি সমান্তরাল সরল রেখাকে তৃতীয় একটি সরল রেখা ছেদ করলে উৎপন্ন অনুরূপ

কোণগুলো এবং একান্তর কোণগুলো পরস্পর সমান হবে। এই উপপাদ্যটি ব্যবহার করেই তিনি প্রমাণ করেছেন আরেকটি উপপাদ্য– ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রির সমান। এমনি ভাবে চলেছে বাকি অনেকগুলো উপপাদ্য।

এর সবই সমতলের ওপর আঁকা যায় এমন জ্যামিতি– অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক স্থানের জিনিস। এরপর ত্রিমাত্রিক স্থানের যে 'সলিড' জ্যামিতি তাতেও চলেছে তাঁর যুক্তিধারা– বেরিয়ে এসেছে গোলক, সিলিন্ডার, কিউব, নানা রকম পিরামিড ইত্যাদি জ্যামিতিক ঘন-আয়তনের জিনিসের নানা গুণাগুণ। আসলে জ্যামিতি ছিল গ্রীক গণিতের সব চেয়ে অগ্রসর অংশ। প্লেটোর যে ফর্‌ম বা আইডিয়া তার সব চেয়ে বিশুদ্ধ প্রকাশ হলো জ্যামিতি। একাডেম নামক গ্রামে ছিল প্লেটোর বিখ্যাত স্কুল, গ্রামের নামে যার নাম হয়েছিল একাডেমি (আজ যে কারণে জ্ঞানচর্চার জায়গাকে একাডেমি বলা হয়)। ওই একাডেমির প্রধান ফটকে প্লেটো লিখিয়েছিলেন 'যারা জ্যামিতি জানেনা তাদের প্রবেশ নিষ্প্রয়োজন'। এর কারণ বুঝতে কষ্ট হয়না। ইউক্লিডের জ্যামিতির একেবারে শুরুতে নানা সংজ্ঞার মধ্যেই প্লেটোর বিমূর্ততার সুন্দর উদাহরণ দেখা যায়, যা আমরা আমাদের স্কুলের জ্যামিতির শুরুতেই দেখেছি। যেমন বিন্দুর সংজ্ঞা হলো 'যার অবস্থান আছে, কিন্তু আয়তন নেই'। আয়তনবিহীন জিনিস কোন বাস্তব জিনিস মোটেই নয়। কাজেই বিন্দু জিনিসটি প্লেটোর ফর্‌ম ছাড়া আর কিছু নয়– যদিও আমরা অবশ্য বাস্তব জিনিসের প্রতিনিধিত্ব করতে অনেক সময় বিন্দুকে ব্যবহার করি যেমন চাকার কেন্দ্রবিন্দু, পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু ইত্যাদি চিহ্নিত করা; ক্ষুদ্র কণিকাকে একটি বিন্দু ধরে নেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে। যখন বলি– 'রেখা মানে যার দৈর্ঘ আছে, প্রস্থ নেই'– তখনো ব্যাপারটি একই।

জ্যামিতির জন্ম ব্যাবিলনে বা মিশরে যেভাবে হয়েছিলো, এবং গ্রীসেও তার উত্তরাধিকার যেভাবে এসেছিলো তাতে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারটিই গুরুত্ব পেয়েছে। এর গ্রীক নাম জিওমেট্রির অর্থই হলো ভূমি পরিমাপ। কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যবহারিক চরিত্রের চেয়ে পিথাগোরাস, প্লেটো ও অন্যান্যদের আইডিয়া-প্রধান চরিত্রই এতে মুখ্য হয়ে উঠেছে, বিমূর্ত গণিত রূপেই এর চর্চা হয়েছে– যেমন ইউক্লিডে। তবে গ্রীক বিজ্ঞানীরা কার্যত তাঁদের বৈজ্ঞানিক কাজগুলোর মধ্যে জ্যামিতির ব্যাপক ব্যবহার করেছেন, এবং সেই সুবাদে প্রকৃতির বাস্তব জিনিস ও ঘটনাগুলোর উদ্ঘাটনের কাজেও। সেটি তো বিজ্ঞানে গণিতের অন্যান্য অংশের মত জ্যামিতির ব্যবহারের বিষয়। কিন্তু আজকের বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ জ্যামিতি নিজকেও শুধু গণিতের অংশ মনে না করে বিজ্ঞানের অংশও মনে

করেন। গ্রীকরা নিজেরা তাঁদের জ্যামিতিকে যতটাই বাস্তব-ছোঁয়া বর্জিত আইডিয়ার জিনিস মনে করুননা কেন আসলে সেই জ্যামিতি বাস্তব জগতেরই উপাদান– এটি স্থানের (স্পেস), তলের, দৃঢ় বস্তুতে গড়া ত্রিমাত্রিক গঠনের, নানা গুণাগুণ উদ্ঘাটন করছে। আজকের একজন সেরা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ রোজার পেনরোজ সর্বকালের ভাল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর তালিকায় প্রাচীন কালের থেকে শুধু ইউক্লিডের জ্যামিতিকেই জায়গা দিয়েছেন। জ্যামিতি এভাবে বিজ্ঞান হিসেবেও সম্মানিত।

গাণিতিক বিমূর্ত সব জিনিসের আইডিয়া নিয়ে গড়া জ্যামিতিতে বাস্তব জগতের বিষয় ঢুকলো কেমন করে? ওই যে স্বতসিদ্ধগুলোকে ইউক্লিড নিজ থেকে প্রমাণিত ধরে নিলেও আসলে আমাদের পরিচিত জগতের স্থান (স্পেস), দৃঢ় বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতাই ওখানে প্রতিফলিত হয়েছে। এ কারণেই ওগুলো আমাদের কাছে এতটাই স্পষ্টভাবে সত্য ও স্বাভাবিক মনে হয়। কার্যত এই বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলোকে যুক্তিতে নানা রূপ দিয়ে জ্যামিতি সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই পুরো জ্যামিতিই আসলে প্রকৃতির এই দিককার বিষয়গুলো উদ্ঘাটন করছে। মজার ব্যাপার হলো এ কথাটি যে সত্যি এটি আমরা বুঝতে পারছি একেবারে সাম্প্রতিক যুগে, আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের যুগে এসে। কারণ এখানে এসে আমরা দেখছি যে আমাদের এখনকার জানা পদার্থবিদ্যার জগতের সঙ্গে ইউক্লিডের জ্যামিতি আর মিলছেনা। এই না মেলাটিই দেখিয়ে দিচ্ছে যে আগের পদার্থবিদ্যা জগতের সঙ্গে ওই জ্যামিতি মিলে যেতো। এ যেন গল্পের 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই'।

ইউক্লিডের পরিচিত যে স্থান তা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচিত স্থানের মতই। কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে পদার্থবিদরা জেনেছেন যে স্থান আসলে নানা জিনিসের ভরের প্রভাবে কুঁকড়ে গিয়ে নানা রকম বক্রতা লাভ করছে। স্থানের এই বক্রতার গুণগুলো ইউক্লিডের জ্যামিতিতে ধরা পড়েনা, তাই এর জন্য ব্যবহার করতে হয় অন্য রকম জ্যামিতি– নন্-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি। অন্য রকম নিয়ম মানা, সত্যিকার অথবা কাল্পনিক নানা রকম 'স্থানের' প্রতিফলন ঘটানো, কয়েক রকমের নন্-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি গণিতবিদরা নিজেদের খেয়ালে আধুনিক কালে তৈরি করে রেখেছেন। আইনস্টাইনের কল্যাণে এগুলোরই একটি সত্যিকার জগতের কাজে লেগে গেলো। ইউক্লীডীয় জ্যামিতির অনেক কিছুই আপেক্ষিক তত্ত্বের বর্ণিত স্থানের মধ্যে খাটবেনা, যেমন

উদাহরণ স্বরূপ কোন বক্রতলের ওপর ত্রিভুজ আঁকলে তার তিন কোণের সমষ্টি যে ১৮০ ডিগ্রি হবেনা, বক্রতা অনুযায়ী বেশি বা কম হবে, সে তো আমরা নিজেরাই চট্ করে দেখতে পারি যেমন ফুটবলের গায়ের ওপর একটি ত্রিভুজ এঁকে তার তিন কোণের সমষ্টি কত হয় মেপে দেখে। অবশ্য ইউক্লিডীয় জ্যামিতির প্রাসঙ্গিকতা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর দ্বারা কমে যায় না। কারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রভাবটি গুরুত্বপূর্ণ হয় শুধু বিশাল আকারের স্থানে– যেমন তারা বা গ্যালাক্সি ইত্যাদির জগতে। সীমিত পরিসরে স্থানের বক্রতা এত কম যে এই স্থানের গুণাগুণ আমাদের স্কুলে শেখা ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতেই দিব্যি উদ্ঘাটিত হয়। তবে এসবের মধ্য দিয়ে ধরা পড়লো যে জ্যামিতি যেমন গণিত, তেমনি এটি বিজ্ঞানও বটে।

জ্যামিতিতেই মাপা গেলো পৃথিবী কত বড়ঃ

খুব অল্প একটু পর্যবেক্ষণ, আর বাকিটা পুরোপুরি জ্যামিতির প্রয়োগ– ওই যে উপপাদ্যগুলো প্রমাণ করা আছে সেগুলোর প্রয়োগ; এভাবেই গ্রীকরা অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। এই অর্থে জ্যামিতিতে জানা মানে মেপে জানা নয়, যুক্তিতে ভেবে জানা; এ সবের মধ্যেই গ্রীক বিজ্ঞানের এই বিশেষ ভঙ্গিটি দেখা যায়। এরকম আবিষ্কারের একটি চমৎকার উদাহরণ হলো পৃথিবীর পরিধির প্রথম আবিষ্কার। খৃষ্টপূর্ব ২৪০ অব্দ নাগাদ এই আবিষ্কারটি যখন হয়েছে তার আগেই ধীরে ধীরে ফয়সালা হয়ে গেছে যে পৃথিবী গোলকাকার– কিন্তু কত বড় এই গোলক তা জানতে তখনো বাকি। এ সময় গ্রীক শাসনাধীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ ছিলেন দার্শনিক এ্যারাটোসথেনেস। যে মানুষটি আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে দূরে কোথাও কখনো যাননি, তাঁর শহরে, তাঁর লাইব্রেরীর চত্বরে থেকেই তিনি উদ্ঘাটন করলেন পুরো পৃথিবীর পরিধি– প্রধানত জ্যামিতির সাহায্যে।

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সোজা দক্ষিণে ৫০০ মাইল দূরের শহর সিয়েন সম্পর্কে একটি কথা তখন জানা ছিল। বছরের দীর্ঘতম দিনটির মধ্যাহ্নে সূর্য ওই শহরে ঠিক মাথার ওপরে থাকে। ব্যাপারটিকে আরো জনপ্রিয় করেছিলো সেখানকার একটি পানির কুয়ার খ্যাতি– ওই বিশেষ দিনের মধ্যাহ্নে সূর্যের কিরণ সোজা খাড়া ওই কুয়ার মুখ দিয়ে তার ভেতরে ঢোকে। অন্য ভাবে বল্লে ওই মধ্যাহ্নে সিয়েনে সূর্যের আলোতে কোন কিছুর কোন ছায়া পড়েনা। কিন্তু ঠিক ওই সময়েই আলেকজান্দ্রিয়ায় সূর্য সামান্য তেরচা ভাবে মধ্যাহ্নে থাকে বলে খাড়া যে কোন

জিনিসের ছোট একটি ছায়া ঠিকই পড়ে। এ্যারাটোসথেনেস এই ব্যাপারটিরই সুযোগ নিলেন। তাঁর লাইব্রেরীর সূর্য-ঘড়িতে যে খাড়া কাঠিটি রয়েছে ওই দিন ঠিক মধ্যাহ্নে কাঠির দৈর্ঘ আর ছায়ার দৈর্ঘ তিনি মেপে ফেল্‌লেন। এই দুইয়ের দুই প্রান্তবিন্দুকে যোগ করলে যে সমকোণী ত্রিভুজটি তৈরি হয় তার শীর্ষ কোণটিও এভাবে তিনি মেপে ফেল্‌লেন যেটি পেলেন ৭.২ ডিগ্রি। ব্যাস মাপজোকের কাজ এখানেই শেষ, বাকিটা শুধু জ্যামিতি।

বহু দূর থেকে আসা সূর্যের সব রশ্মিগুলোকে মোটের ওপর সমান্তরাল বলে ধরে নেয়া যায়। এই রশ্মি সিয়েনে খাড়া ভাবে পড়ছে বলে কল্পনায় একে বর্ধিত করলে তা পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে। আর আলেকজান্দ্রিয়ার সেই খাড়া কাঠিটিকে কল্পনায় নিচের দিকে বর্ধিত করলে তাও পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে। এই দুইয়ের মধ্যে পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণ তা তৈরি হয়েছে পৃথিবী-পৃষ্ঠে আলেকজান্দ্রিয়া ও সিয়েনের ৫০০ মাইল দূরত্বের কারণে। ইউক্লিডের উপপাদ্যে দুই সমান্তরাল রেখাকে ছেদকারী রেখায় একান্তর কোণ দুটি সমান হয়। এখানে আলেকজান্দ্রিয়ার কাঠির ও ছায়ার গড়া ত্রিভুজের শীর্ষ কোণ এবং পৃথিবীর কেন্দ্রে আলেকজান্দ্রিয়া ও সিয়েনের তৈরি করা কাল্পনিক কোণ– এই দুটি কিন্তু সে রকম একান্তর কোণ এবং তাই পরস্পর সমান। কাজেই ওই শীর্ষকোণটির মত পৃথিবী-কেন্দ্রের এই কোণও ৭.২ ডিগ্রি। বাকিটুকু ঐকিক নিয়মের অংক। ৭.২ ডিগ্রির জন্য যদি পরিধিতে ৫০০ মাইল ব্যবধান হয় তাহলে পুরো ৩৬০ ডিগ্রির জন্য কত হবে অর্থাৎ পুরো পরিধিটি কত হবে। ৩৬০ এর মধ্যে ৭.২ আছে ৫০ বার, তাই পরিধি হলো ৫০০×৫০= ২৫,০০০ মাইল। শুধু জ্যামিতি দিয়ে এ্যারাটেসথেনেস আলেকজান্দ্রিয়াতে বসেই পুরো পৃথিবীর পরিধি আবিষ্কার করলেন যা আজকের ভাল পরিমাপের থেকে তেমন ভিন্ন কিছু নয়। জ্যামিতির শক্তি সেই প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানীরা পুরোপুরিই কাজে লাগিয়েছিলেন। এসব ছিল যুক্তি দিয়ে জগতকে জানার চমৎকার সব উদাহরণ। বিজ্ঞানের নানা সমস্যার সমাধানে গণিতের অন্যান্য অংশের মত ইউক্লিডের জ্যামিতিকে আজও যে আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করছিনা তা নয়। তবে গ্রীক দার্শনিকরা অনেক সময় মনে রাখেননি যে জ্যামিতির যুক্তির সঙ্গে বাস্তব জগত থেকে দেখে বা পর্যবেক্ষণে কিছু তথ্য পাওয়াও এখানে জরুরী। যেমন পরিধি জানার এই বিশেষ ক্ষেত্রে আলেকজান্দ্রিয়া ও সিয়েনের রৈখিক দূরত্ব (৫০০ মাইল) এবং কৌণিক দূরত্ব (৭.২ ডিগ্রি) জানাটি জরুরী ছিল।

চাঁদ-সূর্য-তারার আয়তনের প্রথম ধারণাও জ্যামিতি থেকেঃ

চন্দ্রকলা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ এগুলোর সঙ্গে বিজ্ঞানীদের পরিচয় গ্রীকদেরও বহু হাজার বছর আগে থেকেই। কিন্তু গ্রীকরাই প্রথম যুক্তির ও পরিমাপের সাহায্যে এই ঘটনাগুলোকে আরো কিছু আবিষ্কারের জন্য ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। এখানেও তাঁদের জ্যামিতি খুব সহায়ক হয়েছিলো। যেমন চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারার আয়তন সম্পর্কে কোন ধারণা ওই পর্যন্ত ছিলনা, পৃথিবী থেকে চোখে এগুলোর যেটিকে যত বড় দেখা যায় তাতে কিছুই প্রমাণ হয়না।

খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ নাগাদ গ্রীক জ্যোতির্বিদ এরিস্টারখাস চন্দ্রকলার পরিবর্তনগুলো পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থানের ওপর কী ভাবে নির্ভর করে তা লক্ষ্য করে তার জ্যামিতি ঠিক করলেন। তিনি বুঝলেন চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবীর কেন্দ্রগুলো যোগ করলে যখন একটি সমকোণী ত্রিভুজ গঠিত হয় তখনই চাঁদকে ঠিক অর্ধবৃত্তাকার দেখায়– সমকোণটি চাঁদ থেকে সূর্য, এবং চাঁদ থেকে পৃথিবী, এই দুই রেখার মধ্যে। এ সময় চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীতে যে কোণটি তৈরি করে সেটি মাপতে পারলে সেই কোণ বলে দেবে পৃথিবী থেকে চাঁদ ও সূর্যের দূরত্বের অনুপাতটি (ত্রিকোণমিতিতে অনুপাতটিকে বলে কোণটির ট্যানজেন্ট)। আকাশে এভাবে দুটি জ্যোতিষ্কের মধ্যেকার কোণ মাপার যতটা নির্ভুল উপায় এরিস্টারখাসের ছিল তাতে তিনি কোণটি পেয়েছেন ৮৭ ডিগ্রি। ফলে তাঁর হিসেবে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, পৃথিবীর থেকে চাঁদের দূরত্বের ১৯ গুণ বড়।

কোণ মাপতে বেশ কিছুটা ভুল হবার কারণে দূরত্বের অনুপাতটিও এরিস্টারখাস ভুল পেয়েছিলেন। কোণ ভুল পাওয়ার কারণ খুব সম্ভব এরিস্টারখাস সূর্যের কেন্দ্র ঠিক করতে ভুল করেছেন, অথবা ঠিক কোন্ সময় চাঁদ অর্ধবৃত্তাকার তা নির্ণয়ে ভুল করেছিলেন। শুদ্ধ কোণটি হলো ৮৯ ডিগ্রি ৫১ মিনিট যাতে ওই দূরত্ব দুটির অনুপাতের শুদ্ধ মান দাঁড়ায় ৪০০। অর্থাৎ সূর্যের দূরত্ব চাঁদের দূরত্বের আসলে ৪০০ গুণ, ১৯ গুণ নয়। তবুও নিজের মাপ অনুযায়ী এই ১৯ গুণ দেখেই এরিস্টারখাস বুঝতে পারলেন যে যদিও চাঁদ আর সূর্যকে পৃথিবী থেকে প্রায় সমানই মনে হয় আসলে সূর্য চাঁদ থেকে অনেক বড় জিনিস, বেশি দূরে রয়েছে বলেই ছোট দেখাচ্ছে।

তবে এতো গেল চাঁদ আর সূর্যের সাইজ সম্পর্কে তুলনামূলক একটি ধারণা। কিন্তু তাঁর হিসেবে আসলে চাঁদ কত বড়, এবং সূর্য কত বড় এটিও এরিস্টারখাস জানার চেষ্টা করলেন। এ জন্য চন্দ্রগ্রহণের সময় কিছু পর্যবেক্ষণ করা দরকার হলো। ও সময় তিনি পৃথিবীর ছায়াটি চাঁদকে স্পর্শ করার মুহূর্ত থেকে শুরু করে

ছায়াটি চাঁদকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলার মুহূর্ত পর্যন্ত সময়টি নির্ণয় করলেন। এরপর যতক্ষণ পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে পুরো ঢেকে রাখলো সেই সময়টুকুও তিনি মাপলেন। দেখলেন এই দুটি সময় সমান। অর্থাৎ ঢাকা শুরু করার পর পুরো ঢাকতে যতক্ষণ সময় লেগেছে, এরপর চাঁদের আবার প্রথম একটু ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্ত পর্যন্ত একই সময় লেগেছে। স্পষ্টত এখানে পৃথিবীর ছায়ার ব্যাস, চাঁদের ব্যাসের চেয়ে দ্বিগুণ বড়। এটি দেখে এরিস্টারখাস সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে পৃথিবীর ব্যাসও চাঁদের ব্যাসের দ্বিগুণ। এ সিদ্ধান্তটিও কিন্তু শুদ্ধ ছিলনা কারণ এরিস্টারখাস যেভাবে মনে করেছেন সূর্যের আলো সিলিন্ডার আকৃতির জ্যামিতিতে পৃথিবী পার হয়ে চাঁদে পড়ে, কাজেই পৃথিবীর ছায়া আর পৃথিবী সমান; ব্যাপারটি কিন্তু আসলে তা নয়। আসলে সূর্যের আলো পৃথিবী ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় ফানেলের মত ক্রমে সরু হয়ে যায় বলে পৃথিবীর ছায়াটির ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। চাঁদ যে পৃথিবীর থেকে যথেষ্ট ছোট এরিস্টারখাস এইটুকু অন্তত বুঝেছিলেন। একই ভাবে সূর্য যে চাঁদের থেকে ১৯ গুণ বড় তাও তিনি মনে করেছেন (দূরত্ব থেকে)। ইতোমধ্যে এ্যারাটোসথেনেস পৃথিবীর আসল সাইজ জেনে ফেলেছিলেন বেশ নিখুঁত ভাবেই। কাজেই এর সঙ্গে তুলনা করে চাঁদ আর সূর্যের আসল সাইজও জানা হয়ে গেলো এরিস্টারখাসের কাছে। যদিও মাপগুলো সঠিক নয়, তবুও এইটুকু অন্তত সঠিক ছিল যে সূর্য পৃথিবীর থেকে অনেক বড়।

স্থির তারাগুলো কত বড় সেই ব্যাপারেও এরিস্টারখাসের একটি আন্দাজ ছিল। দূরের কোন জিনিসকে যদি পরস্পর থেকে জানা ব্যবধানে আছে এমন দুটি জায়গা থেকে দেখা হয়, তা হলে ওই জিনিসকে কিছুটা ভিন্ন কোণে দেখা যায়। এই ব্যাপারটিকে প্যারালাক্স বলা হয়। কোণটি মেপে ওই জিনিসের দূরত্ব বের করা যায়, অবশ্য সেজন্য দেখার জায়গা দুটার মধ্যে পরস্পর দূরত্বটি জানা প্রয়োজন হয়। দেখার দুটি জায়গার ব্যবধান বড় হলে প্যারালাক্সের কোণটি বড় হয়, কোণটি মেপে দূরত্ব বের করতে সুবিধা হয়। এই ব্যবধান যথাসম্ভব বড় করেও কখনো কোন তারার জন্য এরকম প্যারালাক্স দেখা সম্ভব হয়নি, যার মানে কোণটি এত ছোট যে মাপা সম্ভব হচ্ছিলনা। কোণ ছোট হয় জিনিসটি বেশি দূরে হলে অনেকে এ নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছে, তা সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি। এসব থেকে এরিস্টারখাস সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তারাগুলো পৃথিবী থেকে আরো অনেক বেশি দূরে। আর খুব সম্ভব সে জন্যই পৃথিবী থেকে তারাকে এতো ছোট দেখা যাচ্ছে। আসলে সেগুলো সূর্যের মতই বিশাল।

সূর্য, তারা এ সবের দূরত্ব ও বিশালত্ব, বিশেষ করে পৃথিবীর তুলনায় অনেক বিশালত্ব এরিস্টারখাসকে একটি সাহসী অনুমান করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। যুগে যুগে ওই যে পৃথিবীকে বিশ্বের মাঝখানে স্থির মনে করা হয়েছে এবং বাকি সব কিছু তার চারিদিকে ঘুরছে মনে করা হয়েছে, তিনি সে ব্যাপারে ভিন্ন মত দিলেন। এটি একেবারে সবার বিরুদ্ধে গিয়েই তাঁকে করতে হলো। তিনি বল্লেন পৃথিবী নিজেই যদি ঘোরে তা হলে পৃথিবী থেকে দেখলে অন্য সব কিছু স্থির জিনিসকেও ঘুরছে বলে মনে হবে। সে ক্ষেত্রে অত বড় বড় জিনিস সূর্য আর তারাকে ঘুরতে হবেনা– কারণ অত মস্ত বড় জিনিস ঘোরার চেয়ে পৃথিবী ঘোরাটাই সহজ। অন্যান্য নানা কারণে তিনি সব কিছু সূর্যের চারিদিকেই বরং ঘুরছে বলে মনে করলেন। তিনি বল্লেন পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপর দিনে একবার ঘুরে যাচ্ছে তাই সব কিছুকে দৈনিক একবার ঘুরে যাচ্ছে বলে মনে হয় এখান থেকে। আবার সূর্যের চারিদিকে বছরে একবার পরিক্রমণ করছে, তাই পৃথিবী থেকে মনে হয় সূর্যও সারা বছর একটু একটু করে বছরে একবার ঘুরে আসছে। কিন্তু এই নতুন বিশ্ব-ছবিটি দিয়ে তিনি একটি বৈজ্ঞানিক সমস্যার সম্মূখীন হলেন। বছরের দুই ভিন্ন মৌসুমে যখন পৃথিবী সূর্যের দুই বিপরীত দিকে থাকার কথা তখন এই দুই মৌসুমে বিশেষ বিশেষ তারার কৌণিক অবস্থান মাপলেন, কিন্তু তাতে তারাটির কৌণিক অবস্থানে কোন পরিবর্তন দেখতে পেলেন না অর্থাৎ কোন প্যারালাক্স দেখতে পেলেননা। কক্ষপথের দুই বিপরীত প্রান্তে এই দুই জায়গার মধ্যে বিরাট দূরত্ব সত্ত্বেও এই দুই জায়গা থেকে দেখা তারার কোন প্যারালাক্স খুঁজে না পেয়ে তিনি অবাক হলেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর নতুন বিশ্ব-ছবি ত্যাগ করলেন না, বরং বল্লেন তারাগুলো আসলে যত দূরে মনে করেছিলেন তার চেয়েও অনেক অনেক দূরে, তাই কিছুতেই প্যারালাক্স হচ্ছে না। এখন আমরা বুঝতে পারছি তিনি এই সব ব্যাপারে কতখানি সঠিক ছিলেন।

বিশ্ব-ছবি সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব দিয়েও এরিস্টারখাস এর প্রতি সমর্থন পাননি কারো কাছ থেকে। এর একটি কারণ ছিল গতির নিয়ম সম্পর্কে তখনকার যে ধারণা ছিল পৃথিবীর ঘোরাটি তাতে অসম্ভব মনে হতো। ওসব বিষয়ে, এবং জ্যোতির্বিদ্যার অন্য কিছু বিষয়েও এরিস্টারখাস তাঁর নতুন তত্ত্বের সপক্ষে ভাল সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে পারেননি, ফলে সেদিন এই সঠিক বিশ্ব-ছবি হারিয়ে গিয়েছিলো। এরপর এ নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য হয়নি প্রায় সতরো শ' বছর, দুনিয়ার প্রায় কোথাও নয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এতগুলো বছর পর আধুনিক বিজ্ঞান মোটের ওপর এরিস্টারখাসের কথাগুলোই মেনে নিয়েছে। তাঁর পরিমাপে

ভুল ছিল, সব কিছুর আয়তন নির্ণয়ে ভুল ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলোর সাক্ষ্যতেই যুক্তিতে একটি সঠিক তত্ত্বের দিকে যেতে তাঁর চেষ্টায় কোন ভুল ছিলনা।

ভেবে জানার মধ্যে বাস্তবের ছোঁয়া

কতখানি ভাবনা, কতখানি বাস্তবঃ

প্লেটো বলতেন মনশ্চক্ষে দেখা আইডিয়াই সব। কিন্তু প্লেটোর বিখ্যাত ছাত্র এরিস্টোট্‌ল ভিন্ন কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতায় যা জানি তাকেও বাতিল করা যায়না, জ্ঞান হিসেবে তাও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। এরিস্টোট্‌লকেই মনে করা হয় এভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেবার ক্ষেত্রে অগ্রণী দার্শনিক। চিন্তা বনাম অভিজ্ঞতার বিতর্কে তিনিই অভিজ্ঞতাকে (এ্যাম্পিরিকাল) সামনে আনলেন। যদিও গ্রীকদের আগে ব্যাবিলন বা মিশরে হাজার হাজার বছর ধরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বিজ্ঞানের সব কাজ চলেছে তাঁরাতো আর বিজ্ঞানের বা জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি নিয়ে এসব বিতর্ক তোলেননি, হয়তো অভিজ্ঞতায় অর্জিত জ্ঞান নিয়ে কেউ তখন প্রশ্ন তোলেনি বলে। কিন্তু এরিস্টোট্‌লকে ব্যাপারটি স্পষ্ট করে বলতে হয়েছে। তিনি অভিজ্ঞতায় যাচাই না হলে কোন চিন্তার ফসলকে জ্ঞানের ছাড়পত্র দিতে নারাজ ছিলেন। হাজার হলেও বিজ্ঞান তো বাস্তব প্রকৃতিকে নিয়েই। প্লেটো সে কথাটি অস্বীকার করতেন বলে বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা কম। এরিস্টোট্‌লের ক্ষেত্রে তার ঠিক বিপরীত। বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে (এবং বিজ্ঞানের বাইরেও বহু ক্ষেত্রে) তাঁর প্রভাব অত্যন্ত বেশি, অনেকটা একজন শক্তিশালী পথিকৃতের মত। কিন্তু সেই প্রভাব প্রায়শ বিজ্ঞানকে ভ্রান্তির পথেও নিয়ে গেছে– এবং তা প্রায় দুই হাজার বছর ধরে।

মুশকিল হলো অভিজ্ঞতার প্রতি এরিস্টোট্‌লের যে আগ্রহ তা প্রায়ই উপরে উপরে অভিজ্ঞতায় থেকে গেছে, একে এক্সপেরিমেন্ট করে গভীর অভিজ্ঞতায় পরিণত করার চেষ্টা ছিলনা। ফলে চিন্তা করে যুক্তির মাধ্যমে তত্ত্ব খাড়া করার প্রবণতা তাঁর মধ্যেও ছিল, এবং সেটিই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে, অভিজ্ঞতাটি মামুলি থেকে গেছে। তিনি মনে করতেন প্রত্যেক জিনিসের কিছু সহজাত মূল গুণ আছে– সেটিই ঠিক করে দেয় জিনিসটির আচরণ। তবে অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই সে সম্পর্কে জ্ঞানটি খাঁটি হয়। ওই মূল গুণটি কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধরা পড়েনা, বরং মূল গুণটি আছে বলেই এই অভিজ্ঞতা আসে। তাই

কোন কিছু নিচের দিকে পড়তে দেখেই আমরা বুঝিনা যে ওটির মধ্যে পতনের গুণ আছে (গ্র্যাভিটি), বরং ওই পতনের গুণটি আছে বলে আমরা তাকে পড়তে দেখি। তা হলে পতনের গুণটি জানার উপায় কী? এ সম্পর্কে এরিস্টোট্‌লের বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়। কখনো মনে হয়েছে তিনি ওই গুণগুলোকে ব্যাপক অভিজ্ঞতার ফলে পাওয়া এক রকম ইনডাকশন মনে করতেন (বার বার হতে দেখে সাধারণ সিদ্ধান্ত)। আবার কখনো মনে হয়েছে তিনি গুণগুলোকে স্বতসিদ্ধ মনে করতেন– এগুলো স্পষ্টত সত্য এমনটি ধরে নেয়ার মত। আজকের বিজ্ঞানে হাতেকলমে যাচাইয়ের যে বাধ্যবাধ্যকতা তা এরিস্টোট্‌লের বিজ্ঞানে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। কিন্তু তাঁর কল্পিত মূল গুণের সঙ্গে অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নেয়াকে অবলম্বন করা ওই প্রাচীন বিজ্ঞানের এমন একটি আকর্ষণ ছিল যে তা দুই হাজার বছর ধরে তার স্থান বজায় রাখতে পেরেছিলো। বরাবর দেখা গেছে তাঁরই ভাষায়, এবং তাঁরই মূল বক্তব্যগুলো ঠিক ধরে নিয়ে সবাই বিজ্ঞান চর্চা করে গেছেন। তাই বিজ্ঞানকে চেনার ক্ষেত্রে এসবকে খাটো করে দেখার উপায় নেই।

এখানে আমরা সেদিনের তাঁর বিজ্ঞানের যে বৈশিষ্টগুলো দেখবো তাতে বুঝতে পারবো যে একটি জিনিস তিনি জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। তা হলো বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণ করাটি খুব জরুরী বটে, কিন্তু শুধু পর্যবেক্ষণ করে তার তথ্য জমা করলেই সেটি বিজ্ঞান চর্চা হয়না। আরো বেশি জরুরী হলো ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য অন্তদৃষ্টি– এর মধ্যে মৌলিক অস্তিত্বগুলোকে ও মৌলিক গুণ-গুলোকে দেখতে পাওয়ার মত যুক্তি, যার থেকে তাত্ত্বিক স্পষ্টতা আসে। তাঁর অনেক কথা নাকচ করলেও আধুনিক বিজ্ঞান মোটের ওপর এই কথাটি নাকচ করেনি।

এরিস্টোট্‌লের একটি বড় অবদান হলো বিজ্ঞানে কার্য-কারণ সম্পর্কটিকে উদ্ঘাটনের ও বিশ্লেষণের চেষ্টা। কিন্তু সেটি এখন আমরা কার্য-কারণ সম্পর্ককে যেভাবে দেখি তার চেয়ে জটিল প্রকৃতির ছিল। তিনি বল্‌তেন কোন ঘটনার কারণ আসে বিভিন্ন রকমে– 'বাস্তব কারণ' (ম্যাটেরিয়াল ক'জ), 'গুণগত কারণ' (ফর্‌মাল ক'জ), 'গতীয় কারণ' (এফিশিয়েন্ট ক'জ), এবং 'চূড়ান্ত কারণ' (ফাইন্যাল ক'জ)। প্রাকৃতিক জগতের বাস্তব জিনিসের মধ্যে যে কারণ নিহিত তা বাস্তব কারণ– আধুনিক বিজ্ঞানের মূল অনুসন্ধান তো এখানেই। কিন্তু এরিস্টোট্‌লের মতে বাস্তব জিনিসগুলোর অস্থিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ রয়ে গেছে তার অন্তর্নিহিত গুণ বা ফর্‌মের ওপর। এই ফর্‌ম প্লেটোর সেই বিশুদ্ধ ফর্‌ম বা আইডিয়ার মতই ব্যাপার। আসলে বস্তুর নিজের কিছু সুপ্ত ক্ষমতা

(পোটেনশিয়াল) থাকলেও এমনিতে সেগুলোর কোন কার্যকারিতা নেই। সেগুলো কার্যকর হবে ফর্‌ম যদি ঠিক থাকে– সেটিই ঘটনার গুণগত কারণ বা ফর্‌মাল কারণ। এরিস্টোট্‌লের কাছে গতি জিনিসটার একটি আলাদা মর্যাদা আছে, এটিই ঘটনাকে চাঞ্চল্য দেয়; তাই এটি আলাদা এক ধরনের কারণ– গতীয় কারণ বা এফিশিয়েন্ট কারণ। বাকি রইলো যেই চূড়ান্ত কারণ তাতে খুব সম্ভব ঘটনার পেছনের উদ্দেশ্যের কথা বলা হচ্ছে, যা বহুক্ষেত্রে গুণগত কারণেরই শামিল। খেয়াল করলে বোঝা যায় এই চারটি কারণের মধ্যে বাস্তব কারণটি ছাড়া বাকি সবই কোন না কোন ভাবে প্লেটোর আইডিয়া বা ভাবনা জগতের সঙ্গে যুক্ত। দেখে জানার অন্তত একটি জানালা অবশ্য এরিস্টোট্‌ল খোলা রেখেছেন এই বাস্তব কারণের রূপে। ওখানেই এরিস্টোট্‌লের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্পর্ক অন্য অনেক গ্রীক দার্শনিকের থেকে ঘনিষ্ঠতর।

মৌলিকের সন্ধানেঃ

ডেমোক্রিটাস তাঁর এটমিক থিওরিতে এটমকে সব জিনিসের মৌলিক রূপ মনে করেছিলেন– তাঁর থিওরিতে এটিই মৌল। এরিস্টোট্‌ল, প্লেটো এবং আরো অনেকে এটি মানতেন না। আরো প্রাচীন কাল থেকে যে ধারণা চালু ছিল সেই মাটি, পানি, বাতাস আর আগুনকেই তাঁরা মৌল মনে করতেন। অবশ্য প্লেটো বা এরিস্টোট্‌ল বা অন্য প্রায় সব দার্শনিক এই আলোচনায় শুধু পার্থিব জিনিসের কথাই বলতেন– আকাশের জ্যোতিষ্করা তাঁদের মতে স্বর্গীয় জিনিস, পার্থিব এই স্থূল বস্তুর সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক সেই– সেগুলো অধরা বিশুদ্ধ 'ইথারের' (গ্রীক উপকথার কাল্পনিক স্বর্গীয় বস্তু) তৈরি, স্বচ্ছ কৃষ্টালের মত; পার্থিব বস্তুর কালিমা তাদের স্পর্শ করতে পারেনা। মাটি, পানি, বাতাস, আগুনের এই চার মৌলের ধারণা গ্রীকদের আগে ব্যবিলনীয় ও মিশরীয় বিজ্ঞানে ছিল। অন্যান্য প্রাচীন বিজ্ঞানেও একই ধারণা কিছুটা পরিবর্তিত রূপে ছিল। যেমন প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানে মৌল ছিল পাঁচটি– ক্ষিতি (মাটি), অপ (পানি), তেজ (আগুন), মরুৎ (বাতাস), ব্যোম (আকাশ), এখানেও আকাশকে (ইথার?) আলাদা করা হয়েছে। প্রাচীন চীনের বিজ্ঞানেও পাঁচটি মৌলের ধারণা ছিল কিন্তু সেগুলো ছিল ধাতু, কাঠ, পানি, আগুন, আর মাটি।

এরিস্টোট্‌লের বিজ্ঞান কিন্তু সরাসরি ওই চারটি মৌল মিশিয়ে সব বস্তু তৈরি হয় এমন কথা বলেনা। বস্তুর মধ্যে এই মৌলগুলো বরং আছে একটি সুপ্ত প্রবণতা (পোটেনশিয়াল) হিসেবে। সেই প্রবণতা বুঝতে গেলে ওই মৌলগুলোর ফর্‌মের

কথা বিবেচনা করতে হবে। এরিস্টোট্‌লের দাবী হলো চারটি মৌলের প্রবণতাগুলো তিনি ওদের 'মৌলিক নীতি' থেকে খুঁজে পেয়েছেন – কোন অন্ধ বিশ্বাস থেকে নয়। চারটি মৌলের মত এই নীতিতে চারটি মৌলিক ফর্‌মও রয়েছে– গরম, ঠাণ্ডা, ভেজা ও শুক্‌না। এর মধ্যে গরম-ঠাণ্ডা পরস্পর বিপরীত এবং ভেজা-শুকনা পরস্পর বিপরীত; অর্থাৎ কোন কিছু একই সঙ্গে এর দুটিই হতে পারেনা। চার মৌলের প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ ফর্‌মের সৃষ্টি– মাটি হলো ঠাণ্ডা ও শুকনা, পানি হলো ঠাণ্ডা ও ভেজা, বাতাস হলো গরম ও ভেজা, এবং আগুন হলো গরম ও শুকনা। অন্য সব জিনিস যেগুলো মৌল নয়, সেগুলোর ফর্‌মগুলো বিশুদ্ধ নয়– উত্তাপ হয় মিশ্র প্রকৃতির ঠান্ডা ও গরমের মাঝামাঝি, শুষ্কতা হয় ভেজা ও শুকনার মাঝামাঝি। তিনি দাবী করলেন মৌল যে এ ভাবে এই চারটি, এবং শুধু এগুলোই, তা ওই ফর্‌মের কারণেই হয়েছে। এক রকম যুক্তি তিনি দেখালেন যে ফর্‌মের বিশুদ্ধতার জন্য এই চার মৌলই হতে হবে, অন্যথা নয়। এসব বিশুদ্ধ ফর্‌মের ভিত্তিতে অন্য সব জিনিসের ওপর নানা গুণ আরোপ করা হলো, যেন এভাবেই সবকিছু তার সহজাত গুণগুলো পেয়েছে। যেমন মৌলের কথাই যদি ধরি, পানি কেন তরল তার ব্যাখ্যা রয়েছে পানির ঠাণ্ডা আর ভেজা হওয়ার মধ্যে; আর বাতাস যেহেতু ভেজা হলেও গরম তাই সেটি বায়বীয় এবং ঊর্ধ্বমুখী। মিশ্র পদার্থগুলোর গুণকেও এভাবে ব্যাখ্যা করা হলো। এসব খাড়া করার পরই শুধু এরিস্টোট্‌ল বাস্তবে সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেগুলোকে প্রমাণ করলেন। কাজেই এরিস্টোট্‌লের বিজ্ঞানে মূল নীতিটাই আগে (ভেবে জানা), তারপর তার বাস্তব প্রমাণ (দেখে জানা)।

এরিস্টোট্‌ল তাহলে সাধারণ মিশ্র বা যৌগের ভেতরে মৌলগুলো বাস্তবে পাশাপাশি নেই এমন কেন বলছেন? কেন বল্‌ছেন এগুলো সুপ্তভাবে আছে? এর কারণ হিসেবে তিনি বল্‌লেন মৌলগুলো যৌগতে গিয়ে যৌগকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি নিজেরাও প্রভাবিত হয়, পরিবর্তিত হয়। ফলে ওখানে সেগুলো আর আগের মত মৌল থাকেনা। তা ছাড়া যে কোন বিশুদ্ধ যৌগকেও সমসত্ত্ব (হোমোজেনিয়াস) হতে হয়– তার ক্ষুদ্র এক অংশের সঙ্গেও অন্য অংশের পার্থক্য থাকতে পারেনা। যৌগের মধ্যে মৌলগুলো নিজ নিজ গুণ নিয়ে অবিকৃত থাকলে তো সেটি সম্ভব নয়। বরং যৌগতে গিয়ে তাদের গুণগুলো মিশে একাকার হয়ে যায়। তার যা অবশিষ্ট থাকে তা সুপ্ত প্রবণতা মাত্র। এই সব চিন্তা এর পর হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানীদেরকে ভাবাতে আমরা দেখি। মনে রাখতে হবে এরিস্টোট্‌ল এসব নিয়ে লিখেছেন খৃষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দ নাগাদ।

গতির উৎসঃ

গতি যেরকম আধুনিক পদার্থবিদ্যায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে, তেমনি এরিস্টোট্‌লের পদার্থবিদ্যায়ও তা করেছে। তাঁর কাছে যেকোন পরিবর্তন মানেই ছিল গতি। আর গতির প্রশ্ন এলেই চারটি বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। এরা হলো বস্তু, গুণ, সংখ্যা এবং সময়। আসলে যে কোন পরিবর্তনেই এরা চলে আসে। পরিবর্তন ও গতিকে এরিস্টোট্‌ল এক করে দেখার পেছনেও তাঁর যুক্তি আছে। যুক্তিটা হলো যে কোন পরিবর্তনে দুটি সত্ত্বাকে পরস্পর সংলগ্ন হতে হয় এবং তা হবার জন্য গতি প্রয়োজন। গতি সম্পর্কে এরিস্টোট্‌লের একটি বড় বক্তব্য ছিল– নতুন করে এটি সৃষ্টি হতে পারেনা, সব গতিই পূর্ববর্তী গতির ধারাবাহিকতা মাত্র। তাই আদি থেকেই একটি বিশ্বময় গতি চলে আসছে, অর্থাৎ কিনা বিশ্বময় একটি পরিবর্তন। কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুযায়ী আগের গতিই পরের গতিকে সৃষ্টি করছে; আর সব গতির উৎস হলো সেই আদি চিরন্তন গতি।

তাঁর মতে আকাশের জ্যেতিষ্কগুলো গাণিতিক আদর্শ মেনে বৃত্তাকারে সমবেগে আবর্তন করছে– এটি সেই চিরন্তন গতিরই অংশ। সেই গতি আবার এসেছে মূল গতি-দাতা থেকে যাকে এরিস্টোট্‌ল বলেছেন 'আনমুভ্‌ড মুভার' অর্থাৎ নিজে গতিশীল না হওয়া গতি-দাতা। বাকি সব গতি-দাতা নিজেরাও গতিশীল, শুধু এটিই ব্যতিক্রম। সারা বিশ্বের যে ছবি এরিস্টোট্‌ল খাড়া করেছেন তাতে কেন্দ্রে পৃথিবী এবং সবার বাইরে স্থির তারাগুলো সংযুক্ত গোলক। আর তারও ঠিক বাইরে বিশ্বের বাইরের সেই আনমুভ্‌ড মুভার।

ওই চিরন্তন গতি থেকে নানা বস্তু কোথায় কী রকম গতি পাবে, তা নির্ভর করে তাদের নিজ নিজ গুণের ওপর। এভাবে পাওয়া সেই গতিটা হবে ওই বস্তুর নিজস্ব একটি স্বাভাবিক গতি। সে যখন ওই গতি প্রকাশ করে তার মধ্যে গতির উৎসটি (গতি-দাতা) সব সময় স্পষ্ট হয়না, উহ্য থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বাতাস, ধোঁয়া ইত্যাদির স্বাভাবিক গতি হলো ঊর্ধ্বমুখী (ল্যাভিটি); তাই এ সবের গতি ওপরের দিকে। অন্য দিকে ভারী সব জিনিসের স্বাভাবিক গতি নিম্নমুখী (গ্র্যাভিটি); তাই ওরা নিচের দিকে যায়। এখানে আমরা গতির যে কারণটি পেলাম তা গুণগত কারণ। তবে তার গতীয় কারণটি (এফিশিয়েন্ট ক'জ) খুঁজে পেতে এরিস্টোট্‌লকে আরো গভীরে বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। তিনি মনে করতেন জীবন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে এ বিশ্লেষণ সহজ, কারণ তাদের আত্মা আছে। আত্মা

যেখানে স্পষ্ট সেটিই গতির গতীয় কারণ, আবার সেটিই গতির গুণগত কারণ। প্রাণহীন বস্তুর ক্ষেত্রে একথা বলা যাবেনা।

পার্থিব বস্তুর ক্ষেত্রে গতি-দাতা স্পষ্টই হোক বা উহ্যই থাকুক সেটি কিন্তু থাকে। আর সেগুলো নিজেরাও গতিমান। কিন্তু আকাশের জ্যোতিষ্কদের গতি-দাতা হলো খুবই বিশিষ্ট সেই আনমুভ্ড মুভার। তার থেকে পাওয়া ওদের গতি আদর্শ পরিবর্তনহীন গতি; যার গাণিতিক আদর্শ বৃত্তাকার ও সমবেগ। ওই জ্যোতিষ্কদের গতি থেকেই পার্থিব গতি এসেছে। বিশেষ করে সূর্য তার কক্ষপথে যে বার্ষিক পরিক্রমণ করে সেটিই মাঝখানের ইথারের মাধ্যমে এসে পৃথিবীতে যাবতীয় পরিবর্তন ও গতির প্রাথমিক কারণ হয়; যার মধ্যে ঋতু পরিবর্তন একটি।

প্রত্যেক পার্থিব জিনিসের একটি স্বাভাবিক গতির কথা জেনেছি। কিন্তু এরিস্টোট্‌ল একেই পার্থিব জিনিসের একমাত্র গতি মনে করেন না। অন্য রকম যে গতি আছে তাকে বলা হলো 'বলপূর্বক গতি,' এটি তার নিজের সহজাত কিছু নয়, তার উপর আরোপিত। এটি বস্তুর স্বাভাবিক গতির অনুকূলেও হতে পারে, তার বিপরীতে প্রতিকূলেও হতে পারে। গতি-গ্রহীতার মত গতি-দাতারও এরকম স্বাভাবিক ও আরোপিত গতি উভয়ে থাকতে পারে। যেমন এরিস্টোট্‌ল লিভার যন্ত্রের ব্যাখ্যায় দেখিয়েছেন লিভারে একটি তক্তা বা দন্ডের এক প্রান্ত নিচের দিকে চেপে দিলে অন্য প্রান্ত ওপরের দিকে ওঠে যায়। এর কারণ এক প্রান্তের গতি-দাতা স্বাভাবিক গতিতে নিচের দিকে গেলেও এটিই আবার উল্‌টোমুখী হয়ে অন্য প্রান্তের গতি-গ্রহীতাকে স্বাভাবিকের বিপরীতে অর্থাৎ ওপরের দিকে গতিমান করছে। ওই শেষেরটি কিন্তু আরোপিত গতি।

তীরের গতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এরিস্টোট্‌ল বলেছেন তীর ভারী জিনিস, তার স্বাভাবিক গতি নিচের দিকে। কিন্তু ধনুকের ছিলায় সংলগ্ন করে তাকে বলপূর্বক ওপরের দিকে গতি দিলে সে স্বাভাবিকের বিরুদ্ধে গিয়ে ওপরের দিকে গতিশীল হয়। ছিলার সংলগ্ন ছিল বলেই সে গতি-দাতা ধনুকের গতি লাভ করেছে। ছিলার সঙ্গে অবশ্য বাতাসও সংযুক্ত ছিল, তাই বাতাসও গতিশীল হয়েছে। ধনুক থেকে বিচ্যুত হলেও তীরও আবার বরাবর এই বাতাসের সংলগ্ন রয়েছে– তাই গতিমান বাতাস তীরকে ওপরের দিকে গতিমান রেখেছে স্বাভাবিকের বিরুদ্ধে। যদিও আকাশের জ্যোতিষ্কের গতি কখনো কমেনা, পরিবর্তিত হয়না, কিন্তু পার্থিব জিনিসের গতি তা হয়। বল-পূর্বক গতি এক সময় বলের কার্যকারিতা হারিয়ে থেমে যায়। এভাবে তীরসংলগ্ন বাতাসের গতি হারিয়ে গেলে তীরের বল-পূর্বক গতি আর থাকেনা। যা থাকে তা হলো তার স্বাভাবিক গতি, ভারী জিনিস হিসেবে

যেটি নিচের দিকে। বেশি ভারী ও কম ভারী দুটি জিনিস যদি ওপর থেকে এক সঙ্গে নিচে পড়তে দেয়া হয় কোন্ জিনিসটি আগে ভূমিতে গিয়ে পৌঁছবে? এখানে এরিস্টোট্লের যুক্তিটি হলো ভারী হওয়াটিই বস্তুকে নিচের দিকে গতির গুণ দেয়, তাই বেশি ভারী হলে সেই গতি বেশি হবে। অপেক্ষাকৃত ভারী জিনিসটিই তাই আগে ভূমিতে পৌঁছবে।

পদার্থবিদ্যার যে কোন ছাত্রই বলতে পারবে যে গতি সম্পর্কে এরিস্টোট্লের উপরে বর্ণিত প্রায় সব সিদ্ধান্তই ভুল এবং একেবারে অনাবশ্যক ভাবে জটিল। চার মৌল ও চার মৌলিক ফর্ম সম্পর্কে তাঁর যে সব তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে সেগুলোও ভুল। উদাহরণ স্বরূপ এরিস্টোট্ল যদি বেশ কিছু উঁচু স্থান থেকে ভারী ও হালকা জিনিস এক সঙ্গে ফেলে এবং বাতাসের বাধা সমান রাখার জন্য দুটিকে একই আকৃতি দিয়ে সত্যি সত্যি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতেন তা হলে নিজেই বুঝতে পারতেন যে তাঁর সিদ্ধান্তটি বাস্তবসম্মত নয়– কারণ বেশি ও কম ভারী উভয় বস্তু এক সঙ্গে ভূমিতে পড়ছে। এরকম এক্সপেরিমেন্ট তিনি করেননি। হয়তো সাধারণ যে সব অভিজ্ঞতা সবার হয় হালকা জিনিস (বাতাসে বাধা পেয়ে) ধীরে পড়ে আর ভারী জিনিস দ্রুত পড়ে– সে রকম সচরাচর অভিজ্ঞতাকেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের বাস্তব যাচাই হিসেবে নিয়েছেন, একে গভীরভাবে দেখার কথা ভাবেন নি। তাঁর পরের হাজার বছরেও কেউ তা করেনি, এরিস্টোট্লের যুক্তিটি সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে মেনে নিয়েছেন। প্রায় দু'হাজার বছর পর গ্যালিলিও অন্য ভাবে যুক্তি দিয়েছেন, এক্সপেরিমেন্ট করেছেন এবং শুদ্ধ ঘটনাটি আবিষ্কার করেছেন। এরিস্টোট্লের বাকি অনেক তত্ত্বের পরিণতিও এরকম হয়েছে কিছু আগে পরে।

এই সমস্ত কিছুতে এরিস্টোট্ল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শুরুতেই, তাঁর ভেবে জানা মূলনীতি থেকে। আর তিনি তার সঙ্গে যেটুকু বাস্তব দেখা যোগ করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো মামুলি ভাবে দেখা, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বা এক্সপেরিমেন্ট নয়। ওই যে আকাশের জ্যোতিষ্কগুলোকে ইথারে গড়া বিশুদ্ধ কৃষ্টাল মনে করা, তাদের গতির নিয়ম আলাদা মনে করা– এসবও ভেবে দেখা মূলনীতি থেকেই, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া থেকে নয়। এরিস্টোট্লের সময়ের পর দু'হাজার বছর পর্যন্ত তাঁর এই ভঙ্গিতে বিজ্ঞান চর্চাকে অধিকাংশ বিজ্ঞানী অনুসরণ করে গেছেন। এই পুরো সময় তাঁর তত্ত্বগুলো প্রচুর আলোচিত, বর্ধিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা সমালোচিত হয়েছে। অন্তত জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে আরো বহু হাজার বছর আগে থেকে ভাল বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে প্রায়

নিখুঁত পরিমাপ তথ্য ছিল। গ্রীকরা এবং পরে অন্যান্যরা এই তথ্যকে আরো নিখুঁত করেছে এবং ব্যবহার করেছে। কিন্তু এসব তথ্যের ব্যাখ্যায় যে তত্ত্ব তা এরিস্টোট্‌ল ও তাঁর অনুসারীদের ভুল তত্ত্ব থেকে খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি তাঁর দু'হাজার বছর পর পর্যন্ত।

সেদিনের বিশ্ব-ছবিঃ

গ্রীকদের যে বিশ্ব-ছবি সেটি এক দিনে আসেনি, অনেক জ্যোতির্বিদ-দার্শনিক আরো প্রাচীন ধারণাগুলোর ভিত্তিতে পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারায় গঠিত জানা বিশ্বের কল্পিত বিন্যাসটি গড়ে তুলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এটি মোটের উপর প্লেটো ও এরিস্টোট্‌লের মূল ধারণার ভিত্তিতেই তার মূল চরিত্রগুলো পেয়েছিলো। গ্রীকদের আগেও ব্যাবিলনে, মিশরে, ভারতে, চীনে স্থানীয় উপ- কথা, প্রাচীন ধারণা ও সমসাময়িক বিজ্ঞান ইত্যাদির মিশ্রণে এক এক রকম বিশ্ব-ছবি ছিল বটে, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকরাই প্রথম তাঁদের বিশ্ব-তত্ত্বকে জ্যোতির্বিদ্যার সূক্ষ্ম সব পরিমাপ করা তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিলেন।

আগেই দেখেছি পৃথিবীকে গ্রীক বিজ্ঞানীরা আকাশ-গোলকের মতই আরেকটি গোলক মনে করলেও আকাশের জ্যোতিষ্কের সঙ্গে তাকে একই দৃষ্টিতে দেখেননি– কারণ পৃথিবী তাঁদের মতে স্থূল খুঁতযুক্ত জিনিসে পূর্ণ, আর জ্যোতিষ্কগুলো নিখুঁত বিশুদ্ধ ইথারে তৈরি। পৃথিবী খুঁতযুক্ত হবার কারণ হলো মাটি, পানি, বাতাস, আগুন এই চার মৌলে গঠিত এর বস্তুগুলো এই মৌলগুলোর কোনটিরই বিশুদ্ধ গুণ বজায় রাখতে পারেনা। উদাহরণ স্বরূপ যদি মাটির মধ্যে গাছের শেকড়ের কথা বলি তার মধ্যে চার মৌলের সবগুলোর সুপ্ত রূপ আছে বটে, কিন্তু এর কোনটিই যেটি যেভাবে থাকা উচিত সেভাবে থাকতে পারেনি। যেমন এতে মৌল হিসেবে যে আগুন আছে তা এভাবে মাটির নিচে থাকার কথা নয়, যে মাটি আছে তা আগুনের সঙ্গে মিশে থাকার কথা নয়, যে বাতাস আছে তা উর্ধ্বমুখী না হয়ে এভাবে আবদ্ধ থাকার কথা নয়– ইত্যাদি। কাজেই শেকড় জিনিসটি খুঁতে ভরা, এভাবে সবরকম পার্থিব জিনিসই খুঁতে ভরা; শুধু আকাশের জ্যোতিষ্কই নিখুঁত হতে পারে।

নানা জিনিসের ফরম সম্পর্কে এরিস্টোট্‌লের ধারণা অনুযায়ী ইথারে গড়া আকাশ-গোলকের তুলনায় ভূ-গোলক ভারী। কাজেই এর গতি হবে নিচের দিকে। চারিদিকে আকাশ-গোলকের ইথারের মধ্যে এই ভারি পৃথিবীটি ক্রমাগত

নিচের দিকে যাওয়ার অর্থ হলো আকাশ-গোলকের কেন্দ্রের দিকে চলে যাওয়া। কেন্দ্রই যেহেতু চারিদিকের পরিপ্রেক্ষিতে সব চেয়ে নিচের জায়গা, কাজেই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর ঠাঁই হয়েছে বিশ্বের কেন্দ্রে। একবার কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার পর পৃথিবীর আর গতিপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ কেন্দ্র থেকে সর্‌লে তাকে আবার কেন্দ্রেই ফিরতে হবে। হাজার বছর ধরে শুধু ধারণা বা বিশ্বাস থেকে যে নানা দেশের জ্যেতির্বিজ্ঞানী পৃথিবীকে (তাঁদের কাছে চেপ্টা) বিশ্বের স্থির কেন্দ্র বলে ধরে নিয়েছিলেন এরিস্টোট্‌ল প্রথম তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলেন, যা তাঁর অন্যান্য নানা দার্শনিক–বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটিই এরিস্টোট্‌লের বৈশিষ্ট– যুক্তির মাধ্যমে একটি সার্বিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্ব-তত্ত্ব খাড়া করতে পারা।

পৃথিবীকে কেন্দ্রে স্থাপন করার যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এরিস্টোট্‌ল আরো একটি পুরানো সমস্যার সুরাহা করলেন। দার্শনিকদের মধ্যে একটি বিতর্ক ছিল যে বিশ্ব কি এক না বহু। এই ব্যাপারে এরিস্টোট্‌লের যুক্তি হলো বিশ্ব যদি একটি না হয়ে দুটিও হতো তা হলে তার কেন্দ্র থাকতো দুটি। সেক্ষেত্রে পৃথিবী ঠিক করতে পারতোনা এটি কোন্ কেন্দ্রে যাবে। যেহেতু তা হয়নি পৃথিবী একটি বিশ্বের কেন্দ্রে আছে, কাজেই সেটিই একমাত্র বিশ্ব। বহু শত বছর পর মধ্যযুগে বহুবিশ্বের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিতর্ক আবার চাড়া দিয়ে ওঠেছিলো, এবং তখনো এরিস্টোট্‌ল এ আলোচনায় বেশ প্রাসঙ্গিক ছিলেন। এমনকি একেবারে সাম্প্রতিক কালে অন্য রকম ভাবে মহাবিশ্বের আধুনিকতম ব্যাখ্যায়ও বহু-মহাবিশ্বের গাণিতিক সম্ভাবনাটি সামনে এসেছে। একই ভাবে আমরা দেখবো আমাদের এই বিশ্ব কি অতীতে চিরকাল অপরিবর্তনীয় ভাবে বিরাজ করেছে, না কোন এক মুহূর্তে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিলো, এই প্রশ্নটিও এরিস্টোট্‌লের সময়ে শুরু হয়ে মধ্যযুগেও যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। আর আধুনিক বিগ ব্যাং থিওরি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে গত শতাব্দীতেও এ বৈজ্ঞানিক প্রশ্নটির নিষ্পত্তি হচ্ছিলনা।

প্লেটো, তাঁর ছাত্র বিচক্ষণ জ্যেতির্বিদ ইউডোক্সাস, এবং এরিস্টোট্‌ল প্রমুখ যে বিশ্ব-ছবি দাঁড় করিয়েছিলেন তাতে কেন্দ্রে পৃথিবীটি স্থির এবং তার বাইরে তার সঙ্গে সমকেন্দ্রিক একের পর এক গোলকের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে চাঁদ, এক একটি গ্রহ, সূর্য এবং সবার বাইরের গোলকে স্থির তারাগুলো। গোলকগুলো স্বচ্ছ ইথারের তৈরি বলে সবগুলোর মধ্য দিয়েই আমাদের দৃষ্টি চলে যাচ্ছে ওই জ্যেতিষ্কগুলোর প্রতি। আসলে গোলকগুলো একটির ভেতরে অন্যটি অনেকটা পেঁয়াজের খোসার মত সাজানো। কাজেই এগুলোর প্রত্যেকটি একটি খোলকের

মত কিছুটা পুরুত্ব নিয়ে গোলকাকৃতি, তার ভেতর এর সঙ্গে সংলগ্ন থেকেই আরেকটি খোলক, তার ভেতর আরেকটি, এমনি ভাবে। এদের প্রত্যেকটি গোলক বা খোলক নিজের জ্যোতিষ্কটি নিয়ে নিজের মত গতিতে ঘুরে চলেছে। আগেই দেখেছি এই চিরন্তন বৃত্তাকার সমগতির উৎসটি হলো সবার বাইরের সেই গতিহীন গতি-দাতা। সব চেয়ে বাইরের স্থির তারার গোলকটি বিশ্বের আয়তনের একটি সীমাও নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে।

এভাবে আমরা আশা করতে পারতাম স্থির তারাদের বাদ দিলে অন্য প্রত্যেকটি জ্যেতিষ্কের জন্য একটি করে গোলক থাকবে– অর্থাৎ চাঁদ, সূর্য, পাঁচটি গ্রহ এই সাতটি জ্যোতিষ্কের জন্য সাতটি গোলকের প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আকাশ-গোলকের সংখ্যা আরো বেশি এবং বিভিন্ন জ্যেতির্বিদের হাতে এই সংখ্যা পরিবর্তিতও হয়েছে। এর কারণ পর্যবেক্ষিত যেই জটিলতর গতি এ চাঁদ, সূর্য, গ্রহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেখা যায় নানা গোলকের গতির সমন্বয়ে তার ব্যাখ্যা যাতে সম্ভব হয় সে জন্য এক একটি জ্যেতিষ্ককে কয়েকটি গোলকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে হয়। ইউডোক্সাস এভাবে মোট ২৬টি গোলকের কল্পনা করেছিলেন। পরে সূর্য, চাঁদ, বুধ, শুক্র, মঙ্গল এই ৫টির প্রত্যেকটির জন্য ৫টি গোলক এবং বাকি বৃহস্পতি ও শনির জন্য ৪টি করে সর্ব মোট ৩৩টি গোলক ধরে নেয়া হয়েছিলো। এর ওপর ভিত্তি করে এরিস্টোট্‌লের বিশ্ব-ছবি রচিত হয়েছিলো, কিন্তু পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আরো ভাল ভাবে মেলাবার খাতিরে তাঁর হাতে গোলকের সংখ্যা ৫৫ তে গিয়ে পৌঁছেছিল। বোঝাই যাচ্ছে যথেষ্ট জটিল ছিল এই বিশ্ব-ছবি। তবে এই বিশ্ব-ছবি পূর্ণতা পেয়েছিলো আরো প্রায় ৫০০ বছর পর মিশরের রোমান শাসিত নগর আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমির হাতে। এটিই পরবর্তী দেড় হাজার বছর বিশ্ব-ছবি হিসেবে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিলো। একদিকে এটি এরিস্টোট্‌লের পূর্ণ ভাবধারা রক্ষা করেছে অন্য দিকে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে নিখুঁত ভাবে মিলে গেছে। কিন্তু সমস্যাটি ছিল এটি অতি মাত্রায় জটিল একটি ব্যবস্থা– বিজ্ঞান যে সারল্য আশা করে সেটি দিতে অক্ষম। এ সব আমরা পরে দেখবো।

পুরানো তত্ত্বের নবায়ন

অনুবাদ, অবদান, পুনঃঅনুবাদঃ

গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ তুঙ্গে পৌঁছেছিল রোমান রাজত্বের মধ্যেই। রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই চর্চা ম্রিয়মান হতে হতে এক সময়

প্রায় লোপ পায়। রোমান সম্রাটরা খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার পর ওই সাম্রাজ্যের যে কাঠামোটুকু বিভক্ত রূপে পশ্চিমে রোমকে রাজধানী করে এবং পূর্বে কনস্টান্টিনোপলকে (বর্তমান ইস্তাম্বুল) রাজধানী করে টিকে ছিল, সেখানে শিক্ষাদীক্ষা ও চর্চায় খৃষ্টান চার্চ ও মঠগুলোর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। খৃষ্ট ধর্মতত্ত্ব ছাড়া অন্য সব জ্ঞানকে ওখানে চরমভাবে বর্জন করা হয়েছিলো। এর প্রভাবে গ্রীক দর্শনের চর্চা দূরে থাকে, তার আকর সেই বিখ্যাত সব দার্শনিকের বিখ্যাত সব বইও প্রায় হারিয়ে যায়। পাশ্চাত্যে এভাবে যা শেষ হয়ে যায় প্রাচ্যে তা নতুন ভাবে আবিষ্কৃত হয় ভারতীয় ও ইসলামী বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে। বিশেষ করে উদীয়মান ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে– আরবে, পারস্যে, স্পেনে এবং মধ্য এশিয়ায় পরস্পর যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রীকদের মতই একটি প্রাণবন্ত দার্শনিক–বৈজ্ঞানিক সমাজ গড়ে ওঠে।

আব্বাসীয় খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদ হয়ে ওঠে এর একটি কেন্দ্র– তা ছাড়া ইসলামী দুনিয়ার অন্যান্য নানা স্থানেও গড়ে ওঠে অন্যান্য কেন্দ্র। অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদের বিখ্যাত *দারুল হিক্‌মায়* (জ্ঞান কেন্দ্র) নানা দেশীয় ও নানা ধর্মীয় জ্ঞানীদের সমাবেশে বিজ্ঞানের চর্চা জোরদার হয়েছিলো। সেখানকার একটি বড় প্রয়াস ছিল অনুবাদ বিভাগ। এখানে এবং অন্যত্র গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সব বিখ্যাত বই আরবীতে অনুবাদ করা হয় এ সময়; আর এগুলোই হয় এখানকার বিজ্ঞান চর্চার বড় আকর গ্রন্থ। এভাবে গ্রীকরা খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দিকে যেখানে শেষ করেছিলেন, ইসলামী বিজ্ঞানীরা অষ্টম শতাব্দী নাগাদ তারই যেন পুনরাবিষ্কার করে সেখান থেকে শুরু করেছিলেন।

অন্য দিকে তার কিছু আগে থেকেই ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞানে জোয়ার এসেছিলো যা প্রাচীন ব্যবিলনীয় বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে আলেকজান্ডারের বিজয়ের সঙ্গে আসা গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে সমৃদ্ধ হচ্ছিলো। ভারতীয় গণিতবিদরা এ সময় সংখ্যা ব্যবস্থা, এ্যালজেব্রা আর ত্রিকোণমিতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন– বলতে গেলে এই তিনটিকেই সম্পূর্ণ নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। ১ থেকে ৯ সংখ্যার জন্য নয়টি চিহ্ন এবং সেই সঙ্গে ০ (শূন্য) নামক একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা ও নতুন সংখ্যার আবিষ্কারের মাধ্যমে তাঁরা এ যাবত প্রচলিত অত্যন্ত জটিল অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতিকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন। এই সংখ্যা-ব্যবস্থাটাই পরে আরবরা নানা দেশে বিশেষ করে ইউরোপে পরিচিত করার সুবাদে এটি আরবী সংখ্যা ব্যবস্থা হিসেবেই অধিক পরিচিত হয়েছে। গ্রীসে অঙ্কুরিত এবং ভারতে বিকশিত এ্যালজেব্রা এবং

ত্রিকোণমিতিও এভাবে আরবদের হাতে অনেকটা আধুনিক রূপ নিয়ে পরবর্তী বিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। গণিতের এই অগ্রগতি বিজ্ঞানের জন্য দারুণ কাজ দিয়েছে। জ্যামিতি গ্রীক বিজ্ঞানের জন্য যা করেছিলো, এই সব নতুন গণিত তা আরো অগ্রসর ভাবে করতে পারলো।

এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে খ্যাতি পেয়েছেন নবম শতাব্দীতে দারুল হিকমার একজন অধ্যক্ষ ইবনুল মূসা আল খারেজেমী। তিনি ভারতীয় এ্যালজেব্রাকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের মাধ্যমে অনেকটা আধুনিক ধাঁচে প্রকাশ করেন যা পরে সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের নাম *হিসাব আল জেবর ওয়াল মুকাবিলাহ* (পুনস্থাপন ও পরস্পর-নিরসনের মাধ্যমে হিসাব)। ওই আলজেবর শব্দটি থেকেই বিষয়টির নাম এ্যালজেব্রায় পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে গণিতের এই শাখা বিজ্ঞান চর্চায় প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আলখারেজেমীর আর একটি বইয়ে তথাকথিত আরবী সংখ্যা ব্যবস্থা, শূন্যের ব্যবহার ইত্যাদি প্রাঞ্জল ভাবে তুলে ধরা হয়েছিলো। বেশ কয়েক শতাব্দী পর এর ল্যাটিন অনুবাদের ও ব্যাখ্যার প্রারম্ভিক কথাটি ছিলো *ডিক্সিট আলগোরিজমী* অর্থাৎ 'আলখারেজেমী বলেন'। সেখান থেকেই আজকের গণিত ও কম্পিউটার-বিজ্ঞানে বহুল ব্যবহৃত 'আলগরিদম্' শব্দটি চালু হয়েছে।

গ্রীক গ্রন্থগুলোর আরবীতে অনুবাদের ফলে গ্রীক দার্শনিকদের সমস্ত বিষয়গুলো এত বছর পর আবার বিজ্ঞানীদের চর্চায় চলে এলো– বিশেষ করে ইসলামী অঞ্চলগুলোর বিজ্ঞানীদের চর্চায়। এরিস্টোট্‌লের বিজ্ঞান নিয়ে তাঁদের কাজ এর যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে, গ্রীক ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সেসব একটি বড় যোগসূত্রের কাজ করেছে। তাছাড়া আরব বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মৌলিক অবদানটিও ছিল যথেষ্ট। আধুনিক বিজ্ঞান সেখানে না আসতে পারলেও তাঁদের অবদানটি পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয় বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে বহুদূর যেতে পারার কারণ হলো আর এক দফা অনুবাদের কাজ– এবার আরবী থেকে ল্যাটিনে। ল্যাটিন তখন ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা। অষ্টম থেকে দ্বাদশ এই ক'টি শতাব্দীতে ইসলামী দুনিয়ায় বিজ্ঞানের চর্চা ও উন্নয়ন যেমন হয়েছে, সেগুলোর আরবী আকর গ্রন্থগুলো এবং আরবীতে অনুদিত গ্রীক দার্শনিকদের বিখ্যাত গ্রন্থগুলো তখন আরবী থেকে ল্যাটিনে অনূদিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে ইউরোপের আদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পত্তন হয়– অক্সফোর্ড, প্যারিস, বলোনিয়া, ক্যাম্ব্রিজ ইত্যাদি। যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং জ্ঞানচর্চার অন্য সব কেন্দ্র প্রায় সম্পূর্ণরূপে সেখানে ধর্ম-যাজক-পন্ডিত ও চার্চ প্রতিষ্ঠানের আওতায়, তবুও গ্রীক

ও গ্রীক-পরবর্তী ইসলামী দুনিয়ার বিজ্ঞান-দর্শনের প্রতি সেখানে নতুন করে আগ্রহ দেখা দেয়। আরবী থেকে ল্যাটিনে অনুবাদের চাহিদাটি সে কারণেই।

তা ছাড়া শুধু গ্রন্থের মাধ্যমে নয়, সাক্ষাতে ইউরোপীয় ও আরবীয় পন্ডিতদের মধ্যে আলোচনার একটি চাহিদাও তৈরি হয়। এর সুযোগ বিশেষ ভাবে ঘটেছিলো স্পেনে– যেখানে তখন পাশাপাশি রাষ্ট্রে মুসলিম এবং খৃষ্টান শাসন বজায় ছিল। দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ বিশেষ করে স্পেনের টলেডো নগর উভয়ের পণ্ডিতদের একটি বড় মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। স্পেনে দু'একটি জায়গায় খুবই স্থানীয় ভাবে মুসলিম শাসন পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বজায় ছিল। আরব ও ইউরোপীয়দের সাক্ষাত যোগাযোগের আর একটি অঞ্চল ছিল দক্ষিণ ইতালী ও সিসিলি। নবম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে স্থানীয় ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে কমবেশি পুরো একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বজায় থাকে। রাজত্ব শেষ হয়ে গেলেও এ অঞ্চলে আরবদের সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপস্থিতি চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। এসব কারণে মধ্যযুগের এই শেষ অংশে এসে ইউরোপে আরব পণ্ডিতদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপীয় পন্ডিতদের সঙ্গে একই ভাবে আলোচিত, সমালোচিত ও চর্চিত হয়েছে। আরব বিজ্ঞানীদের কারো কারো গ্রন্থ এসময় ইউরোপে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কোষগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতো। এটি এত স্বাভাবিক ভাবে হতো যে ল্যাটিন অনুবাদে বইয়ের নাম, বিজ্ঞানীর নাম, বিষয়বস্তু ইত্যাদির আরবী নামের ল্যাটিন অপভ্রংশগুলোই সবার কাছে বেশি পরিচিত হয়ে ওঠেছিলো। যেমন খুব বিখ্যাত ইসলামী পন্ডিতদের মধ্যে ইব্নে সিনা হয়ে গিয়েছিলেন আভেসিনা, ইব্নে রুশ্দ হয়ে গিয়েছিলেন এভেরোজ, ইবনুল হিশ্শাম হয়ে পড়েছিলেন আলহাজেন, আর আল্রাজী হয়ে পড়েছিলেন রাজেস।

প্রাচীন বিজ্ঞান, নতুন দৃষ্টিঃ

ইব্নে সিনার কার্যকাল ১০০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ, অর্থাৎ এরিস্টোট্লের প্রায় ১৩৫০ বছর পর। ইব্নে সিনা যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবেই সারা দুনিয়ায় বেশি পরিচিত, দার্শনিক-বিজ্ঞানীরা সে সময় তাঁকে তাঁদের একজন গুরু বলে মানতেন, যা এরপর বহু শতাব্দী বজায় ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতির একটি বড় কারণ এরিস্টোট্লের বিজ্ঞানকে তিনি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সমালোচনার সম্মূখীন করেছিলেন। বিশেষ করে এরিস্টোট্ল যে বস্তুর স্বাভাবিক গুণকে একটি স্বতসিদ্ধ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন ইব্নে সিনা তা মানতে রাজি ছিলেন না। তিনি বল্লেন হ্যাঁ এই গুণের কারণটি অন্তর্নিহিত হতে পারে, কিন্তু সেই কারণটি

উদ্‌ঘাটন করতে হবে, স্বতসিদ্ধ বলে ছেড়ে দিলে হবেনা। যেমন সব কিছুর একটি 'স্বাভাবিক গতি' থাকার কথা বলা হয়েছে, তারও কারণ বের করা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি নি:সন্দেহে আধুনিক বিজ্ঞানের বেশি কাছাকাছি। ব্যাপারটিকে বোঝাবার জন্য ইব্‌নে সিনা একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি বল্‌লেন ধরা যাক একজন দর্শক জীবনে কোনদিন চুম্বকের কথা শোনেন নি। দর্শকটি দেখলেন একটি চুম্বক আপনা আপনি সামনের দিকে যাচ্ছে। তাই তিনি হয়তো ভাবতে পারেন যে এটি এই জিনিসটির অন্তর্নিহিত গুণ; মনে হতে পারে এই গুণের কারণ খোঁজার প্রয়োজন নেই– ব্যাপারটি এতই স্পষ্ট। কিন্তু আসল ঘটনা হলো কাছেই কিছু লোহা আছে বলেই চুম্বকটি গতিশীল হয়েছে। তাই এই দর্শকের উচিত হলো লোহার উপস্থিতি এবং লোহার সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্ক উদ্ঘাটন করা।

ইব্‌নে সিনা গ্রীক বিজ্ঞানের অন্যান্য কিছু তত্ত্বেরও সমালোচনা করেছেন– তারমধ্যে একটি হলো ডেমোক্রিটাসের এটমিক থিওরি। তাঁর সমালোচনার মুখ্য লক্ষ্যবস্তু অবশ্য ছিল ইসলামী দর্শনের মধ্যেই 'কালাম' নামের একটি মতবাদ যা নিজেও এটমিক থিওরির মতই অবিভাজ্য এটম সম্পর্কিত একটি তত্ত্ব প্রচার করছিলো। এটমিক থিওরির গ্রীক সমালোচকরাই বলতেন যে যেহেতু আকৃতি থাকার কারণে এটমের একাধিক তল আছে, কাজেই এটি অবিভাজ্য হতে পারেনা। এ সমালোচনার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আর একজন গ্রীক এটমিস্ট এপিকিউরাস বলেছেন কাটতে থাকার এক পর্যায়ে সব এটমকে আমরা এক তলে পরিণত করতে পারি। এই একই তল নানা দিকে বিরাজ করে এটমকে আকৃতি দেয়। কিন্তু ইব্‌নে সিনা বললেন সেটিও সম্ভব নয়; এটমের যে একটিই তল হতে পারেনা। সেটি দেখাতে তিনি একটি কাল্পনিক এক্সপেরিমেন্টের সাহায্য নিলেন। মনে করি আমি একটি পাতলা পাতকে আমার চোখ আর সূর্যের মাঝখানে রাখলাম। তা হলে ওই পাতটির স্পষ্ট দুটি তল আছে– একটি সূর্যের দিকে এবং অন্যটি আমার দিকে। সূর্যের দিকের তলটি আলোকিত হচ্ছে, আমার দিকেরটি নয়– এরা তাই ভিন্ন তল। যদি কেউ বলে সূর্যের দিকের তল ও আমার দিকের তল একই তল, তা হলে আমি, পাতটি এবং সূর্য একাকার হয়ে যাবো, কারণ সেক্ষেত্রে যে তল সূর্যের দিকে সে তল আবার আমার দিকেও হবে। যেহেতু এটি সম্ভব নয়, কাজেই ধারণাগত ভাবেও পাতটির দুটি তল থাকছেই, দুই তলকে দুই ভাগ করার সুযোগও থাকছে। কাজেই এটম অবিভাজ্য নয়। এখানে ইব্‌নে সিনার বিজ্ঞানের পদ্ধতিটি লক্ষ্যনীয়। তিনি এক্সপেরিমেন্টের অবতারণা

করেছেন– যদিও তা মনে মনে এক্সপেরিমেন্ট। এসব ব্যাপারে কোন রকম এক্সপেরিমেন্টই তাঁর আগে দেখা যায়নি, এদিক থেকে এটি একটি শুভ সূচনা। আর মনে মনে এক্সপেরিমেন্টের রীতি বর্তমান বিজ্ঞানেও চালু রয়েছে।

এটম ছাড়া এটমিক থিওরির অন্য উপাদানটি হলো শূন্যস্থান। শূন্যস্থানকে এরিস্টোট্‌ল যেভাবে নাকচ করেছিলেন ইব্‌নে সিনার কাছে তা যথেষ্ট মনে হয়নি। এরিস্টোট্‌ল বাস্তব কারণ দেখিয়ে বলেছিলেন প্রকৃতি কোন কিছু শূন্য রাখতে চায়না। ইব্‌নে সিনা কিন্তু দেখাবার চেষ্টা করলেন শূন্যস্থানের ধারণাটাই অবৈধ। তিনি বল্‌লেন পৃথিবীতে যত কিছু আছে পার্থিব জিনিস হিসেবে তারা সবই একই গোত্রের (প্রজাতির) হতে হবে। কোন কিছু যদি আছে মনে করি তা অবশ্যই এই গোত্রেরই একটি সদস্য। তা হলে তাঁর প্রশ্ন হলো শূন্যস্থান কি আছে, না নেই। যদি থাকে তা হলে তার মধ্যেও ওই গোষ্ঠিগত গুণ ইতিবাচক ভাবে থাকতে হবে; 'নেই' এর মত নেতিবাচক হতে পারেনা। যেহেতু শূন্যস্থানে সেরকম ইতিবাচক কিছু নেই, কাজেই আর দশটা জিনিসের সমগোত্রীয় হয়ে শূন্যস্থান বলে কিছু থাকতে পারেনা। ইব্‌নে সিনার এই যুক্তি অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞান খন্ডন করেছে। এখন আমরা জানি শূন্যস্থানে বহু রকম ইতিবাচক গুণ থাকতে পারে– যেমন মহাকর্ষ ক্ষেত্র, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, বস্তুকণা জন্ম দেবার ক্ষমতা ইত্যাদি। কিন্তু ইব্‌নে সিনার কালে এগুলো আবিস্কৃত হয়নি।

এ প্রসঙ্গে ইসলামী দুনিয়ার আর একজন দার্শনিক আল্‌ ফারাজীর 'শূন্যস্থান সম্পর্কে' নামক বইটি উল্লেখযোগ্য। তিনি কাজ করেছেন ইব্‌নে সিনার প্রায় এক শ' বছর পর। এই বইয়ে শূন্যস্থান আছে কি নেই দেখার জন্য একটি এক্সপেরিমেন্টের কথা উল্লেখ আছে। এতে তিনি চুপসে যেতে পারে এমন একটি বাটি আকৃতির জিনিস পানির ভেতরে উপুড় করে ধরে দেখার চেষ্টা করেছেন বাটিটির বাতাস বের করে দিয়ে সেখানে পানির ওপর শূন্যস্থান থাকে কিনা। অবশ্য সব রকম চেষ্টার পর তিনিও এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে শূন্যস্থান সম্ভব নয়। তবে সেই যুগে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে একটি বিতর্কিত তত্ত্ব হাতেকলমে নিষ্পত্তি করার চেষ্টাটি অনন্য।

১১৭০ সালের দিকে স্পেনের কর্ডোভায় জন্মগ্রহণকারী দার্শনিক ইব্‌নে রুশদের খ্যাতি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিলো; এর বড় কারণ প্লেটো আর এরিস্টোট্‌লের দর্শনের ওপর তাঁর ব্যাখ্যা আর টিকা সমূহ। ওই দুই গ্রীক দার্শনিকের প্রায় সব গ্রন্থের ওপর ইব্‌নে রুশদের এই ব্যাখ্যাগুলো ছিল– সংক্ষিপ্ত, মাঝারি, এবং বিস্তারিত– এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা। এর মধ্যে 'তাফসীর' নামে পরিচিত

বিস্তারিত ব্যাখ্যাগুলোতে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা এতই প্রাঞ্জল যে বলা যায় ইউরোপীয় পন্ডিতরা প্লেটো আর এরিস্টোট্‌লকে বোঝার জন্য অনেকাংশে ইব্‌নে রুশদের ওপর নির্ভর করেছেন। তবে সমসাময়িক আরব পন্ডিতদের অনেকে এমন অভিযোগও করেছেন এরিস্টোট্‌লের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব অনেক সময় যুক্তিকে ছাড়িয়ে যায়।

এরিস্টোট্‌ল অবিভাজ্য এটমকে স্বীকার না করলেও সব বস্তুর একটি সাধারণ ন্যূনতম অংশ আছে এমন কথা মানতেন। ওই ন্যূনতম অংশকেও ভাগ করা যায়, কিন্তু তা করলে বস্তুটির গুণ আর ওতে অক্ষুণ্ন থাকেনা, মৌল থেকে যৌগ সৃষ্টিতে কাজে লাগে না। মৌল থেকে যৌগ বস্তু তৈরি হলে তাতে মৌলের কী অবস্থা ঘটে তা নিয়ে চতুর্দশ শতাব্দীর ইউরোপে আবার বেশ বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ইব্‌নে সিনা এবং ইব্‌নে রুশদের রচিত বইয়ের যুক্তিগুলো এই বিতর্কে পরস্পর প্রতিপক্ষ হিসেবে বড় ভূমিকা রেখেছে– যদিও তাঁরা দু'জনেই তখন অনেক দিন ধরে পরলোকে। এরিস্টোট্‌ল বলতেন যৌগের মধ্যে মৌলের আলাদা অস্থিত্ব থাকেনা। কিন্তু ইব্‌নে সিনার কথা হলো মৌলের বস্তুগত অস্তিত্ব যৌগের মধ্যেও বজায় থাকবে। যা সেখানে অক্ষত থাকেনা তা হলো মৌলের গুণগুলো। যৌগের মধ্যে বিভিন্ন মৌলের গুণগুলো পরস্পর মিশে একটি মধ্যবর্তী রূপ লাভ করে। চতুর্দশ শতাব্দীর ইউরোপীয় পন্ডিতরা এর মধ্যে যে সমস্যা দেখতে পাচ্ছিলেন তা হলো মৌলের বস্তুগত অস্থিত্ব পাশাপাশি বজায় রেখে গুণের পক্ষে মধ্যবর্তী রূপ ধারণ সম্ভব নয়, কারণ তা হলে গুণের মিশ্রণটি সত্যিকার অর্থে একেবারে মাখামাখি মিশ্রণ হবেনা। অথচ তাঁরা এরিস্টোট্‌লের মত যৌগের মধ্যে মৌলের কোন অস্থিত্ব নেই এটিও মানতে চাইতেননা। যৌগের মধ্যে মৌলের গুণ বদলের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে এরিস্টোট্‌ল বলতেন– 'বস্তুগত ফর্‌ম কখনো বাড়তেও পারেনা, কমতেও পারেনা'। মানুষের উপমায় এই একই কথা তিনি এভাবে বলতেন 'এক মানুষ আরেক মানুষের থেকে বেশি কোন মানুষ নয়'। যৌগের ভেতর মৌলের উপস্থিতিটি কী রকম এই বিতর্কিত বিষয়টি আধুনিক বিজ্ঞানেও গুরুত্ব হারায়নি।

একটি খুব গূঢ় বিষয়ে এরিস্টোট্‌ল, ইব্‌নে সিনা, ইব্‌নে রুশদ তিন জনেরই দারুণ মতৈক্য ছিল– তা হলো বিশ্ব চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর অনেক ইউরোপীয় পন্ডিত মনে করতেন বিশ্ব সব সময় ছিলনা– কোন এক মুহূর্তে এর সৃষ্টি হয়েছে। চিরন্তন বিশ্বের পক্ষে এরিস্টোট্‌ল তাঁর *ফিজিক্স* নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে শুধু বস্তু থেকেই বস্তু আসতে পারে, অন্য কিছু থেকে

নয়, শূন্য থেকেও নয়। কাজেই নতুন করে বিশ্ব সৃষ্টির কথা অবান্তর। তাছাড়া এরিস্টোট্‌ল তো প্রমাণই করেছেন যে শূন্যস্থান সম্ভব নয়। বিশ্ব কোন মুহূর্তে সৃষ্টি হওয়া মানে তো এর আগে শূন্যস্থান থাকা– সেটি সম্ভব নয়। ইব্‌নে সিনা এবং ইব্‌নে রুশদ এরিস্টোট্‌লের এসব যুক্তি সমর্থন করেছেন বটে কিন্তু আরেক জন ইসলামী দার্শনিক আল গাজ্জালি (১১০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ) উল্‌টো যুক্তিতে বলেছেন যে বিশ্ব যদি চিরন্তন হতো তা হলে অনাদিকাল থেকে এখানে জমা 'আত্মার' সংখ্যা অসীম হতো, সেটি সম্ভব নয়; কাজেই বিশ্বের বয়স সসীম। ইউরোপের যাজক-দার্শনিকদের অধিকাংশই আল গাজ্জালির মত বিশেষ মুহূর্তে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এমন মতের পক্ষেই আরো নানা যুক্তি দেবার চেষ্টা করেছেন। এরকম খুবই প্রভাবশালী একজন যাজক-দার্শনিক টমাস আকুইনাস অবশ্য এরিস্টোট্‌লের মতকেও একেবারে ফেলে দিতে চাননি। তিনি বলেছেন দার্শনিক যুক্তি দিয়ে এই বিষয়টির সুরাহা করা যাবেনা, এটি বিশ্বাসের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

আসলে বিশ্বাসের কারণে নয়, গাণিতিক ও পরীক্ষণের যুক্তিতেই এই উভয় ধরনের মতের বিস্তারিত তত্ত্ব বর্তমান বিজ্ঞানে মাত্র ৫০-৬০ বছর আগেও পাশাপাশি বজায় ছিল– চিরন্তন বিশ্বের পক্ষে 'স্টীডি স্টেট থিওরি' (সম-অবস্থার তত্ত্ব), এবং কোন একটি মুহূর্তে বিশ্ব-সৃষ্টির পক্ষে 'বিগ ব্যাং থিওরি' (মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব)। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের পর থেকে অবশ্য বিগ ব্যাং থিওরিই একমাত্র প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব।

জটিল তত্ত্বের ঘেরাটোপে

চলে আসা সেই বিশ্ব-ছবি

মহাসংশ্লেষণঃ

আধুনিক বিজ্ঞান আসার আগে অবধি বিজ্ঞান চলেছে নানা প্রাচীন দার্শনিক তত্ত্বকে মূল-নীতি হিসেবে ধরে নিয়ে। এক দিকে বিজ্ঞান সেই মূলনীতিকে ছাড়তে পারেনি, অন্য দিকে বাস্তব পর্যবেক্ষণে যা দেখা যাচ্ছে তাকেও অগ্রাহ্য করতে পারেনি। এই দুইকে নানা কসরৎ করে মেলাতে গিয়ে বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্বগুলো হয়ে পড়েছিলো খুবই জটিল ও ঘোরপ্যাঁচে ভর্তি। ব্যাপারটি স্বাভাবিক ও বিজ্ঞান-সুলভ হতো যদি বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ওই মূলনীতিগুলোকে যাচাই বাছাই করে নতুন তত্ত্ব নিয়ে এগুনো যেতো। কিন্তু সেটি সম্ভব হয়নি কারণ ওসব তত্ত্বের প্রবক্তরা ছিলেন এরিস্টোট্‌ল, প্লেটোর মত ডাকসাইটে দার্শনিক-বিজ্ঞানী। তাঁদের চিন্তার প্রভাব ছিল হাজার বছর ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে এই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা কিছু হয়েছে তার অধিকাংশই ওই জটিল তত্ত্বগুলোর ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেই হয়েছে, তার বাইরে গিয়ে নয়।

এর একটি খুব বড় মাপের উদাহরণ হলো সেদিনের বিশ্ব-তত্ত্ব। প্লেটো আর এরিস্টোট্‌লের দেয়া বিশ্ব-ছবি আরও শ'পাঁচেক বছর পর গ্রীক শাসিত মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমির হাতে একটি অত্যন্ত গাণিতিক ও সুসংবদ্ধ তত্ত্বে পরিণত হয়েছিলো। এটি তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর বিখ্যাত ও বিশাল গ্রন্থ *মেগালে সিন্‌টেক্সিসে*; এ নামের অর্থ হলো মহাসংশ্লেষণ। প্রকৃতির নানা জ্ঞানের সংশ্লেষণে বিজ্ঞানের একটি সম্পূর্ণ রূপ গড়ে তোলাটাই উদ্দেশ্য ছিল বলে এই নাম। গ্রীকদের অন্যান্য অনেক মূল্যবান গ্রন্থের মত এটিও পরে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী কালে এটি দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের হাতে এসেছে আরবী অনুবাদে; ওখানে আরবী অপভ্রংশে এর নামটি হয়ে গড়েছে *আলমাজেস্ট*; সে নামেই গ্রন্থটি পরে অধিক পরিচিত হয়েছে। তারও পরে অবশ্য এটি আরবী থেকে ল্যাটিনে অনূদিত হয়ে শেষ-মধ্যযুগে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চর্চার বিষয় হয়েছে। টলেমির আলমাজেস্ট যুগ যুগ ধরে বিশ্ব-তত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও গণিতের ক্ষেত্রে একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

তাঁর তত্ত্বে টলেমি যে বিশ্ব-ছবি খাড়া করেছেন তা মোটের ওপর এরিস্টোট্‌লের বিশ্ব-ছবির ভিত্তিতেই গড়া। এতে বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী আর তার বাইরে একের পর এক সমকেন্দ্রিক নানা গোলক– এক একটি 'গ্রহ' যার কয়েকটি করে গোলকের মধ্যে প্রোথিত ও সংযুক্ত। এই গোলকগুলোর নানা ভাবে আবর্তনই প্রত্যেকটি গ্রহকে তার পর্যবেক্ষিত গতি দিয়ে থাকে। আবার একেবারে বাইরের দিকের স্থির তারাগুলোকেও। শুরুতে টলেমি আগের মত এই গোলকগুলোর কথা বল্‌লেও বইয়ের পরবর্তী খণ্ডগুলোতে তিনি গ্রহকে গোলকের একটি টুকরা (স্লাইজ) বা বৃত্তাকার কক্ষপথের সঙ্গে সমগতিতে চলমান হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু এই কক্ষপথ সোজাসাপটা কক্ষপথ বলতে আমরা যা বুঝি সেরকম নয়, তার চেয়ে জটিল। একে জটিল করতে হয়েছে এরিস্টোট্‌লের নীতি আর গ্রহের পর্যবেক্ষিত গতির মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টির জন্য। এমনিতে এই সামঞ্জস্য দেখা যায়না যেমন মঙ্গল গ্রহ এবং আরো কিছু গ্রহ বিশেষ বিশেষ সময়ে হঠাৎ করে অস্থায়ী ভাবে উল্‌টো দিকে চলা আরম্ভ করে, পরে অবশ্য পূর্ব অভিমুখে ফেরৎ আসে। এরিস্টোট্‌লের মূলনীতির মধ্যে আকাশের কোন জ্যোতিষ্কের এরকম অনিয়মিত গতিতে চলার কোন সুযোগ নেই।

কাজেই টলেমিকে বৃত্তের ওপর বৃত্ত (এপিসাইকেল) নামের ব্যবস্থা কক্ষপথের জন্য ধরে নিতে হয় যাতে গ্রহ ঠিকই এরিস্টোট্‌লের নীতি নির্ধারিত ভাবে বৃত্তাকার পথে একই দিকে সমগতিতে চলবে, কিন্তু পৃথিবী থেকে একে কখনো এদিকে, আবার কখনো গতি বদলিয়ে উল্‌টো দিকে যেতে দেখা যাবে। এই চিত্র অনুযায়ী গ্রহটি আসলে ঘোরে ছোট বৃত্ত এপিসাইকেলের ওপর। ওই এপিসাইকেলের কেন্দ্রটি আবার চলমান থাকে বড় বৃত্ত অর্থাৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করা গ্রহের কক্ষপথে। এর ফলে পৃথিবী থেকে মনে হবে যেন গ্রহটি এপিসাইকেলে চক্কর খেতে খেতে এই কক্ষপথে ঘুরছে– তাই কখনো কখনো স্বাভাবিকের উল্‌টো পথেও যাচ্ছে। ঠিক যেভাবে যখন এক একটি গ্রহকে এভাবে সত্যি উল্‌টো পথে চলতে দেখা যায় তার সঙ্গে মেলানোর মত করেই এপিসাইকেলের ব্যাস, সংখ্যা ইত্যাদি ঠিক করতে হয়েছে।

গ্রহগুলো যেমন সমগতিতে চলতে দেখা যায়না, তেমনি সূর্যকেও দেখা যায় ঋতু অনুযায়ী দ্রুত বা ধীর গতিতে চলতে। একে ব্যাখ্যা করার জন্য টলেমিকে বিশ্ব-ছবির এমন একটি জায়গায় সীমিত ভাবে হাত দিতে হয়েছে যা শুধু এরিস্টোট্‌লের দেয়া নীতি নয় আরো প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা ধারণার থেকেও ভিন্ন। তিনি পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র থেকে অল্প একটু সরিয়ে দিয়ে এতে

একটি উৎকেন্দ্রিকতার সৃষ্টি করলেন। ফলে পৃথিবী থেকে যখন সূর্য অপেক্ষাকৃত একটু বেশি দূরে থাকে (উৎকেন্দ্রিকতার কারণে) তখন তাকে একটু ধীরে ঘুরছে বলে মনে হয়, আবার যখন অপেক্ষাকৃত কাছে থাকে তখন একটু দ্রুত ঘুরছে বলে মনে হয় (যেমন একই গতিতে চলা বিমান যখন দূর আকাশে থাকে তখন আমাদের দৃষ্টিতে অতি ধীর মনে হলেও সেটিই কাছে দিয়ে গেলে দ্রুত হুস্ করে চলে গেল মনে হয়)। পৃথিবী থেকে দেখা সূর্য যেভাবে গতিবেগ পরিবর্তন করে, তেমনি গ্রহগুলোও করে। এটি ব্যাখ্যা করার জন্য টলেমি আরো জটিল পরিবর্তনের শরণাপন্ন হলেন। তিনি গাণিতিক হিসেব মত 'ইকোয়েন্ট' নামের একটি কাল্পনিক বিন্দুকে এরিস্টোট্লের বিশ্বের নিয়ম মানা কাল্পনিক দর্শকের স্থান বলে সাব্যস্ত করলেন। অর্থাৎ এতদিন যে মনে করা হতো কক্ষপথের কেন্দ্র থেকে দেখলে গ্রহকে বৃত্তাকারে সমগতিতে ঘুরতে দেখা যাবে, এখন তা আর রইলোনা। ওই কেন্দ্রের একটু দূরে ইকোয়েন্ট বিন্দু থেকে দেখলেই শুধু তা হবে। উৎকেন্দ্রিকতার ধারণা এনে যেমন পৃথিবীকে কক্ষের কেন্দ্র থেকে একদিকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, তেমনি ইকোয়েন্টের ধারণা এনে আদর্শ পর্যবেক্ষণ স্থানকে কক্ষের কেন্দ্র থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দেয়া হলো। এপিসাইকেল, উৎকেন্দ্রিকতা, ইকোয়েন্ট এত সব ব্যবস্থা করে টলেমির বিশ্ব-ছবির দেয়া হিসেবকে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মেলানোর ব্যবস্থা হলো বটে কিন্তু এর ফলে ছবিটি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়লো, তার গাণিতিক চরিত্র সত্ত্বেও।

টলেমির এই বিশ্ব-ছবি কিন্তু বিশেষজ্ঞদের খুব কাজে এলো। এর থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রায় সব রকম তথ্যের ব্যাখ্যা তো দেয়া গেলই, এর বিভিন্ন দিকে শুদ্ধ পূর্বাভাসও দেয়া গেলো। এই প্রথম একেবারে গাণিতিক বিশুদ্ধতায় বিজ্ঞানীরা আমাদের বিশ্বের একটি বৈজ্ঞানিক ছবি হাতে পেলেন। এমনকি টলেমি এই বিশ্বের একটি আয়তনও তাঁর মডেল থেকে হিসেব করে বের করেছিলেন- এটি পৃথিবীর ব্যাসের ২০ হাজার গুণের কিছু বেশি। আরব অনুবাদকরা টলেমির প্রায় সাতশ' বছর পর আবার যখন আলমাজেস্টকে সমসাময়িক জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিকদের উপজীব্য করে তুলেছিলেন তখন থেকেই এটি এই বিষয়ে সবার আকরগ্রন্থ। অবশ্য টলেমির যুগেরই আগে পরে ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা অন্য পথে গ্রীকদের সংস্পর্শে এসে সেখানে টলেমির আগের প্রচলিত জ্যোতির্বিদ্যা এবং টলেমির প্রবর্তিত বিশ্ব-ছবি উভয়ের দ্বারা প্রভাবিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মধ্যযুগে ওই পুনরালোচনা যখন প্রধানত ইসলামী দুনিয়ার বিজ্ঞানীদেরকে কেন্দ্র করে শুরু হলো তখন টলেমির বিশ্ব-ছবিই ছিল তাঁদের আলোচ্য বিষয়। উদাহরণ

স্বরূপ নবম শতাব্দীতে তাবিত ইব্‌নে কুর্‌রা তাঁর *তাহশিল আল মাজিস্টি* (আলমাজেস্ট পরিচয়) নামক গ্রন্থে বিভিন্ন গ্রহের কক্ষ পথ ও পুরো বিশ্বের বিভিন্ন দূরত্বগুলোকে আরো শুদ্ধভাবে নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন টলেমিকে অনুসরণ করেই। আসলে মধ্যযুগের মাঝামাঝিতে এই পুরো সময়টায় ইব্‌নে কুর্‌রার মত গাণিতিক প্রবণতার বিজ্ঞানীরা টলেমির মডেলের হিসাব নিকাশ- গুলোকে আরো নিখুঁত করার চেষ্টায় ছিলেন। অন্যদিকে দার্শনিক মনোভাবাপন্নরা টলেমির বিশ্ব-ছবি কতখানি সত্যিকারের বিশ্বেরই ছবি আর কতখানি নেহাত গাণিতিক মডেল এমনি ধারার প্রশ্ন তুল্‌ছিলেন। ব্যাপারগুলো ঘটছিলো প্রধানত ইসলামী দুনিয়ায়, কারণ ইউরোপের অন্যত্র অথবা আর কোথাও তখনো বিজ্ঞানের এই প্রাণবন্ততা অন্তত দ্বাদশ শতক পর্যন্ত আসেনি।

কাজগুলোর অধিকাংশই টলেমিকে ভিত্তি ধরে হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ নতুন উদ্ভাবনশীল আইডিয়াও আসছিলো। যেমন আল-ফারগানি সূর্যের পরিক্রমণ রেখা (রাশিচক্রে) পৃথিবীর বিষুব রেখার সঙ্গে যে কোণ করে আছে তাকে আরো বাস্তব সম্মত ভাবে নির্ণয় করেছিলেন। এর থেকে তিনি গ্রীকদের চেয়ে অনেক ভাল ভাবে তারাগুলোর দীর্ঘমেয়াদী অবস্থান পরিবর্তনকে (প্রিসেশন) ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছেন। আলরাজী এরিস্টোট্‌লের সসীম বিশ্ব এবং একবিশ্বের ধারণার সমালোচনা করেছেন। তাঁর যুক্তি হলো বিভিন্ন গ্রহ ও তারার মাঝে শূন্যস্থান রয়েছে, আর বিশ্বের বাইরেও অসীম শূন্যস্থান রয়েছে, কাজেই বিশ্ব সসীম হতে পারেনা। তাছাড়া ওই শূন্যস্থানে আরো বিশ্ব না থাকারও কোন কারণ নেই। একাদশ শতাব্দীর আলবিরুনির সঙ্গে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাতে তিনি সাক্ষ্য দিয়ে বলতে পেরেছেন যে কোন কোন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ (যেমন আর্যভট্ট) পৃথিবীর নিজের অক্ষে ঘোরার বিষয় কল্পনা করেছিলেন এবং তাতেও যে জ্যেতিষ্কদেরকে স্থির রেখেই তাদের আপাত দৈনিক গতিকে ব্যাখ্যা করা যার তা তাঁরা মনে করতেন। দ্বাদশ শতাব্দীর ইসলামী স্পেনে ইবনে রুশদ টলেমির উৎকেন্দ্রিকতার অর্থাৎ পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্রে না রেখে খানিকটা সরিয়ে রাখার নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন, এতে এরিস্টোট্‌লের মূল নীতির বিচ্যুতি ঘটেছে বলে। ওদেশেই তাঁর সমসাময়িক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইবনে তুফাইল ও নুরুদ্দীন বেতরুগি টলেমির বিশ্ব-ছবি থেকে উৎকেন্দ্রিকতা, এপিসাইকেল, ও ইকোয়েন্ট একেবারে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন মডেলে এরিস্টোট্‌লকে অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণ ভাবে সফল হলেও পর্যবেক্ষণের সঙ্গে নিখুঁত ভাবে মেলার ক্ষেত্রে এগুলো টলেমির মডেলের সমকক্ষ হয়নি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে টলেমির চর্চা শুরু হলে সেখানে একটি সাধারণ মতবাদ ছিল যে টলেমির বিশ্ব-ছবিটি পর্যবেক্ষণের পূর্বাভাস দেয়ার সুবিধার জন্যই একটি গাণিতিক মডেল হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে, আসল বিশ্ব এরকম নয়। এ মতের বিরোধিতা করেছিলো সমসাময়িক আরব জ্যোতির্বিদদের একটি গোষ্ঠি যা 'মারাঘা' গোষ্ঠি নামে সর্বত্র বিখ্যাত হয়েছিলো। তাঁরা একদিকে গাণিতিক বিশ্ব-ছবিকেই আসল বিশ্ব-ছবি দাবী করছেন, অন্য দিকে পৃথিবীরও গতির অবতারণা করে টলেমির বিশ্ব-ছবির একটি বিকল্প দেবার চেষ্টাও করে গেছেন। এসব থেকে বোঝা যায় যে পরে ১৫০০ শতকে টলেমির বিশ্ব-ছবিকে সম্পূর্ণরূপে চ্যালেঞ্জ করার ব্যাপারটি হঠাৎ করে আসেনি; বহুদিন থেকেই টলেমির তত্ত্বের সমালোচনা ও এর বিরুদ্ধ তত্ত্বগুলো একটু একটু করে পূঞ্জীভূত হচ্ছিলো।

টলেমির আমলে গ্রীক পণ্ডিতদের এবং অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর ইসলামী পণ্ডিতদের গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যার পর চতুর্দশ শতাব্দীর ইউরোপীয় পন্ডিতদের মধ্যে গিয়ে জোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজগুলো ছিলো অনেকটা ব্যবহারিক ধরনের, তাত্ত্বিক ধরনের নয়। টলেমির হিসেবগুলোকে যথাসম্ভব উন্নত করে বিভিন্ন ব্যবহারযোগ্য জিনিসে রূপ দেয়াটাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এর মধ্যে একদিকে ছিল নানা সারণি, পঞ্জিকা, রাশিফল, ক্যাটালগ ইত্যাদি নথি তৈরি, আর অন্যদিকে ছিল বিভিন্ন সময়ে আকাশে নানা গ্রহ তারার অবস্থান নির্ণয়ের যান্ত্রিক কম্পিউটারের মত কিছু যন্ত্র। ওই নথি বা ওই যন্ত্রগুলোর ব্যবহারের জন্য টলেমির তত্ত্ব বা তার বিকল্প কোন তত্ত্বের বিষয়ে জানার কোন প্রয়োজন হতোনা। ওই সারণিগুলোকেই তাঁরা স্বাধীন নিয়মের অধিকারী মনে করতেন, এবং ল্যাটিন ভাষায় সে নিয়মগুলোকে বলতেন ক্যানন যা আরবী 'কানুন' শব্দ থেকে এসছিলো। এক্ষেত্রে বহু আগে গাণিতিক ভাবে আলখারেজেমির তৈরি কানুনগুলো দ্বাদশ শতাব্দীর ইউরোপে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং খৃষ্ট ধর্মীয় উদ্‌যাপনের প্রয়োজনে তাতে কিছু কিছু পরিবর্তনও করে নেয়া হয়।

১২৬০ খৃষ্টাব্দের দিকে স্পেনে আল্‌ফেন্সো যে পরিবর্তিত সারণি তৈরি করেছিলেন তা আল্‌ফেন্সো টেব্‌ল নামে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে ইউরোপে একচেটিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করে। অন্যদিকে জ্যোতির্বিদ্যার যান্ত্রিক কম্পিউটারগুলোরও বিকাশ ঘটে আরব জ্যোতির্বিদদের হাতে– যেগুলোকে তাঁরা বল্‌তেন অ্যাস্ত্রালোব। পকেটঘড়ির মত দেখতে এই জিনিসে একটি ডায়াল, তার সঙ্গে অনেকগুলো ছোট দাঁতালো চাকা, এবং হাতে ঠিক করে দেবার মত চাবি থাকতো। পৃথিবী-পৃষ্ঠে যে কোন স্থানের অবস্থান এবং দিন, মাস ইত্যাদির

মাধ্যমে তারিখ এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলে ডায়ালে নানা তারার অবস্থান ফুটে ওঠতো যা দেখে সেদিনের আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে সুবিধা হতো। আরব অ্যাস্ত্রালোবগুলো ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠাতে ওখানে আরো সূক্ষ্ম ও কার্যকর ভাবে এ যন্ত্রের বিকাশ ঘটে। অবশ্য সারণি হোক বা যন্ত্র হোক সব কিছুতে বড় প্রেরণা ছিল বিজ্ঞান নয়, বরং রাশিফল ও ভাগ্য গণনা।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অবশ্য বিশ্ব-ছবির দার্শনিক আলোচনাগুলো ইউরোপীয় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় মহলে (অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ, প্যারিস, বলোনিয়া ইত্যাদি) এবং যাজক-পন্ডিতদের (স্কুল-ম্যান) চর্চার অন্তর্ভুক্ত হয়। যেহেতু এখন বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব পন্ডিতদের প্রধান চর্চার বিষয় হলো ধর্মতত্ত্ব– এক্ষেত্রেও তাঁদের প্রধান কাজ হলো স্বর্গ-নরকের অবস্থান সহ ধর্ম-গ্রন্থের অন্যান্য বর্ণনাকে টলেমির বিশ্ব-ছবির সঙ্গে সমন্বিত করা। এদিক থেকে শুরুতে এরিস্টোট্‌লের কড়াকড়ি নিয়মগুলো বরং তাঁদের নিজস্ব তত্ত্বের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো, এবং সে কারণে বেশি গুরুত্ব পেতোনা। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে এ সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থের সব বর্ণনাকে একেবারে হুবহু প্রচলিত অর্থে নিলে তাঁদের পক্ষে গ্রীক-আরবীয় দর্শন-গণিতে অংশগ্রহণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এবং যেখান থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় যুক্তি সংগঠিত করা যাচ্ছেনা। এরকম চিন্তার ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন এনেছিলেন সে যুগের একজন বড় মাপের যাজক-দার্শনিক টমাস আকুইনাস, যিনি পরবর্তী কালে বড় মাপের ধর্মগুরু হিসেবে সেইন্ট টমাস আকুইনাস নামে বিখ্যাত হয়েছেন।

মহাসমঝোতাঃ

দ্বাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় যাজক-দার্শনিকদের অনেকেই প্লেটোর দর্শনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, কিছুটা ভিন্ন ব্যাখ্যায়। তাঁরা প্লেটোর বিমূর্ত ফর্‌মের সঙ্গে ঐশ্বরিক বিষয়সমূহের সাযুজ্য দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রীকদের বড় প্রভাবটি ছিল এরিস্টোট্‌ল ও তাঁর আরব ব্যাখ্যাকারীর মাধ্যমে, যার পদ্ধতির মধ্যে পার্থিব ও জ্যোতিষ্কমন্ডলী সম্পর্কীয় অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয় চেতনার গুরুত্ব ছিল। ধর্ম-তত্ত্বের ভেতর দিয়ে যাজক-দার্শনিকরা যেভাবে বিজ্ঞান ও বিশ্ব-তত্ত্বকে দেখতে চাইতেন এরিস্টোট্‌লের মূলনীতিকে তার সঙ্গে সব সময় মেলাতে পারতেননা। কিন্তু অন্যদিকে অনেক যাজক-দার্শনিক তখন ইব্‌নে রুশদের অনবদ্য ব্যাখ্যায় এরিস্টোট্‌লের দর্শন চর্চা করছিলেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন প্যারিসে নিযুক্ত ইতালিয়ান যাজক সেই টমাস আকুইনাস (১২৬০

খৃষ্টাব্দ নাগাদ)। ইব্‌নে রুশদ ইসলাম ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে এরিস্টোট্‌লীয় দর্শনের সাযুজ্য যেভাবে দেখিয়েছিলেন আকুইনাস তাতে মুগ্ধ ছিলেন। ইব্‌নে রুশদ বলতেন সত্য একটিই– কিন্তু তাতে পৌঁছার দুটি রাস্তা আছে– ধর্ম ও দর্শন। এই নীতিটি খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বে প্রচলনের জন্য আকুইনাস অত্যন্ত সচেষ্ট হলেন।

এ পর্যন্ত অধিকাংশ যাজকদের মনোভঙ্গিটি ছিল প্রকৃতি যেহেতু বিধাতার সৃষ্টি এর নিয়ম কানুনগুলো তিনিই দেখবেন, মানুষের পক্ষে সেটি সরাসরি নিজ থেকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা বাতুলতা। এই সম্বন্ধে যেটুকু জানতে হয় তা জানতে হবে ধর্মের কাছ থেকে। কিন্তু এই ব্যাপারে এরিস্টোট্‌লের নীতিটিই আকুইনাসের বেশি পছন্দ হলো, এরিস্টোট্‌ল বিশ্বকে পার্থিব অংশ ও স্বর্গীয় অংশে ভাগ করেছিলেন। পার্থিব অংশে আছে বস্তু, প্রকৃতি ইত্যাদি– এগুলোর বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব, ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে আনাও সম্ভব। কিন্তু যা কিছু ফরম, তা আত্মার বিষয়– যা কিনা বস্তু ও প্রকৃতির আসল সারাৎসার; এগুলো বিজ্ঞানীর আওতার বাইরে। আকুইনাস এই মতেরই অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ভাবলেন এরিস্টোট্‌লের মতবাদকে খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে জায়গা করে দিতে পারলে ধর্মের মধ্য দিয়েই প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান অনুসন্ধান ও ঈশ্বরভক্তি উভয়ই সম্ভব হবে। যাজক-দার্শনিকদের কাজে তিনি কিছু উদার পন্থা আনতে চাইলেন ও কিছু কিছু বিষয়ে মানবিক যুক্তি ও বাস্তব পর্যবেক্ষণের স্থান করে দিতে চাইলেন। আর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আত্মার বিষয়গুলো এর বাইরে ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর রাখতে চাইলেন। এটাই তিনি তাঁর গ্রন্থে, শিক্ষা দানে , প্রচারে এমন অনবদ্য যুক্তিতে ও ভঙ্গিতে আনতে পেরেছেন যে ক্রমেই এরিস্টোট্‌লের দর্শন-বিজ্ঞান খৃষ্টান চার্চের কাছে শুধু গ্রহণযোগ্যই হলোনা, এটি এর ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মতত্ত্বের আবশ্যকীয় অঙ্গে পরিণত হলো। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শুরু হয়ে খৃষ্টান চার্চ ও এরিস্টোট্‌লীয় দর্শনের এই অঙ্গাঙ্গিক সখ্যতা ক্রমে বাড়লো বৈ কমলোনা– এবং মহাসমঝোতা (গ্রেট রিকনসিলিয়েশন) নামে পরিচিত হলো। পরবর্তী অন্তত চারশ' বছর বিজ্ঞানের প্রকৃতি নির্ধারণে ও এর অগ্রগতিকে সহায়তা বা বিরোধিতা করার ব্যাপারে এই মহাসমঝোতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এর ইতিবাচক দিক দেখতে হলে মনে রাখতে হবে ইউরোপে জ্ঞান চর্চার অবস্থা ও সময় এমন অবস্থায় ছিল যে কোন গভীরতা নিয়ে আদৌ কোন বিজ্ঞান চর্চা সেখানে সম্ভব ছিলনা। খৃষ্টান চার্চের অত্যন্ত সংরক্ষণবাদী অনুশাসন সবকিছু আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। কিন্তু যাকে সাধারণত বলা হয় শেষ-মধ্যযুগ (১১০০ থেকে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ) এই সময়টাতে গ্রীক দর্শনের সঙ্গে বোঝাপড়ার

সুযোগটি একটি সৃজনশীলতার আবহ এনে দিতে পেরেছিলো। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও যাজক-দার্শনিকদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে অন্তত কিছু কিছু বিষয়ের চর্চা সম্ভব হলো যেগুলোর সঙ্গে একদিকে ধর্মতত্ত্ব ও অন্যদিকে এরিস্টোট্‌লীয় দর্শনের আপাত দৃষ্টিতে কোন বিরোধ নেই– এর মধ্যে গণিত, দর্শন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলো। এই শেষোক্ত বিষয়গুলোকে বলা হতো 'প্রকৃতির দর্শন' (নেচারাল ফিলোসোফি)। সায়েন্স শব্দটি জ্ঞানের অর্থে গ্রীক দার্শনিকরা এক কালে কিছু ব্যবহার করলেও বিজ্ঞানকে সে সময় দর্শন এবং এখন শেষ-মধ্যযুগে প্রকৃতির দর্শন হিসেবেই বরাবর উল্লেখ করা হয়েছে, তখনো অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কিছুটা মেশাল অবস্থায়। রোমান সাম্রাজ্যের পতন, খৃষ্ট ধর্মের উত্থান এবং গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্মৃতির পর ইউরোপে স্বাধীন জ্ঞানের চর্চা সেই যে বন্ধ হয়েছিলো, এবার তার উন্মোচনে প্রথম কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি হলো। আরবী থেকে ল্যাটিন অনুবাদে গ্রীক ও আরবীয় দর্শন-বিজ্ঞান-গণিত ইউরোপীয় পন্ডিত মহলকে আলোকিত করলো। কিন্তু ইউরোপে সেটি ছিল একেবারেই সীমিত বিজ্ঞান– সেই মহাসমঝোতার নেতিবাচক দিকগুলোই এর কারণ।

এরিস্টোট্‌লীয় নীতি ও বিজ্ঞান খৃষ্টান অনুশাসনে অঙ্গীভূত হওয়ার পর শুধু ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে অমিল হওয়া নয় এরিস্টোট্‌লের মতবাদের সঙ্গে অমিলও চার্চের কাছে চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিণত হলো, ধর্মদ্রোহিতার সমান অপরাধ। আমরা দেখেছি প্লেটো, এরিস্টোট্‌ল, টলেমি প্রমুখের যে প্রচণ্ড প্রভাব গ্রীসে, এবং পরবর্তীতে ইসলামী দুনিয়ায় ও ভারতে দেখা দিয়েছিলো তার ফলে এর থেকে বৈপ্লবিক ভাবে বেরিয়ে এসে নতুন বিজ্ঞানের জন্ম কোথাও সম্ভব হয়নি। অথচ প্লেটো-এরিস্টোট্‌লের মূল নীতির কারণে গতিবিদ্যায়, প্রকৃতি ও বস্তুর অনুসন্ধানে, জ্যোতির্বিদ্যায়, বিশ্ব-তত্ত্বে সেই তত্ত্বগুলো অনেক ভুলে আকীর্ণ ছিল– এসব অনেক মৌলিক ভুল যার মধ্য দিয়ে অগ্রগতি সম্ভব ছিলনা। এমনকি জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যাও এর থেকে মুক্ত ছিলনা। তারপরও মধ্যযুগের ওই সময়ে ইসলামী দুনিয়ায় অন্তত সেই প্রভাবশালী প্রাচীন তত্ত্বগুলো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে, সেগুলোর কিছু কিছু উন্নয়ন সাধন হয়েছে, এমনকি অনেক বেশি সঠিক পথ দেখাবার মত মধ্য বিকল্প তত্ত্বও এসেছে।

কিন্তু এসবের কোন কিছুরই ইউরোপের ওই নব উদ্যমে স্থান পাওয়ার উপায় ছিলনা– কারণ সেখানে গ্রীক মূলনীতির অন্যথা হওয়ার সুযোগ খুব সীমিত হয়ে গিয়েছিল মহাসমঝোতার কারণে। তাকে চ্যালেঞ্জ করা ধর্মকে চ্যালেঞ্জ করার

সমতুল্য হয়ে যাওয়াতে ধর্মচ্যুতদের জন্য নির্ধারিত চরম শাস্তিই তখন তার প্রাপ্য হয়ে উঠতো। যদিও শেষ পর্যন্ত ইউরোপই হয়ে উঠেছিল শেষ-মধ্যযুগে জ্ঞান চর্চার আশার স্থান, অথচ সেটিই চল্‌ছিলো মোটের উপর ভুল পথেই– জটিল সব তত্ত্বের ঘেরাটোপের ভেতরে। এর আগে যারা অগ্রগতির চমৎকার ধারা সৃষ্টি করেছিলো সেই ইসলামী দুনিয়া, ভারত, চীন তখন বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের পথে।

অন্যদিকে তখন ইউরোপের সার্বিক উন্নয়ন পরিস্থিতি ক্রমেই ভাল হচ্ছিল। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তে বাণিজ্যের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়াতে ভূস্বামী এবং রাজা-রাজড়াদের বাইরেও নতুন ধনিক শ্রেণী ও মধ্যবিত্তের আগমন হচ্ছিলো। বড় সাম্রাজ্যের বদলে আসল শাসন ও প্রতিপত্তি চলে যাচ্ছিলো বাণিজ্যের কেন্দ্র নগর-রাষ্ট্রগুলোর ডিউক প্রভৃতি শাসনকর্তাদের হাতে যাঁরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে প্রযুক্তি, কারিগরি দক্ষতা, কারুশিল্প ও চারু শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দায়িত্ব অবশ্য রয়ে গিয়েছিলো চার্চের ওপর, ধর্মগুরু পোপের নেতৃত্বে যেটি নিজেই একটি খুবই প্রতাপশালী ধনী প্রতিষ্ঠান।

চার্চের সংরক্ষণশীলতার কারণে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক অগ্রগতি না হলেও নগর-রাষ্ট্রের ও ব্যবসা বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় বাকি জিনিসগুলো বিশেষ করে প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতি সেখানে হচ্ছিলো। নানা কারণে ইউরোপের জনসংখ্যা এত কম ও ছড়ানো ছিটানো ছিল যে অন্য উন্নত জায়গার মত দাস বা শ্রমিকের পেশিশক্তির ওপর ভরসা করা যেতোনা। সামন্ততন্ত্রের অবসানে সেটি আরো কম গেলো। তার স্থান নিয়োছিলো পানি স্রোতের শক্তি, বায়ুশক্তি ইত্যাদি এবং নতুন প্রযুক্তি। এসব অনেক প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে চীনে, আরবে ও অন্যত্র– সব চেয়ে বেশি হয়েছে চীনে যে সব প্রযুক্তি প্রধানত আরবরাই ইউরোপে নিয়ে গেছে। উদ্ভাবনের নিজের দেশে যে প্রযুক্তি তেমন পরিবর্তন আনতে পারেনি ইউরোপে তাই সোনা ফলিয়েছে। এর মধ্যে ছিল ঘোড়ার কলার (যা ঘোড়াকে দ্রুত দৌড়ানো ও পরিশ্রমের কাজ করানোর সুবিধা করে দিয়েছে), জাহাজের ল্যাটিন পাল যা বাতাসের গতির কিছুটা উল্‌টো দিকেও জাহাজকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, জাহাজকে অল্প জায়গায় ঘোরানোর মত পশ্চাত-হাল, চৌম্বক কম্পাস, বারুদ, বন্দুক, রকেট, কাগজ, কাঠের ব্লক থেকে মুদ্রণ, ইত্যাদি। এমনি অসংখ্য প্রযুক্তি দূর দেশে সমুদ্রযাত্রা, বাণিজ্য, ও শক্তি প্রয়োগের দারুণ সুবিধা করে দিলো– যার সবই সম্পদ সৃষ্টিতে ও সার্বিক অর্থনীতিতে অবদান রেখেছে।

তবে সেই আমলে প্রযুক্তির সঙ্গে বিজ্ঞানের তেমন সম্পর্ক ছিলনা। প্রযুক্তির উদ্ভাবন, ব্যবহার, উন্নয়ন সবই ছিল কারিগরদের হাতে, যাদের দক্ষতা ছিল বটে কিন্তু শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন কিছুই তেমন ছিলনা। এই শেষের জিনিসগুলো সাধারণত ছিলো যাজক-দার্শনিক, মঠের সন্ন্যাসী, এবং সমতুল্য পণ্ডিতদের হাতে– তাঁরা আর এক জগতের মানুষ। এভাবেই চলেছে একেবারে আধুনিক যুগের ঊষালগ্ন পর্যন্ত।

মহাসমাঝোতা একদিকে খৃষ্টান চার্চকে দর্শন-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে উদার করে সেই চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু অন্য দিকে তাকেই বিজ্ঞানের ব্যাপারে চরম অসহিষ্ণু করেছে। তাই আর্থসামাজিক ও প্রযুক্তিগত প্রচুর অগ্রসরতা সত্ত্বেও বিজ্ঞানে সেই অগ্রসরতা কাজে আসেনি। বিশেষ করে বিশ্বতত্ত্ব, বস্তু, গতি ইত্যাদি সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো ঘটতে পারেনি। কিন্তু তারপরও সার্বিক ওই উন্নয়নের মধ্যে বিজ্ঞানের উন্নয়নেরও একটি ক্ষেত্র অলক্ষ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিলো ওই যাজক- বিজ্ঞানীদেরই দ্বারা। তাঁদের কারণেই বন্ধ্যাত্বের অবসান হয়েছিলো, এবং ইউরোপেই ঘটেছিলো বিজ্ঞানের বিপ্লব। ক্ষেত্র প্রস্তুতের উদাহরণগুলো এবং পদ্ধতিগুলো দেখলে সেই বিপ্লবের প্রকৃতিটি ভাল বোঝা যাবে।

খণ্ড খণ্ড অগ্রগতিঃ

শেষ-মধ্যযুগের ওই সময়টিতে কোন বিজ্ঞানী কোন মহাপরিকল্পনায় বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব দেননি– যেমনটি টলেমি দিয়ে গিয়েছিলেন, এমনকি আরব পণ্ডিতদের কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন। এরিস্টোট্‌ল-টলেমির বিরুদ্ধে গিয়ে সেটি করার কোন সুযোগ ইউরোপে ছিলনা। কিন্তু তার মধ্যেও বিজ্ঞান নিয়ে খণ্ড খণ্ড কাজ হয়েছে– যেমন গতিবিদ্যায় এমনকি বিশ্ব-তত্ত্বেও। এর কোন কোনটি পরবর্তী বিজ্ঞান-বিপ্লবের ক্ষেত্রে দারুণ কাজেও এসেছে। এই প্রসঙ্গে প্যারিসের দু'জন প্রায় সমসাময়িক পণ্ডিতের নাম স্মরণীয়। তাঁরা হলেন জ্যাঁ বুরিডান (১৩৩০ নাগাদ) এবং নিকোল ওরেম (১৩৫০ নাগাদ)। দু'জন দু'রকম পেশা থেকে বিজ্ঞান চর্চা করলেও ওরেমের কিছু কাজ বুরিডানের অনুসরণেই হয়েছে, তাঁর ওপর বুরিডানের প্রভাবও স্পষ্ট। এক হিসেবে তাঁরা ছিলেন সেদিনের আদর্শ প্রকৃতির দার্শনিক। বুরিডান সাধারণ যাজক হলেও সেদিক থেকে তাঁর তেমন কোন পদ বা স্বীকৃতি ছিলনা, যেদিক থেকে স্বীকৃতি ছিল তা হলো প্যারিস

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় অধ্যাপক হিসেবে। অন্যদিকে ওরেম ছিলেন একজন পাকাপোক্ত বিশপ– আমাদের পরিচিত সেদিনের যাজক-দার্শনিক।

নিকোল ওরেম সে সময়ের একটি বড় বিতর্ক একবিশ্ব নাকি বহুবিশ্ব, তাতে যোগ দিয়ে দেখালেন ব্যাপারটির সঙ্গে শূন্যস্থানের প্রকৃতি, গতি ইত্যাদি বিষয় জড়িয়ে আছে। বহুবিশ্বের ধারণাটি সে সময় অতীতের আরব পণ্ডিতদের কাছ থেকে আসা যুক্তি এবং তখনকার ইউরোপীয় পণ্ডিতদের তার সঙ্গে যোগ করা যুক্তিতে বেশ প্রবল হয়ে ওঠেছিলো। ওরেম দেখালেন সেটি যদি ঠিক হয় তা হলে এরিস্টোট্‌লের কয়েকটি নীতির মধ্যে দুর্বলতা আছে বলতেই হবে। যেমন একাধিক বিশ্ব থাকলে তাদের মাঝখানে শূন্যস্থান থাকতেই হবে, যা এরিস্টোট্‌ল স্বীকারই করেননি। তাছাড়া অন্য বিশ্ব থাকলে সেখানেও আমাদের বিশ্বের মত প্রাকৃতিক নিয়মগুলো কার্যকর হবে। এরিস্টোট্‌ল যে বলেছেন পৃথিবীর বাইরে সবই স্বর্গীয় সেখানে প্রাকৃতিক নিয়ম খাটেনা, যে কথাও দুর্বল হয়ে যায় এতে।

আমাদের বিশ্বের বাইরে অসীম শূন্যের ধারণাটি বুরিডান ও ওরেমকে গতির ব্যাপারটিকেই নতুন ভাবে দেখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। ওই মহাশূন্যে যেহেতু অন্য কিছু নেই যার পরিপ্রেক্ষিতে কোন গতিকে নির্দিষ্ট করা যাবে, তাই গতি জিনিসটির একটি পরম (এ্যাবসল্যুট) রূপ কল্পনা করতে হলো যার জন্য অন্য কোন কাঠামো লাগেনা। বুরিডান এজন্য একটি মনে মনে করার এক্সপেরিমেন্ট খাড়া করেছিলেন। তিনি বল্‌লেন ধরা যাক আমি বিশ্বের বাইরে মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এখন যেহেতু এখানে অন্য কিছু নেই তাই আমি বলতে পাচ্ছিনা আমার ডানে এই আছে, বামে এই আছে, সামনে এই আছে, পেছনে এই আছে, ওপরে এই আছে, নিচে এই আছে। কিন্তু আগে আমার কাছে দৈর্ঘ-প্রস্থ-উচ্চতার যেই ধারণা ছিল এখন এই মহাশূন্যে চলার সময় সেই ধারণাই আছে। আমি সরল রেখায় চলেছি– বাইরের কিছু থেকে তুলনা করে নয় আমার ওই তিন মাত্রা আমার সঙ্গেই আছে একটি পরম গতি হিসেবে, কারো আপেক্ষিকে গতি হিসেবে নয়।

এদিকে টলেমির বিশ্ব-ছবিতে সূর্য অন্য ক'টা গ্রহের সঙ্গে একই ভাবে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও তার একটি বৈশিষ্টময় গুরুত্ব ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। টলেমি পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ তথ্য অনুযায়ী 'গ্রহ'গুলোকে যেভাবে সাজিয়েছিলেন তা হলো একেবারে বাইরে দিকে রয়েছে শনি গ্রহ। তারপর ক্রমে বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য, শুক্র, বুধ এবং চাঁদ- সবই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। চাঁদই হলো এই হিসেবে কেন্দ্রের এবং পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। শনি সবার বাইরে থাকা গ্রহ

হলেও তারও বাইরে রয়েছে স্থির তারাগুলো– সেগুলো অবশ্য ভিন্ন ব্যাপার। যে গ্রহগুলো পৃথিবীর যথেষ্ট নিকটে তাদেরকে অন্তস্থ এবং যেগুলো বেশি দূরে তাদেরকে বহিস্থ- এই দুই দলে ভাগ করা হতো। শেষ-মধ্যযুগের ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদরা এই দুই ভাগের মধ্যে সূর্যকে কেন্দ্রীয় স্থানে মাঝামাঝি পেয়ে এর বাইরের তিনটি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে বহিস্থ বা সুপেরিয়র (উর্ধ্ব) আর ভেতরের তিনটি শুক্র, বুধ ও চাঁদকে বল্‌লেন অন্তস্থ বা ইনফেরিয়র (অধো)। সূর্যকে মাঝখানে রেখে তিনটি সুপরিয়র ও তিনটি ইনফেরিয়র গ্রহের এই বিন্যাসে একটি সুন্দর প্রতিসাম্য দেখা গেল– যাতে সূর্যের বৈশিষ্টটি আরো প্রকাশিত হলো। বেশ কিছু জ্যোতির্বিদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখালেন যে এই দুই ত্রয়ীর মাঝখানে থেকে সূর্য সব গ্রহকে নিজের প্রভা দিচ্ছে, সেই সঙ্গে সবগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। একটি বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হচ্ছিলো যে এরকম প্রভা শুধু সূর্যেরই আছে, বাকিরা তার থেকেই প্রভা পেয়েছে। এছাড়া ওই গ্রীক আমল থেকেই জ্যোতির্বিদরা বহিস্থ ও অন্তস্থ গ্রহগুলোর আচরণের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখতে পেয়েছেন যেগুলোর এক ধরনের ব্যাখ্যা টলেমির বিশ্ব-তত্ত্বে থাকলেও তা খুব সন্তোষজনক ছিলনা। বিষয়গুলো শেষ-মধ্যযুগের পণ্ডিতদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এ সবই যে আরো কিছু পরে সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা আনতে সহায়ক হয়েছিলো– তা আমরা দেখবো।

একেবারে ব্যাবিলন-মিশরের প্রাচীন কাল থেকে বিজ্ঞানীরা চাঁদ ও সূর্যের অন্য রকম কিছু প্রভাব পৃথিবীর ওপর পড়তে লক্ষ্য করেছেন– যাকে বলা যায় যান্ত্রিক প্রভাব। জোয়ার-ভাটায় পানি ফুলে ওঠা না ওঠাটি চাঁদ ও সূর্যের অবস্থানের ওপর নির্ভর করতে দেখাটাই এই প্রভাব বোঝার মূলে ছিল। শেষ- মধ্যযুগে এসে এই প্রভাবগুলোর খুঁটিনাটি আরো স্পষ্ট হয়েছিলো। তাছাড়া সে সঙ্গে অনেকে বিশ্বাস করতো শুধু নদীর খাড়ির পানি নয় শরীরের জলজ অংশও ওভাবে চাঁদ-সূর্যের প্রভাবে উতলে ওঠে এবং ওসময় বাতের ব্যাথা-বেদনার কারণ হয়। এরিস্টোট্‌ল-টলেমির নীতি অনুযায়ী পৃথিবী ও সূর্য-চন্দ্রের মাঝে যে স্বচ্ছ ইথার তাতে সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসা সহজে ব্যাখ্যা করা গেছে। কিছু যান্ত্রিক ওই প্রভাবগুলো কেমন করে সূর্য থেকে পৃথিবী পর্যন্ত এত দূরে আসে? তাই শেষ-মধ্যযুগের কোন কোন বিজ্ঞানী আলোর নতুন রকমের একটি ব্যাপ্ত সংজ্ঞা দিলেন। সূর্যের যে বিকিরণ তার মধ্যে শুধু দেখার সক্ষমতা তৈরির 'আলোই' থাকেনা বরং যান্ত্রিক টানাপোড়েন সৃষ্টির মত অন্য রকম আলোও থাকে, যেমন থাকে তাপ রশ্মির মতোও। এগুলো একদিক থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে

চমৎকার মেলে, যদিও সেদিন অবশ্য ভিন্ন জিনিসের ব্যাখ্যা খুঁজতে ভিন্ন চিন্তা থেকে ধারণাগুলো এসেছিলো।

বুরিডান ও ওরেম উভয়েই বিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবীর একেবারে নিশ্চল থাকার এরিস্টোট্‌ল-টলেমীয় নীতিকে প্রশ্নের সম্মূখীন করেছিলেন। সেই নীতিকে মেনে নিয়েই বুরিডান বল্‌লেন এখানে কেন্দ্র মানে হলো জ্যামিতিক কেন্দ্র– একটি বিন্দু। পৃথিবী একটি বিরাট জিনিস সে তো আর একটি বিন্দুতে থাকতে পারেনা। পৃথিবীর সব ভর যে বিন্দুতে জমা হয়ে আছে বলে কল্পনা করা যায় সেই ভরবিন্দুটিই থাকে বিশ্বের কেন্দ্রে। এখন ভরবিন্দু কোথায় তা নির্ভর করে পৃথিবীর আকৃতির ওপর। পাহাড়-পর্বত-সমুদ্র ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলে এই ভরবিন্দু সময় সময় সরে যাচ্ছে। যতবার সরছে, ততবার পৃথিবীকে নড়েচড়ে ওই ভরবিন্দুকে বিশ্বের কেন্দ্রে আনতে হয়; কাজেই পৃথিবীর কোন গতি নেই একথা ঠিক নয়। ওরেমও বুরিডানকে অনুসরণ করে পৃথিবীর সম্ভাব্য গতি নিয়ে ভেবেছেন। সেখান থেকে উভয়েই নিজ অক্ষের ওপর পৃথিবীর দিনে একবার ঘোরার বিষয়টি সামনে আনেন। এটি তাঁরা পর্যবেক্ষণের বরাত দিয়েই বলেছেন– কারণ ইতোমধ্যেই তাঁরা দেখিয়েছেন যে গতির বোধটি আপেক্ষিক। কোন কিছু গতিশীল দেখলে নিজে স্থির আছি সেটিই গতিশীল যেমন মনে করা যায়, তেমনি নিজে গতিশীল সেটি স্থির তাও মনে করা যায়। সাধারণভাবে গতির এই আপেক্ষিকতা বোঝা তাঁদের একটি বিরাট আবিষ্কার ছিল– যেটি আরো গাণিতিক সূক্ষ্মতায় বহু পরে গ্যালেলিও দেখিয়েছিলেন। অবশ্য এ ধারণাটি দুই হাজার বছর ধরে নানা সময়ে এরিস্টারখাস (গ্রীস), আর্যভট্ট (ভারত), আল-বেরুনি (আরব) প্রমুখদের কাছেও ধরা পড়েছিলো। তাঁরা সবাই বলছেন পৃথিবীর ২৪ ঘন্টায় একবার ঘুরে যাওয়ার গতি থাকলেই বাকি পুরো বিশ্বকে এদিক থেকে স্থির মনে করা যায়।

ওই অগ্রবর্তীদের মতই বুরিডান ও ওরেম দু'জনের কেউই এই সম্ভাবনাটি নিয়ে বেশিদূর অগ্রসর হননি। কারণ হিসেবে তাঁরা দেখিয়েছেন যে গাণিতিক ভাবে পৃথিবী ঘুরতে পারে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তা হয়না। যদি হতো তা হলে সোজা উপরের দিকে তীর ছুঁড়লে তা নিচে পড়ার সময় কিছুটা দূরে পড়তো কারণ এই সময়ের মধ্যে পৃথিবী বেশ কিছুটা ঘুরে যেতো। অথচ আমরা যেখান থেকে তীর ওপরে ছুঁড়ছি ঠিক সেখানটিতেই পড়তে দেখছি। ওরেম কিন্তু প্রথমে এভাবে বল্‌লেন ও পরে আরো পরীক্ষা করে সেটি বাতিল করলেন। কারণ তিনি দেখলেন তীরের উদাহরণটি ঠিক নয়। চলমান জাহাজের ওপর একই ভাবে ওপরের দিকে

তীর ছুঁড়লে তখনো এটি যেখান থেকে ছোঁড়া হয়েছে সেখানেই পড়ে, জাহাজ এগিয়ে গেছে বলে কিছু পেছনে পড়েনা। তার মানে এই নয় যে জাহাজ চল্‌ছেনা। তিনি বুঝলেন জাহাজের গতি ছুঁড়ে দেয়া তীরেও সঞ্চারিত হয়েছে। এভাবে ওরেম কি গ্যালেলিওর জড়তার নীতি তাঁর কয়েক শ' বছর আগেই আবিষ্কার করেছিলেন শেষ পর্যন্ত? না তা তিনি করেননি। বিশপ ওরেমের পক্ষে সেটি সম্ভব হয়নি হয়তো মহাসমঝোতার কারণেই।

কিন্তু মহাসমঝোতা তাঁদের সব কাজে বাধ সাধেনি। বুরিডান ও ওরেম উভয়েই গতিবিদ্যায় এমন আরো কিছু ধারণার জন্ম দিয়েছেন যা শ' তিনেক বছরের মধ্যে বিজ্ঞান বিপ্লব সৃষ্টিতে কিছুটা হলেও অবদান রেখেছে। এমনি একটি অবদান হলো বুরিডানের চলৎশক্তি তত্ত্ব (ইম্পেটাস থিওরি)। এটিও কিন্তু এরিস্টোট্‌লের গতিতত্ত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এরিস্টোট্‌লের মতে কোন জিনিসকে গতিশীল করতে একটি গতিশীল জিনিসকে এর সঙ্গে সংলগ্ন থাকতে হবে– যতক্ষণ তা থাকবে ততক্ষণই শুধু দ্বিতীয়টির গতি থাকবে। এটি নাকচ করে দিয়ে বুরিডান দেখালেন যে গতি-দাতা কোন কিছুতে ধাক্কা দিয়ে দ্বিতীয় বস্তুটিতে একটি চলৎশক্তি সৃষ্টি করে যা তাকে গতিশীল করে রাখে; কোন কিছু তার সঙ্গে সংলগ্ন থেকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন হয়না। ওই চলৎশক্তি গুণটি পাওয়ার পর ওটি বস্তুর নিজের মধ্যেই থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চলৎশক্তির সবটুকু ক্ষয় না যায় ততক্ষণ এটি চলতেই থাকবে। এই তত্ত্বটি অবশ্য বুরিডানের অনেক আগেই ইব্‌নে সিনা দিয়েছিলেন (১০০০ খৃস্টাব্দ) এবং তারো আগে ষষ্ঠ শতাব্দীর রোমান বিজ্ঞানী ফিনোপন্‌স দিয়েছিলেন। বুরিডান হয়তো এই দুজনের কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন– কারণ উভয়েরই এ বিষয়ে অনুদিত বই তখন ইউরোপে ছিল। কিন্তু বড় কথা হলো এই দুজনেই বলেছেন চলতে চলতে চলৎশক্তি হ্রাস পায় এবং এক সময় ফুরিয়ে গিয়ে চলা থামিয়ে দেয়। কিন্তু বুরিডান সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর মতে চলৎশক্তি নিজে নিজে হ্রাস পায়না, বাইরের বাধা পেলে তবেই হ্রাস পায়; যদি বাধা না পেতো তা হলে কখনই থামতোনা। আধুনিক গতিসূত্রের সঙ্গে এর আশ্চর্যরকম মিল (জড়তার নিয়ম বা নিউটনের প্রথম গতিসূত্র)।

চলৎশক্তি তত্ত্বের জন্য বুরিডান আধুনিক আরো একটি ধারণার পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন, সেটি হলো মোমেন্টাম বা ভরবেগ। বুরিডান দেখিয়েছেন ধাক্কা দিয়ে চলৎশক্তি সৃষ্টির সময় গতি সৃষ্টিকারী বস্তুটি যত ভারী হয়, আর যত বেশি বেগে এসে ধাক্কা দেয় সৃষ্ট চলৎশক্তি তত বড় হয়। ভর আর বেগ এই

দুটির মিলিত রূপ ভরবেগ (মোমেন্টাম) বেশি হলে তা যে সংঘর্ষের মাত্রা বাড়ায় সেটি আধুনিক গতিবিদ্যার একটি মৌলিক ধারণা। বুরিডান জ্যেতিষ্কদের চিরন্তন বৃত্তাকার গতির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন এই চলৎশক্তি দিয়ে– একে তিনি বলেছেন বৃত্তাকার চলৎশক্তি। এতে তিনি দেখিয়েছেন যে এরিস্টোট্‌ল যে জ্যোতিষ্কগুলোকে ক্রমাগত পরিক্রমণ করানোর জন্য বাইরের গতিহীন গতি-দাতার সার্বক্ষণিক হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন সেটির একেবারেই দরকার নেই। সৃষ্টির মুহূর্তেই বিধাতা জ্যেতিষ্কগুলোকে বৃত্তাকার চলৎশক্তি দিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু ওই স্বর্গীয় ইথারের মধ্যে বাধা দিয়ে চলৎশক্তিকে ক্ষয় করার মত কিছু নেই, কাজেই এই গতি চিরন্তন। এই তত্ত্বও আধুনিক মতের বেশ কাছাকাছি যদিও সেদিনের বিজ্ঞানের আবহে সেদিনের ভাষায় এটি প্রকাশিত।

বুরিডান ও ওরেম দুজনেই খুব প্রাজ্ঞ গণিতবিদও ছিলেন; এবং তাঁদের তত্ত্বে গণিতকে ব্যবহারের জন্য নানা উদ্ভাবনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন ওরেমের এরকম একটি খুব সরল আবিষ্কার গতিবিদ্যায় সুদূর প্রসারী ফল রেখেছে। সমবেগে চলার ব্যাপারটি অংকে আনা সহজ। কিন্তু বেগ যখন পরিবর্তিত হয় তখন তাকে অংকে আনা কঠিন। ওরেম এজন্য ওই পরিবর্তনটিকেও একই হারে ক্রমাগত হয়ে চলেছে এরকম একটি অবস্থা কল্পনা করলেন। বাস্তব ক্ষেত্রে বহু কাল পরে ঠিক এমনটি হতে দেখেছেন গ্যালেলিও যে কোন পতনশীল বস্তুর বেগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমহারে গতিবৃদ্ধি। এরিস্টোট্‌লীয় গতিতত্ত্বে শুধু যে এটিই ছিলনা তা নয়, তাতে গাণিতিক বা সংখ্যাবাচক তেমন কিছুই ছিলনা– ছিল শুধু গতির 'গুণের' কথা। বুরিডান এই প্রথম সেই গুণকে গণিতে রূপ দিলেন। তিনি এর অংক করার একটি কৌশল বের করলেন। তিনি দেখালেন স্থির অবস্থা থেকে এরকম সমহারে গতি বৃদ্ধি করে কোন দূরত্বে পৌছার মুহূর্তে গতিবেগ যা দাঁড়ায় তার ঠিক অর্ধেক গতিবেগে যদি এটি সমবেগে চলতো তাহলেও সেখানে একই সময়ে পৌঁছতো। শুরুর গতি ও শেষ গতির সমষ্টিকে দুই দিয়ে ভাগ করে গড় গতি পাওয়ার এই সুন্দর উপায়টি তিনি বের করে ফেল্‌লেন– যা পরবর্তীতে গতিবিদ্যায় দারুণ উপকারী হয়েছে। এভাবে শেষ-মধ্যযুগের যাজক-বিজ্ঞানীরা প্রতিকূল পরিবেশেও খণ্ড খণ্ড যা করেছেন– গণিতে, গতিবিদ্যায়, প্রকৃতির দর্শনে, বিশ্ব-তত্ত্বে–সেগুলোর কিছু কিছু আধুনিক বিজ্ঞানের শুরুতে গ্যালিলিও- নিউটনের সৃষ্ট সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বে জায়গা করে নিতে পেরেছিলো। সেই অর্থে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও তার আধুনিকতার প্রস্তুতিপর্বটি তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিলো বলা যায়।

সেই শেষ-মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত পরবর্তী পুরো সময়ের বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রভাবের কথা বিবেচনা করলে আরো একজন যাজক-দার্শনিকের সৃষ্ট একটি বিশেষ নীতির কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ইংল্যান্ডের একটি মঠের (আবাসিক চার্চ) যাজক ছিলেন এই ইংরেজ দার্শনিক, নাম উইলিয়াম অফ ওক্কাম, ওক্কাম নামেই বেশি পরিচিত; আর খুবই পরিচিত হলো তাঁর সেই নীতি যাকেও চল্‌তি নামে সবাই বলে 'ওক্কামের ক্ষুর' (রেজোর)। যদিও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই নীতির দারুণ প্রভাবের কথা বলছি ওক্কাম কিন্তু বিজ্ঞানী ছিলেননা, তাঁর নীতিটিও বিজ্ঞানের কোন অংশ নয়, এটি অর্জিত জ্ঞানের সত্যতা নিরূপণের একটি সাধারণ দার্শনিক সূত্র। এর মতে কোন ঘটনার গ্রহণযোগ্য দু'রকমের ব্যাখ্যা যদি থাকে তাহলে তার মধ্যে সরলতরটাই সত্য, যেটিতে ধরে নেবার মত বিষয়ের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম সেটি। ক্ষুর বা ছুরি বলার কারণ হলো তিনি ওরকম ধরে নেয়া বিষয়গুলো ছেঁটে ফেলে যে ব্যাখ্যা সরল হয়েছে সেটিকেই সত্য বলেছেন।

ওক্কাম যেভাবে এই নীতিতে পৌঁছেছেন তাকে বৈজ্ঞানিক বলার উপায় নেই, কারণ কোন যুক্তি দিয়ে দেখানো যায় না যে সরলতর তত্ত্বকে সত্য হতে হবে, জটিলতর তত্ত্ব সত্য হবেনা। বড় জোর বলা যায়– সরল হলে তত্ত্বটিকে প্রমাণ করার জন্য কম জিনিস যাচাই করতে হবে বলে সেই যাচাই হবার সম্ভাবনাটি বাড়ে। আর হয়তো বলা যায় সরল ছিমছাম তত্ত্বের মধ্যে একটি নান্দনিক পরিচ্ছন্নতা আছে, যা জটিল তত্ত্বে নেই। ওক্কাম হয়তো এসবের বিবেচনাতেই নীতিটি ঠিক করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পর থেকে বিজ্ঞানে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নীতিটি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি করে কেউ ঠকেনি– এটিই তার বড় সার্থকতা। বিজ্ঞানীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই নীতিতেই সঠিক তত্ত্ব বেছে নিয়েছেন– সরলতর তত্ত্বটিকেই। টলেমির দেড় হাজার বছর টিকে থাকা বিশ্ব-ছবির বদলে যে আধুনিক বিশ্ব-ছবি এসেছে তাও মূলত এই নীতির প্রয়োগেই। ওক্কামের নিজের সময়ে কিন্তু তখনো বিশ্ব-তত্ত্ব সহ অনেক কিছুই ছিল জটিল তত্ত্বের ঘেরাটোপে।

চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিতেও জটিল তত্ত্ব

চিকিৎসা যখন বিজ্ঞান হলোঃ

মানব ইতিহাসে একেবারে আদিম কাল থেকেই চিকিৎসা ছিল, কিন্তু তার মধ্যে বিজ্ঞান বলার মত তেমন কিছু ছিলনা– বেশির ভাগ ছিল তুক্‌তাক, জিন-প্রেত

ইত্যাদিকে দায়ী করা কূসংস্কার। চিকিৎসাকে প্রথম পরীক্ষিত কার্য-কারণ সম্পর্কের ওপর দাঁড় করানোর কৃতিত্ব দেয়া হয় খৃস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ নাগাদের গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটেসকে। শরীরের ভেতরে কোথায় কী আছে সে সম্পর্কে তাঁর খুব জানাশোনা ছিলনা। গ্রীসে শব-ব্যবচ্ছেদকে প্রথাগত ভাবে একটি ঘোরতর নিষিদ্ধ জিনিস মনে করা হতো– অন্যভাবে, যেমন প্রাণী ব্যবচ্ছেদ থেকেও তিনি তা জানার চেষ্টা করেছিলেন বলে প্রমাণ নেই। তিনি অবশ্য চিকিৎসার জন্য রোগের লক্ষণগুলোর উপর খুব গুরুত্ব দিতেন। সেই লক্ষণের সঙ্গে তিনি তাঁর সৃষ্ট কিছু তত্ত্বের নীতিগুলো মিলিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিতেন। এর মধ্যে ওষুধ ছাড়াও পথ্য, যত্ন এবং রোগীর শরীর-সৃষ্ট নানা জিনিসের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা থাকতো। এসবকে তিনি যৌক্তিক কার্য-কারণ ভিত্তিক মনে করতেন এবং আগেকার যে কোন চিকিৎসার থেকে এর পদ্ধতিগুলো কিছুটা বৈজ্ঞানিক ছিল বৈকি। এর সব দিক সম্পর্কে তাঁর অজস্র লেখা বহুকাল ধরে পঠিত হয়েছে– গ্রীক ভাষায় ও পরে অনুবাদে।

হিপোক্রেটেসের মূল তত্ত্ব এবং অধিকাংশ পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁর ৬০০ বছর পর ২০০ খৃস্টাব্দের গ্রীসে দারুণ খ্যাতি লাভ করেছিলেন দার্শনিক-চিকিৎসাবিদ গ্যালেন। তখন থেকে আধুনিক কাল অবধি চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে দেশে দেশে তাঁর দারুণ প্রভাব দেখা গেছে। তাঁর মূল তত্ত্বে, সেটির ব্যবহারে, এবং নানা রোগের চিকিৎসার বিস্তারিত নিয়ম কানুন প্রবর্তনে তিনি তাঁর আদি গুরু হিপোক্রেটেসকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। চিকিৎসক হওয়া ছাড়া তিনি একজন বড় দার্শনিকও ছিলেন। সেদিক থেকে এরিস্টোট্‌লের প্রকৃতির দর্শন সম্পর্কিত একটি নীতিকে তিনি তাঁর চিকিৎসার মূল-মন্ত্র করেছিলেন। এটি হলো 'আগে আসে কার্য, ফর্‌ম (গুণ) তাকেই অনুসরণ করে।' চিকিৎসার ক্ষেত্রে গ্যালেন কার্য বলতে বুঝতেন শরীরের আভ্যন্তরীন অঙ্গসমূহের কাজ, আর ফর্‌ম বলতে শরীরের সুখ-অসুখের অবস্থা। প্রথমে যেহেতু ওই আভ্যন্তরীন অঙ্গ ও তাদের কাজকে বুঝতে হবে, তাই গ্যালেন তাতেই বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। তখনো যেহেতু মানবদেহের ব্যবচ্ছেদ অসম্ভব, গ্যালেন বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর ব্যবচ্ছেদ করেছেন– বিশেষ করে মানুষের সঙ্গে বেশি সাদৃশ্যের কারণে বানর ও এইপের (শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি নরবানর)। ব্যবচ্ছেদ করে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের দেহ-অভ্যন্তর নিয়ে কিছু কিছু এক্সপেরিমেন্টও করেছেন। যেমন জীবন্ত এইপের দেহ স্থানীয় ভাবে কেটে তিনি

তার মূত্রনালী ক্লিপ দিয়ে কিছুক্ষণ আটকিয়ে রেখে দেখেছেন যে এর ফলে কিডনি ফুলে ওঠে। এভাবে তিনি প্রমাণ করেছেন মূত্র কিডনিতেই তৈরি হয়।

দেহের বিভিন্ন অংশের স্নায়ুতন্ত্রের গোড়া বিচ্ছিন্ন করে বিশেষ করে মেরুদণ্ডের বিভিন্ন দুটি হাড়ের মাঝখানের স্নায়ুরজ্জু সূতা দিয়ে বেঁধে তিনি আবিষ্কার করেছেন কোন্ স্নায়ু শরীরের কোন্ অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারো আগে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য যে গ্লাডিয়েটররা রোমান এরিনাতে অস্ত্রযুদ্ধ করে গুরুতর আহত হতো তাদের চিকিৎসা করেও তিনি শারীরবৃত্তের অনেক কিছু জেনেছেন। এভাবে এ্যানাটমি বা আভ্যন্তরীণ শরীর গঠন ও স্নায়ুতন্ত্রীর উদ্ঘাটনে তিনি প্রথম সত্যিকারের বিজ্ঞানী হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেন যার সাক্ষ্য তাঁর অনেকগুলো বইয়ে রেখে গেছেন। তাঁর এই দিকটি সব চেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিজের এবং যুগে যুগে তাঁর অনুসারীদের প্রবর্তিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় এই দিকটি আসলে খুব কম গুরুত্ব পেয়েছে। সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে না কোন উপযুক্ত তত্ত্ব গড়ে তোলা হয়েছে, না সেগুলোর খুব বেশি আর উন্নয়ন হয়েছে। তবে নিজের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরিক্ষার ভিত্তিতে এবং তাঁর আগের অন্যান্যদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে চিকিৎসার জন্য তিনি যে বিস্তারিত পদ্ধতির ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেছেন সেগুলো খুবই অনুসৃত হয়েছে। গ্লাডিয়েটরদের চিকিৎসা করেও তিনি হাড়, পেশি, রগ্ প্রত্যেকটির ক্ষত কী কী যত্ন ও ওষুধে ভাল সারে তা লক্ষ্য করার ভাল সুযোগ পেয়েছিলেন। তাও সেই পদ্ধতিগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতিতে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের তিনিই যে পথিকৃৎ সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

গ্যালেন চিকিৎসার মধ্যে একই সঙ্গে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক দিকের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। এর একটি হলো লক্ষণ কেন দেখা যাচ্ছে তার পেছনের কারণ কী তা বের করার চেষ্টা। আর একটি হলো পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেয়া– কোন্ পরিস্থিতিতে কী অসুখ হয়েছে, কোন্ চিকিৎসার সেটি সেরেছে সেই সব অভিজ্ঞতা। আরো একটি হলো অসুখ সম্পর্কে একটি মূল তত্ত্ব থাকা এবং সেই তত্ত্ব থেকে রোগ ও চিকিৎসার ব্যাপারগুলো যুক্তি দিয়ে নির্ণয়। লক্ষণ দেখে এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি যে চিকিৎসা করেছেন ও চিকিৎসার বিধান দিয়ে গেছেন সেগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁকে ঠকায়নি। যেমন তিনি বল্তেন এক একটি অসুখের কিছু বড় বড় লক্ষণ থাকে, কিন্তু সেই বড় লক্ষণ ওই অসুখটার কারণেই দেখা দিয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হবার জন্য অনেকগুলো ছোট লক্ষণ লক্ষ্য করতে হয়। যেমন কিছু অসুখের বড় লক্ষণ হলো নাড়ির স্পন্দন ও মূত্রের

অস্বাভাবিকতা। কিন্তু এর সঙ্গে মুখের-গালের রঙ, মাথা ধরা, শ্বাসের ভিন্নতা ইত্যাদি ছোট লক্ষণ লক্ষ্য করতে হবে। এর প্রত্যেকটি লক্ষণ কী বলার চেষ্টা করছে তা নিয়ে গ্যালেনের বিস্তর গবেষণা রয়েছে। যেমন শুধু নাড়ির স্পন্দনের প্রকৃতি নিয়ে লেখা তাঁর গ্রন্থের নাম *পাল্‌সিবাস*।

লক্ষণ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক চিকিৎসার গ্যালেন যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক পথে থাকলেও পরবর্তী কালে তাঁর চিকিৎসার সেই দিকগুলো খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি। যা গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর মূল তত্ত্ব, এবং সব কিছু সেই তত্ত্বের আলোকে দেখা। আর সে তত্ত্বটি গ্যালেনের সব চেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এ্যনাটমি ও শারীরবৃত্ত সম্পর্কে তাঁর গবেষণা থেকে না এসে, এসেছে তাঁর প্রাচীন গুরু হিপোক্রেটেসের আদি তত্ত্ব অনুসরণ করে। এর ফলে গ্যালেনের প্রভাব বরং হাজার বছর ধরে চিকিৎসাবিদ্যাকেও জটিল তত্ত্বের অপ্রাসঙ্গিক অভ্যাসে আবদ্ধ রেখেছিলো।

দীর্ঘকাল টিকে যাওয়া জটিল তত্ত্বঃ

দার্শনিক-চিকিৎসক গ্যালেনের বড় পরিচয় ছিল তাত্ত্বিক হিসেবে। তিনি মনে করতেন লক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে যত ভাল চিকিৎসাই হোক না কেন আসল কথা হলো সব কিছুর পেছনে একটি সাধারণ সর্বব্যাপ্ত তত্ত্ব থাকতে হবে– যার থেকে সব কিছু উৎসারিত হবে। তাঁর তত্ত্বটির মূল উৎস যদিও ছিল হিপোক্রেটেসের আদি তত্ত্ব, তাঁর হাতেই এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। শেষ পর্যন্ত গ্যালেনের এই তত্ত্বই অন্য সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে এবং যুগ যুগ ধরে চিকিৎসকরা এর শরণাপন্ন হয়ে অদ্ভুত সব ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেছেন যা রুগীর ক্ষতিই বরং করেছে। এটি হিউমর তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী শরীরে চারটি মূল হিউমর বা রস আছে– শ্লেষ্মা, কালো পিত্ত রস, হলুদ পিত্তরস এবং রক্ত। শ্লেষ্মা হলো শরীরে সাদা রঙের নানা নি:সরণ। এর মধ্যে আছে কফ, অন্যান্য মিউক্যাস বা পিচ্ছিল জিনিস, লসিকা (লিম্ফ) রস, পূঁজ, থুথু এমনকি ঘামও। মনে করা হতো এগুলোর সবেরই উৎস মস্তিষ্ক বা মগজ। অন্য দিকে আর একটি হিউমর কালো পিত্তরস আসে লিভার থেকে। হলুদ পিত্তরস আলাদা একটি হিউমর– সেটি আসে পিত্ত থলি থেকে। এই দুই পিত্তরসের যে কোনটি বা উভয়ে বমির মধ্যে, মলের মধ্যে বা মূত্রের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। রক্ত যদিও আলাদা একটি হিউমর, প্রথম তিনটি মিলেই কিন্তু রক্ত তৈরি হয়। এই তিনটির অনুপাত রক্তের মধ্যে বিভিন্ন রকম হয়ে রক্তের বিভিন্নতা

সৃষ্টি করে। গ্যালেন কেন এসব ভাবলেন, বা তাঁর আগে হিপোক্রেটেস কেন ভেবেছিলেন তার বৈজ্ঞানিক কারণ অনুপস্থিত।

হিউমর তত্ত্বে ভাল স্বাস্থ্য মানে হলো হিউমরগুলো পূর্ণ ভারসাম্যে থাকা, অসুখ মানে হলো এই ভারসাম্যের অভাব, আর চিকিৎসা মানে হলো সেই ভারসাম্যের পুন:প্রতিষ্ঠা। একটি হিউমর যখন অন্যগুলোর তুলনায় অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায় বা কমে যায় সেটিই ভারসাম্যের অভাব। উদাহরণ স্বরূপ যে অসুখে ভাবাবেগের প্রকাশ বাড়ে, রুগী অতিরিক্ত সক্রিয়তা দেখায়, বুঝতে হবে যে রক্তের পরিমাণ বেড়ে গেছে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসার উপায় হবে রক্তের পরিমাণ কমিয়ে আনা। সেটি ওষুধ প্রয়োগে কিছুটা করা যেতে পারে, তবে সরাসরি রক্ত সরিয়ে ফেলে করাটাই বেশি কার্যকর। এ কাজটি করার পদ্ধতি ছিল রুগীর শরীরে জোক লাগিয়ে দিয়ে তার দ্বারা রক্ত চুষিয়ে নেয়া, অথবা শিরা কেটে রক্ত ঝরে যেতে দেয়া। এই শেষের উপায়টি রুগীর অবস্থা বরং অনেক খারাপ করে দিতো– কিন্তু সে সময় চিকিৎসকরা তা মনে করতেন না। এমনকি মাত্রাতিরিক্ত রক্ত ঝরানেটি যে বিপজ্জনক ছিল হিউমর তত্ত্বে বিশ্বাসী চিকিৎসকরা তাও অগ্রাহ্য করতেন।

বেড়ে যাওয়া হিউমরটিকে কমিয়ে ফেলা যেমন চিকিৎসার একটি উপায় হতো, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে গুণাগুণের দিক থেকে বিপরীত হিউমর প্রয়োগ করাটিও একটি উপায় হতো। যেমন কোন কোন সর্দির কারণ মনে করা হতো ঠাণ্ডা লেগে ভেজা পরিবেশে শ্লেষ্মার পরিমাণ বেড়ে যাওয়াকে। এই শ্লেষ্মার 'গুণ' হলো ঠাণ্ডা আর ভেজা। তার বিপরীত গুণ রয়েছে হলুদ পিত্তের– গরম ও শুষ্ক হবার গুণ। তাই ওই সর্দির একটি চিকিৎসা হলো হলুদ পিত্ত বাড়িয়ে শ্লেষ্মা বৃদ্ধির বিপরীত অবস্থা ঘটানো। এটি পিত্তবর্ধক ওষুধ প্রয়োগে ও গরম স্যাঁক দিয়ে করা যেতো। রক্ত ক্ষরণ করিয়ে যেমন রক্ত কমানো হতো, অন্যান্য অসুখে অন্য হিউমর বেড়ে গেছে মনে করে সেগুলোও সরাসরি কমানোর ব্যবস্থা করা হতো। যেহেতু কালো পিত্ত বা হলুদ পিত্ত সঞ্চিত হবার কিছু জায়গা হলো বমি, মল, মূত্র ইত্যাদি। কাজেই ঘন ঘন বমি করিয়ে, মলত্যাগ ও মূত্রত্যাগ করিয়ে এগুলো কমানো হতো। বমি উদ্রেককারী, রেচক এবং মূত্রবর্ধক ওষুধ দিয়ে এগুলো করা হতো। এদেরকে বলা হতো শরীর পরিস্কার করা– চিকিৎসার প্রায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এগুলো। অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত ভাবে করার ফলে এসব রুগীর জন্য ক্ষতিকর হয়ে পড়তো।

গ্যালেনের সময়ে তখনো গ্রীক বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ শেষ হয়নি। গ্যালেনের লক্ষণ ও অভিজ্ঞতা নির্ভর চিকিৎসা সেখানে তখন চিকিৎসাবিদ্যার সেরা উদাহরণ। তাঁর গ্রন্থগুলোও ছিল এই ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে অনুসৃত। গ্রীক যুগের অবসানের পর আরব পণ্ডিতরা এর পুনরাবিষ্কার করেছিলেন এর প্রায় ছয় সাতশ' বছর পর। সেখানে দীর্ঘকাল আলরাজী (দশম শতাব্দী) ও ইবনে সিনার (একাদশ শতাব্দী) চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থগুলো কার্যকর রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপত্রের কোষগ্রন্থ বলে বিবেচিত হতো এবং পরে শেষ-মধ্যযুগে ল্যাটিন অনুবাদে ইউরোপেও একই মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু সেই প্রথম থেকে মধ্যযুগের শেষ অবধি হিউমর তত্ত্বের অসম্ভব প্রভাব থেকে না ইসলামী চিকিৎসা ব্যবস্থা, না ইউরোপীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা, মুক্তি পেয়েছে। এর মধ্যে রক্তক্ষরণের উপযোগিতা নিয়ে মাঝে মাঝে কোন কোন চিকিৎসাবিদ প্রশ্ন তুল্‌লেও এটি বরাবর চিকিৎসার একটি প্রধান পদ্ধতি হিসেবে থেকে গেছে; সেই সঙ্গে 'শরীর পরিস্কার করার' সেই জবরদস্তি ব্যবস্থাগুলো। অবশ্য ভেষজ ওষুধগুলোর ও পথ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নয়ন ঘটেছিলো ওই আরব ও ইউরোপীয় মধ্যযুগে। গ্যালেন যে সব আদিতে প্রবর্তন করেছিলেন সেই নাড়ি, শ্বাস, মূত্র পরীক্ষা ইত্যাদি থেকে রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়ারও উন্নয়ন ঘটেছিলো। সব কিছুর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল একই – হিউমরের ভারসাম্য আনা। এমনকি মূত্র পরীক্ষায় মূত্রের রং থেকে হিউমরের ভারসাম্য ও শরীরের অবস্থা বোঝার জন্য এক রকমের 'কালার চার্ট' এ সময় উদ্ভাবিত হয়ে ব্যবহৃত হতো।

হিউমরের সঙ্গে বিষের সম্পর্কটিও এক সময় এই তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন হিউমরের আধিক্যে একটি বিষের প্রভাব দেখা দিলে বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয় করার একটি বিশ্বাস গড়ে ওঠে। এভাবে চিকিৎসায় পারদ, ক্যালামেন (মার্কুরিক ক্লোরাইড), আর্সেনিক ইত্যাদি বিষকে ওষুধ হিসেবে প্রয়োগের রীতি চালু হয়। এখন আমরা জানি সামান্য পরিমাণেও এসব বিষের কাজ শরীরকে কী ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে– অনেক সময় দীর্ঘ মেয়াদে একটু একটু করে। রক্তক্ষরণের মত এই আর একটি মারাত্মক রীতি ওই গ্যালেনীয় হিউমর তত্ত্বের আড়ালেই ইউরোপীয় ও অন্যান্য কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক চিকিৎসা চালু হবার আগে পর্যন্ত, বিশেষ করে অসুখের জীবাণু তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত, এ সবের অত্যাচার শেষ হয়নি।

গ্যালেনের হিউমর তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো এক পর্যায়ে এসে ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদ গ্যালেনের কাল থেকেও অনেক

প্রাচীন পদ্ধতি, প্রায় বৈদিক আমল থেকে চলে আসছিলো। প্রাচীন আয়ুর্বেদে কফ, পিত্ত, বায়ু– শরীরের ওপর এই তিনটির প্রভাবের কথা রয়েছে। কিন্তু গ্রীক প্রভাবে হিউমর তত্ত্বের অনেকখানিই এর ওপরও ভর করেছিলো। উপোস, বমি উদ্রেক, রেচন, মূত্র বর্ধন এমনকি এক সময় রক্ত ক্ষরণও বাদ যায়নি। অবশ্য ভেষজ চিকিৎসায় অমূল্য আরো সংযোজন প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থায় এভাবে ঘটেছে। আধুনিক কালে এসেও আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি কবিরাজিতে ও হেকিমিতে এর প্রভাব উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যথেষ্ট ছিল। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার বর্ণনায় এসব ভীতি উদ্রেককারী চিকিৎসার সুন্দর বর্ণনা আছে যার কিছু কিছুকে হিউমর তত্ত্বের রেশ বলে মনে করা যায়।

গ্যালেন যে এ্যানাটমি ও শারীরবৃত্তের মূল্যবান বাস্তব জ্ঞান দিয়ে গিয়েছিলেন (কিছু ভুল সহ) সেদিকে এই দীর্ঘ সময়ে কোথাও খুব একটি নজর দেয়া হয়নি, শেষ-মধ্যযুগের ইউরোপেও নয়। শব ব্যবচ্ছেদ তখনো সর্বত্র নিষিদ্ধ। এমন কি প্রাচীন কালে যেটুকু অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে যে চিকিৎসা হতো তাও প্রায় ভুলে যাওয়া হয়েছিলো। দাঁত তোলা, সরে যাওয়া হাড় বসানো, মূত্র থলির পাথর সরানোর মত ছোটখাট কাজ ছাড়া আর কিছু হতোনা বলেই চলে। গ্যালেনের এ্যানাটমি জ্ঞান ব্যবহার এবং তার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে একেবারে ষোড়শ শতাব্দীতে এসে আধুনিক বিজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে।

রক্ত নিয়ে জটিল তত্ত্বঃ

গ্রীক যুগ থেকেই শারীরিক অনেক কিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ঘুরে ফিরে রক্তের বিষয় এসেছে। এ নিয়ে নানা কল্পিত তত্ত্ব ক্রমেই সৃষ্টি হয়েছে। এরিস্টোট্‌ল সন্তান জন্মের বংশগতিতে রক্তকে প্রধান নিয়ামক মনে করতেন। তাঁর মতে প্রজননে পুরুষের অংশ শুক্র তৈরি হয় রক্ত থেকে আর প্রজননে স্ত্রীর অংশ হলো মাসিকের রক্ত। হিপোক্রেটেসের আদি হিউমর তত্ত্ব থেকেই ধারণা ছিল যে রক্তই খাদ্যের পুষ্টিকে সারা শরীরে নিয়ে যায়, শরীরে হিউমরগুলোকেও সেই পুষ্টি থেকেই সৃষ্টি করে। সাধারণ ভাবে গ্রীক চিকিৎসকরা মনে করতেন শরীরে শিরা ও ধমনী দু'রকমের নালি রয়েছে বটে তবে এর মধ্যে শুধু শিরাই রক্ত বহন করে। এটি অন্ত্র ও লিভার থেকে যাত্রা শুরু করে ওখান থেকে পুষ্টি নিয়ে যায়। ধমনী শরীরে বাতাস নিয়ে যায়, এর মধ্যে যে কিছু রক্ত দেখা দেয়া যায় তা শিরা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে।

গ্যালেন যেহেতু বিভিন্ন প্রাণী ব্যবচ্ছেদ করে হার্ট এবং নানা রকম শিরা, ধমনী সব ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন তিনি ওই প্রচলিত ধারণাগুলোকে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারলেন। ধমনীতে রক্ত যাবার ব্যাপারে তিনি বল্‌লেন এটি হার্টের নিচের বাম ও ডান কামরার (ভেনট্রিকল) মাঝের দেয়ালের ফুটোর মধ্য দিয়ে শিরার রক্ত সংবহল ব্যবস্থার মধ্য থেকে ধমনী জালের মধ্যে যায় (আসলে এরকম ফুটো নাই)। তিনি রক্ত সৃষ্টির একটি বিস্তারিত তত্ত্বও দিয়েছেন যেটি গ্রীক প্রচলিত ধারণার খুব বাইরে ছিলনা। খাদ্য পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে প্রায়-তরলায়িত অবস্থায় লিভারে যায় ও সেখানে রক্তে পরিণত হয়। এই রক্তই শিরায় বাহিত হয়ে সারা শরীরে পুষ্টি নিয়ে যায়। এভাবে খাদ্য থেকে ক্রমাগত নতুন ভাবে রক্ত তৈরি হতে থাকে আর শরীরে ছড়িয়ে গিয়ে তা নানা কাজে ফুরিয়ে যেতে থাকে। এটি একটি একমুখী ব্যবস্থা। এসবের মূল ধারণাই ভুল।

গ্যালেনের তত্ত্বে ফুসফুসের সঙ্গে হার্টের সংযোগটি ভাল করে এসেছে। হার্টের ভেতর দিয়ে ধমনীতে গিয়ে কিছু রক্ত বিশেষ ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে যায়। ফুসফুসে আবার বাতাসের সহায়তায় তৈরি হচ্ছে জীবনীশক্তি। ধমনীর রক্তের মাধ্যমে এই জীবনী শক্তি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। ফুসফুসে বাতাসের আর একটি কাজ হচ্ছে বিশেষ শিরার মাধ্যমে হার্টে এসে একে ঠান্ডা করা। এখানে উত্তাপ যে গরম বাষ্প তৈরি করে তাও ওই শিরার মাধ্যমেই ফুসফুসে ফেরৎ গিয়ে শ্বাস ফেলার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এজন্য একই শিরাতে ঠাণ্ডা বাতাস হার্টে আসা ও গরম বাষ্প উল্টা পথে ফেরৎ যাওয়ার ব্যবস্থা তাঁকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। এর মধ্যে কিছু একমুখী কপাটিকা কল্পনা করে তিনি তা করেছেন। ধমনীতে যে নাড়ির স্পন্দন তাকে তিনি ধমনীর দেয়ালের একটি নিজস্ব গুণ মনে করতেন যা এটি হার্টের স্পন্দন থেকে জীবনীশক্তির মাধ্যমে লাভ করেছে। এটি তিনি প্রমাণ করেছেন বলে দাবী করেছেন প্রাণীর ধমনীতে একটি ছিদ্র করে সেখানে একটি ফাঁপা শলা ঢুকিয়ে তার দুদিকে সূতার বাঁধনে বেঁধে। তিনি দেখিয়েছেন এর পর বাঁধনের বাইরে হার্টের দিকে ধমনীতে নাড়ি স্পন্দন থাকে কিন্তু শলা পার হয়ে অন্যদিকে থাকেনা কারণ ওই ছিদ্র ও শলার ভেতর দিয়ে জীবনীশক্তি বের হয়ে যাচ্ছে। এসবেরও অধিকাংশই ভুল।

এখানে দেখা যাচ্ছে প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেও, এমনকি কিছু কিছু এক্সপেরিমেন্ট করার পরও গ্যালেনের রক্ত সংক্রান্ত তত্ত্বে ভুলের সংখ্যা অনেক। খুব সম্ভব প্রাণ সম্পর্কে এরিস্টোট্‌লের জীবনীশক্তি তত্ত্ব (ভাইটালিস্ট থিওরি) দ্বারা তিনি এত প্রভাবিত হয়েছিলেন যে নিজের

পর্যবেক্ষণগুলোকে তিনি ওই তত্ত্বের আলোকে ভুল ব্যাখ্যার দিকে নিয়ে গেছেন। এরিস্টোট্‌লের জটিল তত্ত্ব তাঁকে রক্ত সঞ্চালনের আরো জটিল ও ভুল তত্ত্বের দিকে যেতে বাধ্য করেছে। নইলে হয়তো তিনি বুঝতে পারতেন রক্ত হার্ট কর্তৃক পাম্প হয়ে ধমনী দিয়ে শরীরে ছড়িয়ে আবার শিরা দিয়ে হার্টে ফিরে আসছে এবং একই রক্ত তা বার বার করছে। এটি প্রত্যেকবার তৈরি হচ্ছেনা, আদৌ লিভারে তৈরি হচ্ছেনা। ফুসফুসে রক্ত যাওয়ার জন্য হার্ট থেকে আলাদা ধমনী আছে। রক্তও রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে গ্যালেনের জটিল তত্ত্বের গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পেতে বিজ্ঞানকে আরো অন্তত হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে– দামেস্কে আল নাফিস ১২৫১ খৃস্টাব্দে ব্যাপারটা প্রথম তুলে ধরতে পেরেছেন; এবং ইংল্যান্ডের উইলিয়াম হার্ভে আরো তিন শ' বছর পর এটি চূড়ান্ত করতে পেরেছেন।

ঘেরাটোপের মধ্যেই বৈপ্লবিক বিশ্ব-তত্ত্ব

সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের আবহঃ

মোটামুটি ১৪০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ইউরোপে পুনর্জাগরণের কাল (রেণেঁষা) বলে চিহ্নিত করা হয় (গ্রীক সভ্যতার কালকে মূল জাগরণ মনে করে)। শেষ-মধ্যযুগের অনেক বৈশিষ্ট তখন বিদায় নেবার পথে। আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন তখন আসতে শুরু করেছিলো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে চার্চের কর্তৃত্ব একটুকুও কমে গেছে বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চার্চের বা এরিস্টোট্‌লের মতবাদকে অগ্রাহ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নতুন কিছু বলা সম্ভব হয়েছে। তবে ওই পরিবর্তনগুলো একটু একটু করে নতুন তত্ত্বের সুযোগ বাড়িয়ে দিচ্ছেলো বৈকি। এত দিনে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছিলো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বাণিজ্যিক ব্যবস্থার দিকে। যখন ক্ষমতা ক্রমে ব্যবসায়ীদের হাতেও গেল, অন্যান্য মানুষের জন্য নানা পেশা সৃষ্টি হলো কারিগরি ও শিল্পে। ধীরে ধীরে মধ্যবিত্তের মত একটি শ্রেণী সৃষ্টি হলো। বড় সাম্রাজ্যের চেয়ে ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্রগুলোর গুরুত্ব বাড়লো-ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদে। এসব কিছু চিন্তার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনলো বৈকি; বিশেষ করে নানা সুকুমারকলার ক্ষেত্রে– চিত্র-শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত, সাহিত্য সব কিছুতে। তখনো সুকুমারকলার বিষয়বস্তুতে ধর্মীয় বিষয়ই রইলো, কিন্তু তার মর্মমাণীতে ফুটে উঠছিলো ক্রমে মানুষের জয়গান, মানুষের চিত্রায়ন। মানুষ, মানুষের জীবন, তার পার্থিব জগত এসবের চাহিদাটি ক্রমে মুখ্য হলো।

পরিবর্তনগুলো প্রথমে ইতালীতে দেখা দিয়েছিলো। পরে উত্তর ইউরোপে জার্মানি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছিলো। অন্যদিকে পর পর অনেকবার প্লেগ মহামারী (ব্ল্যাক ডেথ) এসে ইউরোপের লোকসংখ্যাকে সাংঘাতিক ভাবে কমিয়ে ফেল্‌ছিলো। প্রায় অর্ধেকের মত মানুষের অসহায় মৃত্যু চার্চের প্রতিপত্তিতেও কিছুটা ফাটল ধরিয়েছিলো। সাধারণ মানুষের উৎসাহ এখন যেমন চার্চের প্রতি তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা সহ অন্যান্য দিকেও বিস্তৃত হচ্ছিলো।

আমরা দেখেছি পুরো শেষ-মধ্যযুগ জুড়েই এরিস্টোট্‌লের গতিতত্ত্বের মত কিছু কিছু অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ক্রমে সমালোচনার মুখে পড়ছিলো। টলেমির একেবারে আটঘাট বাঁধা তত্ত্বের আংশিক বিকল্প প্রস্তাবও আসতে শুরু করেছিলো। এগুলো জমে জমে ওই পুনর্জাগরণের কালে পুরানো জটিল তত্ত্বের সমালোচনার সুযোগ আরো বিস্তৃত হয়েছিলো।

কিছু কিছু সমালোচনা খোদ এরিস্টোট্‌লপন্থীদের দিক থেকেই উঠছিলো। যেমন তাঁরা বল্‌লেন ওই যে টলেমি বিশ্বের যেই বিন্দু থেকে জ্যোতিষ্কদের আদর্শ গতি দেখা যাবে তা বিশ্বের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে কাল্পনিক ইকোয়েন্টে নিয়ে গেছেন– তাতে এরিস্টোট্‌লের তত্ত্বের মৌলিক ব্যত্যয় ঘটেছে। একই ভাবে পৃথিবীকে কেন্দ্র থেকে সরিয়ে উৎকেন্দ্রিকতায় আনাও মূল এরিস্টোট্‌লীয় নীতি বিরোধী বলে সমালোচিত হয়েছে। এর মধ্যে টলেমির এপিসাইকেল, উৎকেন্দ্রিকতা ও ইকোয়েন্টকে এড়িয়ে, অথচ এ তত্তের মৌলিক চরিত্র ঠিক রেখে নানা বিকল্প বিশ্ব-ছবি যে ইসলামী ও ইউরোপীয় উভয় ঘরানার পণ্ডিতদের থেকে এসেছে সেটি আমরা দেখেছি। এর বেশির ভাগের তুলনায় অবশ্য টলেমির মডেল বাস্তব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে অনেক ভাল ভাবে খাপ খেতো।

কিন্তু ওই পুনর্জাগরণের কালে এসে এই দিকটিতেও টলেমির মডেলে বেশ কিছু ঘাটতি দেখা গেলো। শেষ-মধ্যযুগে এবং তারও পর ইসলামী বিশ্বে বিজ্ঞান চর্চায় ভাটা পড়লেও এর কোন কোন অঞ্চলে খুবই উচ্চ সক্ষমতার মানমন্দির স্থাপনের মাধ্যমে আকাশ পর্যবেক্ষণে অত্যন্ত সূক্ষ্ম উপাত্ত সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছিলো। নির্ভুলতার দিক থেকে আগেকার যে কোন উপাত্তের থেকে এগুলো ছিল অনেক উন্নত মানের। এর মধ্যে ১২৬০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত তখন পারস্য শাসিত আজারবাইজানে ম্যারাগেহ মানমন্দির এবং ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে সমরখন্দে উলুগ বেগের স্থাপিত মানমন্দির প্রায় কিংবদন্তীর খ্যাতি পেয়েছিলো। মানের দিক থেকে এদের সমকক্ষ না হলে তখন ইউরোপেও উন্নত মানমন্দির স্থাপিত হয়েছিলো। এসবের

উন্নত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে টলেমির মডেল থেকে হিসেব করা ফলাফল এখন আর আগের মত মিল্‌ছিলোনা। কাজেই ওই মডেলের ওপর যে ঐতিহাসিক আস্থা এতকাল অক্ষুণ্ন ছিল, কোনদিক থেকে কোন বিকল্প তত্ত্ব ঠাই পাচ্ছিলোনা, সেই রকম অবস্থা আর বজায় ছিলনা। কিন্তু এগুলো ছিল খুঁটিনাটির বিষয়। টলেমির বিশ্ব-ছবির মূল প্রতিপাদ্য বিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবীর স্থির অবস্থান সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন তখনো অকল্পনীয় ছিল। পৃথিবীর পরিবর্তে সূর্যকে বিশ্বের কেন্দ্রে স্থাপনের সেই চূড়ান্ত অভাবনীয় কাজটি করলেন পোল্যান্ডের বাসিন্দা একজন যাজক-বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাস ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে।

সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্ব কেন:

কোপারনিকাসের বৈপ্লবিক সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাটি ওই ১৫৪৩ সালেই প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর মৃত্যুর পর পর। 'জ্যেতিষ্কদের কক্ষপথে পরিক্রমণ' (সংক্ষিপ্ত মূল নাম: *রেভোল্যুশনিবাস*) নামের এই গ্রন্থটির প্রকাশটি এত গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষের চিন্তাজগতের ইতিহাসে গ্রন্থটির স্থান এতই বিশিষ্ট যে কেউ কেউ প্রতীকী অর্থে ওই বছরটিকেই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রারম্ভের বছর বলতে ভালবাসেন। কোপারনিকাসের তত্ত্বটি যে একটি দু:সাহসী তত্ত্ব তা বোঝা যায় কোপারনিকাস তাঁর জীবদ্দশায় এটি প্রকাশ করতে সাহস করেননি দেখে। প্রকাশের পরও বহু বছর এখানে প্রকাশিত মতামতকে খোলামেলা ভাবে সমর্থন দেয়া প্রায় কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর গ্রন্থে কোপারনিকাস সম্পূর্ণ নতুন একটি বিশ্ব-তত্ত্ব দিয়েছেন যাতে সূর্য বিশ্বের কেন্দ্রে, এবং বৃত্তাকারে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে সব চেয়ে কাছে বুধ গ্রহ এবং তারপর ক্রমানুযায়ী শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। আবার চাঁদ পরিক্রমণ করছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। স্থির তারাগুলো এই পরিক্রমণের অংশ নয়– সেগুলো দূরে স্থির রয়েছে। এই তত্ত্বে পৃথিবী নিজেও পরিক্রমণশীল একটি গ্রহ, অন্য সব গ্রহের মত। তার পরিক্রমণের সময় ১ বছর, অন্য গ্রহগুলোরও পরিক্রমণ সময় সূর্য থেকে যেটি যত দূরে সেটি তত বেশি। পৃথিবী আবার একই সঙ্গে নিজের অক্ষের ওপর ২৪ ঘন্টায় একবার ঘুরে যাচ্ছে। এর দ্বারা কোপারনিকাস পৃথিবী থেকে দেখা সব জ্যেতিষ্কের দৈনিক ঘোরা, এবং সূর্যের ও গ্রহগুলোর রাশিচক্রে বার্ষিক ভ্রমণ ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন যা টলেমির বিশ্ব-ছবিও পারতো। তা হলে টলেমির মডেলটি বাতিল করে এই নতুনটিতে আসার কারণ কী? কোপারনিকাস এর স্বপক্ষে কী কী যুক্তি দেখাতে পেরেছিলেন?

সবচেয়ে বড় যুক্তি অবশ্যই এর তুলনামূলক সারল্য। টলেমির বিশ্ব-ছবিটি ছিল অত্যন্ত জটিল; জটিল না করে তাকে সব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মেলানো ছিল অসম্ভব। তাছাড়া গতির দিক থেকে খুবই অস্বাভাবিক কিছু তাতে ধরে নিতে হয়েছিলো পৃথিবী থেকে অনেক দূরে থেকে স্থির তারাগুলোকে ২৪ ঘন্টায় একবার পৃথিবীকে আবর্তন করতে বলে। এজন্য যে প্রচণ্ড গতির প্রয়োজন তাদের হতো ওই বিশাল আয়তনের জিনিসের পক্ষে তার ধকল সামলানো নিয়ে অনেকে চিন্তিত ছিলেন। এজন্যই বুরিডান ও ওরেম এর বদলে পৃথিবীকে অক্ষের ওপর ঘোরার মডেল দিয়েছিলেন– যদিও অন্য কারণে সেই মডেল থেকে পিছিয়ে এসেছিলেন। কোপারনিকাসের কালে এসে বিশ্বে সূর্যের যে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র আছে তা অবশ্য অনেকের কাছে বেশ স্পষ্ট ছিল। কারণ সুপেরিয়র অর্থাৎ বহিস্থ তিন গ্রহ (মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি) এবং ইনফেরিয়র অর্থাৎ অন্তস্থ তিন 'গ্রহের' (শুক্র, বুধ, চাঁদ) মাঝখানে থেকে প্রতিসাম্য বজায় রেখে এটি সবাইকে প্রভা বিলোচ্ছিলো এমনটিই সবাই লক্ষ্য করেছেন। কোপারনিকাস সূর্যকে বিশ্বের কেন্দ্রে নিয়ে এসে এই ব্যাপারটিকেই আরো যৌক্তিক করে নিয়েছেন। তাঁর বিশ্ব-ছবিতে সূর্য থেকে সুপেরিয়র গ্রহগুলোর দূরত্ব সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে বেশি, এবং ইনফেরিয়র গ্রহগুলোর (শুক্র ও বুধ) ক্ষেত্রে তা কম।

ইনফেরিয়র গ্রহগুলোর পর্যবেক্ষণে এমন কিছু বৈশিষ্ট বরাবর দেখা গিয়েছে যা এবার কোপারনিকাসের মডেলে অনায়াসে ব্যাখ্যা করা গেল। অন্যদিকে সুপেরিয়র গ্রহগুলোরও পর্যবেক্ষণে অন্য কিছু বৈশিষ্ট আছে যাও খুব সহজে ব্যাখ্যা করা গেল; টলেমির মডেলে এর কোনটির ভাল ব্যাখ্যা নেই। যেমন দুটি ইনফেরিয়র গ্রহ বুধ এবং শুক্র কোপারনিকাস মডেলে সূর্যের খুব কাছে হওয়াতে পৃথিবী থেকে এদেরকে সব সময় সূর্যের থেকে খুব অল্প ব্যবধানে দেখা যায়। বিশেষ করে শুক্র গ্রহের ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদরা এই ব্যাপারটি বহু হাজার বছর ধরে লক্ষ্য করে এসেছেন। শুক্রকে সব সময় আকাশে সূর্যের খুব কাছাকাছি দেখা যায়। যেহেতু সূর্য আকাশে থাকলে তার আলোর কারণে শুক্রের অল্প আলো দেখা যায়না তাই শুধু ভোরে সূর্য ওঠার ঠিক আগে ওই ওঠার জায়গার কাছেই শুক্রকে উঠতে দেখা যায় শুক তারা রূপে, আর সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার ঠিক পরে কিছুক্ষণ ওই ডোবার জায়গার কাছে সন্ধ্যা তারা রূপে দেখা যায়। রাতের অন্য সময়ে সূর্য দূরে থাকে বলে উর্ধ্বাকাশে শুক্রকে দেখার কোন সম্ভাবনা নেই। টলেমির প্রচলিত মডেলে এর কোন ব্যাখ্যা স্বাভাবিকভাবে আসেনা, কৃত্রিম উপায়ে মডেলে পরিবর্তন এনে সেখানে এর ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে।

কোন কোন গ্রহ মাঝে মাঝে উল্‌টো দিকে যাত্রা করে, যা ব্যাখ্যার জন্য টলেমিকে এপিসাইকেলের মত জটিল বিষয় আমদানী করতে হয়েছিল। এই ঘটনাগুলো ঘটে সুপেরিয়র গ্রহ অর্থাৎ মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির ক্ষেত্রে। কোপারনিকাসের গ্রহে এটি ঘটার ব্যাখ্যা স্পষ্ট। যেমন মঙ্গলের গতি পৃথিবী থেকে কম (সব সুপেরিয়র গ্রহের জন্যই কম)। কাজেই যে সময় পৃথিবী মঙ্গলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায় তখন পৃথিবী থেকে মনে হয় মঙ্গল তার গতির দিক পরিবর্তন করে উল্‌টো দিকে চল্‌ছে। এমনটি হবার জন্য সে সময় সূর্য পৃথিবীর যে দিকে থাকে মঙ্গলকে তার ঠিক বিপরীত দিকে থাকতে হবে– মঙ্গল-পৃথিবী-সূর্য এভাবে এক লাইনে। সে কারণে মঙ্গল তখন পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে থাকবে এবং একে বড় দেখাবে। এটি তখন সূর্যাস্তের সময় উদিত হয়ে, মধ্যরাতে মাথার ওপরে যাবে এবং সূর্য ওঠার সময় অস্ত যাবে; এভাবে সারা রাত আকাশে থাকবে। পর্যবেক্ষণেও দেখা গেছে যে মঙ্গলকে অস্থায়ী ভাবে উল্‌টো দিকে যাবার সময়টিতে ঠিক এভাবেই মঙ্গলকে দেখা যায়। কোপারনিকাসের মডেলে এগুলোর কারণ খুব স্বাভাবিক ভাবে এসেছে। অথচ টলেমিকে এর ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে খুব কৃত্রিম ও জটিল এপিসাইকেলের সৃষ্টি করে।

পৃথিবী থেকে দেখলে রাশিচক্রের ওপর যেভাবে সূর্য বছরে একবার ঘুরে আসে, অন্যান্য গ্রহগুলোও এর ওপরেই একবার ঘুরে আসে। এটিও হয় সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর আপেক্ষিক গতির কারণে– কোপারনিকাসের মডেলে সেটি স্বাভাবিক ভাবেই স্পষ্ট, পৃথিবীর নিজের গতির কারণে। টলেমির মডেলে এর ব্যাখ্যাও ভিন্ন ভাবে করতে হয়েছে জটিলতার সঙ্গে। এখানে কোপারনিকাসের একটি বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয়: "আমরা শুধু প্রকৃতিকে অনুসরণ করি। প্রকৃতি কোন কিছুই অনর্থক করেনা, বা খামখেয়ালিপনার পরিচয় দেয়না। এটি বরং একটি মাত্র কারণকে অনেকগুলো পৃথক ঘটনার ব্যাখ্যায় কাজে লাগাতে পছন্দ করে"। শুধু প্রকৃতিকে অনুসরণ করলে নেহাৎ আত্মকেন্দ্রিক বিশ্বাস থেকে শুধু নিজেদের গ্রহ হবার কারণে পৃথিবীকে বিশেষ স্থান দেবার সুযোগ ঘটেনা, যা কোপারনিকাস দেননি। এখানেই তিনি প্রথম আধুনিক বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন। বিজ্ঞানীর, বিশেষ করে আধুনিক বিজ্ঞানীর আরেকটি মূল আস্থা কোপারনিকাসের এ কথার মধ্যে ধরা পড়েছে – একটি সাধারণ ও একীভূত তত্ত্ব দিয়ে যথাসম্ভব বেশি ঘটনার ব্যাখ্যা করাটাতেই তাঁর আনন্দ; ওরকম তত্ত্বকেই সত্যের বেশি কাছাছাছি মনে করেন তিনি। কোপারনিকাস শুধু পৃথিবীর গতির একটি কারণ দিয়ে এখানে উল্লেখিত সব ঘটনার স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। টলেমিকে এর

প্রত্যেকটি ব্যাখ্যার জন্য যেখানে যে রকম দরকার এপিসাইকেল ইত্যাদির আলাদা আলাদা অবতারণা করতে হয়েছে। টলেমি এর মধ্যে একীভূত নিয়ম না দেখে অন্য কিছু দেখেছেন যাকে তিনি বলেছেন "মহাজাগতিক খেয়াল– কাকতালীয় ব্যাপার"। জোর করে এসবকে তাঁর 'মহাসংশ্লেষণের' অংশ করতে গিয়ে তিনি বিশ্ব-ছবিকে মহাজটিল করে ফেলেছিলেন। ওই জোর তাঁকে করতে হয়েছিলো এরিস্টোট্‌লের নীতিকে রক্ষা করার জন্য।

এরিস্টোট্‌লের নীতির প্রতি এই মোহ কোপারনিকাসও একেবারে ত্যাগ করতে পারেননি। তাই গ্রহগুলোর জন্য কক্ষপথ বৃত্তাকার হওয়া ও সমবেগের গতি হওয়ার নিয়ম তিনি রেখে দিয়েছিলেন। সূর্যের পর্যবেক্ষিত বিভিন্ন বেগের ব্যাখ্যা তাঁকে কৃত্রিম ভাবেই করতে হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে টলেমির ইকোয়েন্টকে তিনি এত অপছন্দ করেছিলেন যে সেটিই তাঁকে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের বিবেচনায় উৎসাহিত করেছিলো। ইকোয়েন্টের মত তাঁর ভাষায় 'কিম্ভূতকিমাকার' ধারণাকে তিনি বরং বেশি এরিস্টোট্‌ল-বিরোধী মনে করেছিলেন। সেজন্য গ্রহের পর্যবেক্ষিত গতির সঙ্গে এরিস্টোট্‌লীয় আদর্শ মেলাতে কিছু এপিসাইকেল তাঁকেও ব্যবহার করতে হয়েছে। তাই কোপারনিকাসের বিশ্ব-ছবিকে আজকের আধুনিক অবস্থায় আনার জন্য পরে কেপলার, গ্যালিলিও এবং নিউটনকে আরো কাজ করতে হয়েছে। তখনই এটি চূড়ান্ত ভাবে সরল ও সুন্দর হয়েছে।

বিজ্ঞানে সারল্যের মানে কী:

শেষ অবধি কোপারনিকাসের শুরু করা বিশ্ব-তত্ত্বের জয় হয়েছে তার সারল্য ও সৌন্দর্যের জন্য। এক্ষেত্রে ছাড়াও বিজ্ঞানের আরো বহু বিষয়ে সঠিক তত্ত্বের ফয়সালাটি করে দিয়েছে তত্ত্বের মধ্যে এই দুটি গুণের বিবেচনায়। বিজ্ঞানে সারল্যের প্রকৃতিটি বুঝতে গেলে প্রথমেই সামনে আসে 'ওক্‌কামের ক্ষুরের' কথা। আমরা দেখেছি এই নীতি অনুযায়ী যেই তত্ত্বে ধরে নেবার বিষয় যত কম থাকবে সেটি সঠিক হবার সম্ভাবনা তত বেশি। স্পষ্টত টলেমির মডেলে ধরে নেবার জিনিস অনেক বেশি আছে– ইকোয়েন্ট, উৎকেন্দ্রিকতা, এপিসাইকেলের সংখ্যা, গ্রহের কক্ষের সংখ্যা ইত্যাদি। কাজেই এই বিচারে কোপারনিকাসের মডেলই সত্য। কিন্তু এও আমরা দেখেছি ওক্‌কামের নীতির নিজেরই কোন যুক্তি-ভিত্তি নেই। তা হলে বলতে হয় বিজ্ঞানীরা সরল তত্ত্বকে অগ্রাধিকার দেন এটি ঠিক, কিন্তু সেটি তাঁদের একটি নান্দনিক পছন্দ ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে বিজ্ঞানের দীর্ঘ ইতিহাসে সরলতর তত্ত্বগুলোই বার বার প্রমাণিত হয়ে অধিকতর হারে টিকেছে ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখে মনে হয় শুধু বিজ্ঞানীরা নয়, প্রকৃতিও সরল তত্ত্বই পছন্দ করে। কোন কোন দার্শনিক হয়তো বলবেন বিজ্ঞানীরা তাঁদের পছন্দটাই প্রকৃতির ওপর আরোপ করছেন।

সরল তত্ত্বের মধ্যে এক রকম সৌন্দর্য আছে, জটিল ঘোরপ্যাঁচের তত্ত্ব 'সুন্দর' হতে পারে না। বিজ্ঞানীরা সাধারণত সুন্দর বলতে গাণিতিক সৌন্দর্যের কথা বোঝান, কখনো কখনো সেটি আমাদের সাধারণ সৌন্দর্যবোধের সঙ্গেও মিলে যায়। আমরা কোন চিত্রে বা দৃশ্যে ডান-বাম প্রতিসাম্য দেখলে তাতে ভারসাম্যের সৌন্দর্য দেখি; ডান-বাম ছাড়া এই প্রতিসাম্য সেই চিত্রে আরো নানা ভাবে আসতে পারে। বিজ্ঞানীরাও তাঁদের তত্ত্বে ঠিক এরকম প্রতিসাম্য পেলে পুলকিত হন– এটিই ঠিক তত্ত্ব বলে ভরসা পান। অবশ্য তাঁদের এই প্রতিসাম্য (সিমেট্রি) বা সৌন্দর্য এমনি চাক্ষুষ জিনিসে সীমাবদ্ধ থাকেনা– আরো সব উচ্চতর প্রতিসাম্য তাঁদের জন্য সৃষ্টি করতে পারে গণিত। এর মধ্যে কোন কোনটিকে তো তাঁরা প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম বলেই প্রমাণ করতে পেরেছেন। সরল তত্ত্বেই এই সৌন্দর্যগুলো থাকাটি স্বাভাবিক। আরো এক ভাবে বিজ্ঞানীদের তত্ত্বে সৌন্দর্য আসে। যেসব ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাকে ব্যাখ্যার জন্য আগে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব ব্যবহার করতে হতো, সেগুলো যদি একই তত্ত্বের ব্যাখ্যায় আনা যায় সেটিও একটি দারুণ সুন্দর প্রতিসাম্য। কোপারনিকাস যে পৃথিবীর গতির কারণটি দিয়ে বিশ্ব-তত্ত্বের এতগুলো পর্যবেক্ষিত বিষয়ের সুরাহা করতে পেরেছেন সেখানেও এই প্রতিসাম্য রয়েছে। এভাবে সব মূল তত্ত্বকে একটি তত্ত্বে নিয়ে এসে আজ সে পদার্থবিদ্‌রা থিওরি অব এভ্‌রিথিং (সকল কিছুর একই তত্ত্ব) আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন সেটি একটি চূড়ান্ত প্রতিসাম্যের।

আধুনিক পদার্থবিদরা আসলে বেশ কিছুদিন থেকেই সুন্দরকে সত্য মানার নীতিটিকে এক অদ্ভুত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। আইনস্টাইন যখন ১৯১৬ সালে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের মাধ্যমে গাণিতিক ভাবে খুবই সুন্দর তত্ত্ব উপহার দিলেন তখনো এটি বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি। তিনি কিন্তু অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে বল্‌লেন 'যে তত্ত্ব এত সুন্দর, তা কখনো ভুল হতে পারেনা'। এই আস্থা শিগ্‌গির সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তিরিশের দশকে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে গড়ে তোলার একজন মূল বিজ্ঞানী পল ডিরাক পরে এও বলেছেন যে একটি তত্ত্ব সঠিক কিনা তা প্রমাণিত হবার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো এটি সুন্দর কিনা তা দেখা

(গাণিতিক ভাবে 'এলেগ্যান্ট' বা মুগ্ধকর কিনা), এমনকি এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণিত হওয়ার চেয়েও সেটি বেশি জরুরি।

ডিরাকের পক্ষে অবশ্য এই কথা বলা সাজে, কারণ কোয়ান্টাম তত্ত্বে তাঁর বিখ্যাত সমীকরণটি সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত 'এলেগ্যান্ট'। বোদ্ধা যে কারো কাছেই তার সৌন্দর্য ধরা পড়ে; আর তাঁর ভাষ্যমতে তিনি এটি আবিষ্কার করেছিলেন শুধু এর সৌন্দর্য অনুসরণ করে। বিজ্ঞানীর কাছে এমন কথা একটু অদ্ভুত ঠেকে– যদিও ইংরেজ কবি কীটসের কাছে তা শুনে কেউ অবাক হন্‌না– "সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর"(ট্রুথ ইজ বিউটি, বিউটি ট্রুথ)।

যদি বিজ্ঞানের চিরন্তন চর্চায় ফিরে আসি সেখানেও কিছু নিয়ম দেখা যায় যেগুলো বিজ্ঞানীরা মেনে চলেন। সাধারণত তত্ত্বটি কিছু মূলনীতির কথাই বলে, তবে একে বাস্তব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মেলাবার জন্য এর সঙ্গে কিছু 'সহায়ক অনুসঙ্গ' যোগ করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ টলেমির বিশ্ব-তত্ত্বে মূল নীতি ছিল পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে থাকা, আর জ্যোতিষ্কগুলো বৃত্তাকার পথে সমবেগে ঘোরা, এতে গোলক বা খোলক থাকা, বৃত্তের ওপর বৃত্ত বা এপিসাইকেলে গ্রহদের ঘোরা। কিন্তু একটি বিশ্বাসযোগ্য তত্ত্বে পরিণত করতে এর সঙ্গে কিছু সহায়ক অনুসঙ্গ যোগ করতে হয়েছে যা ঠিক করে দিয়েছে গোলক বা খোলকের সংখ্যা, কক্ষের সংখ্যা, এপিসাইকেলের সংখ্যা ইত্যাদি। এগুলো দরকার মত নানা ক্ষেত্রে ধরে নেয়ার ব্যাপার– মূলতত্ত্বে থাকেনা। এসব সহায়ক অনুসঙ্গ যত বেশি দরকার হবে ততই বোঝা যাবে যে মূল তত্ত্বটি বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে বেশি বেগ পেতে হচ্ছে; অর্থাৎ তত্ত্বটি বেশি কষ্টকল্পিত, জটিল। কোপারনিকাসের তত্ত্বে এরকম সহায়ক অনুসঙ্গ অনেক কম।

তত্ত্বের মধ্যে অনেক সময় আরো কিছু জিনিস বাইরে থেকে আনতে হয়, যেমন তার কোন কোন নির্ধারকের মান বাইরের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে সত্যি সত্যি মেপে সেই অনুযায়ী বাড়িয়ে কমিয়ে ঠিক করে দিতে হয় (এ্যাডজাস্ট করতে হয়)। এরকম এ্যাডজাস্ট করার নির্ধারক বেশি থাকাটিও তত্ত্বের একটি দুর্বলতা; এর মানে তত্ত্ব নিজে ওই নির্ধারকগুলোর মান ঠিক করে দিতে অক্ষম– ভবিষৎদ্বাণী করার ক্ষমতা এই তত্ত্বের কম। টলেমির বিশ্ব-তত্ত্বে কক্ষগুলোর ব্যাস, এপিসাইকেলের ব্যাস, এক একটি গ্রহের পরিক্রমণের সময় ইত্যাদি জিনিসগুলো প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ থেকেই হিসেবের মধ্যে ঢুকাতে হয়েছে। এই মডেল থেকে অংক কষে নানা ফলাফল বের করার জন্য এগুলো দরকার। পরে কোপারনিকাস থেকে শুরু করে বিশ্ব-তত্ত্ব যত উন্নত হয়েছে

এভাবে বাইরের পরিমাপকে তত্ত্বের ভেতরে ঢুকানোর প্রয়োজনীয়তা ততই কমে গেছে– প্রায় সব কিছু তত্ত্ব থেকেই এসেছে। নিউটনের হাতে তার চূড়ান্ত রূপ পাওয়ার পর নিউটনের গতির নিয়ম ও মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের কল্যাণে শুধু একটি জিনিস– বিশ্বজনীন মাধ্যাকর্ষণ ধ্রুবককে (G) বাস্তব পরিমাপ থেকে পেতে হয়েছে; তাছাড়া তত্ত্বের মধ্যে এ্যাডজাস্ট করার মত আর কিছুরই প্রয়োজন হয় নি।

আমরা তাই টলেমির তত্ত্বকে জটিল বলেছি এই সব অর্থেই। বিজ্ঞানে সারল্যের মানে এরকম নানা দিক থেকে আসে। এই প্রসঙ্গে আমরা গ্যালেনের চিকিৎসাবিদ্যার হিউমর তত্ত্বের একটি বিষয়ের কথা মনে করতে পারি। হাজার বছর পর ইউরোপীয় চিকিৎসকরা যখন রুগীর মূত্রের পরীক্ষা করার জন্য কালার চার্ট তৈরি করেছেন তখন নানা রোগের লক্ষণের সঙ্গে রুগীর মূত্রের রঙ মেলাবার যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তার ভিত্তিতেই সেই চার্টটি তৈরি করেছেন। কিন্তু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সময় তাঁরা গ্যালেনের হিউমর তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন– কোন্ হিউমর বেড়ে যাওয়ার ফলে মূত্রের এই রঙ হয়েছে– ইত্যাদি। কালার চার্টের তথ্য বাইরের বাস্তবতা থেকে আসাতে আসলে হিউমর তত্ত্বকে এর জন্য খুব বেশি কৃতিত্ব দেয়া যায় না। শুধু তত্ত্বটি থেকেই বিবেচনা করে কালার চার্টের রঙগুলো কার্যকর ভাবে নির্দিষ্ট করে দিতে পারেনি বলে (তত্ত্ব নিজে রঙের সূক্ষ্ম ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেনি) এবং অনুরূপ আরো অনেক ব্যর্থতার কারণে ওটিও জটিল কষ্টকল্পিত তত্ত্ব; তাই বিজ্ঞানে সহায়ক হয়নি।

এক্সপেরিমেন্টমুখী প্রেরণা

আলকেমিতে এক্সপেরিমেন্ট-ঐতিহ্য

বিজ্ঞান না হয়েও কেমিস্ট্রির পথপ্রদর্শকঃ

আলকেমি বিষয়টি কখনো ঠিক বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারেনি, যদিও কিছু কিছু দিক থেকে একে কেমিস্ট্রির ধোঁয়াটে এক পূর্বসূরি মনে করা হয়। 'আলকেমি' শব্দটি আরবী হলেও এর ইতিহাস আরব আলকেমিস্টদের থেকে অনেক পুরানো। সেই ব্যবিলন-মিশরের যুগে এটি ছিল, গ্রীকদের সময়েও। তারপর আরবদের হাত ধরে ইউরোপে গিয়ে একেবারে নিউটনের কাল পর্যন্ত টিকে ছিল; খোদ নিউটন এর চর্চা করেছেন। বিজ্ঞান না হবার কারণ হলো এর পেছনের উদ্দেশ্য ও মূল ভাবধারা। ওই আগাগোড়া সময়ে আলকেমিস্টরা বিশ্বাস করেছেন যে আমাদের চারপাশের বস্তুগুলোর প্রত্যেকের মধ্যে এক রকম 'আত্মা' আছে– এক একটিতে এক এক রকমের আত্মা। বস্তুগুলো বাইরে নানা গুণ দেখায়– কোনটি ধাতব, চক্‌চক্‌ করে; কোনটি অন্যের সঙ্গে দারুণ শক্তির সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফুঁসে ওঠে; কোনটি সহজে গলে, কোনটি নয়। গুণগুলো বাইরে এভাবে দেখলেও এগুলো আসলে ভেতরের সেই আত্মারই বহিপ্রকাশ, বিভিন্নটির আত্মার ক্রিয়াকলাপের ফলশ্রুতি। আলকেমিস্টদের বিশ্বাস ছিল এই ক্রিয়াকলাপগুলো বুঝতে পারলে হয়তো তাঁরা এই বস্তুগুলোকে নিজের প্রয়োজনমত গড়ে নিতে পারবেন।

ওই 'আত্মার' উপস্থিতি ধরে নেয়া এবং তাকে বোঝার চেষ্টা করা– এসবের মধ্যে বিজ্ঞানের মত কিছু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বরং যেভাবে এর চর্চা করা হয়েছে তাতে ক্রমেই এটি হয়ে পড়েছে ভুতুড়ে রহস্যময় একটি বিষয়, যার সঙ্গে তুকতাক ও ম্যাজিকের সম্পর্কও যথেষ্ট। আবার কোন কোন সময় একে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে। নানা রকম নাম, প্রতীক ইত্যাদি এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে একদিকে তা বিষয়টির রহস্যময়তায় ইন্ধন যুগিয়েছে, আবার অন্যদিকে এর মধ্যে এক রকম শৃঙ্খলাও গড়ে তুলেছে। ক্রমাগত চর্চার মাধ্যমে এরও এক রকম তথ্য ভাণ্ডার যুগে যুগে গড়ে ওঠেছে। আসলে আলকেমি যেন ছিল মানুষ ও বস্তুর মধ্যে এক রকম যোগসূত্র। মানুষের মনের মধ্যে যে রহস্যবোধ ও আকাঙ্খা কাজ করছিলো তাই যেন আলকেমিস্টরা

আরোপ করেছেন বস্তু জগতের নানা ভাঙ্গাগড়ার ওপর। মনের ভেতরের ওসব চিন্তায় বিজ্ঞানের কিছু ছিলনা বটে, কিন্তু সেগুলো চরিতার্থ করতে গিয়ে তাঁরা যা করেছেন সেই অভিজ্ঞতা ও তথ্যের কিছু কিছু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কাজে লেগে গেছে; নানা বাস্তব ব্যবহারের ক্ষেত্রেতো বটেই। বরং ওই চরিতার্থ করার ইচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে আলকেমিস্টদেরকে বিজ্ঞানীর চেয়েও বেশি 'ল্যাবোরেটরিমুখী' করেছে– বিজ্ঞানী নিজে যখন হাতেকলমে কাজ করার চেয়ে দার্শনিকের মত ভেবে জানার ও অংক করার কাজে বেশি ব্যস্ত ছিলেন।

ল্যাবোরেটরির পরিবেশ, যন্ত্রপাতি, উপাদান, এবং এসব নিয়ে কাজ করার নিয়মবাঁধা পদ্ধতি, ইত্যাদিতে পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীরা আলকেমিস্টদেরকে অনুসরণ করতে পেরেছেন। বিজ্ঞানীদের এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে আলকেমিস্টদের ওসব নিয়ে রহস্যময় কাজের বিস্তর পার্থক্য থাকলেও আলকেমির ওই হাতেকলমে কাজের উপযোগী ঐতিহ্যটি বিজ্ঞানীরা চট্ করে আত্বস্থ করতে পেরেছিলেন। এভাবে আত্বস্থ করাটি সহজ হবার আরেকটি কারণ হলো আলকেমি নিজেও এক জায়গায় বসে ছিলনা। এর মূল উদ্দেশ্য যাই থাক্ , এটি কাজের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বিস্তৃত হয়েছিলো ওষুধশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, সুগন্ধিদ্রব্যবিদ্যা, রঙবিদ্যা ইত্যাদি নানা জন-গুরুত্বপূর্ণ দিকে। এই শেষের বিষয়গুলোতে বিজ্ঞানেরও উৎসাহ ছিলো। এভাবেই ধীরে ধীরে বিজ্ঞান ও আলকেমির সীমারেখাগুলো অন্তত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিছুটা আবছা হয়ে পড়েছিলো; আলকেমির ল্যাবোরেটরির আদলে বিজ্ঞানের ল্যাবোরেটরি গড়ে উঠতে পেরেছিলো।

একেবারে প্রাচীনকাল থেকে মদ চোলাই করার জন্য পাতন পদ্ধতি ব্যবহারের নানা কাহিনী লেখাজোকায় পাওয়া যায়– সেটি কতখানি ইতিহাস, আর কতখানি পৌরানিক কাহিনী তা আলাদা করা মুশকিল। ব্যাবিলন, চীন, ভারত সর্বত্র নিজ নিজ পৌরানিক কাহিনী মেশানো এ ধরনের চোলাইয়ের উল্লেখ আছে– যাতে শুধু কাজের কৌশল নয়, মন্ত্র-তন্ত্রের বিষয়ও উল্লেখ থাকতো। পাতনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শস্য থেকে তৈরি বিয়ার মদের জলীয় ভাগ পৃথক করে একে ঘন স্পিরিট মদে পরিণত করা। ক্রমে নানা মিশ্র তরলের থেকে বিশুদ্ধ কোন তরল পেতে আরো নানা ক্ষেত্রে পাতনের ব্যবহার প্রধানত গ্রীকদের মধ্যে শুরু হয়েছিলো। সেখানে আদিকাল থেকে পার্থিব চার মৌল– মাটি, পানি, বাতাস আর আগুনের সঙ্গে এরিস্টোট্ল স্বর্গীয় জ্যোতিষ্কদের জন্য পঞ্চম মৌলকে যোগ করে তার নাম দিয়েছিলেন কুইন্টেসেন্স অর্থাৎ 'পঞ্চম সারবস্তু' (ইথারও বলা

হতো)। গ্রীক আলকেমিস্টরা এই স্বর্গীয় বস্তুকে লুফে নিয়েছিলেন তাঁদের কল্পিত 'ফিলোসফার স্টোনের' ভিত্তি হিসেবে (দার্শনিক পাথর, যার অনেক গুণ- যেমন লোহাকে সোনা করা)। এভাবে গ্রীক আলকেমিতে তাদের বিশ্ব-তত্ত্ব ও জ্যোতিষ শাস্ত্রও ঢুকে পড়েছিলো যা আলকেমিকে আরো রহস্যময় করে তুলেছিলো।

ওই যে ফিলোসফার স্টোনের একটি বড় গুণ লোহাকে সোনা করা– এটিই হয়ে পড়েছিলো আলকেমির প্রধান লক্ষ্য। কল্পনার ফিলোসফার স্টোনকে সোনা করার মত বাস্তব রূপ দেয়াটাই এখন তাঁদের ধ্যানজ্ঞান হয়ে পড়লো। এটি করার জন্য তাঁদের যে অনুমানভিত্তিকও কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ছিল তা বলা যাবেনা। নানা বস্তুর 'আত্মার' ওপর যখন যেমন সুবিধা তেমনি গুণ আরোপ করে তাঁরা কিছুটা ইতস্তত ভাবেই নানা বস্তুর ক্রিয়া-বিক্রিয়া উপস্থিত মত করে করে দেখ্ছিলেন। এসব কাজের মধ্যে তেমন কোন শৃঙ্খলা বা পারস্পরিক সমন্বয় ছিলনা। কিন্তু অনেকে দীর্ঘকাল করার ফলে এসবের অনেক তথ্য পুঞ্জীভূত হতে পেরেছিলো। যদিও তাতে ফিলোসফার স্টোনের দ্বারা সোনা করার মূল উদ্দেশ্যের দিকে মোটেই এগুনো সম্ভব হয়নি, ওই তথ্যসম্ভার নানা রকম ব্যবহারিক কাজে ও ধাতু-ওষুধ-সুগন্ধি ইত্যাদির উন্নয়নে বেশ কাজে এসেছিলো। এখান থেকে হাতেকলমে কাজের অভ্যাসটি বিজ্ঞানের কাছে যেতে সুবিধা হয়েছিলো।

আলকেমি এক্সপেরিমেন্ট:

হাতেকলমে কাজে গ্রীকরা বেশি জুত পেতেননা– না বিজ্ঞানে, না আলকেমিতে। গ্রীক আলকেমির ধারণাগুলো সত্যিকার অর্থে পাখা মেলেছিলো অনেক পরে ইসলামী দুনিয়ার আলকেমিস্টদের হাতে। এই শেষোক্তরা অবশ্য চীনা আলকেমির দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন, যার ভিত্তি হলো ইয়াং আর ইয়িন নামে পরস্পর বিপরীত দুই গুণ। ইয়াং হচ্ছে ধনাত্বক, গরম ও আলোকিত; আর ইয়িন হলো ঋণাত্বক, ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। এই আলকেমিরও উদ্দেশ্য হলো অন্য ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করা, এবং তারও চেয়ে বেশি হলো অমরত্ব লাভ করা। অমরত্বের সন্ধানে চীনা আলকেমিস্টরা দেহকে ইয়াং আর ইয়িনের ভারসাম্যে রেখে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ ছন্দিত অবস্থায় রাখার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন– যার দেখা এখনো চীনা ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাবিদ্যায় মেলে। তাছাড়া ইয়াং-সমৃদ্ধ দ্রব্যের সঙ্গে ইয়িন-সমৃদ্ধ দ্রব্যের বিক্রিয়া ঘটিয়ে ওষুধ তৈরি করা হতো, এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। এমনি সব মিশ্রণের কাজ থেকেই ইয়াং-সমৃদ্ধ সালফারের সঙ্গে ইয়িন-সমৃদ্ধ সোরা (পটাশিয়াম নাইট্রেট) মিশিয়ে চীনারা

উদ্ভাবন করেন বারুদের– যা সালফার, সোরা আর কাঠকয়লার গুড়ার মিশ্রণ। এই বারুদ প্রথমে চীনে, এবং পরে আরবদের মাধ্যমে ইউরোপে এসে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলো। অন্যদিকে চীনা প্রভাবে আরব আলকেমির আর একটি বড় লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ে 'আবে হায়াত' অর্থাৎ অমৃত; ফিলোসফার স্টোনের লক্ষ্যটিতো ছিলই।

আরব আলকেমিস্টদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি খ্যাতি পেয়েছিলেন অষ্টম শতাব্দীর জাবির ইব্নে হাইয়ান– যাঁর তত্ত্বগুলো বহুশত বছর ধরে ইসলামী দুনিয়ায় ও ইউরোপে আলকেমি কাজের প্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের কাজে লেগেছে তাঁর রেখে যাওয়া অনেক ল্যাবোরেটরি পদ্ধতি ও দ্রব্য-গুণ সম্পর্কে শিক্ষণীয় বিষয়। সেযুগে বিজ্ঞান আর আলকেমির মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য করা হতোনা তেমনি অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আবার খ্যাতনামা আলকেমিস্টও ছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন চিকিৎসাবিদ, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আলরাজী। আলকেমির ওপর তাঁর একটি খুব বিখ্যাত বইয়ের নাম 'গুপ্ত জ্ঞানের গুপ্ত কথা'। একে সেকালের কেমিস্ট্রি ল্যাবোরেটরিতে নানা পরীক্ষা কাজ করার একটি বিস্তারিত ম্যানুয়াল (ব্যবহারবিধি) বল্লে অত্যুক্তি হবেনা। এতে যাবতীয় দ্রব্যকে তিনি ধাতু, ভিট্রিয়োল, বোরাক্স, লবন ও পাথর এই ক'টি ভাগে ভাগ করেন। দ্রবণীয়তা, দাহ্যতা, স্বাদ ইত্যাদি নানা দিক থেকে এগুলোর পার্থক্যও তিনি নির্ণয় করেছেন। এদের ওপর পরীক্ষণে কেমন করে বিশুদ্ধীকরণ, পৃথকীকরণ, জল-হ্রাস, মিশ্রণ ইত্যাদি কাজ করতে হয় তার বর্ণনা দিয়েছেন। এসব কাজের জন্য ব্যবহৃত যে আয়োজন, পাত্র, সরঞ্জাম দরকার হয় তাও এতে এসেছে– যেগুলোর সঙ্গে কেমিস্ট্রের পরবর্তী সব পাত্র-সরঞ্জাম ইত্যাদির মিল রয়েছে। কার্যক্রমের মধ্যে প্রধান ছিল পাতন, উর্ধ্ব পাতন, দহন, বাতাসে রেখে উত্তপ্তকরণ ইত্যাদি। এগুলো যে পরবর্তী বিজ্ঞানীগণ অন্যভাবেও কাজে লাগাবেন তা আর বিচিত্র কী।

আলরাজী যখন চিকিৎসাবিদ্যা আর প্রকৃতির দার্শনিক হিসেবে দারুণ খ্যাতিমান, তিনি তখন ফিলোসফার স্টোন ও আবেহায়াতের গবেষণার জন্যও সমানে খ্যাতিমান। এরকম অনেক বিজ্ঞানীই আলকেমি চর্চা করেছেন। কিন্তু আবার অনেক বিজ্ঞানীর কোন আস্থাই এর ওপর ছিলনা– যেমন ইব্নে সিনার ছিলনা। ইব্নে সিনা এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিণত করার তত্ত্বে মোটেই বিশ্বাসী ছিলেননা, কারণ তাঁর মতে প্রত্যেক ধাতুর গুণাগুণ তার অন্তর্নিহিত। কিন্তু আলরাজীর 'গুপ্ত ধনের গুপ্ত কথা' বা জাবির ইবনে হাইয়ানের আলকেমি গ্রন্থগুলোর অনুবাদ শেষ-মধ্যযুগ এবং তারও পরের ইউরোপীয় আলকেমিতে

আকর-গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। ওখানেও মূল লক্ষ্য একই ছিল। আরো বহু নাম করা বিজ্ঞানীও আলকেমির হাতছানিকে এড়াতে পারেন নি।

আরব আলকেমিস্টদের থেকে শুরু হয়ে একবারে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাক্কালে এসেও আলকেমি ওষুধশাস্ত্র, ধাতুবিদ্যা সহ অনেকগুলো ব্যবহারিক বিষয়ে সরাসরি অবদান রেখেছে– এবং তার প্রায় সবই পূঞ্জীভূত জ্ঞান ও হাতেকলমে এক্সপেরিমেন্টের ফলে। আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন কিংবা সংকর ধাতু তৈরি করে ধাতুর গুণাগুণের উন্নয়ন এভাবেই এসেছে। এর সঙ্গে মূল উদ্দেশ্য ফিলোসফার স্টোনের সম্পর্ক ঠিকই ছিল, কিন্তু ফলাফল ওখানে আসেনি, এসেছে তার উপজাত এসব ব্যবহারিক জ্ঞানে। তেমনি বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্যাদিতে আলকেমির ফসল এসেছে যেমন ফুলের নির্যাস থেকে বিখ্যাত আরব আতর তৈরি, কিংবা কাপড় রঙ করার জন্য নানা রঙবস্তু তৈরি। আলকেমি থেকেই পরবর্তী কেমিস্ট্রি শুরু হয়েছে একথা বলা যাবেনা, কারণ এই দুইয়ের নীতি সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কিন্তু আলকেমির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছাড়া কেমিস্ট্রির অথবা ধাতুবিজ্ঞানের যাত্রাশুরু এত মসৃণ হতোনা। উদাহরণ স্বরূপ যে অল্প ক'টি মৌল শুরুর দিকে কেমেস্ট্রির কাছে পরিচিত ছিল তার কোন কোনটি আলকেমির মাধ্যমেই আবিষ্কৃত হয়েছিলো– যেমন দস্তা ও ফসফরাস। আলকেমির এক্সপেরিমেন্টমুখী ঐতিহ্যের মধ্যেও অনেক ঘাটতি ছিল। ওই এক্সপেরিমেন্টগুলো ছিল প্রায় সবই গুণবাচক বিবেচনার ভিত্তিতে, সংখ্যাবাচক বিবেচনায় নয়। তাই যন্ত্রপাতি যা ছিল তাতে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ চলতো, কিন্তু তা সংখ্যায় বা গাণিতিক নিয়মে প্রকাশ হবার উপায় ছিলনা। ওই সব যন্ত্রপাতির মধ্যে একটি জিনিসের খুব অভাব ছিল তা হলো খুব সূক্ষ্ম একটি ওজন করার নিক্তি। ল্যাবোরেটরিতে ওটি আসতে পেরেছে আরো অনেক পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে– তখনই সত্যিকার কেমিস্ট্রি শুরু হতে পেরেছিলো।

আধুনিক বিজ্ঞানের শুরুর কালে এসেও আমরা নিউটন ও সমসাময়িক কোন কোন বিজ্ঞানীকে আলকেমি চর্চা করতে দেখেছি। তাঁদের মধ্যে রবার্ট বয়েলের উদাহরণটি বেশ চমকপ্রদ। তিনি বয়েলের নিয়ম খ্যাত বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন, একেবারে প্রথম যুগের একজন কেমিস্টও ছিলেন। ঠিক এটম নয় কিন্তু এক রকম কণার ভিত্তিতে তাঁর রাসায়নিক তত্ত্ব যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক ছিল। একই সঙ্গে একজন আলকেমিস্ট হিসেবে অন্য ধাতুকে সোনায় পরিণত করার চেষ্টা তিনি চালিয়ে গেছেন– যাকে এখন আমরা মোটেই বৈজ্ঞানিক কাজ বলবোনা। বয়েলের মত মানুষের মধ্যে আলকেমি ও কেমিস্ট্রি একই সঙ্গে থাকায় ওই যুগের কেমিস্ট্রি

যে দ্রব্যাদির বিভিন্ন রহস্যময় আলকেমি নাম ও জ্যোতিষ শাস্ত্র থেকে নেয়া নানা প্রাচীন চিহ্ন আলকেমির মত ব্যবহার করবে সেটি মোটেই অবাক হবার মত বিষয় ছিলনা। নাম যাই হোক, চিহ্ন যাই হোক, এটি অবশ্য কেমিস্ট্রিই ছিল; এবং আলকেমির এক্সপেরিমেন্ট-ঐতিহ্য তাকে দারুণ সাহায্য করেছিলো। আসলে শুধু আধুনিক কালে এসে নয়, আলকেমির ওই ঐতিহ্য আরো অনেক আগে মধ্যযুগেও বিজ্ঞানের কোন কোন অংশকে একভাবে কিছুটা এক্সপেরিমেন্টর আবহের মধ্যে রাখতে পেরেছিলো।

আলোকবিদ্যায় এক্সপেরিমেন্টমুখিতা

দেখতে পাওয়ার মানেঃ

গ্রীক আমলে শুধু যুক্তির ব্যবহারের বিজ্ঞান চর্চা করার প্রবণতাটাই মুখ্য হলেও তখন এক্সপেরিমেন্ট একেবারে হয়নি তা বলা যাবেনা। এরিস্টোট্‌ল ও গ্যালেনের মত তাত্ত্বিকরাও জীববিদ্যায় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও এক্সপেরিমেন্ট-নির্ভর গবেষণা করেছেন। তাঁদের মূল্যবান জীববিদ্যার আবিষ্কারের অনেকগুলোই কালজয়ী হয়েছে যার কিছু কিছু আমরা দেখেছি। এটি ঠিক যে গ্রীক আমল এবং মধ্যযুগের একটি বড় অংশের বিজ্ঞানে সাধারণভাবে এক্সপেরিমেন্টমুখিতার অভাব ছিল। অনেক অগ্রগতি সত্ত্বেও আধুনিক বিজ্ঞান তখন না আসতে পারার পেছনে এটিকেই বড় কারণ বলে মনে করা হয়।

বিজ্ঞানে কোন না কোন রকমের এক্সপেরিমেন্টের অপরিহার্যতার বিষয়টি ধীরে ধীরে এসেছে। ইসলামী দুনিয়ার কিছু বিজ্ঞানীদের মধ্যেই এর উন্মেষ দেখা যায়। পরে ইউরোপীয় রেণেঁষার কাছাকাছি সময়ে এটি বিকশিত হয়। তাঁদের কেউ কেউ নিজেরা হাতেকলমে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, কেউ কেউ মনে মনে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন– যাতে হাতেকলমে করার মতই যুক্তি বিস্তার করা হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ অন্যদের এক্সপেরিমেন্টে পাওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করেছেন। অবশ্য তখনকার এই এক্সপেরিমেন্ট-নির্ভরতাকে সম্পূর্ণ বা সর্বব্যাপ্ত বলা যাবেনা। বিজ্ঞানের কোন কোন শাখায় এই প্রবণতা বেশি দেখা গেছে, তার মধ্যে একটি ছিল আলোকবিদ্যা।

প্রাচীনকাল থেকেই আলো নিয়ে মানুষের খুব কৌতুহল ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৭৫০ অব্দ নাগাদ মেসোপোটেমিয়ায় (ইরাক) কোয়ার্টজ কৃস্টাল পালিশ করে লেন্স তৈরির নিদর্শন আছে; কাচ তখনো আসেনি। গ্রীক যুগেই এসেছিলো আলো নিয়ে প্রথম

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। আলোর রশ্মিকে জ্যামিতিক রেখা ধরে নিয়ে তত্ত্বগুলো এসেছে জ্যামিতির মত করে; আর তা দেবার পুরোভাগে ছিলেন স্বয়ং ইউক্লিড– জ্যামিতির সবচেয়ে কৃতী মানুষটি। তিনি জ্যামিতির থিওরেম প্রমাণের মত করে যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন কত দূর থেকে দেখলে, দৃশ্য বস্তুটি চোখে কী কোণ উৎপাদন করলে, তাকে কত ছোট বা কত বড় দেখা যাবে। আলোর ভৌত দিকগুলো নিয়ে বেশ সম্পূর্ণ তত্ত্ব দিয়েছেন আরো পরে টলেমি– তাঁর 'আলমাজেস্ট' বইটি প্রকাশের পরই প্রকাশিত হয়েছিলো 'অপটিক্স' (আলোকবিদ্যা) বইটি। এতে তিনি আলোর বর্ণ উৎপাদন, প্রতিফলন, প্রতিসরণ ইত্যাদি গুণের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রতিসরণ জিনিসটাকে তিনি অনেকটা গাণিতিক যুক্তিতে সেরে ফেলেছেন– ওভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে অন্য মাধ্যমে ঢোকার সময় আলোর বেঁকে যাওয়ার মধ্যে প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণের সমানুপাতিক হবে– যেটি ভুল।

আলো যে সরল রেখায় চলে তা ইউক্লিডও জানতেন, খুব সম্ভব সোজা সরু নলের মধ্যে বাধাহীন থাকার কারণে সেটি বোঝা গিয়েছিলো। আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে টলেমির তত্ত্ব বলেছে আলো চোখ থেকে রশ্মি হিসেবে নির্গত হয়। কোন বস্তুতে প্রতিফলিত হলে এটি চোখে ফেরৎ আসে; আসার সময় ওই বস্তুর আকার-আকৃতি-রঙ ইত্যাদির ছাপ ওতে পড়ে যা সংবেদনশীল চোখ বুঝতে পারে। এগুলোর কোনটিই স্পষ্টত টলেমির পর্যবেক্ষণ-লব্ধ সিদ্ধান্ত নয়, বরং মূলত প্লেটোর দেয়া তৎকালীন গ্রীক বিশ্বাসের প্রতিফলন।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী হিরো (৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ) বরং কিছু কিছু সিদ্ধান্তে এসেছিলেন অনেকটা মনে মনে এক্সপেরিমেন্টের মত করে। আলো যে সব সময় সরল রেখায় চলে এর একটি কারণ তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন এই বলে যে আলো এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যেতে সব সময় সব চেয়ে ন্যূনতম পথ দিয়ে যায়। এই নীতি থেকে তিনি প্রতিফলনের নিয়মটিও ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। পরে দেখা গেছে তাঁর এই নীতিটি খুবই সঠিক। প্রাচীনকাল থেকেই আলোর গতিবেগ অসীম মনে করা হয়েছে, অর্থাৎ আলো কোথাও যেতে কোন সময় নেয়না। মনে মনে এক্সপেরিমেন্ট করে এরও একটি প্রমাণ হিরো খাড়া করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন কোন বস্তু ছুঁড়ে দিলে তার গতিবেগ যত বেশি হয় ততই সেটি পড়ে না গিয়ে বেশি দূর সরল রেখায় যেতে পারে, তবে পরে এক সময় নিচের দিকে বাঁকা হয়ে পড়ে যায়। আলো যেহেতু ক্রমাগত সরল রেখায়

যায়, কখনো পড়ে না গিয়ে, কাজেই আলোর বেগ অসীম। এর বহু পরে অবশ্য বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন আলোর একটি নির্দিষ্ট বেগ আছে।

আলোর প্রকৃতি নিয়ে এবং দেখার কাজটি কীভাবে ঘটে এর মোটামুটি শুদ্ধ উত্তর পেতে গ্রীক আমলের পরেও বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। এটি এসেছে ১০০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ কায়রোতে কর্মরত বিজ্ঞানী ইবনুল হিশশামের কাছ থেকে। পরবর্তীকালে তিনি ইউরোপে আলহাসেন নামে বিখ্যাত হয়েছেন তাঁর পুরো নাম আল হাসান ইবনুল হিশশামের থেকে। বিশেষ করে আলোকবিদ্যায় তাঁর তত্ত্বের কারণে এবং এক্সপেরিমেন্টমুখী বিজ্ঞান-পদ্ধতির একজন উৎসাহী প্রবর্তক হিসেবে তিনি তাঁর নিজের স্থান ও সময়কে ছাড়িয়ে শেষ-মধ্যযুগে ও রেণেঁষার কালে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদেরকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। গ্রীক বিজ্ঞানীদের আলোকতত্ত্ব যে ভুল সেটি তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে প্রক্রিয়ায় তা তাঁর আগের আর একজন আরব বিজ্ঞানী আল কিনদি (৮৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ) শুরু করেছিলেন। আগেই বলেছি টলেমির আলোকতত্ত্বটি মূলত প্লেটোর ধারণা থেকে এসেছে, যাকে বলা যায় 'বহির্গমনতত্ত্ব' কারণ এর মতে আলো চোখ থেকে বাইরে যায়। এর বিপরীতে এরিস্টোট্‌লের দেয়া একটি তত্ত্বকে বলা যায় 'অন্তর্গমনতত্ত্ব'। এতে ধরা হতো যে কোন দৃশ্য বা বস্তু তার আকার-আয়তন ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত বাতাসের মধ্যে (বা অন্য মাধ্যমের মধ্যে) নিজেদের একটি ছাপ সৃষ্টি করে। বাতাসের এই ছাপটি চোখে ঢুকে সেখানে দৃষ্টির অনুভূতি জাগায়। ইবনুল হিশশাম এই অন্তর্গমনতত্ত্ব থেকে বাতাসে ছাপ পড়ার ব্যাপারটি বাদ দিয়ে আলকিন্দির অনুসরণে দেখান যে বস্তুর প্রত্যেকটি বিন্দু থেকে আলোক রশ্মি চোখের প্রত্যেকটি বিন্দুতে এসে পতিত হয়। এতগুলো বিন্দু থেকে রশ্মি এলে যে জটিলতা হবে তা এড়াতে তিনি লম্বভাবে পড়া রশ্মির কার্যকারিতা বেশি বলে ধরে নিলেন। এর জন্য মনে মনে এক্সপেরিমেন্টে তিনি দেখালেন একটি বোর্ডে লম্বভাবে বল ছুঁড়লে তা এখানে গর্ত ফেলে, কিন্তু তেরচা ভাবে ফেল্‌লে তা ঠিকরে বেরিয়ে যায়। পরে অবশ্য গ্যালেনের দেয়া চোখের এ্যানাটমি থেকে তিনি দেখিয়েছেন তেরচা রশ্মিও চোখে প্রতিসরিত হয়ে চোখের ভেতরে ঢুকবে।

১০২০ সালে প্রকাশিত 'আলোকবিদ্যার গ্রন্থ' (*কিতাবুল মানাজির*) নামক বইয়ে ও পরে আরো কয়েকটি বইয়ে ইবনুল হিশমাম তাঁর আলোকতত্ত্বগুলো প্রমাণের চেষ্টা করে গেছেন। সেখানে জ্যামিতিক যুক্তি, চোখের এ্যানাটমি ছাড়াও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও সত্যিকার করা বা মনে মনে করা নানা এক্সপেরিমেন্ট।

এক্সপেরিমেন্টের ভাষায় সব বক্তব্যঃ

একটি বদ্ধ বাক্সের একটি তলের মাঝে পিনের একটি ছোট্ট ফুটো করে সেটিকে আলোকিত দৃশ্যের দিক তাক করলে এর ঠিক বিপরীত তলে এই দৃশ্যের একটি উল্‌টো ইমেজ পড়ে। একে এখন পিন-হোল ক্যামেরা বলা হয়, সেকালের ল্যাটিন নাম ছিল 'ক্যামেরা অব্‌সক্যুরা'। ইবনুল হিশশাম একে চোখের একটি বৈজ্ঞানিক মডেল হিসেবে গ্রহণ করে এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন চোখের ভেতর কী ঘটে, কী ভাবে এর মতই উল্‌টো ইমেজ চোখের মধ্যে সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি পিন-হোল ক্যামেরায় রশ্মিগুলো কী ভাবে আসে, ইমেজ তৈরি করে ইত্যাদি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। এসব এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত ছিল। তিনি বলেছেন যে এক্সপেরিমেন্ট করার সময় পরিবেশের বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; এক এক বার এক একটি দিক পরিবর্তন করে দেখতে হবে তাতে ফলাফলের ওপর কী প্রভাব পড়ে। আলোকবিদ্যায় তাঁর সিদ্ধান্তেগুলোকে তিনি যথাসাধ্য পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করেছেন, এমনকি যেসব বিষয় বহুদিন আগে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে সেগুলোকেও– যেমন আলোর সরল রেখায় গমন, প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়ম ইত্যাদি।

টলেমির আলোর বহির্গমন তত্ত্ব বাতিল করতে তাঁর যুক্তি হলো চোখ থেকে আলো বের হবার কোন বাস্তব প্রদর্শন নেই। বরং খুব প্রখর আলোর দিকে তাকানো মাত্র চোখ ঝলসে যায়, আহতও হতে পারে– এটি কি চোখ থেকে আলো নির্গত হবার লক্ষণ, না ওই প্রখর আলো চোখে প্রবেশ করার লক্ষণ? তাঁর নিজের তত্ত্বে দৃশ্য প্রত্যেকটি বিন্দুর থেকে চোখে প্রত্যেক বিন্দুর ওপর সরল রেখায় আলোক রশ্মি আসার প্রমাণ করতে তিনি বলেছেন যে একটি সরল নল দিয়ে এই দুই বিন্দু যোগ করা যায়। ওই নলের মুখের কোন একটি বিন্দু যদি ঢেকে দেয়া হয় তাহলে ওই বিন্দু দিয়ে যাওয়ার আলোক রশ্মি চোখে পৌঁছবেনা তাই দৃশ্যের ওই বিন্দুটি দেখা যাবেনা। ওই বিন্দু থেকে রশ্মি চোখে পৌঁছতে পারছেনা বলে এমন হচ্ছে। এরিস্টোট্‌লের তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তু নিজে যদি আলোকিত না হতো, আলোকিত বাতাসে বস্তুর ছাপ থেকে যদি আমরা দেখতাম তা হলে নলের ঢেকে রাখা বিন্দু চোখের আড়াল হতোনা।

একটি শিখার কিনার আলো একটি সরু ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তিনি দেখলেন। এরপর একই ছিদ্র দিয়ে ওই শিখার মাঝখানের আলো দেখলেন। এবার আলোটি আগেরবারের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল দেখালো। এভাবে তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন

যে আলো চারিদিকে বিস্তৃত হয়। শিখার কেন্দ্রে চারিদিক থেকে আলো এসে বেশি উজ্জ্বল হচ্ছে, শিখার প্রান্তে আলো শুধু একদিক থেকে আসছে বলে তা নিষ্প্রভ। ইবনুল হিশ্‌শাম প্রমাণ করলেন যে নানা আলোক রশ্মি ও নানা রঙ বাতাসে এক জায়গা দিয়ে গেলেও একটি অন্যটির সঙ্গে মিশে যায়না, বরং নিজ নিজ স্বকীয়তা বজায় রাখে। এটিও তিনি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিয়েছিলেন। এ জন্য বেশ কিছু বাতি একই জায়গার বিভিন্ন বিন্দুতে রাখা হলো, এর মধ্যে কোন কোনটি বিভিন্ন রঙের। এখন একটি বড় পিন্-হোল ক্যামেরা বাতিগুলোর সামনে রেখে তার পর্দায় এদের ইমেজগুলো পড়তে দেয়া হলো। প্রত্যেকটি বাতির ইমেজ পর্দায় একটি পৃথক বিন্দুতে গিয়ে পড়বে। কোন একটি বাতি ঢেকে দেয়া হলে শুধু সেই বাতিটির ইমেজ পর্দা থেকে লোপ পাবে। ঢাকনিটি সরিয়ে দেয়া হলে তার ইমেজ আবার ফেরত আসবে। এতে অন্য সব বাতির ইমেজে কোন রদবদল হবেনা। সব রশ্মিগুলো ওই অতি ক্ষুদ্র পিনের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আসছে অথচ সেখানে একে অপরের ঘেঁষাঘেঁষি করলেও পরস্পর মিশে যাচ্ছেনা। প্রত্যেকে যার যার নির্দিষ্ট বিন্দুতে চলে যাচ্ছে। যদি মিশে যেতো তাহলে সবার ইমেজ পর্দায় একাকার হয়ে যেতো।

গ্রীক চিকিৎসাবিদ গ্যালেন দেহের এ্যানাটমি সম্পর্কে পরীক্ষায় (বানরের মত প্রাণীর ব্যবচ্ছেদে) চোখের আভ্যন্তরীন গঠনের ওপর যা লিখে গেছেন তা ইবনুল হিশশামের বিবেচনার মধ্যে ছিল। বিশেষ করে গ্যালেন দেহের বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্রীর কাজের সঙ্গে চোখ থেকে অপটিক নার্ভে স্নায়ু স্পন্দন নিয়ে যাওয়াটিও আবিষ্কার করেছিলেন। এর ভিত্তিতে ইবনুল হিশশাম দেখিয়েছেন চোখের বাঁকা কর্নিয়াতে আলো বেঁকে যায়, অভ্যন্তরে গিয়ে প্রতিসরিত হয় এবং লেন্সের ওপর উল্টো ইমেজ তৈরি করে। এই ইমেজের সৃষ্ট স্নায়ু স্পন্দন মস্তিষ্কে গেলে দেখার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। তিনি অবশ্য ইমেজ লেন্সে তৈরি হয় বলে ভুল করেছেন, কারণ আসলে তা হয় রেটিনায়। দেখার ব্যাপারে মস্তিষ্কের ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারায় দৃষ্টি-বিভ্রম, আফটার-ইমেজ (কিছুক্ষণ একটি দৃশ্য দেখার পর সাদা দেয়ালে তার ছায়া-ইমেজ দেখা), দুই চোখে দেখার ফলে দৃশ্যের গভীরতার বোধ হওয়া ইত্যাদি তিনি ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন। এ কারণেই দেখার ব্যাপারটিকে তিনি শুধু আলোর ব্যাপার মনে করেননি, মস্তিষ্কের ব্যাপারও মনে করেছেন।

পদ্ধতির ওপর 'আলোক'পাতঃ

অবাক হবার মত একটি ব্যাপার হলো ইবনুল হিশ্‌শামের কার্যকালের প্রায় আড়াইশ' বছর পর ১২৬০ খৃস্টাব্দের দিকে ইংল্যান্ডের একটি খৃষ্টান মঠের যাজক-সন্ন্যাসী-দার্শনিক রোজার বেকন তাঁকে নিজের কাজের বড় প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই প্রেরণা দু'দিক থেকেই সত্য– রোজার বেকন আলোকবিদ্যাকে তাঁর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ করে নিয়েছিলেন এবং বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্টমুখী প্রেরণার উপর খুব জোর দিয়েছিলেন। উভয় ক্ষেত্রে তিনি ইবনুল হিশ্‌শাম প্রদর্শিত পথকে অনুসরণ করেই এগিয়েছিলেন। রোজার বেকন আলোকবিদ্যা ছাড়াও গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং আলকেমি নিয়েও প্রচুর কাজ করেছেন– এবং এর সবকিছু বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর 'বৃহত্তর গ্রন্থ' (*অপুস মাইয়ুস*) নামের বইয়ে। তবে তাঁর সব তত্ত্বের ওপর তত্ত্ব ছিল বিজ্ঞানের পদ্ধতি নিয়ে। যখনই এই পদ্ধতির আলোচনায় এসেছেন তখন উদাহরণ হিসেবে আলোকবিদ্যাকেই বেছে নিয়েছেন বেশি। তাছাড়া বিজ্ঞানের কাজের ক্ষেত্রে তাঁর একটি দর্শন ছিল। তা হলো বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাকে কোন না কোন কাজে লাগাতে হবে তা সেই কাজ ইহকাল বা পরকাল যে সময়েই হোক। তিনি গণিতকেও এই দলে ফেলেছিলেন। তাঁর মতে বাস্তবে সংঘটিত ঘটনাকে সত্যায়িত করার একটি অদ্ভুত ক্ষমতা গণিতের রয়েছে। এই ক্ষমতার কারণে তিনি গণিতকে বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের সহযোগী মনে করতেন।

আলোকবিদ্যার ক্ষেত্রে আলোক রশ্মিকে এক্সপেরিমেন্টে ধারণ করতে গেলে তাকে জ্যামিতিক সরল রেখা হিসেবে নিতে হয়। মৌলিক আলোকবিদ্যার ক্ষেত্রে রোজার বেকন ইবনুল হিশ্‌শামকে অনুসরণ করে গেছেন; এমনকি এক্সপেরিমেন্টকে খুব বড় করে তুলে ধরেও তিনি নিজের হাতে বড় একটা এক্সপেরিমেন্ট না করে ইবনুল হিশ্‌শামের এক্সপেরিমেন্টের ভিত্তিতেই আলোক-বিদ্যার চর্চা করেছেন। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টমুখী বিজ্ঞানই যে আসল বিজ্ঞান এ কথাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ইউরোপে তিনিই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

আলোকবিদ্যায় একটি দিক থেকে অবশ্য রোজার বেকন তাঁর প্রেরণাদাতার থেকে এগিয়ে ছিলেন। তিনি আলোকে নেহাৎ আলো মনে করতেননা, একই গোষ্ঠির বিভিন্ন বিকিরণের মধ্যে তাকে একটি বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন এজন্যই আলোকবিদ্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত। এই গোষ্ঠির মধ্যে অবশ্য আলো নিজের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, কারণ একে সরাসরি দেখা

যায়। তবে অন্যান্য বিকিরণগুলোও আলোর মতো একই গণিত মেনে চলে। রোজার বেকন যদি আলোর এই বহুত্বকে আধুনিক বিজ্ঞানের মত শুধু প্রাকৃতিক বিকিরণগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন তাহলে তাঁকে আধুনিকতার কৃতিত্ব দেয়া যেতো। কিন্তু তিনি একই সঙ্গে জ্যোতিষ শাস্ত্রের নানা আধ্যাত্মিক কল্পিত বিষয়কে এক রকম আলোকরশ্মির রূপ দিয়ে বিজ্ঞানের সীমার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তবে যখনই তিনি দেখা-ধরা-ছোঁয়ার বিজ্ঞানের কথা বলেছেন তখনই আবশ্যকীয় পদ্ধতি হিসেবে গণিত দ্বারা পরিচালিত এক্সপেরিমেন্টের কথা বলেছেন।

রোজার বেকন এই এক্সপেরিমেন্টের আবশ্যকতা সম্পর্কে প্রচুর লিখেছেন। এতে বিজ্ঞানের যে পদ্ধতির কথা বলেছেন তা হলো শুরুতে পর্যবেক্ষণ, তারপর এর ভিত্তিতে তত্ত্ব সম্পর্কে অনুমান, তারপর অনুমানটি যাচাই করার জন্য এক্সপেরিমেন্ট, এভাবে চক্র সম্পূর্ণ করে আবার শুরুতে গিয়ে পর্যবেক্ষণ। এরপর পর্যবেক্ষণে আরো নতুন নতুন জিনিসের প্রতি দৃষ্টি যাওয়াতে নতুন করে অনুমান হতে পারে, যার ওপর এক্সপেরিমেন্ট। এমনিভাবে চক্রটি বার বার পুনরাবৃত্তি করার ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। আরো একটি বিষয়কে তিনি সামনে নিয়ে এসেছেন, তা হলো অন্য বিজ্ঞানীও যেন স্বাধীনভাবে পুরো বিষয়টি যাচাই করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা রাখা। এজন্য এক্সপেরিমেন্টের সব কিছু খুলে বলতে হবে, এবং এটি এমন ভাবে করতে হবে যেন অন্যরা নিজেরা তার পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বলে যাওয়া বেকনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এই দিকগুলো আধুনিক পদ্ধতিতেও অনুসরণ করা হয়। তিনি শক্ত ভাবে মনে করতেন যে শুধু যুক্তি-তর্ক দিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়কে সুরাহা করা যায়না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ইন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্যে এনে এর নিশ্চয়তা বিধান করা না যাচ্ছে। বিজ্ঞানধর্মী প্রচলিত জ্ঞানের ধারাকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করে দেখতে চেয়েছেন– এক্সপেরিমেন্ট ভিত্তিক বিজ্ঞান, অনুমান-নির্ভর বিজ্ঞান, এবং পেশাগত শিল্প। খুব সম্ভব চিকিৎসাবিদ্যা, কারিগরি ইত্যাদিকে তিনি শেষের ভাগটিতে ফেলতে চেয়েছিলেন। এই প্রথম এক্সপেরিমেন্ট ভিত্তিক বিজ্ঞানকে একটি আলাদা ধারার মর্যাদা দেয়া হলো, এবং বলা হলো যে এটিই বিজ্ঞানের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা দিতে পারে। অন্য দুটির প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু শুধু এক্সপেরিমেন্ট ভিত্তিক বিজ্ঞানই সত্যের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে– যা অন্য দুটি দিয়ে সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায় 'এটিই শুধু প্রকৃতির গোপন রহস্যগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে পারে, এবং অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে জ্ঞান উন্মোচন করতে পারে'।

কেন ভুল তত্ত্বের সৃষ্টি হয় সেই আলোচনায় রোজার বেকন চারটি জিনিসকে দায়ী করেছেন– প্রভাবশালী কেউ চাপিয়ে দেয়ার কারণে, সচরাচর প্রচলিত ধারণার ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করার কারণে, অজ্ঞ মানুষদের পরামর্শের কারণে, অথবা না জেনেও জানার ভাণ করার কারণে। রোজার বেকন আদর্শ এক্সপেরিমেন্ট বলতে বুঝিয়েছেন আলোকবিদ্যার এক্সপেরিমেন্টগুলোকে। কিন্তু সেই আলোকবিদ্যার এক্সপেরিমেন্ট তিনি নিজে খুব একটি করেননি, বরং ইবনুল হিশ্‌শামের কাজগুলোর ওপর নির্ভর করেছেন, এবং অন্যদেরগুলোও কিছু কিছু অনুসরণ করেছেন। তিনি উচ্ছসিত ভাবে সেগুলোর প্রশংসাও করেছেন। আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে বিক্ষিপ্ত হয়ে রংধনুর বর্ণালী তৈরি সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের প্রমাণ স্বরূপ তিনি মুখে পানি নিয়ে তা সূর্যের বিপরীতে কুলি করে ছিটিয়ে রঙধনু সৃষ্টি করেছিলেন। তবে তাঁর যে এক্সপেরিমেন্টগুলো লেখার মধ্যে বেশি এসেছে তা বরং তাঁর আলকেমি চর্চা থেকে। এর মধ্যে বারুদ তৈরি, কাচপত্র দিয়ে ঢেকে দিয়ে মোমবাতির নেভানো এসব এক্সপেরিমেন্ট উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বান

১২৬০ সাল নাগাদ রোজার বেকনের সময়ের ইংল্যান্ড এবং ১৬২০ সাল নাগাদ ফ্রান্সিস বেকনের সময়ের ইংল্যান্ডের অনেক তফাত ছিল। কিন্তু বেকন নামের এই দুই ইংরেজ পন্ডিতের মধ্যে একটি বড় মিল ছিল– তাঁরা দু'জনেই এক্সপেরিমেন্টমুখী বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, এবং সার্বিক ভাবে সফলও হয়েছেন বলা যায়; বিশেষ করে ফ্রান্সিস বেকনের ক্ষেত্রে তো বটেই। ফ্রান্সিস বেকনের কালে ইংল্যান্ড তার সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অনেকটা বাদ দিয়ে, একটি বড় নৌশক্তি ও ব্যবসায়িকশক্তি হিসেবে বাণিজ্যমুখী এবং বহির্মুখী হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সেখানে অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে। ভুলে গেলে চলবেনা ওটি রাণী প্রথম এলিজাবেথের যুগের সমৃদ্ধির ও শেক্সপীয়ারের যুগের সাহিত্য ও নাট্য শিল্পের বিকাশের ইংল্যান্ড। আরেকটি বড় পরিবর্তন এসেছে রোমের পোপের শাসিত ক্যাথোলিক চার্চের প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান এ্যাঙ্গলিকান চার্চের প্রবর্তন– যা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক উদার ও প্রগতিশীল। কাজেই বিজ্ঞানের আবহটি রোজার বেকনের সময়ের তুলনায় ফ্রান্সিস বেকনের সময় ছিল অনেকটা স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ। আগের সময়ের মত দার্শনিক বা বিজ্ঞানীদের অধিকাংশ আর যাজক শ্রেণীভুক্ত ছিলেননা, বরং চিকিৎসাবিদ্যা, শিক্ষকতা ইত্যাদি নানা পেশায় যুক্ত ছিলেন। ফ্রান্সিস বেকন

নিজেও রোজার বেকনের মত যাজক ছিলেননা– ছিলেন একজন আইনবিদ, আইন প্রণেতা এবং ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। আসলে তিনি বড় দার্শনিক ছিলেন বটে কিন্তু নিজে বিজ্ঞানী ছিলেননা, যদিও বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে এক্সপেরিমেন্টমুখী করতে এবং বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের উপকারমুখী করতে তাঁর লেখার প্রভাব দারুণ ভাবে কার্যকর হয়েছিলো।

এর অনেকখানি ফ্রান্সিস বেকন প্রকাশ করেছেন তাঁর ১৬২০ সালে প্রকাশিত বই *নোভাম অরগানামে* (নতুন পদ্ধতি)। আসলে অরগানন নামের যে গ্রন্থে দু'হাজার বছর আগে এরিস্টোট্‌ল বিজ্ঞানের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে গেছেন সেটিকে নাকচ করার জন্যই বেকনের এই বইয়ের উদ্যোগ। এরিস্টোট্‌লের অরগাননের বিধি অনুযায়ী কতগুলো মূল নীতিকে স্বতসিদ্ধের মত দাঁড় করিয়ে যুক্তির টানে যে বিজ্ঞানের চর্চা এতকাল হয়েছে ফ্রান্সিস বেকন তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। যেটুকু বাস্তব পর্যবেক্ষণ সেখানে হয়েছে তার থেকে এত বড় বড় সাধারণ সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন বৈধতা তিনি দেখতে পাননি। কারণ তাঁর মতে ইন্‌ডাকশন বলতে যা বোঝায় তা এভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। তিনি দেখিয়েছেন এরিস্টোট্‌লের পদ্ধতিতে প্রকৃতি থেকে যথেষ্ট না জেনে প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে মত দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীর যা করা উচিত তা হলো প্রকৃতি থেকে জেনে সেটি শুধু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা।

বেকনের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলো সত্যিকারের ইন্‌ডাকশন। গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কিছু প্রাথমিক অনুমান, কিন্তু সে অনুমানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরো পর্যবেক্ষণ, ফলে আরো সঠিক অনুমান; এভাবে পর্যায়ক্রমে করে করেই শুধু প্রকৃত তত্ত্ব খাড়া হতে পারে। হালকা পর্যবেক্ষণে ভারী তত্ত্ব দেবার বিপক্ষে যেমন তিনি ছিলেন তেমনি কিছু পর্যবেক্ষণ তথ্যকে সাজিয়ে বর্ণনা করলেই তাতে সত্যকে যে পাওয়া যায়না সেটিও তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। সেটি পেতে হলে ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে পাওয়া তথ্যকে সত্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে। সে জন্য কার্য-কারণ অনুসন্ধান করে এর ভেতরের ভৌত প্রক্রিয়াটিকে আবিষ্কার করা চাই। ওই পর্যায়ক্রমে অনুমানগুলোকে উন্নত করার চেষ্টায় প্রত্যেক পর্যায়ে যথাযথ এক্সপেরিমেন্ট করে কার্য-কারণগুলো বুঝতে হবে। বলার ভঙ্গিটির কথা ছেড়ে দিলে বিজ্ঞানের পদ্ধতি নিয়ে বেকনের মতামতগুলো আধুনিক বিজ্ঞান পদ্ধতির খুব কাছাকাছি। তিনিই আধুনিক এক্সপেরিমেন্ট-নির্ভর বিজ্ঞান পদ্ধতির জন্য আহ্বানটি এমনভাবে জানিয়েছেন যে সেটি আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো

গড়তে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলো। বিশেষ করে ইংল্যান্ডে সে সময় বিজ্ঞানচর্চা আধুনিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে তাঁর মতবাদের সরাসরি প্রভাব ছিল।

ফ্রান্সিস বেকনের বিজ্ঞানপদ্ধতির একটি দিক হলো বিজ্ঞানকে একটি সক্রিয় গঠনমূলক কাজ হিসেবে দেখা। এক্সপেরিমেন্টকে তিনি সেভাবেই দেখেছেন। তাঁর মতে 'জানা মানে তৈরি করা, আর তৈরি করা মানে জানা'। বোধ হয় তাঁর কাছে 'ভেবে জানা' আর 'দেখে জানার' একটি সম্মিলিত সুখকর পরিণতি হলো 'তৈরি করে জানা'। এক্সপেরিমেন্টের যে যান্ত্রিক আয়োজন তাতে তৈরি করার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা অজ্ঞতা, কূসংস্কার, বিভ্রান্তি, মেকি জ্ঞানের দাবী– এসবকে দূর করে। একই সঙ্গে তৈরি করার মাধ্যমে মানুষের উপকারে কাজে লাগার মত কৌশল ও যন্ত্র সৃষ্টি করে বিজ্ঞান। মানব জ্ঞানকে এভাবে মানব কীর্তিতে পরিণত করার আহ্বান ছিল ফ্রান্সিস বেকনের। জ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে আরো সক্ষম, আরো শক্তিমান করবে এটিই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। এদিক থেকে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে একীভূত করে সমাজের সঙ্গে তার যোগসূত্র ঘটাতে চেয়েছিলেন। এটি যেন ঘটে সেই লক্ষ্যকে তিনি শুধু একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে নেননি, একটি ব্রত হিসেবেও নিয়েছিলেন। এটি যেন ছিলো একটি আন্দোলনের ডাক। সেদিন বিজ্ঞানীরা এই আন্দোলনে যথেষ্ট সাড়া দিয়েছিলেন; আধুনিক বিজ্ঞানের আগমনের পেছনে সেটি প্রচুর অবদান রেখেছে। পরবর্তীকালে এবং আজ অবধি বিজ্ঞান যেদিকে এগিয়েছে তাতেও ফ্রান্সিস বেকনের প্রত্যাশাগুলোই পূরণ হবার লক্ষণ দেখা যায়।

ফ্রান্সিস বেকনের কালে এবং তার পর পর সময়ে নিউটন ও তাঁর সমসাময়িক ইংরেজ বিজ্ঞানীরা যেভাবে তাঁর বিজ্ঞানপদ্ধতির দর্শনকে ও আহ্বানকে নিজেদের বিজ্ঞান চর্চায় গ্রহণ করেছিলেন ইউরোপের অন্য অনেক দেশে বিশেষ করে ফ্রান্সে এবং জার্মানীতে তা ঘটেনি। এর একটি বড় কারণ সেখানে আরেকজন বড় মাপের দার্শনিকের প্রভাব, যিনি নিজেও ছিলেন খুব সফল একজন গণিতবিদ এবং প্রকৃতির দার্শনিক– ফ্রান্সে জন্মগ্রহণকারী রেনে দেকার্ত (১৫১৬-১৬৫০)। স্কুল-কলেজের গণিতের ছাত্ররা যেই কার্টেজিয়ান জ্যামিতি (তাঁর নামে) বা এন্যালাইটিকাল জ্যামিতির সঙ্গে খুবই পরিচিত, বিজ্ঞানীদেরকে যা নিত্য ব্যবহার করতে হয়, সেটি তাঁরই অনবদ্য সৃষ্টি। এতে জ্যামিতিকে এ্যালজেব্রায় পরিণত করে সরলরেখা, বৃত্ত, ইত্যাদি নানা জ্যামিতিক গঠনকে এ্যালজেব্রা-সমীকরণ হিসেবে প্রকাশ করা হয়। আজকের ছাত্রদের বা বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁর গণিত খুব পরিচিত হলেও তাঁর জ্ঞান-দর্শন বা তাঁর পদার্থবিদ্যা কিংবা বিশ্ব-তত্ত্বকে

এখন কেউ গ্রহণ করেনা। অবশ্য সেই সময় বিশেষ করে ওই দেশগুলোতে নিউটনের তত্ত্বের চেয়েও তাঁর প্রকৃতি-দর্শন ও বিশ্ব-তত্ত্বকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হতো। বেকনের মত তিনিও এরিস্টোট্‌লের পদ্ধতিগুলোর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বটে কিন্তু পুরোপুরি সেই বলয় থেকে বের হয়ে আসতে পারেননি। দেকার্ত বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টি এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে অভিজ্ঞতা– উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে জ্ঞানার্জনে। কিন্তু তাঁর মতে বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টিই বলে দিতে পারে বস্তুর কী কী গুণ হতে পারে; আর বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতি বলে দেবে বিশেষ বস্তুর জন্য ওই গুণগুলোর কোন্‌টি কোন্‌টি প্রযোজ্য। সরাসরি দৃশ্য বস্তুর সম্পর্কেই এই শেষোক্ত কথাটি খাটে, অদৃশ্য সব কিছুর জন্য আমরা শুধু অন্তর্দৃষ্টি ও যুক্তির ওপরেই নির্ভর করতে পারি।

বস্তুর বাইরে যে কোন শূন্যস্থান আছে যা বস্তুর আধার হিসেবে কাজ করে এমন কথা দেকার্ত মানতেননা। স্থান জিনিসটি বস্তুর বিস্তৃতির মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। বাধা না পেলে বস্তুর গতি চিরকাল সরল রেখায় অব্যাহত থাকে এই আধুনিক তত্ত্বটি তিনিও দেখিয়েছেন। কিন্তু এই গতির পরিবর্তনে যে সংলগ্ন কোন কিছুর 'ধাক্কা' প্রয়োজন সেটিই ছিল তাঁর অভিমত– যা কিনা বস্তুর ওপর 'বলের' ধারণা থেকে ভিন্ন। এই কারণে সূর্যের চারিদিকে গ্রহের পরিক্রমণের কারণ হিসেবে তাঁকে সর্বক্ষণ এগুলোকে ধাক্কা দেবার একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা কল্পনা করে নিতে হয়েছে। তিনি বলেছেন সূর্য আর গ্রহের মাঝখানে যে 'ইথার' রয়েছে তাতে বিশেষ এক রকম বস্তু-কণার ঘূর্ণি (ভোরটেক্স) সব সময় কাজ করছে। এই ঘূর্ণিগুলোই গ্রহগুলোকে পরিক্রমণ করাচ্ছে। একই রকম ঘূর্ণির প্রভাবেই যে কোন বস্তু পৃথিবী থেকে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে তা আবার পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। সূর্যের প্রভাব গ্রহের ওপর ধাক্কা দেয়ার জন্য দেকার্ত যা ভেবেছেন তা তিনি অন্য সব প্রভাবের ক্ষেত্রেও বজায় রেখেছেন। যেমন একটি চুম্বক যে অন্য একটি চুম্বককে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করে সেটিকে তিনি এক চুম্বকের প্রভাব 'দূর থেকে কাজ করে' অন্য চুম্বকে যাচ্ছে মনে করতেন না, বরং ওই কণাস্রোতের ঘূর্ণির ধাক্কার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। এমনকি জীববিদ্যার ক্ষেত্রেও জীবের বৃদ্ধি, অনুভূতি, বংশবিস্তার ইত্যাদিকে তিনি এভাবে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন।

সমস্যা হলো এসব সিদ্ধান্ত তিনি যতটা না এক্সপেরিমেন্ট বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়েছেন তার চেয়ে বেশি নিয়েছেন তাঁর 'অন্তর্দৃষ্টির' বরাত দিয়ে। স্পষ্টত এক্সপেরিমেন্টমুখী প্রেরণার যুগে এসেও সবার কাছে বিজ্ঞান চর্চা সর্বোতভাবে

সেই প্রেরণায় নিবেদিত ছিলনা। দেকার্তের এই মতবাদগুলো ১৭০০ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইউরোপের একটি বড় অংশে প্রভাব রেখে চলেছিলো যে কারণে নিউটনের এমন আধুনিক বিজ্ঞানও ওই সময় পর্যন্ত সেখানে ঠিক প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। পরে অবশ্য সর্বত্রই ফ্রান্সিস বেকনের এক্সপেরিমেন্ট-দর্শনে বলীয়ান নিউটনীয় বিজ্ঞানেরই জয় হয়েছিলো।

তবে কোন কোন বিষয়ে দেকার্তের চিন্তার প্রভাব আধুনিক বিজ্ঞানেও বিস্তৃত হয়েছে। জীববিদ্যার বস্তুগত ও যান্ত্রিক ব্যাখ্যা তার মধ্যে একটি। এরিস্টোট্‌লের মত আত্মাসর্বস্ব তত্ত্বের বদলে তিনি জীবদেহকে এক রকম যন্ত্রের মত দেখেছেন। দেকার্ত শরীর ও মনকে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস মনে করতেন– সেই ধারণাও মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে অনেকদিন প্রভাব রেখেছে, যদিও সাম্প্রতিক কালের কাছে এসে তা পরিত্যক্ত হয়েছে। তাঁর জ্ঞান-দর্শনের একটি বিষয় কিন্তু এখনো সবাই নিত্য স্মরণ করে। তিনি মনে করতেন জ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিসর অনেকখানিই নির্ভর করে জ্ঞান-অর্জনকারীর নিজের মানসিক প্রবণতার ওপর। তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি তাই কালজয়ী হয়েছে; 'আমি চিন্তা করি, সেটিই আমার অস্থিত্ব' (*কোগিতো এরগো সাম্*)।

আধুনিক বিজ্ঞানের আলামত

পূর্ণতায় গতিবিদ্যা ও বিশ্ব-তত্ত্বঃ

কোপারনিকাস যে বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিলেন তা পূর্ণতা পেয়েছিলো কেপলার, গ্যলিলিও, এবং নিউটনের হাতে। আর শেষোক্ত দু'জনের হাতেই গতিবিদ্যা আধুনিক হয়েছিলো– যার ফলে বিশ্ব-তত্ত্বও আধুনিক হতে পেরেছে। এক্সপেরিমেন্টমুখী প্রেরণার সার্থক রূপায়নও তাঁদের হাতেই শুরু। জোহান্‌স কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) ছিলেন একজন জার্মান গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ। ওই সময়ের একজন বিখ্যাত জ্যেতির্বিদ টাইকো ব্রাহের সহকারী ও গবেষণা উত্তরাধিকারী হওয়ার সুবাদে গ্রহ জগতের গতিবিধির অত্যন্ত নিখুঁত পর্যবেক্ষণ-উপাত্ত তাঁর হাতে আসে। কেপলার এই উপাত্তের সঙ্গে মিলিয়ে কোপারনিকাসের বিশ্ব-ছবিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে প্রথমে মঙ্গলগ্রহের উপাত্তগুলো দেখে তিনি লক্ষ্য করলেন যে বৃত্তাকার কক্ষ ও এপিসাইকেলের ধারণার ভিত্তিতে কোপারনিকাস যেভাবে মঙ্গলের গতিবিধি ব্যখ্যা করেছিলেন তাতে নতুন নিখুঁত উপাত্তের সঙ্গে ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তারতম্য থেকে যায়। কেপলার এর সমাধান করলেন বিশ্ব-ছবিতে মঙ্গলের কক্ষপথটি যে

বৃত্তাকার সে ধারণা ত্যাগ করে। তিনি গাণিতিক ভাবে দেখালেন যে মঙ্গলের কক্ষপথকে কিছুটা উপবৃত্তাকার আকার দিলে এবং সূর্য এর কেন্দ্রে না থেকে এর একটি ফোকাসে আছে বলে ধরে নিলে (যে কোন উপবৃত্তের দুটি ফোকাস-বিন্দু থাকে) পর্যবেক্ষণের সঙ্গে হিসেবের ওই তারতম্যটুকু আর থাকেনা। এতে আর এপিসাইকেলের মত জটিল কাল্পনিক কিছুর আশ্রয় একেবারেই নেয়ার কোন কারণ থাকেনা। ওই প্লেটোর আমল থেকে চলে আসা বৃত্তাকার কক্ষপথের মোহ ত্যাগ করা, আর সূর্যকে উপবৃত্তের ফোকাসে স্থাপন করা উভয়েই ছিল অত্যন্ত বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত।

অনেকটা একই ভাবে পর্যবেক্ষণের উপাত্তের জোরে কেপলার দেখালেন যে অন্য গ্রহগুলোও কমবেশি উপবৃত্তাকার, এবং সূর্য সবগুলোরই ফোকাস একটি বিন্দুতে রয়েছে। উপাত্তগুলোর ব্যবহার করে কেপলার আরো দেখালেন যে গ্রহের রৈখিক গতিবেগ ও কৌণিক গতিবেগ নানা সময় নানা রকম হয় বটে, কিন্তু তার ক্ষেত্রফল-গতিবেগ একই থাকে। এর মানে হলো গ্রহকে সূর্যের সঙ্গে যোগ করা সরল রেখাটি একক সময়ে উপবৃত্তের তলে যেটুকু জায়গাকে কুড়িয়ে যায় তার ক্ষেত্রফল সবসময় একই থাকে। সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছে থাকার সময় ওই কুড়িয়ে যাওয়া জায়গাটুকু একটি প্রশস্ত বেঁটে ত্রিভুজ গঠন করে (গ্রহের গতিবেগ এসময় দ্রুত হয় বলে), আবার দূরে থাকার সময় লম্বা কম প্রশস্ত ত্রিভুজ গঠন করে (গতিবেগ ধীর হয় বলে), কিন্তু একক সময়ের মধ্যে গড়া এরকম সব ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিন্তু সমান হয়। পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া এই নিয়মকে বলা হয় কেপলারের দ্বিতীয় নিয়ম। কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হওয়াটি প্রথম নিয়ম। তৃতীয় আরো একটি নিয়ম কেপলার আবিষ্কার করেছিলেন– তাও পর্যবেক্ষণ-উপাত্ত থেকে। ইতোমধ্যে পর্যবেক্ষণ উপাত্ত থেকে বিভিন্ন গ্রহের সূর্য থেকে আপেক্ষিক দূরত্ব এবং প্রত্যেকের পরিক্রমণ কাল (যেমন পৃথিবীর ক্ষেত্রে সূর্য থেকে দূরত্ব ১ ধরে নিয়ে, ও পৃথিবীর পরিক্রমণ কাল যে ৩৬৫ দিন সেটি ব্যবহার করে) বের করা সম্ভব হয়েছিলো। এগুলো থেকে নানা ভাবে করে দেখতে দেখতে কেপলার আবিষ্কার করলেন প্রত্যেক গ্রহের জন্য দূরত্বটির ঘন শক্তিকে (কিউব) এর পরিক্রমণ কালের বর্গ (স্কোয়ার) দিয়ে ভাগ করে যেই সংখ্যাটি হয় তা সব গ্রহের জন্য একই হয়– এটি একটি ধ্রুব সংখ্যা। সব গ্রহের মধ্যে এরকম একটি সুন্দর নিয়মের শৃঙ্খলা কেন আসলো তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কেপলার দিতে পারেন নি। তাই তিনি বলেছেন এ যেন 'জ্যেতিষ্কসমূহের এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের ছন্দিত সুর'।

এই যে কেপলারকে সব কিছু নিখুঁত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে করেও শেষ পর্যন্ত স্বর্গীয় সঙ্গীতের মত যাদুময় ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিলো সেই অবস্থা থেকে বিজ্ঞানকে পুরাপুরি মুক্ত করে একেবারেই বাস্তব তথ্য ও গণিতের ব্যাখ্যায় নিয়ে আসতে পেরেছিলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন। আর এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন তাঁর কিছুটা আগে কেপলারের সমসাময়িক ইতালীয়ান গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২)। গ্যালিলিও ইতালীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপনা করেছেন, প্রথম দূরবীক্ষণ দিয়ে (নিজের হাতে তৈরি) আকাশ পর্যবেক্ষণে চমকপ্রদ সব আবিষ্কার করেছেন, এবং নিজের এক্সপেরিমেন্টের ভিত্তিতে গণিতের ব্যবহার করে আধুনিক গতিবিদ্যার ভিত্তি গড়েছেন।

গ্যালিলিওর এক্সপেরিমেন্টগুলো ছিল অনেকটা গতি ও বস্তুকে লিভার, ঢালুতল ইত্যাদি সরল যন্ত্রের সাহায্যে ভারসাম্যে নেয়ার মাধ্যমে। গ্রীক যুগে আর্কিমিডিস প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এরকম সরল যন্ত্র তাঁদের স্থিতিবিদ্যার জন্য ব্যবহার করেছেন। গ্যালিলিও তার সঙ্গে আরো একটি সরল যন্ত্র যোগ করেছিলেন– পেন্ডুলাম বা দোলক। পড়ন্ত বস্তুর গতিবৃদ্ধির নিয়ম আবিষ্কারের জন্য তিনি ঢালুতল ও পেন্ডুলামকে চমৎকার ভাবে ব্যবহার করেছিলেন। এভাবেই তিনি পড়ন্ত বস্তুর সমহারে গতিবৃদ্ধির হার অর্থাৎ ত্বরণটি যে একটি নির্দিষ্ট রাশি তা আবিষ্কার করেছিলেন। আবার পিসা নগরের গির্জার হেলে পড়া টাওয়ারের ওপর থেকে একই আকৃতির ভারী ও হালকা বস্তুর এক সঙ্গে পড়ার এক্সপেরিমেন্ট করে তিনি এ তত্ত্ব প্রমাণ করেছিলেন, এবং হাতেকলমে দেখিয়েছিলেন যে এরিস্টোট্‌লের ভারী বস্তু আগে পড়ার তত্ত্বটি ভুল। একটি মনে মনে এক্সপেরিমেন্ট থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে সমান গতিতে সরলরেখায় চলমান বস্তু চিরকাল এই গতিতে চল্‌বে। পরস্পর তেরচা করে খাড়া করা দুটি ঢালু তলের একটার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া শক্ত বল নিজের স্থিতিস্থাপকতায় লাফিয়ে ওঠে অন্যটির গা বেয়ে ওপরে ওঠে যায়। যত উঁচু থেকে প্রথমটায় পড়ে দ্বিতীয়টায় আবার ঠিক সেই উচ্চতায় ওঠে। তিনি ধরে নিয়েছেন যে ঢালু তল দুটি একেবারে ঘর্ষণহীন মসৃণ, আর স্থিতিস্থাপকতাও একেবারে নিখুঁত। এবার দ্বিতীয় তলটিকে ক্রমাগত ঢালু করলে একই উচ্চতায় ওঠার জন্য বলকে ক্রমাগত একটু বেশি দূরে যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত তলটিকে একেবার শুইয়ে দিয়ে ভূমি সমান্তরাল করলে অসীম কোন দূরত্বে না গিয়ে এটি ওই উচ্চতায় উঠতে পারবেনা– অসীম দূরত্বেই শুধু পারবে। অর্থাৎ বলটি অসীম ভাবে সরল রেখায় একই বেগে চলতেই থাকবে। এই

আবিষ্কারটিকে আমরা জড়তার নিয়ম বা পরে নিউটনের প্রথম গতিসূত্র হিসেবে চিনি। এই জড়তার নিয়মে পৃথিবীর সঙ্গে তার সংলগ্ন সব বস্তুই তার সঙ্গে একই বেগে ছুটছে– বাতাস সহ। তাই কোপারনিকাস বিরোধীরা এবং আগেকার দার্শনিকরা যে বলতেন পৃথিবী ঘুরলে আমরা আছাড় খেয়ে পড়তাম, বল ওপরে ছুঁড়লে পেছনে পড়তো, বা অসম্ভব জোরে বাতাস বিপরীত দিক থেকে আসতো, এগুলোর কোন সারবত্তা আর রইলোনা।

কোপারনিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বের তত্ত্বের স্বপক্ষে গ্যালিলিও আরো সাক্ষ্য-প্রমাণ যুগিয়েছিলেন। যেমন এই তত্ত্বের একটি ফলশ্রুতি হবার কথা ইনফেরিয়র গ্রহ দুটি অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে ছোট কক্ষের দুটি গ্রহ বুধ আর শুক্রের চন্দ্রকলার মত কলা থাকার কথা– সরু অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণ অবস্থায় যাওয়ার। গ্যালিলিও দূরবীক্ষণের সাহায্যে শুক্র গ্রহের কলা আবিষ্কার করেছেন। দূরবীক্ষণে বৃহস্পতি গ্রহের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান চারটি চাঁদ (উপগ্রহ) আবিষ্কার করে তিনি সরাসরি প্রমাণ করেন যে সবকিছু শুধু পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে পারে, এমন কথা ঠিক নয়। গ্যালিলিওই প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিকে আকাশ পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করেছিলেন, এবং শুরুতেই এর মাধ্যমে চাঁদ পর্যবেক্ষণ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি দেখালেন চাঁদের রয়েছে পৃথিবীর মতই সাগর (এখন শুকনা), উচ্চভূমি, আগ্নেয়গিরির মত জ্বালামুখ ইত্যাদি– অথচ এত দিন মনে করা হতো সব জ্যোতিষ্ক মসৃণ, নিষ্কলুষ কৃষ্টালের মত ইথারের তৈরি। আসলে গ্যালিলিও এভাবে দূরবীক্ষণ দিয়ে চাঁদের পিঠের ওপর জরিপ করে এর একটি মানচিত্র তৈরি করে ফেলেছিলেন, এবং ওখানে বড় বড় সবকিছুর নাম দিয়েছিলেন। সেই মানচিত্র, সেই নাম, এখনো ব্যবহৃত হয়। হাজার হাজার বছরের ভুল ধারণা তিনি এভাবে সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

প্রচলিত ধারণা বিরোধী তাঁর এসব আবিষ্কার যে সহকর্মীরা সহজে মেনে নিয়েছিলেন তা নয়। তাঁকে অনেক ধৈর্য ধরে অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে হয়েছিলো বেশ কিছু বিখ্যাত বই লিখে। কিন্তু রোমের পোপ শাসিত ক্যাথোলিক চার্চ শেষ পর্যন্ত তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে শাস্তি দেবার উদ্যোগ নিয়েছিলো– প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার অপরাধে। শেষ-মধ্য-যুগের 'মহা সমঝোতায়' এরিস্টোট্‌লের মতের বিরুদ্ধাচারণকে যে ধর্মদ্রোহিতায় পরিণত করা হয়েছিলো, সেই অবস্থার অবসান তখনো হয়নি। গ্যালিলিও প্রধানত অভিযুক্ত হলেন সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বের পক্ষে প্রচারণার অভিযোগে। তাঁর ভাগ্য ভাল যে অন্য কারো

কারো মত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের মত চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়নি। বৃদ্ধ বয়সের কারণে তাঁর লঘুশাস্তি হয়েছিলো হাঁটু গেড়ে বসে দোষ স্বীকার আর ক্ষমা প্রার্থনা, এবং এরকম বিজ্ঞান চর্চা থেকে বিরত থাকা। এমন বাধা ও গ্যালিলিওর এই ক্ষমা প্রার্থনা আধুনিক বিজ্ঞানের আগমনকে বন্ধ করতে পারেনি– যার অনেকটা কৃতিত্ব তাঁর।

নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) গতিবিদ্যাকে এবং বিশ্ব-তত্ত্বকে সম্পূর্ণ আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। এটি তিনি করেছেন এই উভয় বিষয়কে চমৎকার ভাবে একটি গাণিতিক শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে এনে, যার মূলে সব কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। অল্প কিছু গাণিতিক নিয়মকে একেবারে সর্বব্যাপ্তভাবে সব বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে যে কোন একটি মুহূর্তে অবস্থান ও গতি থেকে ভবিষ্যতের সকল গতিবিধির ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা অর্জন করেছে তাঁর তত্ত্ব। আমাদের হাতের কাছের একটি বল বা মার্বেলের গতির জন্য এটি যেমন প্রযোজ্য তেমনি আকাশের জ্যোতিষ্কের জন্যও প্রযোজ্য। ওই নিয়মগুলো পাওয়ার জন্য এবং ব্যবহারের জন্য নিউটনকে গণিতের একটি নতুন শাখাই আবিষ্কার করতে হয়েছে– ক্যালকুলাস, যা যে কোন বিশেষ মুহূর্তে যে কোন কিছুর পরিবর্তন-হার সূক্ষ্ম ভাবে দিতে সক্ষম। আর গতিবিদ্যার মধ্যে তো সবকিছুই পরিবর্তন-হারের ব্যাপার; অবস্থানের পরিবর্তন-হার হলো বেগ, আবার বেগের পরিবর্তন-হার হলো ত্বরণ– ইত্যাদি। নিউটনের আবিষ্কৃত প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে আছে তাঁর তিনটি গতিসূত্র– প্রথম সূত্রটি চিরকাল সরল রেখায় সমবেগে চলার জড়তার নিয়ম; দ্বিতীয় সূত্রটি বল প্রয়োগে সেই বেগের বা দিকের পরিবর্তন হওয়া (যার পরিবর্তন-হার হলো ত্বরণ), আর প্রয়োজনীয় বল বস্তুটির ভরের সঙ্গে এবং ত্বরণের সঙ্গে সমানুপাতী হওয়া; তৃতীয় সূত্রটি প্রতিটি ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকা। এর সবই এসেছে গ্যালিলিও এবং তাঁরও আগের বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ ও এক্সপেরিমেন্টের ফলকে গাণিতিক রূপ দিয়ে। এই তিনটি সূত্র ঠিক হয়ে যাওয়ার পর বল, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদির সত্যিকার পরিচয় নিয়ে আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলোনা।

অন্যদিকে পর্যবেক্ষণ থেকে নির্ণিত কেপলারের তিনটি নিয়মের সঙ্গে নিজের গতিসূত্র মিলিয়ে নিউটন তাঁর মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। সূর্য কী রকম বল প্রয়োগ করে গ্রহগুলোকে নিজের চারিদিকে ঘুরতে বাধ্য করছে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিউটন দেখালেন সর্বত্র সব ভর অন্য ভরকে একটি বিশেষ আকর্ষণে আকৃষ্ট করে। ফলে সূর্য যে রকম গ্রহকে আকৃষ্ট করে গ্রহও সে

রকম সূর্যকে আকৃষ্ট করে। গ্রহ তার সৃষ্টিকালীন আদি গতিতে জড়তার নিয়মে সরল রেখায় চলে যেতো, কিন্তু সূর্যের আকর্ষণ তাকে সূর্যের ওপর ফেলে দেবার চেষ্টা করে; গ্রহ তাই সব সময় সূর্যের ওপর পড়ে যেতে যেতেও নিজের সম্মুখ গতির জন্য পড়তে পারেনা– বরং তার চতুর্দিকে একটি উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে। গণিতই দেখিয়ে দেয় যে ওই আকর্ষণে তার এমনি হবার কথা।

ঘোরার কক্ষপথটি কতখানি উপবৃত্তাকার হবে তা নির্ভর করবে একদিকে আদি গতি এবং অন্যদিকে সূর্য ও গ্রহের পরস্পর টানের ওপর। বৃত্তাকার কক্ষ হওয়াটি ওই উপবৃত্তেরই একটি বিশেষ রূপ যাতে দুটি ফোকাস মিশে গিয়ে বৃত্তের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সব কিছু মিলে গেলে হুবহু বৃত্ত হবার এই বিশেষ রূপটি দেখা দিতে পারে, তবে তা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যে কোন দুটি ভরের ক্ষেত্রেই এমন আকর্ষণ হবে। আকর্ষণ বলটি নির্ভর করে বস্তু দুটির ভরের প্রত্যেকটির পরিমাণের ওপর, আর এটি কমে যায় বস্তু দুটির মধ্যেকার দূরত্বের বর্গ অনুযায়ী (ব্যস্ত-বর্গ নিয়ম)। কেপলারের নিয়ম থেকেই গণিতের প্রয়োগে নিউটন সূর্য ও গ্রহের মধ্যে আকর্ষণের এই মহাকর্ষ তত্ত্ব দিতে পেরেছেন– তাই এর ভিত্তি ছিল কেপলারের বাস্তব পর্যবেক্ষণ। নিউটনের বড় সাফল্য হলো তাঁর এই মহাকর্ষ তত্ত্বও সর্বত্র সব বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– সূর্যের সঙ্গে গ্রহের যেমন, পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদেরও তেমন, পৃথিবীর সঙ্গে গাছ থেকে পড়া ছোট্ট আপেলের ক্ষেত্রেও তেমন। এই আকর্ষণ বলের হুবহু পরিমাণটুকুও প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের ফরমুলা অনুযায়ী হিসেব করে বের করা যায়।

এর কোন কিছুর জন্য নিউটনকে নিজে পর্যবেক্ষণ করতে বা এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়নি। কিন্তু কেপলার, গ্যালিলিও প্রমুখের পর্যবেক্ষণ ও এক্সপেরিমেন্ট থেকেই সব কিছু এসেছে; অনুমান বা কল্পনার ভিত্তিতে কিছুই নয়। ওই বাস্তব তথ্যগুলোর ওপর গণিতের প্রয়োগেই সব নিয়ম এসেছে। এর সবকিছু নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'প্রাকৃতিক দর্শনের গাণিতিক নীতি' (*ফিলোসফী নেচারেলিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা*) যেটি প্রকশিত হয়েছে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে। সংক্ষেপে প্রিন্সিপিয়া নামে পরিচিত এই গ্রন্থই যেন আধুনিক বিজ্ঞানের দিক ঠিক করে দিয়েছে– প্রকৃতির শৃঙ্খলাকে গাণিতিক নিয়মে প্রকাশ করাই যার আকাঙ্খা। এ কারণে প্রিন্সিপিয়াকে দুনিয়ার সর্বকালের মুষ্টিমেয় সেরা ক'টি বইয়ের একটি বলে মনে করা হয়।

বিজ্ঞানের পদ্ধতির দিক থেকে নিউটন বিশুদ্ধভাবে ফ্রান্সিস বেকন-পন্থী ছিলেন– অভিজ্ঞতার ইন্‌ডাকশনের ওপরেই নিজের তত্ত্বগুলোকে খাড়া করেছিলেন। এই

ব্যাপারে অভিজ্ঞতার সমর্থনের বাইরে গিয়ে কোন মনগড়া অনুমানের মধ্যে যেতে তিনি রাজি ছিলেননা। প্রিন্সিপিয়ার একটি পরবর্তী সংস্করণে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন 'আমি অনুমান খাড়া করিনা' ('হাইপোথেসিস নন্ ফিঙ্গো')। সেজন্য মাধ্যাকর্ষণে দুটি বস্তু যখন পরস্পরকে টানে, সেই টান কিসের মাধ্যমে কেমন করে সক্রিয় হয় তার জন্য কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থা কল্পনা করার অধিকার তাঁর আছে বলে তিনি মনে করতেননা। টান্‌কে তাই তিনি টান হিসেবে রেখে ওখানেই ছেড়ে দিয়েছেন– 'দূর থেকে কার্য' (এ্যাকশন এট্ অ্যা ডিস্টেন্স) ব্যাপারটিকে যতই অদ্ভুত ঠেকুক, তিনি সেটিকেই তুলে ধরেছেন। অনেকে একে তাঁর তত্ত্বের দুর্বলতা হিসেবে নিয়েছেন। আগেই বলেছি ইউরোপের অনেক দেশে সে সময় নিউটনের তত্ত্বের অনেক সমালোচক ছিলেন; তাঁরা বরং এসব বিষয়ে দেকার্তের অনুসারী ছিলেন।

দেকার্তের তুলনায় নিউটনের প্রকৃতি-চিন্তা অনেক বাস্তববাদী ও কম জটিল ছিল। দেকার্তের কাছে বস্তুর বিস্তারের বাইরে 'স্থান' বলে কিছু ছিলনা, কিন্তু নিউটন সর্বব্যাপ্ত একটি পরম স্থানে বিশ্বাস করতেন যা সবকিছুর আধার হিসেবে কাজ করে। সব গতিকে এই পরম স্থানের কাঠামোর প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা যায়। স্থান পরিবর্তনটাই নিউটনের গতি; দেকার্তে নানা গতির মধ্যে পার্থক্য করতেন। তাছাড়া নিউটনের কাছে 'বল্' জিনিসটি একটি বিমূর্ত জিনিস যা কোন বস্তুর ওপর প্রয়োগ করা যায়; প্রয়োগটিকে তিনি বলেছেন এ্যাকশন (কার্য)। এ্যাকশন শেষ হয়ে গেলে বল্‌টি আর বস্তুর মধ্যে থাকার প্রয়োজন নেই, এটি থাকার জন্য কোন যান্ত্রিক উপায় খোঁজারও প্রয়োজন নেই। এ্যাকশনেই বল বস্তুর ওপর কার্যকর হয়ে যায়। এর জন্য দেকার্তের কল্পনায় সৃষ্ট কণার ঘূর্ণি ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। বিনা কারণে অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে বিজ্ঞানকে ভারাক্রান্ত করা মোটেই কাম্য নয়। শেষ পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় বিজ্ঞান নিউটনের তত্ত্বকেই মেনে নিয়েছে। নিউটন যে তাঁর তত্ত্বকে সর্বত্র প্রযোজ্য হিসেবে খাড়া করেছেন তার জন্য যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হয়েছে। তিনি পৃথিবীর সাধারণ বস্তুর ভর যেমন আপেলের ভর, আর সূর্যের ভরকে একই ভাবে দেখেছেন। অথচ তাঁর সময়ে সূর্য আদৌ একই ধরনের কোন বস্তু দিয়ে গড়া কিনা, তার আদৌ কোন ভর থাকতে পারে কিনা, তার কেন্দ্র বলে কিছু থাকতে পারে কিনা– এসব নিয়ে কোন ঐক্যমত্য ছিলনা। কিন্তু নিউটন আপেল আর সূর্য উভয়কে একই গাণিতিক নিয়মের আওতায় আসতে দেখে উভয়কে একই ভাবে নিয়েছেন– সাহসের সাথে;

তিনি ভুল করেননি। ওটি ছিল বিজ্ঞানের একটি অভূতপূর্ব উল্লম্ফন। এরপর থেকে বিজ্ঞানের সব নিয়ম বিশ্ব-নিয়ম হিসেবেই এগিয়েছে।

ভিন্ন ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্টমুখী প্রেরণাঃ

ফ্রান্সিস বেকনের আহ্বান এবং সেদিনের সাধারণভাবে এক্সপেরিমেন্টমুখী প্রেরণা বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের সূচনা করেছিলো। এটি বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে ইংল্যান্ডে নানা কৃতী বিজ্ঞানীর কাজে। তাঁদের একজন ছিলেন উইলিয়াম গিলবার্ট (১৫৪৪-১৬০৩)। পেশায় ইংল্যান্ডের রাজ-চিকিৎসক হলেও তিনি বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-দার্শনিক হিসেবেই বেশি পরিচিত হয়েছেন। ফ্রান্সিস বেকনের আহ্বানের আগেই তিনি নিজের কাজে ও মতবাদে একই নীতির প্রচার করেছিলেন। ১৬০০ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "চুম্বক, চৌম্বক-বস্তু, এবং বিশাল চুম্বক পৃথিবী সম্পর্কে" (সংক্ষেপে *দে ম্যাগনেট*) প্রকাশ করেন। এতে তিনি চুম্বকত্ব সম্পর্কে তাঁর নানা এক্সপেরিমেন্টের বর্ণনা দিয়ে এগুলোর ভিত্তিতে তাঁর ভূ-চৌম্বকত্বের তত্ত্বটি উপস্থাপন করেন।

গিলবার্টের অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্ট ছিল পৃথিবীর প্রতিনিধিত্বকারী একটি ব্যতিক্রমী গ্লোবের সাহায্যে করা। প্রাকৃতিক চুম্বক লোডস্টোনকে একটি ছোট গোলকের আকৃতি দিয়ে তিনি এটি তৈরি করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন *টেরেল্লা* অর্থাৎ 'ছোট পৃথিবী'। কম্পাস বা চুম্বক-শলাকা যে সব সময় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর থাকে তা মধ্যযুগ থেকেই নাবিকরা ব্যবহারিক কারণেই জানতো। এর কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীদের কেউ বলতেন উত্তরের ধ্রুব তারার চৌম্বক আকর্ষণে এটি হচ্ছে, আবার কেউ বলতেন পৃথিবীর উত্তর মেরুর কাছে বড় একটি চৌম্বক দ্বীপ আছে বলেই এমন হচ্ছে। গিলবার্ট কিন্তু এসব কাল্পনিক অনুমানের ওপর নির্ভর করতে নারাজ ছিলেন। নানা সাক্ষ্য-প্রমাণে যে অনুমানটি তিনি করেছিলেন তা হলো পৃথিবী নিজেই একটি বিশাল চুম্বক। তিনি সঠিক ভাবেই ধারণা করেছিলেন যে লোহা ভারী হওয়াতে পৃথিবীর কেন্দ্রটি লোহা দিয়ে তৈরি হবার সম্ভাবনা বেশি– তার থেকেই পৃথিবী নিজে চুম্বক হবার ধারণা। ভূ-চুম্বকত্বের এই অনুমানটিই তিনি এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন। ইতোমধ্যে ১৫৪৪ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিলো যে কম্পাস বা ওরকম একটি চুম্বক শলাকা যদি খাড়া করে রাখা হয় তা হলে শলাকাটি খাড়া ওপর-নিচ থাকেনা, বরং ভূ-সমান্তরালের সঙ্গে সমকোণের থেকে ছোট একটি কোণ করে হেলে থাকে– যেই কোণটিকে ডিপ কোণ বলা হয়। এতে মনে হয় শলাকাটির একটি প্রান্ত অর্থাৎ চৌম্বক মেরু

যেন পৃথিবীর ভেতরের দিকে ও মেরুর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। ১৫৮২ সালে পরিমাপ করে দেখা গিয়েছে যে এই ডিপ কোণ পৃথিবীর এক এক জায়গায় এক এক রকম। এই সব কিছু থেকেই গিলবার্ট বুঝতে পারছিলেন যে পৃথিবী নিজেই একটি বিশাল চুম্বক যার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুও আসলে চুম্বকেরও মেরু।

গিলবার্ট এই সবকিছু ছোট আকারের তাঁর চুম্বক-পৃথিবী টেরেল্লার ওপর পরীক্ষা করে দেখলেন। ছোট সুবিধাজনক চুম্বক শলাকা ওই টেরেল্লার খুব কাছে– আনলে এবার সেটি বরং টেরেল্লারই দুই মেরুর দিকে বরাবর থাকে। একই ঘটনা ঘটে ডিপ কোণ করার ক্ষেত্রেও। এভাবে নানা ভাবে এক্সপেরিমেন্ট ও পরিমাপ করে তিনি ভূ-চুম্বকত্বের তত্ত্বটি দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের বাস্তব মডেলের ব্যবহার (এক্ষেত্রে টেরেল্লা), এর মধ্যে সত্যিকার পরিস্থিতির অনুকরণ করে তাকে নিয়েই এক্সপেরিমেন্ট করা, পুরো বিষয়গুলো অন্যদেরকে প্রদর্শন করে দেখানো– এই সব দিকে একজন পথিকৃৎ বলা যায় তাঁকে।। এম্বার নামক প্রাকৃতিক রজনকে ঘষলে যে তাতে এক ধরনের আকর্ষণ শক্তি জমে তা প্রাচীন গ্রীকরা লক্ষ্য করেছিলেন এবং এম্বারের নামে এই ব্যাপারটিকে বলেছিলেন *ইলেকট্রন* বা ইলেকট্রিক। স্থৈতিক বিদ্যুতের ব্যাপারটি প্রাচীনকাল থেকে বিজ্ঞানীরা এভাবেই জানতেন। গিলবার্ট প্রথম এর ওপর পরীক্ষা নিরিক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন ঘর্ষণের ফলে এম্বার থেকে অদৃশ্য তরল বা বাতাসের মত কিছু জিনিস চলে যাচ্ছে বলে ওটি আকর্ষণশক্তি পাচ্ছে– ওই চলে যাওয়া জিনিসকে তিনি বলেছেন 'চার্জ'। এই চার্জ আসা-যাওয়া ও আকর্ষণটিকে সংবেদনশীল ভাবে দেখার জন্য তিনিই ইলেকট্রোস্কোপ যন্ত্রটিও উদ্ভাবন করেছিলেন।

গিলবার্টের ভূ-চম্বকত্ব তত্ত্বের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে কেপলার সূর্য ও গ্রহগুলোর মধ্যে চৌম্বক আকর্ষণের কল্পনা করেছিলেন। গিলবার্ট নিজেও পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে চৌম্বক আকর্ষণের কথা ভেবেছেন। এগুলো সত্য প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের একেবারে সূচনাতে এক্সপেরিমেন্ট- প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর গ্রন্থে তিনি শুধু নিজের বিজ্ঞানের কাজের কথাই নয় এর জন্য কাম্য পদ্ধতির কথাও স্পষ্ট বলে গেছেন।

জীববিদ্যার ক্ষেত্রে এ কাজটি করেছেন গিলবার্টের প্রায় সমসাময়িক আর একজন ইংরেজ রাজ-চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭)। রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার আধুনিক তত্ত্বটির ভিত রচনার কাজটি করে তিনি বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। এটি তিনি করেছিলেন সরাসরি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে– দুই

হাজার বছর আগের গ্যালেনের সময় থেকে চলে আসা বিভ্রান্তিগুলোকে নাকচ করে দিয়ে। ওই ভুল ধারণার মধ্যে বড় ব্যাপারটি ছিল যে রক্ত লিভারে তৈরি হয়ে পুষ্টি বহন করে শিরার মাধ্যমে সারা শরীরে গিয়ে ফুরিয়ে যার– প্রত্যেকবার নতুন করে লিভারে তৈরি হতে হয়। হার্টের মাধ্যমে শিরা থেকে কিছু রক্ত ভিন্ন রূপে ধমনীতে যায়। ফুসফুস থেকে আনা বাতাস ও জীবনী শক্তি নিয়ে রক্ত ধমনী দিয়েই সারা শরীরে যায় এবং সেখানে ফুরিয়ে যায়। একেও তাই নতুন তৈরি হওয়া রক্ত থেকে বার বার আসতে হয়। দীর্ঘকাল গ্যালেনের এসব ভুল ধারণা সবাই মেনে নিয়েছে এর মধ্যে ১২৫০ খৃষ্টাব্দের দিকে দামেস্কের বিজ্ঞানী ইবনুল নাফিস হার্ট থেকে ফুসফুসে ধমনী দিয়ে গিয়ে শিরা দিয়ে ফেরৎ আসার একটি স্থানীয় সঞ্চালন ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর বই ল্যাটিন অনুবাদে ১৫০০ শতকের ইউরোপে বেশ পরিচিত হয়েছিলো। ইতালীতে ছাত্র থাকা কালীন হার্ভের নিজের শিক্ষক ফ্রেব্রিসিয়াস শিরার মধ্যে রক্তকে হার্টমুখী রাখার জন্য কিছু ভাল্‌ব বা কপাটিকা আবিষ্কারের বিষয়টি তিনি দেখেছিলেন। হয়তো এগুলোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই হার্ভে নিজে শব ব্যবচ্ছেদ , সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও বহু এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে সারা শরীরের জন্য রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। এটি ছিল একটি অত্যন্ত কঠিন ও সাহসী কাজ।

১৬২৮ সালে হার্ভের বিখ্যাত বই "প্রাণীর হার্টের ও রক্তের চলন সম্পর্কে কিছু শারীরবৃত্তীয় গবেষণা" প্রকাশিত হয়। এটি সংক্ষেপে *দে মোত্যু করদিস* (হার্টের চলন সম্পর্কে) নামে পরিচিত। হার্ভের আবিষ্কারের মূলে যদিও ছিল সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, সেই পর্যবেক্ষণ কিন্তু ঘটেছে একটি আনুমানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে। আর অনুমানকে চূড়ান্ত ভাবে যাচাই করা হয়েছে কিছু এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে। হার্ভের অনুমান ছিল একই রক্ত বার বার হার্ট থেকে ধমনী দিয়ে পুরো শরীরে যাচ্ছে আর শিরা দিয়ে হার্টে ফেরৎ আসছে। রক্তের পরিমাণের একটি মোটা দাগের হিসেবেই তিনি ব্যাপারটি ধরতে পারলেন। হার্টের নিম্নাংশের যে বাম কামরা (ভেনট্রিকল্) সংকুচিত হয়ে রক্ত প্রতিবার মূল ধমনীতে যাচ্ছে তাতে বড় জোর ২ আউন্স রক্ত থাকতে পারে। প্রতিবার সংকোচনে এর যে অংশ বেরিয়ে আসে তা এর $\frac{১}{৪}, \frac{১}{৫}, \frac{১}{৬}$ এ রকম যে কোন একটি ভগ্নাংশ হতে পারে। হার্ভে মনে করলেন সাধারণত হার্টের স্পন্দন হার মিনিটে ৩৩ বার। তা হলে ভগ্নাংশ কোন্‌টি বেছে নেবো সেই অনুযায়ী ৩০ মিনিটে ৩.৯ কিলোগ্রাম থেকে ৩১ কিলোগ্রাম পর্যন্ত রক্ত শরীরে যাবে। এত রক্ত দেহের আয়তনের তুলনায় অনেক

বেশি (আসলে হার্ভে রক্তের পরিমাণকে প্রকৃত পরিমাণ থেকে অনেক কম ধরেছিলেন)। স্পষ্টত এত রক্ত এত অল্প সময়ে খাদ্য থেকে শরীরে তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। তাই একই রক্ত বার বার সঞ্চালিত হচ্ছে ধরে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

গ্যালেন বলতেন ধমনীগুলো কামারের হাপরের মত স্পন্দিত হয় এবং হাপরের মতই (বা ড্রপারের মত) রক্তকে টেনে নেয়। হার্ভে হাতেকলমে দেখালেন তা মোটেই ঠিক নয়, একটি থলে বা বেলুনে যেভাবে তরল ভরা হয়, রক্ত সেভাবেই হার্টের চাপে ধমনীতে যায়। ধমনীতে পাওয়া নাড়ি আসলে হার্টের স্পন্দনের ফলে রক্ত গিয়েই সৃষ্টি হচ্ছে, গ্যালেন যেভাবে বলেছিলেন সেভাবে নয়। এটি প্রমাণ করতে এক্সপেরিমেন্টে তিনি দেখালেন যে বাহুর ওপর দড়ি দিয়ে খুব টাইট করে বাঁধ দিলে বাহুর গভীরে থাকা ধমনীগুলো বন্ধ হয়ে যায়, রক্ত যেতে না পেরে যেখানে আর নাড়ি পাওয়া যায়না। বাহুর বাঁধনকে এত শক্ত না করে মাঝারি রকম টাইট করলে ধমনীগুলো বন্ধ হয়না, শুধু বাহুর চামড়ার কাছে থাকা শিরাগুলোই বন্ধ হয়। এতে বাঁধনের ওপরের ধমনী ফুলে ওঠে, ও জায়গাটি গরম হয়ে যায়; যেহেতু শিরা বন্ধ থাকায় সঞ্চালন অব্যাহত থাকছেনা তাই এটি হয়। বাঁধনের ওপরে শিরাগুলো কিন্তু ফুলে ওঠেনা কারণ রক্ত সেখানে এখন আর ফেরৎ যাচ্ছেনা। শিরার কপাটিকা যে শুধু হার্টের দিকে খোলে, বিপরীত দিকে খোলেনা এটি তিনি হাতেকলমে প্রমাণ করেন এই দেখিয়ে যে শিরার ভেতর দিয়ে হার্টের দিকে সূচ চালনা করতে পারেন অথচ এর উল্টো দিকে তা করতে পারেননা– তা কপাটিকায় আটকে যায়। এরকম এক্সপেরিমেন্টই হার্ভেকে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ করে দিয়েছিলো। গ্যালেন ও অন্যান্যরা এক্সপেরিমেন্ট যে একেবারে করেননি তা নয়; কিন্তু তাঁরা প্রচলিত তত্ত্বের দ্বারা এত বেশি আচ্ছন্ন ছিলেন যে তা তাঁদেরকে সত্যের দিকে নিয়ে যেতে পারেনি। হার্ভের যুগের এক্সপেরিমেন্টমুখী প্রেরণাটিই এখানে আধুনিক যুগের সূচনা সম্ভব করেছিলো। সেই প্রেরণাকে জোরদার যাঁরা করেছিলেন হার্ভেও তাঁদের একজন ছিলেন।

প্রথম বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের অবদানঃ

১৬০০ শতকের শুরু থেকে ওই শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ইউরোপের বেশ কিছু দেশে বেশ আয়োজন করে কিছু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিলো। এগুলোর কোনটি রাজ-সভার উদ্যোগে হলেও অধিকাংশের পেছনে উদ্যোগী ছিলেন

উৎসাহী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ। এভাবেই তখন ইতালীতে, ফ্রান্সে, ইংল্যান্ডে বিজ্ঞান একাডেমি বা সোসাইটিগুলো গড়ে ওঠেছিলো। কিন্তু এদের মধ্যে ইংল্যান্ডের 'রয়্যাল সোসাইটি' নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানটি তখন আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনায় সব চেয়ে বড় ঐতিহাসিক ভূমিকাটি পালন করেছে। এই বিশিষ্ট ভূমিকার একাধিক কারণ রয়েছে। এর উদ্যোক্তাদের অনেকে নিজেরাই ছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টিকার এবং অনেকে বিজ্ঞানী না হয়েও খুবই বিজ্ঞানোৎসাহী। ওখনকার ইংল্যাণ্ডের পরপর বেশ কয়েকজন রাজা এতে খুব উৎসাহ যুগিয়েছেন– ইংল্যাণ্ডে তৎকালীন গৃহযুদ্ধেও যা স্তিমিত হয়নি। একটি বড় কারণ ছিল রয়্যাল সোসাইটি গড়ে ওঠেছিলো বিজ্ঞানের কিছু আদর্শ ও নীতির ওপর ভিত্তি করে– ফ্রান্সিস বেকনের আহ্বান ছিল যার প্রধান প্রাণশক্তি। এই আদর্শ আজ পর্যন্ত টিকে আছে, রয়্যাল সোসাইটিও টিকে আছে।

১৬৬০ সালে কয়েকজনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'প্রাকৃতিক জ্ঞানের উন্নয়নকল্পে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি' এই নামে গড়ে ওঠে। আরো বছর পনরো আগে থেকে বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েলের উৎসাহে 'অদৃশ্য কলেজ' নামের একটি ক্লাব সংগঠন প্রথমে অক্সফোর্ডে এবং পরে লন্ডনে নিয়মিত বিজ্ঞান আলোচনার জন্য প্রতি সপ্তাহে একত্র হতো। লণ্ডনের গ্রেশাম কলেজে একত্রিত হতেন বলে তাঁদেরকে 'গ্রেশামের মানুষও' বলা হতো। এই গোষ্ঠিটিই আনুষ্ঠানিক ভাবে রয়্যাল সোসাইটি সৃষ্টি করে এবং এর পর পর ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস একে রাজকীয় সনদ (রয়্যাল চার্টার) প্রদান করেন। এরপরও অবশ্য ওই গ্রেশাম কলেজের বৈঠকগুলোই ছিল এর প্রধান কাজ, এবং ওই কলেজের জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক ক্রিস্টোফার রেন ছিলেন এর বড় উদ্যোক্তা।

প্রতিষ্ঠার সময় এর উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে এটি হবে 'এক্সপেরিমেন্ট-নির্ভর ভৌত-গাণিতিক জ্ঞান গড়ে তোলার' প্রতিষ্ঠান যা সপ্তাহে একবার একত্র হয়ে বিজ্ঞান আলোচনা করবে এবং এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করবে। শুরুতেই রবার্ট হুকের মত বিখ্যাত বিজ্ঞানী পূর্ণকালীন কর্মকর্তা হিসেবে এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। একজন খুবই দক্ষ ও কৃতী সংগঠক হিসেবে সোসাইটির সাংগঠনিক দায়িত্বে দীর্ঘদিন ছিলেন সেক্রেটারি হিসেবে বিজ্ঞানী হেনরি ওল্ডেনবার্গ। বিজ্ঞান পদ্ধতির বেকনীয় দর্শন যে এর উপজীব্য ছিল তা সোসাইটির ঘোষণা, আলোচনা, এক্সপেরিমেন্ট সবকিছুতেই ফুটে ওঠেছে। শিগগির প্রতিষ্ঠানটি শুধু ইংল্যান্ডের নয় পুরো বিজ্ঞান-বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলো– সেই সঙ্গে ওই বিজ্ঞান-দর্শনও। প্রথম দিকে রবার্ট

হুক, রবার্ট বয়েলের মত বিজ্ঞানীদের নিজেদের কাজগুলোও রয়্যাল সোসাইটিকে কেন্দ্র করেই চলতো বলে এটি একটি গবেষণা কেন্দ্রও হয়ে ওঠেছিলো। কিন্তু ক্রমে এটি ইংল্যান্ডের ভেতরে ও বাইরে নানা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ও আবিষ্কারের আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা, আলোচনা ও স্বীকৃতি প্রদানের প্রতিষ্ঠানেই রূপ পায়। বিজ্ঞানীদের পরস্পর-বিরোধী দাবী ও অগ্রাধিকারগুলো নিষ্পত্তিও এর একটি কাজ হয়। বিজ্ঞানের চর্চা যেভাবে বাড়ছিলো তাতে এ সবের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিলো।

১৬৬৫ সালে রয়্যাল সোসাইটি 'ফিলোসফিক্যাল ট্রান্জেকশন' (দর্শন-আলোচনা) নামে বিজ্ঞান-জার্নালকে এর মুখপত্র হিসেবে গ্রহণ করে, যদিও তখনো সেক্রেটারী ওল্ডেনবার্গ ব্যক্তিগত ভাবে নিজেই এটি প্রকাশ করতেন। অনেক দিন পর ১৭৫৩ সালে এটি আনুষ্ঠানিক ভাবে সোসাইটির জার্নালে পরিণত হয়। এই জার্নালে প্রকাশ করার সুযোগকে স্বীকৃত বিজ্ঞান হবার পথে একটি বড় পদক্ষেপ মনে করা হতো, এবং প্রকাশের আগে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচনাটি পরীক্ষিত হবার নিয়ম চালু হয় (পীয়ার রিভিউ) যেটি এখনো বিজ্ঞান-প্রকাশনার মূল নীতি। এই জার্নাল এখনো নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে তার গুরুত্বটি ধরে রেখেছে।

রয়্যাল সোসাইটি সব চেয়ে সম্মানিত আসনটি হলো এর সভাপতির– সেই প্রথম যুগেও অত্যন্ত কৃতী বিজ্ঞানীরা ছিলেন এর সভাপতি। ১৭০৩ থেকে ১৭২৭ সাল পর্যন্ত নিউটনের সভাপতিত্বকাল এর প্রথম যুগের বিশেষভাবে স্মরণীয় সময়– সোসাইটির সম্মান তখন অনেক বেড়ে যায়। তবে এও ঠিক যে জার্মান গণিতবিদ, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক লাইবনিৎসের সঙ্গে ক্যালকুলাস আবিষ্কারের অগ্রাধিকার নিয়ে নিউটনের বিরোধ এই আবহকে কিছুটা ম্লান করেছিলো। অনেকে মনে করেন যে নিউটন সে সময় রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি হিসেবে তাঁর পদের অপব্যবহার করেছেন। এর দীর্ঘ ইতিহাসে রয়্যাল-সোসাইটির কার্যকারিতায় উত্থান-পতন থাকলেও উনবিংশ শতাব্দী থেকে আজ অবধি এটি বিজ্ঞান জগতের সম্মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে অত্যন্ত উঁচু স্থানে রয়েছে। এর ফেলো বা সদস্য নির্বাচিত হওয়া যে কোন বিজ্ঞানীর একটি পরম কৃতিত্ব মনে করা হয়– তাঁদের তখন উপাধি হয় এফ আর এস (ফেলো রয়্যাল সোসাইটি)। সেই শুরুর সময় থেকে রয়্যাল সোসাইটি সারা দুনিয়ায় বিজ্ঞানী সমাজের প্রতিষ্ঠান হিসেবে আদর্শ হয়ে রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানকে বুঝতে গেলে এরকম প্রতিষ্ঠানের কাজকেও বুঝতে হয়।

তত্ত্বের জন্ম-মৃত্যু, তত্ত্বের জয়

তত্ত্ব বেছে নেয়ার শর্ত

সেই নিউটনের আমলে অর্থাৎ রয়্যাল সোসাইটির আধুনিক বিজ্ঞান-আবহে আমাদের আজকের পরিচিত বিজ্ঞানের নিয়ম-নীতির অনেকটাই মোটামুটি চালু হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে একই বিষয় ব্যাখ্যার জন্য একাধিক তত্ত্ব আর থাকেনি, কিংবা ভুল তত্ত্ব যে ভুল একথা চট্ করে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। তখনো অনেক ভুল তত্ত্ব বহুদিন যাবত বহাল তবিয়তে বেঁচে থেকেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না অকাট্য প্রমাণে এক সময় বিজ্ঞানীরা তা ত্যাগ করেছেন। ভুল তত্ত্ব বেঁচে থাকার পেছনে নানা কারণের মধ্যে অতীতের মতো তখনো ছিল বড় বিজ্ঞানীর প্রভাব– যিনি এই তত্ত্ব দিয়ে এর স্বপক্ষে বরাবর জোর দিয়েছেন। এর একটি বড় উদাহরণ হলো নিউটনের আলোক তত্ত্ব।

নিউটন নিজের হাতে সব চেয়ে বেশি এক্সপেরিমেন্ট করেছেন আলোকবিদ্যার ক্ষেত্রে। এর অধিকাংশ তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত বই 'অপ্টিক্সে' (আলোকবিদ্যা)। এই বইয়েই তিনি তাঁর এক্সপেরিমেন্টগুলোর ভিত্তিতে গড়ে তোলা আলোক তত্ত্বকে উপস্থাপন করেছেন। আলোর আচরণ সম্পর্কে খুবই শক্তিশালী নানা তথ্য তাঁর এক্সপেরিমেন্টগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে। যেমন কাচের প্রিজমের মধ্য দিয়ে সাদা আলো নিয়ে গিয়ে তিনি তাকে বর্ণালীর সাত রঙে বিশ্লিষ্ট করে দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন রঙের আলো চলার পথে মাধ্যম বদলাবার সময় বিভিন্ন পরিমাণে প্রতিসরিত হয়– যেমন নীল আলো লাল আলোর চেয়ে বেশি প্রতিসরিত হয়। চেপ্টা কাচের ওপর অর্ধ-কনভেক্স লেন্স রেখে তিনি খুবই সরু নানা রঙে রঙীন রিং একের ভেতরে এক সমকেন্দ্রিক ভাবে দেখতে পেয়েছেন। পরে এগুলোকে নিউটনের রিং বলা হয়েছে। তাছাড়া বর্ণালীর একটি মাত্র অংশকে নিয়ে (তাই একই রঙের) তা পর পর নানা প্রিজমের ভেতর দিয়ে প্রতিসরিত করে দেখিয়েছেন যে ওই বিশেষ আলোর প্রতিসরণ প্রতি প্রিজমে একই ভাবে হয়েছে। অর্থাৎ রঙের ওপর নির্ভরশীল এই গুণটি একান্তই আলোর নিজের, প্রিজমের কাচের বা অন্য কোন কিছুর নয়। এরকম সব কিছুকেই নিউটন যখন ব্যাখ্যা করেছেন তখন তিনি আলোর নিজস্ব গঠন-প্রকৃতি হিসেবে ধরে নিয়েছেন যে আলো এক প্রকার কণায় (কোরপাস্সল) গঠিত।

এগুলো খুবই ক্ষুদ্র কণা, তবে এটমের ধারণার মত অবিভাজ্য কিছু নয়। তিনি বল্‌লেন শুধু এই কণা তত্ত্ব দিয়েই আলোর সব ধর্ম বোঝা সম্ভব।

সে সময় অন্য বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী কিন্তু আলোকে কণা হিসেবে নিয়ে নয়, বরং একে তরঙ্গ হিসেবে নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি তত্ত্ব দিয়েছিলেন, যা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্যও হয়েছিলো। এর একজন আবিষ্কর্তা ছিলেন হল্যান্ডের বিজ্ঞানী হাইগেন্স। রয়্যাল সোসাইটির আদি প্রাণ-পুরুষদের একজন নিউটনের আরো কাছের মানুষ রবার্ট হুকও ছিলেন আলোর তরঙ্গ তত্ত্বের একজন অনুসারী। যে কোন সরু ফাটলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ও আলোর নানা রঙের অংশ নানা পরিমাণে বেঁকে যায় ঠিক প্রিজমের মত। নিউটন এই বেঁকে যাওয়াকে বিশেষ ধরনের প্রতিসরণ হিসেবে ধরে নিয়েছেন, কিন্তু হুক তা বলতে রাজি ছিলেন না। তিনি একে আলোর সম্পূর্ণ আলাদা একটি ধর্ম ডিফ্র্যাকশন (অপবর্তন) বলেছেন এবং দেখিয়েছেন যে একমাত্র তরঙ্গ-তত্ত্ব দিয়েই একে ব্যাখ্যা করা যায়। হাইগেন্স ১৬৮৭ সালে তাঁর বই 'আলোক বিষয়ক গ্রন্থ' প্রকাশের মাধ্যমে আলোর তরঙ্গ তত্ত্বকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে বিকশিত করেন।

এরপর থেকে বিজ্ঞানীদের সামনে আলোর কণা তত্ত্ব এবং তরঙ্গ তত্ত্ব উভয়েই সবিস্তারে বিরাজ করছিলো। নিউটন দাবী করছিলেন আলো যদি তরঙ্গ হতো তা হলে সেটি সরলরেখায় চলতে পারতোনা, ফলে আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়মগুলো মানার প্রশ্নও উঠতোনা। অন্য দিকে হাইগেন্স দেখিয়ে দিয়েছিলেন তরঙ্গ তত্ত্ব দিয়েই আলোর সরল রৈখিক রূপ এবং অন্যান্য সব গুণ চমৎকার ব্যাখ্যা করার সম্ভব– ডিফ্র্যাকশন সহ। শুধু তাই নয় একটি সরু ফাটলের মধ্য দিয়ে গেলে আলোক তরঙ্গের সম্মুখ ভাগের দুটি অংশ যখন পরস্পরের ওপর আপতিত হয় তখন এর কোথাও একটি অংশের তরঙ্গের শীর্ষ অন্য অংশের শীর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জোরদার আলোর সৃষ্টি করে কিন্তু অন্যত্র একের শীর্ষ অন্যের পাদদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাটাকুটি হয়ে আলোর অভাব সৃষ্টি করে। এভাবে ওখানে পর পর আলো ও আঁধারের ঝালর সৃষ্টি হবার কথা। ডিফ্র্যাকশনে বেঁকে ধাওয়া আলোর কিনারায় ঠিক তাই দেখা যায়।

নিউটন কণা-তত্ত্ব দিয়ে তাঁর মত করে আলোর অধিকাংশ ধর্মকেই ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতিফলনকে তিনি দেখেছেন একটি তলের ওপর বল ছুঁড়লে বলটির ফিরে আসার প্রকৃতি দিয়ে– এখানে আলোর কণা সে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে বলের মতই তলটি আলোক কণাকে বিকর্ষণ করে। প্রতিসরণের ক্ষেত্রে অবশ্য

আলোক কণা যখন কম ঘন মাধ্যম থেকে বেশি ঘন মাধ্যমে ঢুকে (যেমন বাতাস থেকে কাচে) তখন উভয় মাধ্যমের সংযোগ স্থলের তল আলোক কণাকে আকর্ষণ করে। ফলে ঘন মাধ্যমে কণার বেগ বেড়ে যায় ও আলোক রশ্মি বেঁকে যায়। ডিফ্র্যাকশানকে নিউটন এরকম এক ধরনের প্রতিসরণ হিসেবে দেখিয়েছেন বটে কিন্তু এর সঙ্গে দেখা যাওয়া আলো-আঁধারের ঝালরকে বা নিউটন-রিংকে ব্যাখ্যা করা তাঁর পক্ষে মোটেই সহজ হয়নি। এজন্য শুধু কণার ওপর নির্ভর করতে পারেননি তিনি। তিনি বরং বলেছেন কণাগুলো সর্বব্যাপ্ত ইথারের মধ্যে এক প্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি করে যেগুলো তালে তালে ছন্দিত হয়ে কখনো কণাকে যেতে দেয়, কখনো দেয়না। অর্থাৎ কিনা কণা তত্ত্ব বজায় রেখেও তাঁকে এক ধরনের তরঙ্গের অবতারণা করতে হয়েছে আলো-আধাঁরের ঝালরটি ব্যাখ্যা করতে। এতে কণা তত্ত্বে কিছুটা কৃত্রিমতাই সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া তাঁর ব্যাখ্যার কোথাও কোথাও কিছু পরস্পর অসঙ্গতিও দেখা দিয়েছে যা তিনি স্বচ্ছন্দভাবে এড়িয়ে যেতে পারেননি। যেমন দুই মাধ্যমের সংযোগ তল থেকে আংশিক প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে তাঁকে ধরে নিতে হয়েছে যে কণা তল থেকে বিকর্ষিত হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে ঘন মাধ্যমে এই আলোর আংশিক প্রতিসরণের ব্যাখ্যায় ধরে নিতে হয়েছে যে তা তলের দ্বারা আকর্ষিত হয়েছে।

এই সব কৃত্রিমতা ও অসঙ্গতি সত্ত্বেও নিউটনের তত্ত্বটিই সে সময় অগ্রাধিকার পেয়েছিলো, হাইগেন্সের তত্ত্ব নয়। নিউটনের খ্যাতি ও প্রভাব এতে নি:সন্দেহে কাজ করেছিলো। তাছাড়া হাইগেন্সের তরঙ্গ তত্ত্বটিও একেবারে নির্ভুল ছিলনা। বিশেষ করে হাইগেন্স আলোক তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গের মত যেদিকে তার গতি সেদিকেই তার কম্পন বলে ধরে নিয়েছিলেন (লংগিচ্যুডানাল)। এমন তরঙ্গের পোলারায়ন হবার কথা নয়। তাই হাইগেন্স আলোর পোলারায়নের ব্যাখ্যা করতে পারেননি, কিন্তু নিউটন কণা তত্ত্ব দিয়ে তা পেরেছিলেন। এর পর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তরঙ্গ তত্ত্বের এই দুর্বলতা দূর করলেও নিউটনের কণা তত্ত্বই দীর্ঘকাল দাপটের সঙ্গে থেকে যায় তাঁর মৃত্যুর অনেকদিন পরেও।

অবশেষে নিউটনের অপটিক্স গ্রন্থটি প্রকাশের প্রায় একশ' বছর পর আরেকজন ইংরেজ বিজ্ঞানী টমাস ইয়াং কণা তত্ত্বের অবসান ঘটিয়ে তরঙ্গ তত্ত্বকে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ইতোমধ্যে তরঙ্গ তত্ত্বের তুলনায় নিউটনের ব্যাখ্যাগুলোর জটিলতা বিজ্ঞানীদের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। তরঙ্গ তত্ত্ব আলোর যতগুলো আচরণের ব্যাখ্যা দিতে পারছিলো কণা তত্ত্ব তা পারছিলোনা। দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বের থেকে একটিকে বেছে নেবার ক্ষেত্রে এগুলো শর্ত হিসেবে

কাজ করে। তবে ইয়াং একটি বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমেই এ চূড়ান্ত কাজটি করলেন। একে বলা হয় 'দুই ফাটল এক্সপেরিমেন্ট'। এতে একই উৎস থেকে পাওয়া আলোকে দুটি খুব সরু ফাটলের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে সঠিক অবস্থানে একটি পর্দাকে রাখলে পর পর আলো ও অন্ধকারের ঝালর তাতে ফুটে ওঠে। তরঙ্গ তত্ত্ব দিয়ে সহজেই এটি ব্যাখ্যা করা যায়, কণা তত্ত্ব দিয়ে সরল ভাবে মোটেও করা যায় না। এভাবেই দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটিকে বেছে নেয়া সম্ভব হয়েছিলো। তুলনামূলক সারল্য এবং অধিকতর ক্ষেত্রে ফলপ্রসুতা এই বেছে নেবার ক্ষেত্রে কাজ করেছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে আরো কিছু শর্ত এ ধরনের ক্ষেত্রে সঠিক তত্ত্বকে বেছে নিতে সাহায্য করে থাকে। যেমন যেই তত্ত্বকে ব্যাপকতর ভাবে ব্যবহার করা যায়, যার থেকে বেশি নতুন আইডিয়া পাওয়া যায়, অথবা যেটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ– সেটিকেই সাধারণত বেছে নেয়া হয়। আলোর কণা তত্ত্বের আপাতমৃত্যু এভাবে ঘটেছে বটে, কিন্তু এই মৃত্যু স্থায়ী হয়নি– কারণ এর একশ' বছরের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এ তত্ত্বের এক রকম পুনর্জন্ম ঘটেছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের মধ্যে, যা আলোর ভিন্ন এক রকমের কণা প্রকৃতি ও তরঙ্গ প্রকৃতি উভয়টিকেই একই সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। সেটি আমরা পরের অধ্যায় দেখবো।

কেমিস্ট্রিতে তত্ত্ব-বিভ্রাট

আধুনিক বিজ্ঞানের ছোঁয়া কেমিস্ট্রিতে একটু দেরি করে লেগেছে। জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে যখন আধুনিক বিজ্ঞান চালু হয়ে গিয়েছিলো তখনো আলকেমির দাপট অব্যাহত থাকায় বৈজ্ঞানিক কেমিস্ট্রি আসতে বিলম্ব ঘটেছে। আলকেমির মোহ কাটিয়ে এর কিছু পরে এমন কিছু চর্চা শুরু হলো যাকে কেমিস্ট্রি বলা যায়। এর শুরুটা হলো সব জিনিসের মধ্যে থাকা মৌলিক জিনিস ওই মৌলগুলোকে আরো বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখার চেষ্টা করার মাধ্যমে। এরিস্টোটলের চার মৌল নিয়ে সন্দেহ আগেই দেখা দিয়েছিলো। দেখা গেল ওগুলোর কোন কোনটি আবার একাধিক মৌলে গড়া। যেমন বাতাসের মধ্যেই পাওয়া গেলো অন্তত দু'রকমের 'বাতাস' (গ্যাস)– অক্সিজেন, নাইট্রোজেন। কিছু দিনের মধ্যে আধুনিক কেমিস্ট্রির জনক বলে পরিচিত ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভোশিয়ে যখন মৌলের একটি তালিকা তৈরি করলেন তা গিয়ে দাঁড়ালো ৪টির বদলে ৩২টিতে। এগুলোর প্রত্যেকটি যার যার মত মৌলিক জিনিস অন্য কোন

জিনিস দিয়ে গঠিত নয়। অন্য দিকে তিনি দেখালেন এরিস্টোটলের কথিত ওই চার মৌল– মাটি, বাতাস পানি ও আগুন– এদের কোনটিই ওই রূপে মৌল নয়, তাই ৩২টির তালিকায় নেই। বাতাসের জায়গায় তো আসলো অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস; মাটির জায়গায় ৫ রকমের ভিন্ন ভিন্ন 'মাটি'– চক, ম্যাগনেশিয়া, ব্যারোট, এলাম, সিলিসি; আগুনের জায়গায় আসলো ক্যালোরিক নাম নিয়ে তাপ, আর পানির গঠনে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ইতোমধ্যে মৌল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে পানির জায়গায় নতুন কোন মৌল এলোনা। এভাবে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা চার মৌলের অবসানেই কেমিস্ট্রির সূচনা হলো। অবশ্য ল্যাভোশিয়ের এই তালিকাও ত্রুটিহীন ছিলনা– তাপকে ও আলোকে রাসায়নিক মৌল মনে করা ছিল তাঁর এমনি ভুল। তাছাড়া এমন কিছু কিছু জিনিসকে তিনি মৌল মনে করেছেন যেগুলো আসলে যৌগ। এসব পরে বাদ পড়েছে এবং আরো নতুন নতুন মৌল আবেষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু ওই পর্যায়ে মৌল সম্পর্কে ধারণা বদলের ফলে কেমিস্ট্রি এগোতে পারলো।

মৌলের অনেকটা পূর্ণাঙ্গ তালিকাকে আর এক উচ্চ পর্যায়ে নিতে পারলেন রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেন্‌ডেলীভ। তিনি দেখালেন হালকা থেকে ভারী এই ক্রমে সাজানো তালিকা থেকে প্রতি ৮ অথবা ১৮ টি মৌল পর পর পর্যায়ক্রমে মৌলকে যদি সারি ভেঙ্গে পরের সারিতে নেয়া হয় তা হলে একের নিচে আরেক এ ভাবে সৃষ্টি হওয়া প্রত্যেকটি গ্রুপের সবগুলো মৌলের রাসায়নিক আচরণে অদ্ভুত মিল দেখা যায়। এই "পর্যায় সারণীর" কোন কোন ঘর শূন্য দেখে মেন্‌ডেলীভ ওই ঘরগুলোর অবস্থান থেকে কয়েকটি মৌলের সম্ভাব্য গুণাবলী সহ সেগুলোর উপস্থিতি নিয়ে ভবিষ্যৎদ্বাণী করতে পেরেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পরে মৌলগুলো আবিষ্কৃত হলে এই নতুন কেমিস্ট্রির একটি বিজয় সূচিত হয়। যৌগের মধ্যে মৌল তার গুণ বজায় রাখেনা এমন এরিস্টোটলীয় ধারণাও এখন পরিত্যক্ত হলো। দেখা গেলো যেসব মৌল দিয়ে একটি যৌগ গড়া তা যৌগের অনেক কিছু ঠিক করে দেয়, যেমন মৌলগুলোর ওজনের সমষ্টিই যৌগের ওজন বলে দেয়।

মৌল ও যৌগের সম্পর্কটি আরো স্পষ্ট করা সম্ভব হলো যখন ইংরেজ রসায়নবিদ ড্যালটন ১৮০০ সাল নাগাদ দু'হাজার বছরেরও বেশি পুরানো ডেমোক্রিটাসের এটমের ধারণাটিকে তাঁর কেমিস্ট্রিতে নিয়ে এলেন। যৌগের অণুকে এখন মৌলের এটমের সমন্বয় হিসেবে দেখা হলো। ওজনের যে অনুপাতে দুটি মৌল যৌগ গঠন করে তাদের এটমের ওজনের অনুপাতও ঠিক তাই। ডেমোক্রিটাসের এটমের মত ড্যালটনের এটমও অবিনাশী– রাসায়নিক ভাঙ্গাগড়ায় এটম

অপরিবর্তিত থাকে। যৌগের মধ্যে মৌল যে তার স্বকীয়তা বজায় রাখে সে ধারণা এতে আরো শক্ত হলো। ড্যালটনের কেমিস্ট্রি অবশ্য এটমের বাস্তবতা সম্পর্কে দু'হাজার বছর পুরানো বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারেনি। অনেকে এখনো মনে করতে থাকলেন যে যে জিনিস দেখা যায়না, দেখা যাবার কোন সম্ভাবনা নেই, সেটি একটি কষ্ট-কল্পনা ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা। তবে কেমিস্ট্রিতে ইতোমধ্যে একটি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছিলো দুই মৌল যখন যৌগ গঠন করে তাতে মৌল দুটির ওজনের অনুপাত সব সময় সমান থাকে– এটি 'নিত্য অনুপাতের নিয়ম'। এটম নিয়ে যদি যৌগ গঠিত হয় তা হলে এই নিয়ম খুবই স্বাভাবিক ভাবে আসে।

এটমের এত সুবিধা সত্ত্বেও এ নিয়ে সন্দেহের কমতি ছিলনা। এটমের অস্থিত্বের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত সুরাহা হয়েছিলো একেবারে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের হাতে। এর আগে রবার্ট ব্রাউন নামের উদ্ভিদবিদ মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে দেখেছেন পানিতে ভাসমান পরাগ রেণুর এক একটি হঠাৎ হঠাৎ এদিক ওদিক ইতস্তত ছুটে যায়। একে 'ব্রাউনীয়ান মোশন' বলা হতো। আইনস্টাইন গাণিতিকভাবে প্রমাণ করলেন যে পানির অসংখ্য অণুগুলো পরাগ রেণুর ওপর নানা দিক থেকে যেভাবে ধাক্কা দেয় তার সম্মিলিত প্রভাবে এমনটি হতে পারে। ব্যাপারটি পরে এক্সপেরিমেন্টেও প্রমাণিত হলো। এভাবে অণুর (এবং এটমের) অস্থিত্বেরই শুধু প্রমাণ হলো না, ওই হিসেব থেকে তার আয়তনও বের হলো।

১৭০০ শতকের শেষ দিকে কেমিস্ট্রির প্রথম যুগে যদি ফেরৎ যাই সেখানে এটমের ধারণা তখনো আসেনি, বরং কতগুলো নৈরাজ্যমূলক তত্ত্ব দিয়েই কোন রকমে কেমিস্ট্রির ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলছিলো। যেমন ধরা যাক ল্যাভোশিয়ের পক্ষে ক্যালোরিক বলে জিনিসটাকে মৌল হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারটি। আসলে এ সময় তাপশক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসেবে যা প্রচলিত ছিল তা হলো ক্যালোরিক তত্ত্ব। তাপকে মনে করা হতো ক্যালোরিক নামের এক অদ্ভুত অদৃশ্য তরল। এই তরল যে বস্তুতে বেশি তার তাপ বেশি, আবার বস্তুর গঠন অনুযায়ী ওই তরলের উপরিতলের মাত্রাটি বলে দেবে তার উত্তাপ বা তাপমাত্রা (টেম্পারেচর)। দুই উত্তাপে থাকা দুই বস্তুকে পরস্পর সংলগ্ন করলে এ তরল একটি থেকে অন্যটিতে গিয়ে উভয়কে সম উত্তাপে নিয়ে আসে। অনেক কিছুর ব্যাখ্যা এই ক্যালোরিক তরলটি দিয়ে দেয়া হলো। যেমন বরফ গলার সময় বা পানি ফোটার সময় তাপ দিলেও তার উত্তাপ বাড়েনা, একই থাকে; তখন তাপটি সুপ্ততাপ হিসেবে থাকে। এর ব্যাখ্যায় বলা হলো তখন ক্যালোরিক

এমন ভাবে বরফের সঙ্গে বা ফুটন্ত পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে যে উত্তাপ না বাড়িয়ে বরং গলতে অথবা বাষ্পীভূত হতে সাহায্য করে। ল্যাভোশিয়ের কাছে তাই মনে হয়েছে ক্যালোরিক অন্য যে কোন মৌলের মতই একটি মৌল– যা রাসায়নিক বিক্রিয়া করতে পারে। এর রয়েছে এক রকম বিকর্ষণ ধর্ম, যা কঠিনকে তরল ও তরলকে বাষ্পে পরিণত করতে পারে। কিন্তু এই ক্যালোরিক তত্ত্ব স্থায়ী হয়নি। আসলে ক্যালোরিক বলে কোন কিছুর অস্থিত্বই নেই বলে প্রমাণিত হয়েছে– তাপের একক হিসেবে ক্যালোরি শব্দটাই শুধু টিকে আছে। দেখা যাক এই তত্ত্বের অবসান কীভাবে হলো।

ক্যালোরিক জিনিসটির অস্থিত্ব কখনো কোন এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণিত হয়নি। যদিও মেনে নেয়া যায় যে উত্তপ্ত জিনিসের সংস্পর্শে ওটি থেকে ক্যালোরিক পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু দুটি জিনিস পরস্পরের সঙ্গে ঘষাঘষি করে উভয়টিই যখন উত্তপ্ত হয় তখন ক্যালোরিক আসে কোথা থেকে? এর প্রতি এরকম সন্দেহই প্রকাশ করেছিলেন বৃটিশ-আমেরিকান বিজ্ঞানী কাউন্ট রামফোর্ড, যিনি কিছুদিন একজন সামরিক অধিনায়কও ছিলেন। সে সময় কামান তৈরি করা হতো নিরেট লোহার সিলিন্ডারের মাঝখানে গোলা যাওয়ার মত লম্বালম্বি গর্ত করে নিয়ে। দীর্ঘ সময় ধরে ড্রিলের সাহায্যে খুঁড়ে খুঁড়ে এই গর্ত করা হতো। যতই ড্রিল ঘোরানো হয় এবং লোহা খোঁড়া হয় ততই তাপ সৃষ্টি হয়। ক্যালোরিক তত্ত্ব বলার চেষ্টা করতো যে লোহা চিরে তার ফাঁক দিয়ে ক্যালোরিক গড়িয়ে আসছে বলেই এই তাপ। কিন্তু সরু ড্রিল বা ছুরি দিয়ে নয় বরং মোটা ভোতা অস্ত্র দিয়ে একই কাজ করলেও উত্তাপ তৈরি হয়– লোহাকে সূক্ষ্ম ভাবে না কাটা সত্ত্বেও। স্পষ্টত তাপ লোহার ভেতর থেকে বেরুচ্ছেনা; যতই ভোতা অস্ত্র চাপিয়ে একে ঘষাঘষি করা হচ্ছে ততই তাপ বেরুচ্ছে– সে তা যতক্ষণ ধরেই করা হোক না কেন তাপ সৃষ্টি থামেনা। এতে বোঝা গেল ওই ঘষাঘষির যে গতি তাই আসলে তাপ– ক্যালোরিক নামের কাল্পনিক তরল নয়। এরপর থেকে তাপের গতীয় তত্ত্বটিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই গতিটি কার, এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পদার্থ যে অণু আর এটমে গঠিত সেই বিষয়টিই শক্তিশালী হয়েছে। এর থেকে বোঝা গেল কঠিন পদার্থে তাপ দিলে তার অণুগুলোর কাঁপুনি বাড়ে। এক পর্যায়ে ছোটাছুটি বেড়ে গিয়ে অণুর চলাচলের স্বাধীনতা পদার্থটিকে তরলে পরিণত করে। তাপ আরো দিলে অণুর ছোটাছুটির আরো স্বাধীনতা তাদেরকে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ দেয়– পদার্থটিকে বায়বীয় অবস্থায় নিয়ে যায়। ক্যালোরিক তত্ত্ব দিয়ে এত কিছুর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হতোনা।

ক্যালোরিক তত্ত্বের বদলে গতীয় তত্ত্ব আসায় তা অন্য প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব কেমিস্ট্রির এটমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলো। এটম বা এটম-সমষ্টির গতিই তো তাপ অনেক বেশি ঘটনার ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল। তাই যখন দুটি তত্ত্বের মধ্যে বেছে নেবার প্রশ্ন আসে তখন সরলতর হওয়া ছাড়াও, যে তত্ত্বটি বেশি জায়গায় প্রযোজ্য হয় এবং ইতোমধ্যে গ্রহণ করা অন্য তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, সেটিকেই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়।

কেমিস্ট্রির প্রথম যুগে যেই তত্ত্বটি এর প্রধান নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো সেটিই বরং এর অগ্রগতির পথে একটি অন্তরায় ছিল। এর নাম 'ফলিজেস্টোন তত্ত্ব'। ১৭০৩ সাল নাগাদ এর প্রথম প্রবর্তন করেন জার্মান বিজ্ঞানী স্টাল। ক্রমে তত্ত্বটির প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়েছিল বস্তুর দহন এবং বাতাসে উত্তপ্ত করলে ধাতুর মরিচা ধরার মত অবস্থার ব্যাখ্যা করা– যাকে আমরা এখন অক্সিডেশন বলে থাকি। তবে কেমিস্ট্রির সব রকম বিক্রিয়া এ তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হতো। এ তত্ত্ব অনুযায়ী দাহ্য পদার্থগুলোতে ফলিজেস্টোন নামের একটি অদৃশ্য বস্তু থাকে যার নামের অর্থ 'শিখা'। দহনের সময় এর থেকে ফলিজেস্টোন বের হয়ে যায় বলে সেটি ছাইয়ে পরিণত হয়। কাঠকয়লার মত জিনিস পুড়লে খুব কমই ছাই থাকে– এর মানে কাঠকয়লা প্রায় সর্বাংশেই ফলিজেস্টোন। ধাতুর আকরিকের (পাথরের মত দেখতে) সঙ্গে কাঠকয়লা (অথবা কয়লা) মিশিয়ে উভয়কে উত্তপ্ত করলে বিশুদ্ধ ধাতু পাওয়া যায়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী কয়লার ফলিজেস্টোন আকরিকে গিয়ে তার ধাতব অংশে যুক্ত হয় এবং তার ফলেই আমরা ধাতু পাই। এই ধাতুকে আবার বাতাসে রেখে উত্তপ্ত করলে ফলিজেস্টোন বাতাসে চলে যায় বলে ধাতুটি আবার আকরিকের মত পাথুরে হয়ে ওঠে– তাতে ধাতুর গুণ হারিয়ে ফেলে। ধাতুর মরিচা ধরা বা অন্য ভাবে অক্সাইড হওয়াতে এটিই ঘটে। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় একটি বিপত্তি ছিল। মরিচা ধরার সময় ধাতু ফলিজেস্টোন হারিয়ে ফেল্‌ছে বটে কিন্তু মরিচা ধরা ধাতুর ওজন বিশুদ্ধ ধাতুর চেয়ে বেশি। কিছু হারানো সত্ত্বেও ওজন বাড়াটি একটি অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু ফলিজেস্টোন তত্ত্বের মোহে আচ্ছন্ন কেমিস্টরা তাতে দমলেন না, তাঁরা বল্‌লেন ফলিজেস্টোন জিনিসটা সাধারণ বস্তুর মত নয়, এর রয়েছে 'ঋণাত্মক ভর'– যেটি চলে গেলেই বরং ওজন বাড়ে। ফলিজেস্টোনকে ত্যাগ করার থেকে বরং তাঁরা ঋণাত্বক ভরের মত একটি অসম্ভব ব্যাপারকে কবুল করতে দ্বিধা করলেন না। এসব কিছুর জন্যেই তাঁদের কাছে কোন প্রামাণ্য এক্সপেরিমেন্ট ছিলনা– না ফলিজেস্টোনের, না তার অদ্ভুত গুণের ।

ফলিজেস্টোনকে কখনো আলাদা ভাবে পাওয়ার কথাও তাঁরা ভাবেননি। বরং তাঁরা ধরেই নিলেন যে একে আলাদা করা যায়না– শুধু এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসে চলে যেতে দেয়া যায়। নানা রকম বাতাস বলে পরিচিত যে সব গ্যাস তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছিলো তার মধ্যে হাইড্রোজেনকে তাঁরা বলতেন পুরোটাই ফলিজেস্টোন– কারণ সেটি জ্বলে। অক্সিজেনকে তাঁরা বল্‌লেন 'ফলিজেস্টোন হারানো বাতাস'– কারণ এটি জ্বলেনা কিন্তু অন্যের জ্বলার সময় ফলিজেস্টোন নেবার জন্য অবশ্যই থাকতে হয়। আর নাইট্রোজেন ছিল তাঁদের কাছে 'ফলিজেস্টোন সম্পৃক্ত বাতাস'। বিখ্যাত সব কেমিস্টরাও সেদিন ফলিজেস্টোন তত্ত্বের বাইরে কিছুতেই যেতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু ল্যাভোশিয়ে এই তত্ত্বের অসারতার বিষয়টি বুঝতে পারছিলেন। দারুণ কিছু এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে তিনি এই তত্ত্বকে বাতিল করতে পারলেন। তাঁর এক্সপেরিমেন্ট ছিল খুবই নিয়ন্ত্রিত; অত্যন্ত সংবেদনশীল নিক্তির সাহায্যে তিনি বাতাসকে পর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মেপে পরীক্ষণ পাত্রে ঢুকিয়েছেন। তার মধ্যে বাতাসে ধাতু গরম করে তিনি দেখালেন বাতাসের এক পঞ্চমাংশ ওজন কমে গেছে, আর ঠিক এই পরিমাণ ওজন ধাতুটি মরিচা ধরার সময় তাতে যোগ হয়েছে। এভাবে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল বাতাসের ওই এক পঞ্চমাংশ ওজন অক্সিজেনের– যা ধাতুর সঙ্গে মিশে তার অক্সাইড তৈরি করেছে। থেকে যাওয়া বাতাসের বাকি চার পঞ্চমাংশ হলো নাইট্রোজেন। এ সবের মধ্যে ফলিজেস্টোনের কোন ভূমিকা নেই। এভাবে কেমিস্ট্রি ফলিজেস্টোন তত্ত্বের অবসান ঘটিয়ে একটি আধুনিক বিজ্ঞানে পরিণত হতে পেরেছে ১৭০০ শতকের শেষের দিকে এসে। আর এতে নায়কের ভূমিকায় ল্যাভোশিয়ে। অথচ এ মানুষটির পরিণতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যে ফরাসী বিপ্লব বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ঘোষণায় সোচ্চার ছিল সেই বিপ্লবের একটি তথাকথিত গণ-আদালতে কয়েক মিনিটের বিচার করে সুবিধাভোগী অভিজাতদের একজন হবার অভিযোগে গিলোটিন যন্ত্রে তাঁর মাথা কেটে নেয়া হয় (১৭৯৪ সাল)।

পৃথিবীর 'বিপর্যয় তত্ত্বের' বদলে 'সমতালে পরিবর্তন তত্ত্ব':

১৬০০ শতক থেকে ইউরোপের প্রকৃতিবিদরা নানা দেশের ভূ-প্রকৃতিটি ভাল ভাবে পরীক্ষা করা আরম্ভ করেছিলেন। যতই তাঁরা দেখেছেন ততই মনে হয়েছে ভূ-প্রকৃতির ওপর প্রচুর ভাঙ্গাগড়ার চিহ্ন চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। শিলাস্তরের ভাঁজে ভাঁজে যেখানে পুরাতন শিলা নিচে ও নতুন শিলা উপরে থাকার কথা, তা অনেক জায়গার উল্‌টা পাল্‌টা হয়ে গেছে– কোথাও মনে হচ্ছে নিচের শিলা মাটি

ফুঁড়ে ওপরে উঠেছে, অন্য জায়গায় দারুণ ভাবে ভেঙ্গে গিয়ে অভ্যন্তরটি উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে প্রকান্ড সব লবন-গম্বুজ, আবার হঠাৎ কোথাও কয়লার একটি বিরাট সঞ্চয়। প্রাচীন প্রাণীর মরদেহের নানা নিদর্শন বিভিন্ন ধরনের ফসিল রূপে এ সময় আবিষ্কৃত হওয়া শুরু হয়। কোন কোন ফসিল এমন সব অদ্ভুত জায়গায় উদ্ঘাটিত হয় যে তাও প্রকৃতিবিদদের ভাবিয়ে তোলে– যেমন পর্বতের ওপরে মাছের ফসিল। এই ফসিলের বয়স মোটামুটি নির্ণয় করতে পেরে এবং এদের প্রাচুর্যের হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করে একটি জিনিস স্পষ্ট হলো যে বেশ কিছু সময় পর পর প্রায় একই সময়ে অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে– যাকে বলা যায় এক রকমের গণবিলুপ্তি। সবকিছু দেখে বিজ্ঞানীদের মনে একটি ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হচ্ছিলো যে পৃথিবী তার বয়সে বেশ কিছু বড় বড় বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গেছে– যার ফলে এত ওলটপালট, ভাঙ্গন, বিলুপ্তি। এটিই পৃথিবীর বিপর্যয় তত্ত্ব (ক্যাটাস্ট্রোফ থিওরি)। প্রথমে এটি একটি ধর্মীয়-দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে দেখা দিয়েছিলো বিশেষ করে বাইবেলে বর্ণিত নূহ নবীর মহাপ্লাবনের বিষয়কে সামনে নিয়ে এসে; তবে পরে এটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবেই রূপ পায়। বন্যা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ ইত্যাদিই ছিল ওই বিপর্যয়ের রূপ।

বিপর্যয় তত্ত্বটি অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক রূপ লাভ করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভূ-পুরাতত্ত্ববিদ ক্যুভীরের হাতে। তিনি বিপর্যয়ের চিহ্নগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে এগুলো পৃথিবীজোড়া ছিলনা, বরং স্থানীয় ভাবে সময় সময় হয়েছে। যেমন প্লাবনের কথাই যদি বলি তা পৃথিবীর এক এক জায়গায় সীমিত স্থানে হয়েছে এবং দীর্ঘকাল পর পর বার বার হয়েছে। কী পরিমাণ এলাকা পানির নিচে চলে গিয়েছিলো, কতদিন পর তা আবার পানি- মুক্ত হয়েছে এসবের স্পষ্ট চিহ্ন তিনি নির্দিষ্ট করতে পেরেছিলেন। বন্যাকে বড় বিপর্যয় মনে করা হলেও পরে অনুরূপ গুরুত্ব দিয়ে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রকান্ড জগদ্দল বরফের নদী হিমবাহের কাজকেও। এক এক সময় উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে বা আল্পসের মত উচ্চ ভূমি থেকে এরকম অতি ধীর গতির হিমবাহ নতুন নতুন অঞ্চলে এসে শিলার মধ্য দিয়ে চষে গিয়ে সব কিছু রীতিমত লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। পরে এক সময় হিমবাহ নিজকে গুটিয়েও নিয়েছে।

পৃথিবীর বিপর্যয় তত্ত্ব যখন এভাবে বেশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলো তখন একই পরিবর্তনগুলোর ব্যাখ্যায় বিপরীত আর একটি তত্ত্ব ধীরে ধীরে বিবেচিত হচ্ছিলো– সেই ১৭০০ শতক থেকেই। এই বিপরীত তত্ত্বের পেছনে ছিল দুটি

কারণ। স্কটিশ ভূতত্ত্ববিদ জেম্‌স হাটনের পাললিক শিলাস্তর আবিষ্কার তার মধ্যে একটি। সমুদ্রের পানির তলানি পড়ে কেমন করে শিলাস্তরগুলো একের ওপর এক অতি ধীরে গঠিত হয়েছে তা তিনি প্রমাণ করলেন– এমনকি সে শিলাস্তরে সমুদ্রের ঢেউয়ের কাঁপুনিগুলো পর্যন্ত চিহ্ন রেখে গেছে। এখান থেকেই ধারণা করা গেলো যে আদি আগ্নেয় শিলা যা ভূগর্ভ থেকে গলিত অবস্থায় উদ্গীর্ণ হয়ে এসেছিলো তা অতি ধীরে বায়ুপ্রবাহ, জলস্রোত ইত্যাদির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং সেই ক্ষয়িত চূর্ণগুলো সমুদ্রে জমা হয়েছিলো তলানি পড়ে। হাটন অনেক জায়গায় শিলাস্তরে চাক্ষুষ এমন সাক্ষ্য দেখতে পেয়েছেন যাতে মনে হয় এমন ঘটনা নানা পর্যায়ে ঘটেছে। প্রত্যেক পর্যায়ে নতুন করে সমুদ্রতলে পলি জমেছে, তারপর ভূগর্ভের চাপে এভাবে গঠিত স্তরগুলোই আবার তেরচা হয়ে ওপরের দিকে উঠে এসেছে এবং পুনর্বার ক্ষয়ের শিকার হয়েছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বার বার হতে প্রত্যেকবার অনেক সময় নিয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া এখনো অলক্ষ্যে হয়ে চলেছে।

এর মধ্যে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন অতীতে যেমনটি মনে করা হয়েছিলো তার তুলনায় পৃথিবীর বয়স অনেক বেশি– ভূ-প্রকৃতির সাক্ষ্য প্রমাণে তা বোঝা যাচ্ছিলো। একদিকে খুব ধীর দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন হয়ে চলার প্রমাণ, অন্যদিকে পৃথিবীর দীর্ঘ বয়স এই দুই নতুন ধারণা থেকেই বিপরীত তত্ত্বটির জন্ম হলো– এর নাম দেয়া হলো 'সমতালে পরিবর্তন তত্ত্ব' (ইউনিফর্মেটেরিয়ানিজম)। ১৮৩০-৩৩ সালে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত চার্লস লায়েলের 'ভূতত্ত্বের নীতি' নামক গ্রন্থ এই তত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত সব সাক্ষ্য প্রমাণ তুলে ধরলেন। এতে তিনি দেখিয়েছেন যে আজ প্রতি মুহূর্তে যে সব শক্তি পৃথিবীর শিলার ওপর সক্রিয় রয়েছে, সেই একই রকম শক্তি অতীতেও একই ভাবে সক্রিয় ছিল। সব পরিবর্তন চিরকাল একই ভাবে ঘটেছে, এখনো সমতালে ঘটে চলেছে। তবে বিপর্যয় তত্ত্ব ও সমতাল পরিবর্তন তত্ত্ব উভয়ে পাশাপাশি এই গত শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল এবং উভয়ের সম্পর্কে বিতর্ক ও অব্যাহত ছিল। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শুরু হওয়া বিপর্যয় তত্ত্ব বহুদিন বেশি গুরুত্ব পেলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে গিয়ে সমতাল পরিবর্তনের ধারণা অনেকের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, এবং এর প্রভাব সে সময় চার্লস ডারউইনের জীবের বিবর্তন তত্ত্বের ওপরেও পড়ে। পৃথিবীর নিজের ধীর পরিবর্তন এবং জীব জগতের ধীর পরিবর্তন (বিবর্তন) এই দুই যেন পরস্পরের সঙ্গে বেশি সাযুজ্যপূর্ণ হচ্ছিল।

একই সঙ্গে ফসিল গবেষণা থেকে এও আবিষ্কৃত হয়েছিলো যে দীর্ঘ কোটি বছরের ব্যবধানে এক এক সময় পৃথিবীতে বিপর্যয় এসেছে এবং তা জীবের গণবিলুপ্তি ঘটিয়ে জীব-জগতের পরিবর্তনও দ্রুততর করেছে। ওই বিপর্যয়গুলোর কোন কোনটি ছিল বড় ধরনের জলবায়ু পরিবর্তন– ফলশ্রুতিতে সমুদ্রতল উত্থানের কারণে বিস্তীর্ণ স্থলের জীব ডুবে মরা ইত্যাদি, কোন কোনটি ছিল ব্যাপক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, আবার কোন কোনটি ছিল বিশাল কোন উল্কা-পাতের ঘটনা। কাজেই একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে সমতালে পরিবর্তন তত্ত্বটি অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত হলেও সেটি ঠিক লায়ালের ব্যাখ্যার মত নয়, এই সমতাল পরিবর্তনের ভেতরেই মাঝে মাঝে বিপর্যয়গুলোও ভূমিকা রেখে চলেছে। কাজেই এক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই তত্ত্বের মধ্যে কোন তত্ত্বের মৃত্যু ঘটেছে, কোন তত্ত্বের জয় হয়েছে এমন ভাবে বলা যাবেনা– পূর্ববর্তী দুটি তত্ত্বই পরবর্তী তত্ত্বে ভূমিকা রেখেছে।

অনেক সময় তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করেছে অন্য কোন একটি বিষয় নিষ্পত্তি করতে পারার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে পৃথিবীর দীর্ঘ বয়সটি নির্ণয় করতে পারাটি এই ভূমিকা পালন করেছে। এক সময় বাইবেলকে আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ করতে গিয়ে প্রায় সবারই ধারণা ছিল পৃথিবীর বয়স মাত্র ৬ হাজার বছর। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবে ভূ-প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গিয়েছিলো এটি একেবারেই অবাস্তব একটি বয়স– পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া অনেক পরিবর্তনই এত অল্প সময়ে ঘটতে পারেনা। তারপর থেকে নানা ভাবে পৃথিবীর প্রকৃত বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা চলেছে। কখনো সেটি হয়েছে পলি জমার হার দেখে, কখনো পাহাড় ক্ষয় যাওয়ার হার নির্ণয় করে। কিন্তু পদ্ধতি শুদ্ধ ছিলনা বলে এতে যথেষ্ট দীর্ঘ বয়স পাওয়া সত্ত্বেও সে বয়স আসল বয়সের ধারেকাছে ছিলনা। ১৮৬২ সালে পদার্থবিদ লর্ড কেলভিন বেশ বিজ্ঞানসম্মত একটি পদ্ধতি এ কাজে ব্যবহার করেন। তিনি গলন্ত পার্থিব বস্তুর উত্তাপকে পৃথিবীর জন্মের সময়কার উত্তাপ হিসেবে নিয়ে সেখান থেকে বর্তমান উত্তাপে নেমে আসতে ভূত্বকের কত দিন লেগেছে তা পদার্থবিদ্যার শীতল হবার নিয়ম প্রয়োগে হিসেব করেন। তাতেই বোঝা গেছে পৃথিবীর বয়স ২০ মিলিয়ন থেকে ৪০০ মিলিয়ন বছরের মধ্যে। দেখা গেল পৃথিবী বেশ প্রাচীন জিনিসই বটে। কিন্তু লর্ড কেলভিনের পরিমাপে একটি জিনিসকে ধর্তব্যের মধ্যে নেয়া হয়নি। পরে বোঝা গেল পৃথিবী যেমন ঠাণ্ডা হচ্ছে তেমনি ভূ-গর্ভের তেজস্ক্রিয় পদার্থের কারণে নতুন করে কিছুটা গরমও হচ্ছে, যে কারণে স্বাভাবিক ঠাণ্ডা হবার নিয়ম তার ক্ষেত্রে খাটেনা– আসলে তার

বয়স এর চেয়েও অনেক বেশি। শেষ পর্যন্ত ১৯২৭ সালের দিকে জুতসই কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ শুরুতে কত ছিল এবং এখন কত আছে তা এবং এর ক্ষয় হবার হার এই দুই থেকে পৃথিবীর প্রকৃত বয়স নির্ণয় করা গেছে– যা কিনা ৪.৫ বিলিয়ন বছর! এমন অকল্পনীয় দীর্ঘ বয়সী পৃথিবীতে ধীরগতির সমতাল পরিবর্তন যে সংগঠিত পরিবর্তন গুলোর পেছনে প্রধান প্রক্রিয়া হবে তা বলাই বাহুল্য।

শাখা-তত্ত্বকে ভুল রেখেও মুল তত্ত্ব ঠিক হতে পারে

সাক্ষ্য-প্রমাণে জীব বিবর্তনঃ

যাবতীয় জীব-প্রজাতিগুলো যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত তা বিজ্ঞানীদের কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু বিজ্ঞানী সহ অনেকের মনের সায়টি ছিল এর বিপরীত। তাঁদের বিশ্বাস ছিল প্রজাতিগুলো প্রত্যেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট নিয়ে চিরকাল ওই প্রজাতিই হয়ে ছিলো; কালক্রমে এক প্রজাতি অন্যটিতে পরিণত হবার কথা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না। অথচ বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণ এমন কিছুরই ইঙ্গিত দিচ্ছিল। উদাহরণ স্বরূপ ১৭০০ শতকের মাঝামাঝিতে সুইডেনের উদ্ভিদবিদ কার্ল লিনিয়াসের উদ্যোগে যখন সব জীবের শ্রেণী বিভাজন করা হলো এবং সে অনুযায়ী তাদের বৈজ্ঞানিক নাম দেয়া হলো তখন এক জীবের সঙ্গে অন্য জীবের মিল-অমিলগুলো খুব স্পষ্ট হয়ে গেলো। শ্রেণী বিভাজনে ঘনিষ্ঠতর জীবগুলোর মধ্যে যত মিল একটু দূরবর্তী জীবে ততটা থাকেনা বটে, কিন্তু সেখানেও দেহ ও আচরণের অবিশ্বাস্য সব মিল দেখে অবাক হতে হয়। এভাবে ঘনিষ্ঠতম মিল থাকে স্পেসিস (প্রজাতি) পর্যায়ে, তারপর জেনাস, ফ্যামিলি, ক্লাস, অর্ডার, ফাইলাম ও কিংডম– সর্ব পর্যায়েই পর্যায়ক্রমে মিল কমে গেলেও মিলের ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ইঁদুর থেকে তিমি, বাঘ থেকে মানুষ– সবই স্তন্যপায়ী প্রাণী, এদের সবার অর্ডার এক; এবং এত ভিন্ন প্রাণী হয়েও তাদের মিলগুলো অভাবনীয়। এটি শুধু মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া বা স্তন্য পান করার মিল নয়, বরং মস্তিষ্কের মৌলিক গঠন কিংবা উষ্ণ রক্ত হবার মত আরো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে এদের সবার। কেউ যদি বলে তাদের মধ্যে আসলে কোন সম্পর্ক নেই, নেহাৎ কাকতালীয় ভাবে তারা এক রকম হয়ে গেছে, এমন কথা মানা শক্ত। বরং তারা সবাই একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এই একই গুণগুলো নিয়ে এসেছে– এমন মনে করাটাই স্বাভাবিক।

এভাবে শ্রেণী বিভাজনের পুরো ব্যাপারটিতেই দেখা যায় যে প্রত্যেক পর্যায়ে এক একটি জীব কিছু কিছু ভিন্নতা নিয়ে কাছাকাছি নতুন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরে ওগুলো আরো ভিন্ন হয়ে নিম্নতর পর্যায়ে পরস্পরের শ্রেণীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু উচ্চতর পর্যায়ে এক থেকেছে। সব মিলে দেখলে ঠিক মনে হয় যে একই আদি জীব থেকেই ধীরে ধীরে এই বৈচিত্রের দিকে এরা চলে গেছে। এভাবে জীব বিবর্তনের ধারণাটি ক্রমেই বিজ্ঞানীদের কাছে অপ্রতিরোধ্য হয়ে এসেছে। তাছাড়া বাইরের থেকে দেখতে খুবই ভিন্ন চেহারার ও ভিন্ন আচরণের, এবং শ্রেণী বিভাজনে পরস্পর থেকে অনেক দূরের, এমন সব প্রাণীরও কোন কোন বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যখন আমরা দেখি তাতে অভাবনীয় সব মিল ধরা পড়ে। যেমন ব্যাঙের সামনের পা, ইঁদুরের পা, মানুষের হাত, পাখির ডানা, মাছের পাখনা এদের কাজের মিল না থাকলেও হাড়ের গঠনে অদ্ভুত মিল– আগে-পিছের দুই অংশে বিভক্ত (হাতের সামনের ও পেছনের বাহুর মত), সামনের বাহুতেই দুটি হাড় সেইফটি পিনের আকারে যুক্ত, তালু ও আঙ্গুল একই রকম। সহজ সিদ্ধান্ত হলো এরা সবাই সাধারণ একই পূর্বপুরুষ থেকে এসব গঠন নিয়ে এসেছে এবং ক্রমে বিভিন্ন দিকে বিবর্তিত হয়েছে।

বিবর্তনের ব্যাপারটি আরো জাজ্বল্যমান হয়ে উঠলো যখন ফসিল খুঁজে পাওয়ার হার বেড়ে গেলো এবং বোঝা গেলো প্রাচীন কালের অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ফসিল যাদের চিহ্ন বহন করছে। শিলাস্তর ও ফসিলের প্রকৃত বয়সও নির্ণয় করা গেলো। একই প্রাণীর বিভিন্ন বৈচিত্রের কোন কোনটির ফসিলের মধ্যে সময়ের সঙ্গে ধারাবাহিক সব পরিবর্তন দেখা গেলো। যেমন ডাঙ্গার একটি চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী ছোট পশু কেমন করে লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যবধানে পা ক্রমাগত ছোট ও চেপ্টা হয়ে মুখ ও লেজ ক্রমে সরু ও সূঁচালো হয়ে মাছের মতো দেখতে আজকের তিমিতে পরিণত হলো তা এসব পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের ফসিল থেকে স্পষ্ট হয়েছে। অথবা কোন একটি ছোট ডাইনোসরের ফসিলে দেখা গেলো পাখির ডানা ও পালকের মত চিহ্ন, এবং গলা, মাথা ও লেজে ক্রমে পাখির সাদৃশ্য যা এর পরবর্তী কালের ফসিলগুলোতে আরো পাখি-সদৃশ হয়েছে। বোঝা গেল এই মধ্যবর্তী সময়ে প্রাণীটি ডাইনোসর ও পাখির একটি মিশ্রণের মতই থেকেছে এবং ক্রমে পাখি হয়ে ওঠেছে। অর্থাৎ এই ডাইনোসর প্রজাতিটি থেকেই আজকের পাখি বিবর্তিত হয়েছে– যদিও এসবে সময় লেগেছে বহু মিলিয়ন বছর।

বিবর্তন স্পষ্ট হলেও এর তত্ত্বের বিষয়ে বিজ্ঞানীরা যে সব সময় একমত ছিলেন তা কিন্তু নয়। যেমন ক্যুভীর মনে করতেন পরিবর্তনগুলো হঠাৎ হঠাৎ হয়েছে এক একটি গণবিলুপ্তির পর। এটি ছিল অনেকটা পৃথিবীর পরিবর্তনের বিপর্যয় তত্ত্বের মত। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী কোঁতে দে ব্যুফোঁ বলেছেন সব জীব একই পূর্বপুরুষ থেকে আসেনি, বরং এক এক শ্রেণীর জীব একই পূর্বপুরুষ থেকে ক্রমে নানা দিকে বৈচিত্র লাভ করেছে। যেমন বেড়াল 'ফ্যামিলি'র সব সদস্য– বেড়াল, বনবেড়াল, বাঘ, সিংহ– সবই একটি আদি বেড়াল থেকে এসেছে। তাঁর তত্ত্বে সব স্তন্যপায়ীর জন্য এরকম মোট ৩৮টি আদি পূর্বসূরি ছিল। কিন্তু ওই উনবিংশ শতাব্দী ধরে এগিয়েই বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত একমত হয়েছিলেন যে আদিতে এরকম কোন গোষ্ঠি-বিভক্তি ছিল না। সব জীব একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। কিন্তু ঠিক কীভাবে সে কাজটি ঘটেছে তার বিস্তারিত তত্ত্বে একমত হওয়াটি সহজ ছিলনা– আসছিলো বিভিন্ন তত্ত্বের দেয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়া, যার অধিকাংশই ধোপে টেকেনি। শেষ পর্যন্ত জীব বিবর্তনের যে তত্ত্বটি সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আজো প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা হলো ইংরেজ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব।

বিবর্তনে বংশগতির গুরুত্বঃ

বিবর্তন যেভাবেই ঘটুক তাকে ঘটতে হয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। কাজেই এক প্রজন্মের বৈশিষ্ট পরবর্তী প্রজন্মে কেমন করে যায় সেই বংশগতির (হেরিডিটি) প্রক্রিয়াটি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা। অর্থাৎ সন্তান যে বাবা-মা'র মত হয় সে বিষয়টি বিবর্তন তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তবে কেন সে বাবা মা'র মত হয় সেই প্রক্রিয়াটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিবর্তনের সব তত্ত্বে সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। ডারউইনের সফল তত্ত্বটির আগে উনবিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যামার্কের একটি তত্ত্ব বেশ কিছুকাল গ্রহণযোগ্য থেকেও শেষ পর্যন্ত বর্জিত হয়েছিলো। ল্যামার্কের তত্ত্ব অনুযায়ী কোন জীব যখন নিজের জীবনের তাগিদে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশি ব্যবহার করে তখন তাতে ব্যবহার অনুযায়ী পরিবর্তন আসে এবং সেই পরিবর্তন সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। একই রকম কারণে একই পরিবর্তন সন্তানের ক্ষেত্রেও ঘটে এবং আগেরটুকুর সঙ্গে তা যোগ হয়। এভাবে প্রজন্মান্তরে পরিবর্তনটি বড় ও স্থায়ী হয়। যেমন জিরাফের উদাহরণ দিয়ে ল্যামার্ক বলেছেন ক্রমাগত গাছের ওপরের দিকের পাতা খাবার চেষ্টা করতে গিয়ে জিরাফকে তার গলা বার বার উঁচু করতে হয়েছে,

যার ফলে নিজের জীবদ্দশায় আদি জিরাফের বেঁটে গলা সামান্য লম্বা হয়েছিলো। জিরাফের বাচ্চা বংশগতিতে এই গুণ পেয়ে সেই একটু লম্বা গলা নিয়েই জন্ম নিয়েছে। বাচ্চার নিজের জীবদ্দশায় তার গলা বাড়ানোর ফলে এই গলা তার ক্ষেত্রে আরো লম্বা হয়েছে। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লম্বা হতে হতে আজ জিরাফের গলা এত লম্বা। ল্যামার্কের তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবার কারণ হলো পরে প্রমাণিত হয়েছে যে জীবদ্দশায় কোন জীব যে পরিবর্তন 'অর্জন' করে তা সাধারণত বংশগতিতে যায়না, তাই সন্তানরা সে সব পরিবর্তন জন্মগত ভাবে পায়না। বরং জীব বাবা-মা'র কাছ থেকে বা পূর্বসূরির কাছ থেকে বংশগত ভাবে যে সব গুণ পায় সেগুলোই তার বংশগতিতে থাকে, এবং সেগুলোই শুধু তার সন্তানও জন্মগত ভাবে পেতে পারে। যেহেতু ল্যামার্কের তত্ত্বটি তার ভুল বংশগতির প্রক্রিয়ার ওপর একেবারেই নির্ভরশীল ছিল– জীবদ্দশায় লম্বা হওয়া গলা সন্তানের মধ্যে যাওয়ার ব্যাপারটি– তাই ওই প্রক্রিয়া ভুল প্রমাণিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ল্যামার্কের তত্ত্বটিও ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের ক্ষেত্রে এটি ঘটেনি। সেখানেও বংশগতি প্রাসঙ্গিক, কিন্তু বংশগতির প্রক্রিয়াটি ঠিক কীভাবে ঘটে সেটি খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়। কাজেই ডারউনের অনুসৃত বংশগতির নিয়মটিও পরে ভুল প্রমাণিত হলেও তাঁর তত্ত্বটির ওপর তাতে কোন আঘাত আসেনি। এটি বুঝতে ডারউইনের তত্ত্বটি এক নজরে দেখা যাক। ১৮৫৯ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অরিজিন বা স্পেসিস' (প্রজাতির উৎস) ডারউইন তাঁর যুগান্তকারী এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বে বিবর্তনের প্রক্রিয়াটির নাম দেয়া হয়েছে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে বিভিন্ন বিশেষ বৈশিষ্টধারী কুকুর ইত্যাদি প্রাণী পাওয়ার জন্য ব্রীডাররা (প্রজননকারী) প্রাণীটির নানা বৈচিত্র থেকে একরকম নির্বাচন করেন। উদাহরণ স্বরূপ সব বৈচিত্রের কুকুরের মধ্য থেকে সামান্য পরিমাণেও ওই বৈশিষ্ট আছে এমনগুলোকে বাছাই করেন এবং ওদের মধ্যেই শুধু প্রজনন ঘটান। যেমন খুব দ্রুত দৌড়তে পারে এমন কুকুর পাওয়ার জন্য অন্তত তুলনামূলক ভাবে কিছুটা দ্রুত চলা কুকুরকে প্রজননের উদ্দেশ্যে সাধারণ কুকুরদের থেকে নির্বাচন করেন। বংশগত ভাবেই এদের দৌড় ক্ষমতা বেশি বলে ক্ষমতাটি তাদের বংশগতিতেই (জিন হিসেবে) আছে। বাবা ও মা উভয়ের এটি থাকাতে এভাবে প্রজননকৃত সন্তানদের মধ্যে ক্ষমতাটি আরো একটু বেশি দেখা যায়। এই সন্তানদের মধ্য থেকেও দ্রুততরগুলোকে নির্বাচিত করে শুধু তাদের মধ্যে প্রজনন করা হয়। ফলে পরবর্তী প্রজন্মে দৌড়ের ক্ষমতা আরো বাড়ে। এভাবে বহু প্রজন্ম

পর খুবই দ্রুত দৌড়তে সক্ষম কুকুরের একটি বিশেষ জাত ব্রীডার পেয়ে যান, যেই জাত আগে ছিলনা। এখানে ব্রীডার কৃত্রিমভাবে নিজে নির্বাচন করে এই পরিবর্তন সম্ভব করেছেন।

ডারউইন দেখালেন প্রকৃতিও অনেকটা লটারির মত চান্সের ওপর নির্ভর করে এরকম নির্বাচন করে থাকে। বিশেষ করে কোন পারিবেশিক সংকট যখন দেখা দেয় তখন একই জীবের দলের মধ্যে থাকা সব সদস্যদের বাঁচার জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। তখন ওই দলে ইতোমধ্যে থাকা নানা বৈচিত্রের মধ্যে কোন একটির বিশেষ গুণ হয়তো ওই সংকটে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য বেশি উপযুক্ত হয়, তাদের একটি পারিবেশিক সুবিধা থাকে তখন ওই গুণধারী সদস্যটির বাঁচার সম্ভাবনা অন্যদের থেকে কিছুটা বেশি হয়: বেশি বাঁচার কারণে সেটি সন্তানও দিতে পারে বেশি। সেই সন্তানদের মধ্যেও সেই গুণটি বংশগত ভাবে থাকে বলে পরের প্রজন্মে এই জীবের দলে ওই গুণধারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যায় থাকবে। একই সুবিধা পেয়ে এই সন্তানরাও অপেক্ষাকৃত বেশিদিন বাঁচবে ও বেশি সন্তান দেবে। ফলে পরের প্রজন্মে এই গুণধারীর সংখ্যা আরো বাড়বে। এ ভাবে বহু প্রজন্ম পর গিয়ে পুরো দলটিই এই বিশেষ গুণধারীতে পরিবর্তিত হবে, এবং তার ফলে একটি আলাদা প্রজাতিতেও পরিণত হতে পারে। এখানেও ব্যাপারটি প্রতি প্রজন্মে বাছাই হবার বা নির্বাচিত হবার (সেই গুণধারীগুলো)। কিন্তু এখানে বাছাই করছে প্রকৃতি, আর সেটি করছে অন্ধ ইতস্তত ভাবে; কারো বিশেষ ইচ্ছায় নয়, বা কোন লক্ষ্যের দিকে যাবার জন্য নয় (ব্রীডারের ক্ষেত্রে যেমন দ্রুতগামী কুকুর পাওয়ার লক্ষ্য ছিল)।

দেখা গেল তত্ত্বটি অত্যন্ত শক্তিশালী; জীবজগতের প্রায় সব ঘটনাকে এই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সময় নিয়ে খুব ধীরে একটির পর একটি ইতস্তত এরকম দৈবক্রমে সৃষ্ট পরিবর্তন একের সঙ্গে এক যোগ হয়ে যে কোন জটিল পরিবর্তন সম্ভব হয়ে ওঠে। শুধু তাৎক্ষণিক ভাবে বাঁচার সুবিধাই এই প্রত্যেকটি পর্যায়কে সংঘটিত করে, অন্য কিছু নয়। প্রাথমিক ভাবে বিরোধিতার সম্মূখীন হওয়া সত্ত্বেও দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বিংশ শতাব্দীতে এসে অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণে জীববিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক কোন বিশেষ জাতের কুকুরের বৈশিষ্ট হলো বন্য অবস্থায় এগুলো খুব দ্রুতগামী। তা হলে বুঝতে হবে এর পূর্বপুরুষ কুকুরগুলো স্বাভাবিক বৈচিত্রের মধ্যেই কিছুটা দ্রুতগামী হওয়ায় কোন সংকটে বাঁচার ক্ষেত্রে বেশি সুবিধা

পেয়েছিলো; যেমন দ্রুত ছুটে গিয়ে শিকার ধরতে পারায় সংকটে অন্যদের চেয়ে বেশি দিন বাঁচতে পেরেছিলো। ওদের মধ্যে বংশ পরম্পরায়ে এই গুণটির অধিকতর অধিকারীরা এ সুবিধা আরো বেশি পেয়ে বেশি বংশ বিস্তার করতে পেরেছে বলেই আজ কুকুরের ওই অনেক দ্রুতগামী জাতটি সৃষ্টি হয়েছে– সবই প্রাকৃতিক নির্বাচনে।

ডারউইনের সময় বংশগতির সঠিক তত্ত্ব অনেকের জানা ছিলনা, যদিও ইতোমধ্যে মেন্ডেল নামের একজন যাজক-বিজ্ঞানী অখ্যাত একটি বিজ্ঞান জার্নালে তাঁর 'জিন' ভিত্তিক সঠিক বংশগতির প্রথম তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। ডারউইনেরও সেই সঠিক তত্ত্ব জানা ছিলনা। বরং তিনি নিজে বংশগতির একটি তত্ত্ব দিয়েছিলেন যেটি ভুল। একে বলা হতো প্যানজেনেসিস। এতে ধরে নেয়া হয়েছিলো যে শরীরের সব অঙ্গে গ্যামুল নামের এক ধরনের ক্ষুদ্র কণা থাকে যা সেই অঙ্গের বৈশিষ্ট বহন করে পুরুষের শুক্রকোষে এবং স্ত্রীর ডিম্বকোষে গিয়ে হাজির হয়। কেমন করে তা হয় তার কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা ডারউইনের কাছে ছিলনা। এভাবে বংশগত ভাবে পাওয়া বৈশিষ্ট যেমন করে শুক্র ও ডিম্বকোষে যায়, তেমনি জীবদ্দশায় অর্জিত বৈশিষ্টগুলোও সেখানে যায়। ওই দুই কোষের মাধ্যমে এ বৈশিষ্টগুলো সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বোঝাই যাচ্ছে যে ডারউইনের প্যানজেনেসিসের স্বপক্ষে তেমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ তো ছিলইনা, বরং এও ল্যামার্কের বংশগতির তত্ত্বের মত একই দোষে দুষ্ট। তা সত্ত্বেও এই দোষ তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে স্পর্শ করেনি। প্রাকৃতিক নির্বাচনে যা প্রয়োজন ছিল তা হলো যে সব বৈশিষ্ট সুবিধা পেয়েছে সেগুলোই বংশধরদের মধ্যে বেশি গিয়েছে– এ কথাটি ঠিক থাকা। যেহেতু সংকটের সময় সুবিধা পাওয়া বা না পাওয়া বৈশিষ্টগুলোর প্রায় সবই দলের সাধারণ বৈচিত্রের ভেতর বংশগত ভাবেই কারো কারো থাকতে পারে, তাই ঠিক কীভাবে তা সন্তানদের মধ্যে যাচ্ছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, সন্তানদের মধ্যে গেলেই তা প্রাকৃতিক নির্বাচনে কাজ করবে। এ কারণেই ভুল বংশগতি তত্ত্ব সত্ত্বেও সেটি ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বে সে সময় তেমন কোন ইতর-বিশেষ ঘটায়নি।

শেষ পর্যন্ত বংশগতিতে ডিএনএ'র ভূমিকা আবিষ্কারের পর বোঝা গেছে যে প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক কোষে থাকা ডিএনএ'র মধ্যেই জীবের সকল বৈশিষ্ট কোডের ভাষায় লেখা থাকে। একই ডিএনএ সব কোষের মত শুক্রকোষ আর ডিম্বকোষেও রয়েছে– যেখান থেকে সন্তান তাদের ডিএনএ পায় এবং সেই সূত্রে বাবা মা'র বৈশিষ্টগুলো পায়। ডিএনএর কোডের মধ্যে মিউটেশন নামক

পরিবর্তনগুলো কচিৎ নানা দৈব-ক্রমে ঘটে বলে অতীতের দীর্ঘ বংশগতির মধ্যে বৈশিষ্টের নানা বৈচিত্র দেখা দেয়। আর সেখান থেকেই কোন কোনটি প্রাকৃতিক নির্বাচনে সুবিধা পায়। বংশগতির এই সঠিক তত্ত্ব ডারউইনের তত্ত্বকে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাই শুধু দেয়নি, বরং ডিএনএ'র কোডিং এবং মিউটেশনের ফলে তার পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ নিরিখে প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ও অপ্রতিরোধ্য করেছে। কিন্তু ডারউইনের সময়ও বংশগতির ভুলতত্ত্ব নিয়েও প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রতিষ্ঠিত হতে অসুবিধা হয়নি। এমন ঘটনা বিজ্ঞানের আরো নানা ক্ষেত্রেও ঘটতে দেখা যায়– একটি ভুল শাখা-তত্ত্ব সত্ত্বেও মূলতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

সব তত্ত্ব আদর্শ পদ্ধতিতে প্রমাণযোগ্য নয়

আমরা দেখেছি আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু আদর্শ-স্থানীয় পদ্ধতি রয়েছে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে কিছু আনুমানিক তত্ত্ব খাড়া করে সে অনুমানকে বাস্তব এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণ করেই সেই পদ্ধতি কাজ করে। অবশ্য অনুমানকে সরাসরি প্রমাণ প্রায়শ সম্ভব হয়না। সেক্ষেত্রে ওই অনুমান থেকে যৌক্তিক ভাবে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে ওই ভবিষ্যদ্বণীকেই এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। তবে সব তত্ত্বের ক্ষেত্রে এরকম আদর্শ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হয়না, তার কিছু উদাহরণ আমরা এই অধ্যায়ে দেখেছি। পৃথিবীর পরিবর্তনের নানা তত্ত্বের কথা যখন উঠেছে সেই পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা কিছু অনুমান করতে পারি বটে কিন্তু বাস্তবে ল্যারোরেটরিতে সে রকম পরিবর্তন ঘটিয়ে দেখা কঠিন। তাই পরোক্ষ ননা আলামত দেখেই আমাদেরকে ঠিক করতে হয়েছে বিপর্যয় তত্ত্ব না কি সমতাল পরিবর্তন তত্ত্ব এই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে।

বিবর্তন তত্ত্বের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও আদর্শ পদ্ধতি প্রয়োগের উপায় নেই– অন্তত দীর্ঘকাল ছিলনা। বিবর্তনের পুরো ব্যাপারটিই ঘটেছে অতীতে, এবং সাধারণত অত্যন্ত ধীরে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। ভবিষ্যতে কার বিবর্তন কী হবে সে সম্পর্কে তেমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী করাই যায়না– কারণ এই ব্যাপারটা দৈব চান্সের ওপর নির্ভর করে। তাই বিবর্তনকে অতীতের ফসিল সাক্ষ্য প্রমাণ, বর্তমান নানা জীবের মিল-অমিল ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছে। কাজেই এখানে একটি অনুমান করলাম, তার থেকে একটি ফলাফল ভবিষ্যদ্বাণী করলাম, আর সেই ফলাফলটি বাস্তব এক্সপেরিমেন্ট থেকে পেলাম বলে অনুমানটি সঠিক প্রমাণিত হলো এমনটি হবার সুযোগ নেই। বরং

এর স্বপক্ষে সাক্ষ্যগুলো আলাদা আলাদা ভাবে এসেছে। ফসিলের কথা যদি বলি– যে রকম ফসিল পেলে একটি অনুমান সঠিক হবে সেই ফসিল আমরা চাইলেই পাবনা। বরং দৈবক্রমে হঠাৎ হঠাৎ যে ফসিল আমরা পেয়েছি তার দ্বারাই অনুমানগুলো খাড়াও করেছি, প্রমাণও করেছি।

বিবর্তন তত্ত্বের মত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত হবার পথে উপায় হলো জীববিজ্ঞানের নানা রকম বিচিত্র ঘটনার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব সফল ভাবে প্রয়োগ। যেখানে অন্য কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে প্রাকৃতিক নির্বাচিন যদি তাকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে তা হলেই তত্ত্বটি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মহাদেশীয় মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে গ্যালাপগোস দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটি দ্বীপের চড়ুইয়ের ঠোঁট বৈচিত্র যখন ওখানকার খাদ্যের নিরিখে ব্যাখ্যা করা যায় তখন দেখি প্রাকৃতিক নির্বাচনই সেখানে একমাত্র ব্যাখ্যা। দেখা গেছে যে দ্বীপে চড়ুইয়ের শক্ত ঠোঁট সেখানে একমাত্র খাদ্য শক্ত বাদাম। ঠোঁটের নানা বৈচিত্রের মধ্যে যে ঠোঁট এ বাদাম ভাঙ্গতে পেরেছে তার অধিকারী বেশিদিন বাঁচতে পেরেছে, একই রকম ঠোঁটের সন্তান দিতে পেরেছে। অন্য কোন ব্যাখ্যা এখানে সম্ভব হয়নি। কোন কোন পতঙ্গ কেন দেখতে হুবহু একটি শুকনা কাঠির মত, কোন কোন টিকটিকি কেন হুবহু একটি চেপ্টা, সবুজ, দাগ কাটা গাছের পাতার মত, কোন কোন ফুল কেন হুবহু একটি মৌমাছির মত। এর সব ক'টির ব্যাখ্যা একমাত্র করা যায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে। আক্রমণকারী পাখির থেকে আত্মরক্ষার জন্য অথবা শিকারকে ধরার সময় শিকারটি যেন সাবধান হয়ে না যেতে পারে সে জন্য আত্মগোপন করার সুবিধাটিই কাঠির মত পতঙ্গ বা পাতার মত টিকটিকিকে অধিক বাঁচতে ও সন্তান দিতে সাহায্য করেছে। কাজেই নানা বৈচিত্রের মধ্যে যারা কিছুটা হলেও ওরকম ছিল তারা সুবিধা পেয়ে বংশ বিস্তার করেছে। সন্তানদের মধ্যে যারা আর একটু বেশি ওরকম ছিল তারা পরের প্রজন্মে আরো বেশি সুবিধা পেয়েছে। এভাবে পর পর নানা পর্যায়ে কাঠির বা পাতার সঙ্গে আরো সাদৃশ্য যখন দৈবক্রমে কারো কারো হয়েছে সেই সুবিধা পেয়ে তারা বেঁচেছে আরো বেশি। পুরো ক্যাপারটি ঘটেছে লক্ষ বছর ধরে।

ভারতের বা আরবের উট এককূঁজী, চীনের উট দুইকূঁজী, আবার দক্ষিণ আমেরিকার লামা বা আলপাকা উট একেবারে ছোট ভিন্ন রকমের– ভৌগলিক অবস্থানের সঙ্গে এই রূপ-পার্থক্য কেন? এর উত্তরও একমাত্র দিতে পারে প্রাকৃতিক নির্বাচন। এক অভিন্ন পূর্বসূরি উট নানা দূরবর্তী জায়গায় গিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থানীয় পরিবেশ-সংকটে এক এক জায়গায় এক এক ভাবে

বিবর্তিত হয়েছে। যেখানে যে রকম হওয়াটি সুবিধাজনক হয়েছে সেখানে সেরকমই টিকে থেকেছে বেশি, সন্তান দিয়েছে বেশি– সেই একই বৈশিষ্টধারী সন্তান। শুধু উটের ব্যাপারের নয়, নানা ভৌগলিক অবস্থানে প্রাণীর নানা রকম রূপের ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক নির্বাচন এমনি চমৎকার ভাবে করতে পারে।

এই সব বিবেচনা করলে প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবর্তন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দেরী হয় না। কিন্তু যে ভাবে তা হয় সেটি অনুমান, ভবিষ্যদ্বাণী ও এক্সপেরিমেন্টের আদর্শ নিয়ম নয়। তবে আরো অসংখ্য বিষয় এই তত্ত্বের আওতায় আসার ফলে এবং এর কোন কোনটির বিবর্তন অপেক্ষাকৃত দ্রুত হওয়াতে এখন ধীরে ধীরে সেটিও সম্ভব হয়েছে– আদর্শ পদ্ধতিও এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা গিয়েছে। যেমন পঞ্চাশের দশকে ইংল্যান্ডের অনেক শহরের দালানগুলো ছিল বাড়িতে বাড়িতে কয়লার ধোঁয়ার কারণে কালো রঙের, আর সেই রঙের সঙ্গে নিজেদের রঙ মিলে গেলে আত্মরক্ষায় সুবিধা হতো বলে সে সব শহরে প্রচুর কালচে রঙের মথ পতঙ্গ দেখা যেতো। কিন্তু ওসময় কয়লার ব্যবহার বে-আইনী করা হলে এবং দালানগুলোর বাইরের দিকটা পরিস্কার করে সাদা করা হলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন কালো মথ এখন সাদা দালানের কারণে আত্মরক্ষায় ব্যর্থ হবে এবং ক্রমে সাদাটে মথে বিবর্তিত হবে। মথের পর পর প্রজন্ম গুলো দ্রুত আসায় এবং গায়ের রং পরিবর্তনটি খুব সরল দু'একটি জিনের ব্যাপার হওয়ায় তাঁরা এই বিবর্তন অপেক্ষাকৃত অল্প সময় কয়েক দশকের মধ্যে ঘটবে এমন একটি ভবিষ্যৎদ্বাণী করতে পেরেছিলেন। বাস্তবেও ঠিক তাই হয়েছে। ত্রিশ বছরের মত সময় পরে খোঁজ করে দেখা গেছে এই শহরগুলোতে ব্যাপক ভাবে সাদাটে মথ দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ এরকম বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে আমরা নিজের জীবদ্দশাতেই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি– যেভাবে কালো মথ নতুন পারিবেশিক সংকটে সাদা মথে বিবর্তিত হলো। এখানে কিন্তু অনুমান, যৌক্তিক নির্ণয় এবং বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়ার আদর্শ পদ্ধতিতেই প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বটিকে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। সব তত্ত্বের যা আকাঙ্খা সেই সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা এভাবে আমরা বিবর্তন তত্ত্বকেও লাভ করতে দেখ্ছি এখন– অন্তত: কিছু কিছু ক্ষেত্রে।

এই জিনিসটি এখন আরো সহজে আরো অনেক অল্প সময়ে আমরা দেখতে পারি– বিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করার কাজটিকে। সেটি অবশ্য করতে পারি চোখে দেখা প্রাণীকে নিয়ে নয়– ব্যাকটেরিয়াকে নিয়ে। আসলে আমরা না চাইলেও ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে দ্রুত বিবর্তন ঘটে যায়। ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার

কাজে ব্যবহৃত হয় এন্টিবায়োটিক। এন্টিবায়োটিক ওষুধ বিনা প্রয়োজনে খেলে, অথবা কিছু খেয়ে মাঝপথে খাওয়া ছেড়ে দিলে রোগ হয়তো আপাতত ভাল হয়, কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে এই রোগীর ক্ষেত্রে এই এন্টিবায়োটিকটি ভবিষ্যতে তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে পারে। এমন ঘটার কারণ ব্যাকটেরিয়া দলের মধ্যেও নানা বৈচিত্রে কিছু কিছুর ক্ষেত্রে ওই এন্টিবায়োটিক সহনশীলতার পরিমাণ বেশি থাকে। তাই এন্টিবায়োটিকে বাকি ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হলেও সহনশীলতার গুণ সুবিধা পেয়ে নির্বাচিত হয়ে এগুলো ধ্বংস হয়না, বেঁচে থাকে। এগুলোই পরে বংশবৃদ্ধি করে বলে শিগ্‌গির এই এন্টিবায়োটিকের প্রতি সহনশীল (প্রতিরোধী) ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রাধান্য লাভ করে– এদের মধ্যেও প্রজন্মান্তরে অধিক সহনশীলগুলোই বেশি দেখা দেয়। পরে প্রয়োজনে এন্টিবায়োটিকটি আবার ব্যবহার করা হলে প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়াতে পূর্ণ ওই ব্যাকটেরিয়া দলের ওপর এটি আর কাজ করেনা। এখানেও ব্যাপারটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের– এন্টিবায়োটিক প্রয়োগে ব্যাকটেরিয়ার যে সংকট তাতে সুবিধা পেয়েছে প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়াগুলো। এগুলোই টিকে থেকে বংশবৃদ্ধি করেছে– ফলে সাধারণ ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ায় বিবর্তিত হয়েছে।

এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী বিষয় হলো বিবর্তন যেখানে হাজার বা লক্ষ বছরে হয় এখানে কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে হতে দেখি, কারণ ঘন্টার হিসেবেই ব্যাকটেরিয়ার নতুন প্রজন্ম আসতে পারে। এখানে অনুমান, ভবিষ্যদ্বাণী, এক্সপেরিমেন্ট সব কিছু মিলেই আমরা বিবর্তন তত্ত্বকে হাতেনাতে প্রমাণ করতে পারছি একেবারে নিয়মবাঁধা পদ্ধতিতেই। কাজেই ডারউইনের সময় বিবর্তন তত্ত্বকে যে প্রমাণের পদ্ধতিগত আপত্তির মুখে পড়তে হয়েছিলো, যে কারণে কেউ কেউ এতে সংশয়ও প্রকাশ করতেন, অন্তত এ ক্ষেত্রে সেই অবস্থা আর নেই। কিন্তু এ কথা ঠিক যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাত্রকেই যে এই নিয়মবাঁধা পদ্ধতিতেই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এমন কথা নেই। ক্ষেত্র বিশেষে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার আরো পথ রয়েছে।

চিরায়ত ধারণা ছাড়িয়ে বৈপ্লবিক তত্ত্ব

স্থান ও কালের নতুন ব্যাখ্যা

আমাদের অন্তর্নিহিত ধারণায় ভুলঃ

নিউটনের হাতে পদার্থবিদ্যা যে সুসংহত রূপ লাভ করেছিলো তাতে গতি, মহাকর্ষ, বস্তু, শক্তি এ সবের সুন্দর নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিলো। এরপর থেকে নিউটনীয় ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতেই বিজ্ঞানে এ সবের চর্চা হয়েছে। এই ধ্যান-ধারণার কাঠামোটি ভারি সুন্দর– চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই নিজেদের অন্তর্নিহিত চেতনায় স্থান, কাল ইত্যাদিকে যে ভাবে ধারণ করেন তার সঙ্গে এ কাঠামো দিব্যি মিলে যায়। এই যেমন ধরা যাক সর্বব্যাপ্ত একটি পরম স্থানের (স্পেস) উপস্থিতির ধারণা– যার এপাশ-ওপাশ, সামনে-পেছন, ওপর-নিচ এই তিন মাত্রা আমাদের বোধেরই অন্তর্ভুক্ত। তেমনি আছে একটি চিরন্তন কাল-স্রোতের ধারণা– অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে যা এক-রৈখিক, এর একটিই মাত্রা। এই স্থান আর এই কালে যত কিছু রয়েছে তাদের যত নড়াচড়া, যত পরিবর্তন তাতে ওই পরম স্থান আর পরম কালের কিছুই ইতর বিশেষ ঘটেনা; স্থান ও কাল তাদের চিরায়ত অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা নিয়ে বিরাজ করে। কাজেই নিউটনীয় গতিবিদ্যার বা পুরো পদার্থবিদ্যার সঙ্গে নিজের চিন্তাকে খাপ খাইয়ে নিতে পরবর্তী বিজ্ঞানীদের তো নয়ই, সাধারণ মানুষেরও বড় একটা অসুবিধা হয়নি।

তেমনি বস্তু ও শক্তি সম্পর্কেও এরকম সুপ্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো যা আমাদের সাধারণ বোধের অতীত কিছু নয়। বস্তুকে এক রকম কণার ভিত্তিতে আর শক্তিকে তরঙ্গের ভিত্তিতে দেখতে চিরায়ত পদার্থবিদ্যা অভ্যস্ত হয়েছে, এবং আমাদের বোধশক্তির কাছে তা বেমানান ছিলনা। বিজ্ঞানীরা এরই কাঠামোর মধ্যে থেকেই পরবর্তী সব উন্নয়ন সম্পন্ন করেছেন, একে আরো চমৎকার রূপ দিয়েছেন। হাজার বছরের বিজ্ঞান-চেষ্টা যেন নিউটনীয় পর্যায়ে এসে স্থিত হয়েছিলো, এবং একটি চিরায়ত রূপ লাভ করেছিলো– ক্ল্যাসিকাল, ধ্রুপদী, সুষমামণ্ডিত এসব অর্থেই চিরায়ত।

আঠারো শতকের শেষের দিকে এসে বিজ্ঞানের এই সুবিধাজনক অবস্থানটি বাধা পেলো; এমন বাধা যে তা চিরায়ত পদার্থবিদ্যার জন্য রীতিমত সংকট সৃষ্টি করলো। এ সংকট কোন একটি শাখা-তত্ত্বকে একটুখানি বদলে নিয়ে নিরসণ

হবার নয়, পুরো চিরায়ত ধ্যান-ধারণাগুলোকেই মৌলিক ভাবে না বদলিয়ে এর সমাধান সম্ভব নয়। তাই মৌলিক পরিবর্তনই আসলো। কিন্তু আমাদের সাধারণ বোধে প্রকৃতি যে ভাবে ধরা পড়ে তার সঙ্গে ওই মৌলিক ভাবে বদলানো ধারণা মোটেই মিল্‌তে চাইলোনা। অথচ বিজ্ঞানে সূক্ষ্মতর এক্সপেরিমেন্টে এই নতুন বৈপ্লবিক তত্ত্বগুলোই প্রমাণিত হয়েছে। চিরায়ত বিজ্ঞানের বাইরের এবং বোধশক্তির বাইরের এসব ধারণা মেনে না নিয়ে তাই উপায় থাকলোনা। বোঝা গেলো আমাদের সাধারণ যে বাস্তবতা, সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা তার চেয়ে আরো অনেক গভীরে– যা ওই সব সূক্ষ্ম এক্সপেরিমেন্টে ধরা পড়ছে ওই বোধশক্তির কাছেই। এমনি একটি বিপ্লব এসেছে স্থান ও কাল সম্পর্কে আমাদের ধারণায়; প্রথমে সেটিকেই দেখা যাক।

আলো যে একটি বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ যেটি দেখিয়েছিলেন ১৮ শতকের বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। পরে এই তত্ত্বের নানা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে আলোর বা অন্য যে কোন বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের (রেডিও তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, আলট্রাভায়োলেট, এক্স'রে, গামা'রে ইত্যাদি) গতিবেগ ও অন্যান্য প্রকৃতির সঙ্গে নিউটনের গতিবিদ্যা যেন ঠিক খাপ খাচ্ছেনা। যেমন আলো সহ সব বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের গতি একই, এবং নানা পরিস্থিতিতেও তার বেগ সব সময় একই থাকার আলামত তাত্ত্বিক হিসেবে দেখা যাচ্ছিলো। বিষয়টি আরো গুরুতর হয়ে উঠলো যখন এক্সপেরিমেন্টেও এমনটিই দেখা গেল।

আলবার্ট মাইকেলসন ও এডওয়ার্ড মর্লি নামের দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানী ১৮৮৭ সালে একটি এক্সপেরিমেন্ট করলেন যা মাইকেলসন-মর্লি এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। পৃথিবী প্রবল বেগে যে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে সেদিকে আলো ছুঁড়লে পৃথিবীর গতি যোগ হয়ে আলোর গতি বাড়ার কথা। সেদিকে আলো না ছুঁড়ে যদি পৃথিবীর গতির সমকোণের দিকে আলো ছোঁড়া হয় তা হলে আগেরটির থেকে তার গতি কম হবার কথা। চিরায়ত গতিবিদ্যায় এমনটি হওয়া অবধারিত। কিন্তু খুব সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে বার বার এক্সপেরিমেন্ট করেও তাঁরা এই দুই বেগের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যও খুঁজে পেলেন না– উৎসের (এবং গ্রাহকের) গতি নির্বিশেষে আলোর গতি একই পাওয়া গেলো। চিরায়ত পদার্থবিদ্যার এই সাধারণ নিয়মগুলো আলোর এবং অন্যান্য বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের ক্ষেত্রে ভেঙ্গে পড়লো। পরবর্তী বছরগুলোতে আরো অনেক বিজ্ঞানী আরো সূক্ষ্ম ভাবে এক্সপেরিমেন্ট করে একই ফল পেলেন। এটি ছিলো চিরায়ত পদার্থবিদ্যার জন্য একটি বড় সংকট।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইন আবিষ্কার করলেন এই সংকট আসলেই গুরুতর– কারণ এটি সময় সম্পর্কে আমাদের চিরকালীন ধারণাকেই তছনছ করে দিতে বসেছে। একটি উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটি দেখা যাক। একটি চলন্ত ট্রেনের এক কামরার দুই প্রান্তে দু'জন মানুষ মুখোমুখি বসেছেন– একজনের মুখ ট্রেনের চলার দিকে অন্যজনের পিঠ সেই দিকে। তাঁদের দু'জনের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে একটি বৈদ্যুতিক বাতি নেভানো অবস্থায়। যেই মুহূর্তে বাতিটি জ্বল্‌লো, মুখোমুখি বসা দুই মানুষ তা দেখা মাত্র যার যার সামনের বোতাম টিপে সেই মুহূর্তটি রেকর্ড করলেন। কামরার ভেতরে থাকা দর্শক দেখলেন তাঁরা দু'জন ঠিক 'এক সঙ্গে' বোতাম টিপেছেন, কারণ বাতি থেকে সমান দূরত্বে থাক দু'জনের কাছে আলো একই সময়ে পৌঁছেছে। মাইকেলসন-মর্লি এক্সপেরিমেন্ট অনুযায়ী ট্রেনের গতির কারণে আলোর গতিতে কোন হেরফের হয়নি বলে দু'জনে কাছে একই গতিতে একই সময়ে আলো পৌঁছেছে। ট্রেনের বাইরে স্টেশনে দাঁড়ানো অন্য এক দর্শক কিন্তু দেখলেন ভিন্ন রকম। তিনি দেখলেন ট্রেনের চলার দিকে মুখ করে থাকা মানুষটি যেহেতু বাতি থেকে রওয়ানা হওয়া আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তাই আলো তাঁর কাছে একটু আগে পৌঁছলো। তিনি তাই বোতাম টিপলেন একটু আগে। অন্যদিকে ট্রেনের চলার দিকে পিঠ দিয়ে থাকা মানুষটি যেহেতু বাতি থেকে রওয়ানা হওয়া আলোর থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন তাই তাঁর কাছে আলো একটু পরে পৌছলো। তিনি তাই বোতাম টিপলেন একটু পরে। বাইরের দর্শকের কাছ তাই দুজন মানুষ 'একসঙ্গে' বোতাম টেপেন্‌নি। স্পষ্টত দুটি ঘটনা (দু'জনের বোতাম টেপা) এক সঙ্গে ঘটেছে কি ঘটেনি সব দর্শক সে ব্যাপারে এক মত হচ্ছেন না; পরস্পরের সঙ্গে গতিতে থাকা দু'জন দর্শক এই ব্যাপারে ভিন্ন মত দিচ্ছেন।

অথচ বিজ্ঞান চিরকাল বলে এসেছে দুটি ঘটনা এক সঙ্গে ঘটলে তা সবার কাছেই, সব অবস্থায় থাকা দর্শকের কাছে একই সঙ্গে ঘটছে– কারণ কাল-প্রবাহের পরম স্রোতে ঘটনা দুটি একই মুহূর্তে সুনির্দিষ্ট। বোঝাই যাচ্ছে বর্তমান উদাহরণে এর ব্যতিক্রমটি হচ্ছে ট্রেনের গতি আলোর গতিকে পরিবর্তন না করার কারণে। আলোর গতির সঙ্গে চিরায়ত পদার্থবিদ্যার ধারণামত যদি ট্রেনের গতি যোগ হতো তা হলে ট্রেনের বাইরের দর্শকের কাছে ট্রেনের দিকে পিঠ দিয়ে বসা ব্যক্তিটির কাছে আসতে বাতির আলোকে বেশি জায়গা ভ্রমণ করতে হলেও আলো যেহেতু দ্রুততর বেগে আসতো তাই তার কাছেও এটি চলার দিকে মুখ দিয়ে বসা ব্যক্তির সঙ্গে একই সময়ে আসতো। তা হলে ট্রেনের ভেতরের ও

বাইরের উভয় দর্শকই দুটি ঘটনা এক সঙ্গে ঘটছে বলে দেখতেন– চিরায়ত বিজ্ঞান যা আশা করে। এখানে আলোর গতিবেগ সব অবস্থাতে একই থাকার ব্যাপারটি সবার কাছে এক সঙ্গে ঘটার বিষয়টিকেই শুধু নয়, পরম স্বাধীন কাল-স্রোতের বিষয়টিকেও তছনছ করে দিলো।

অবশ্য উপরের উদাহরণটি ছিল একটি কাল্পনিক এক্সপেরিমেন্টের– ট্রেনের বেগ আলোর বেগের থেকে অনেক অনেক কম (মনে রাখতে হবে আলোর বেগ সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার!)। তাই ট্রেনের বাইরের দর্শকের কাছে দু ব্যক্তির বোতাম টেপার মধ্যে সময়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা তিনি টেরই পাবেন না। কিন্তু ট্রেনটি যদি আলোর গতির কাছাকাছি বেগে চল্‌তো – যেমন সেকেন্ডে এক লক্ষ কিলোমিটার– তা হলে বাইরের দর্শক সত্যি দেখতেন এক জন বোতাম টেপার অনেক্ষণ পর অন্যজন বোতাম টিপেছে। অবশ্য চলার জিনিসটি ট্রেন হবার প্রয়োজন নেই। আলোর গতির কাছাকাছিতে যদি আমার আপেক্ষিকে কোন কিছু চলে তাহলে সেখানকার অনেককিছু আমি অদ্ভুতভাবে দেখবো। কারণ আইনস্টাইন দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের কাছে এই অদ্ভুত ব্যাপারগুলোই সত্য, আমরা আগে যা ভাবতাম তা সত্য নয়। আপেক্ষিক গতিতে থাকার সময় এমন হয় বলে তাঁর তত্ত্বটিকে বলা হয় আপেক্ষিক তত্ত্ব (থিওরি অফ রিলেটিভিটি)।

ওই অদ্ভুত ব্যাপারের আরেকটি দিক হলো কাল-স্রোত স্বাধীন ভাবে প্রবাহিত হয় এবং সবার কাছে তার গতি একই– একথা ভুল প্রমাণ হওয়া! আইনস্টাইন দেখালেন কোন কিছু যদি আমার আপেক্ষিকে গতিমান হয় তা হলে আমার কাছে সেখানকার সময়ের গতি অপেক্ষাকৃত ধীর মনে হবে, অর্থাৎ সেখানকার ঘড়ি 'স্লো' মনে হবে। এর কারণও ওই একই– মাইকেল-মর্লি পরীক্ষার ফল, আলোর গতি সব সময় এক থাকা। এটি সহজে বোঝার জন্য আমরা একটি অতি সরল ঘড়ি কল্পনা করি। ঘড়িটিতে রয়েছে ১০-১২ সেন্টিমিটার ব্যবধানে দুটি মুখোমুখি সমান্তরাল আয়না, আর আলোর একটি কণা আয়না দুটির সঙ্গে লম্বভাবে থেকে ক্রমাগত একবার একটিতে এবং তারপর অন্যটিতে প্রতিফলিত হয়ে সময় রক্ষা করছে (আধুনিক বিজ্ঞানে আলোকে এরকম কণার সমষ্টি হিসেবে দেখা যায়)। এই ঘড়িটির আমরা নাম দিই 'আলোঘড়ি'। ধরা যাক আমার টেবিলের ওপর রাখা এই আলো ঘড়ির পাশ দিয়ে আরেকটি আলোঘড়ি দ্রুত বেগে চলে গেলো। এখন এই চলন্ত আলোঘড়ির আলো কণাটিকে যদি আমি দেখতে পেতাম তা হলে দেখতাম গতির কারণে ওটি আয়নার থেকে লম্ব ভাবে প্রতিফলিত হবার বদলে তার গতির দিকে তেরচা ভাবে গিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে তার

তুলনায় আমি স্থির আছি বলে এটি আমার কাছেই মনে হবে। ওই চলন্ত ঘড়ির সঙ্গে যদি কেউ থাকতেন তাঁর কাছে মনে হতো তিনি স্থির আছেন আমার টেবিল সহ আমিই চলছি। তাই তাঁর কাছে তাঁর ঘড়ির আলো কণা লম্বভাবেই আয়নাতে প্রতিফলিত হচ্ছে বলে মনে হতো। আমার কাছে অবশ্য মনে হবে তাঁর ঘড়ির কণা তেরচা গিয়ে প্রতিফলিত হতে বেশি জায়গা অতিক্রম করছে, এবং সমান বেগে তা করতে গিয়ে বেশি সময় নিয়েছে। কাজেই এই আলোঘড়ি, আমার আলোঘড়ির থেকে ধীরে সময় রাখছে, অর্থাৎ এটি আমারটির থেকে 'স্লো'।

চলন্ত ঘড়ি এভাবে স্লো হবার ব্যাপারটি শুধু আলোঘড়ির ক্ষেত্রেই ঘটবে এমন কোন কথা নেই। ধরা যাক ওই চলন্ত আলোঘড়ির সঙ্গে চলন্ত একটি হাতঘড়িও আছে। আমরা দেখাতে পারি আমার কাছে ওই হাতঘড়িটিও স্লো মনে হবে। ধরা যাক ওই দুটি ঘড়ি চলন্ত হয়েছে সমগতিতে একই দিকে মসৃণভাবে চলমান একটি ট্রেনের মধ্যে রয়েছে বলে। ওই ট্রেনের কামরার সব জানালা বন্ধ, তাই তার ভেতরের মানুষরা বুঝতে পারছেননা যে তাঁরা চলছেন (গ্যালিলিও আবিস্কার করেছিলেন এমন মসৃণ গতিতে চল্‌লে আমরা অন্য জিনিসের আপেক্ষিকেই শুধু নিজেকে স্থির বা চলন্ত মনে করতে পারি)। ট্রেনের ভেতরের আলোঘড়ি ও হাতঘড়ি যদি একই লয়ে সময় না দেয় সেখান থেকেই ট্রেনের লোকরা বুঝে ফেলবে যে ট্রেনের গতি আছে– কিন্তু মসৃণ গতিতে চলা অবস্থায় তাঁদের সেটি বুঝতে পারার কথা নয়। কাজেই এই বুঝতে না পারার নিয়ম মানতেই হাতঘড়ি ও আলোঘড়িকে একই লয়ে চলতে হবে। স্থির থাকা আমার কাছে– ট্রেনের আলোঘড়ি যেমন স্লো মনে হবে, হাত ঘড়িকেও ঠিক অনুরূপ পরিমাণেই স্লো মনে হবে; যে কোন ঘড়িকেই তা মনে হবে। স্লো হবার জন্য প্রচলিত অর্থে ঘড়ির মত কিছুর প্রয়োজন নেই, সময়ের সঙ্গে বদলানো যে কোন জিনিসের বদলানোর হার কমে যাবে– যেমন মানুষের বয়সও (দেহঘড়ি) ধীরে বাড়বে! এভাবে সব কিছুর স্লো হওয়াকে বলা হয় গতির ফলে সময়ের প্রসারণ (টাইম ডাইলেশন)। অবশ্য এসব বাইরে যে স্থির আছে তার কাছ মনে হবে– ট্রেনের মধ্যে যে আছে তার কাছে নিজের ঘড়িও স্লো হবেনা, নিজের বয়সও ধীরে বাড়বেনা– সবই স্বাভাবিক থাকবে।

কিন্তু এখানে একটি অদ্ভুত ব্যাপার আছে যার নিরসণ প্রয়োজন। আমার কাছে মনে হচ্ছে ওই ট্রেনটি তার ঘড়ি সহ চলছে, তাই সেই ঘড়ি আমারটির থেকে স্লো চল্‌ছে। কিন্তু ট্রেনের ভেতরের লোক যদি আমার দিকে তাকান তাঁর কাছে মনে হবে তাঁরা স্থির আছেন আমিই চল্‌ছি, তাই তাঁদেরটির তুলনায় আমার ঘড়িই স্লো

চল্‌ছে– সব মসৃণ গতিইতো আপেক্ষিক। এটি হতে পারেনা, তাঁর ঘড়ি স্লো চল্‌লে আমার ঘড়ি তাঁরটি থেকে ফাস্ট চলা উচিত– উভয়ে উভয়ের থেকে স্লো হওয়াটি যুক্তিসম্মত নয়। আমরা এর নিরসন করবো এটি প্রমাণ করে যে উভয়ে উভয়ের তুলনায় চল্‌ছে একথা ঠিক নয়, একজন সত্যি স্থির থাকছে, শুধু অন্য জন সত্যি চল্‌ছে– এবং তার ঘড়িই স্লো হচ্ছে। তার তুলনায় অন্য জনের ঘড়ি ফাষ্টই থাকছে।

প্রমাণটি বোঝার সুবিধার জন্য মনে করি আমরা দু'জনেই মহাশূন্যে পৃথক দুটি রকেটে আছি, আপাতত রকেট বন্ধ বলে পরস্পরের সঙ্গে আপেক্ষিক মসৃণ গতিতে চলছি, সমবেগে সরল রেখায়। আমি মনে করছি তিনি চলছেন আমি স্থির আছি, তিনি মনে করছেন তিনি স্থির আছেন আমি চল্‌ছি। দুজনেই তত্ত্ব অনুযায়ী অন্য জনের ঘড়ি স্লো মনে করছি। কিন্তু এটি প্রমাণ করতে হলে দুই ঘড়িকে এক জায়গায় এনে উভয়ের তুলনা করতে হবে। এটি করতে হলে হয় আমাকে তাঁর কাছে যেতে হবে অথবা তাঁকে আমার কাছে আসতে হবে– ধরা যাক্ আমিই তাঁর কাছে যাচ্ছি। এজন্য আমার রকেট চালু করে আমার গতি বাড়াতে হবে, হয়তো দিকও পরিবর্তন করতে হবে তাঁকে ধরার জন্য। এটি করার মানে হলো ত্বরণ সৃষ্টি, আর তা করলেই আমি বুঝে ফেলবো যে আমি স্থির নই, গতিমান। মসৃণ গতি থাকলেই শুধু নিজেকে অপরের তুলনায় স্থির মনে করা যায়, নইলে নয়। (যেরকম আমার ট্রেন যদি গতি বাড়ায় বা বাঁক নেয় তা হলে কখনো আমি ভাবতে পারবোনা যে আমি স্থির আছি)। এভাবে গিয়ে আমি যখন অপর জনের ঘড়ির সঙ্গে নিজের ঘড়ি মেলাবো তখন তার তুলনায় আমি গতিমান একথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়াতে তাঁর কাছে আমার ঘড়িটিই স্লো হবে, আমার কাছে তাঁরটি নয়। কাজেই অযৌক্তিকতাটি থাকবেনা। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দুজনের ঘড়িকে মেলাচ্ছি ততক্ষণ পরস্পরের ঘড়িকে স্লো বলাতে দোষ নেই। পরস্পর দেখা না করে ফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘড়ি মেলালেও যে অন্য ভাবে একই ঘটনা ঘটবে সেটি প্রমাণ করা যায়।

আগে যা বলেছি, সে রকম গতিমান জিনিসটির গতিবেগ আলোর বেগের কাছাকাছি না হলে ঘড়ি স্লো হওয়ার ব্যাপারটি এত সামান্য হয় যে তা টের পাওয়া যাবেনা। কাজেই যে সব কাল্পনিক উদাহরণ নেয়া হয়েছে সেখানে ট্রেনের গতি এমন কিছু হবেনা যে সেভাবে সত্যিকার এক্সপেরিমেন্ট করলে টের পাওয়া যাবে; এমন কি রকেটের বেগও তার জন্য যথেষ্ট হবেনা। অবশ্য প্রমাণটি হাতেনাতে মিলেছে ক্ষুদ্র মৌলিক কণিকার ক্ষেত্রে, যেখানে গতিবেগ আলোর

গতির কাছাকাছি। যেমন মিউয়ন নামে একটি মৌলিক কণিকা ল্যাবোরেটরিতে স্থির অবস্থায় থাকার সময় এক সেকেণ্ডের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ একটি বিশেষ সময়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যে সময়টিকে বলা হয় তার আয়ুষ্কাল। কিন্তু এই মিউয়নই আবার যখন শক্তিশালী কণিকা ত্বরক যন্ত্রে আলোর গতির খুব কাছাকাছি গতিতে ছুটে যায় তখন তার আয়ুষ্কাল অনেক বেড়ে যায়– আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী ক্ষয়ক্রিয়া (ঘড়ির তুল্য) যতখানি স্লো হওয়া উচিত ঠিক ততখানি। এভাবে আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী গতির ফলে সময়ের প্রসারণটি হাতেনাতে হুবহু প্রমাণিত হয়েছে। আজকাল আমরা স্মার্ট ফোনের সঙ্গে থাকা জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) দেখে নিজের অবস্থান হুবহু জানতে পারি। সেটি সম্ভব হয় বেশ কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে আমাদের ফোনে সিগন্যাল পাঠনো হচ্ছে বলে। কিন্তু উপগ্রহ অত্যন্ত দ্রুত বেগে চলে বলে তার ঘড়ি স্লো হওয়াটি এক্ষেত্রে হিসেবের মধ্যে আনতে হয়, নইলে আমাদের অবস্থান নির্ণয়ে ভুল হবে। এর বিস্তারিত আমরা পরের অধ্যায়ে দেখবো। বোঝাই যাচ্ছে অন্তত এ ধরনের অনেক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক তত্ত্বের সময়ের প্রসারণটি দৈনন্দিন কাজকেও প্রভাবিত করছে।

আপেক্ষিক তত্ত্বে গতির ফলে সময় যে রকম প্রসারিত হয়, স্থান তেমনি সংকোচিত হয়– উভয়ে আসলে এক সুত্রে গাঁথা। ধরা যাক আমি আমার নতুন গাড়িটি স্থির রেখে সামনে থেকে পেছনের কিনারা পর্যন্ত ফিতা দিয়ে তার দৈর্ঘটি মেপে ফেল্‌লাম যা পেলাম ১০ ফুট। তারপর গাড়িটি সমান বেগে জোরে চালিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা আমার বন্ধুর পাশ দিয়ে চলে গেলাম। বন্ধু ঠিক করেছিলো যে আমার গাড়ির দৈর্ঘ ঠিক ওসময় সেও মাপবে। যেহেতু চলন্ত গাড়িকে ফিতা দিয়ে মাপতে পারবেনা তাই সে একটু কৌশলে তা মাপলো। আমার গাড়ির সামনের কিনার যখন তার পর্যন্ত পৌঁছেছে তখন সে নিজের ঘড়িতে সময়টি রেকর্ড করলো, তারপর যখন পেছনের কিনারা পৌঁছনো তখনো সময় রেকর্ড করলো। এই দুই সময়ের যে ব্যবধান গাড়িটি পার হতে তত সময় লেগেছে। গাড়ির বেগকে এই সময় দিয়ে গুণ করলে গাড়ির দৈর্ঘটি বের হয়ে গেলো। কিন্তু সমস্যা হলো বন্ধু এভাবে আমার গাড়ির দৈর্ঘ পেলো তা আমার মাপা ১০ ফুট থেকে কিছুটা কম। এর কারণ আমার আপেক্ষিকে গতিমান বলে আমার কাছে আমার ঘড়ির তুলনায় তার ঘড়ি স্লো। কাজেই সে যে সময় দিয়ে গুণ করেছে সেটি স্লো হওয়া ঘড়ির কম সময়– দৈর্ঘটিও সে তাই কম পেয়েছে। এটিই গতির

ফলে স্থানের সংকোচন। গাড়ির ক্ষেত্রে বাস্তবে এ পার্থক্য দেখা সম্ভব না হলেও আলোর গাতির কাছাকাছি গতির জিনিসে এটি সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

আরো দেখা যায় আলোর গতির একেবারে কাছে চলে আসতে থাকলে স্থান একেবারেই সংকোচিত হতে হতে ঠিক আলোর গতিতে একেবারে শূন্যে পরিণত হবে। যেহেতু সেটি অসম্ভব, তাই আলোর গতিতে চলাটিও অসম্ভব। আলোর গতিই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতি। যদি এর চেয়ে বেশি বেগ সম্ভব হতো তা হলে সময়ের গতি স্লো হতে হতে একেবারে স্থির হয়ে এবার উল্‌টো দিকে অর্থাৎ অতীতের দিকে চল্‌তে আরম্ভ করতো! আলোর বেগের চেয়ে বেশি বেগ সম্ভব নয় বলে এভাবে অতীতের দিকে ভ্রমণও সম্ভব নয়।

গতির সঙ্গে সঙ্গে কালের প্রসারণ ও স্থানের সংকোচন একটি জিনিস স্পষ্ট করে দিলো। চিরকাল আমরা যে মনে করে এসেছি পরম স্থান ও পরম কাল আমাদের বাইরে আমাদের থেকে একেবারে স্বাধীন ভাবে বিরাজমান তা ঠিক নয়। কে মাপছে তার গতির ওপর নির্ভর করে এটি এক এক গতি-কাঠামোতে এক এক রকম। পরম স্থান বলে কিছু নেই, পরম কাল বলেও কিছু নেই– যতই ওই ধারণাগুলো আমাদের মজ্জাগত হোক না কেন।

স্থান এবং কাল অভিন্ন জিনিসঃ

স্থান ও কাল দুটি ভিন্ন জিনিস হিসেবেই চিরকাল বিজ্ঞানীদের কাছে পরিগণিত– আমাদের কাছেও। কিন্তু এদের একটি সংকোচন অন্যটির প্রসারণের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা হওযাতে দেখা গেলো যে এরা একের সঙ্গে অন্যটি বিনিময়যোগ্য। একটি উপমা দিয়ে ব্যাপারটি বোঝা যাক। রাস্তার পাশাপাশি লেইন দিয়ে কয়েকটি গাড়ি ঘন্টার ৫০ মাইল বেগে সোজা দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে যাচ্ছে এমন মনে করা যাক। শুরুর লাইন থেকে শেষের লাইন পর্যন্ত যেতে এদের সবার সমান সময় লাগবে। এখন এক পাশের লেনে থাকা গাড়িটি যদি সোজা না গিয়ে একই বেগে কিছুটা পূর্বদিক করে কোণাকুণি ওই একই সমাপ্তি লাইনে গেল। তা হলে সেখানে পৌঁছতে সেই গাড়ির কিছু বেশি সময় লাগবে, পথটি একটু দীর্ঘতর হওয়াতে। ব্যাপারটিকে এভাবে দেখা যায়– ৫০ মাইলের বেগের পুরোটাকে উত্তর দিকে যেতে ব্যয় না করে গাড়িটি তার খানিকটা পূর্ব দিকে যেতে ব্যয় করেছে। তাই উত্তর দিকের বেগ ৫০ মাইলের কম হওয়াতে তার সময় বেশি লেগেছে। এর মানে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম এই দুই মাত্রায় গড়া তলের ওপর দিয়ে চলা গাড়িটি এক মাত্রার গতিকে অন্য মাত্রার গতির সঙ্গে

বিনিময় করেছে। এরকম বিনিময় সম্ভব হয়েছে স্থানের এই দুই মাত্রার প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য না থাকায় উত্তর-দক্ষিণ আমাদের কাছে যে রকম পূর্ব পশ্চিমও সে রকম জিনিস।

আপেক্ষিক তত্ত্বে স্থানের সংকোচন ও কালের প্রসারণও এক সূত্রে গাঁথা থাকায় দেখা যায় স্থানের মাত্রার সঙ্গে কালের মাত্রাকেও এভাবে বিনিময় করা যায়। এর মানে স্থান যে রকম জিনিস কালও সে রকম জিনিস– উভয়ে একই জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা। আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণ করলো যে দুয়ে মিলে অভিন্ন জিনিসটি হলো স্থান-কাল (স্পেস-টাইম)। স্থানের তিন মাত্রার সঙ্গে (উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম ও ওপর-নিচ) কালের এক মাত্রা একাকার হয়ে মোট চার মাত্রার এই স্থান-কাল, যেখানে স্থানের সঙ্গে কালের মৌলিক কোন প্রভেদ নেই। এগুলো আমাদের বোধশক্তির কাছে তো বটেই চিরায়ত বিজ্ঞানের কাছেও একেবারেই অদ্ভুত কথা, কিন্তু প্রমাণিত সত্য। যে কোন কিছু তার গতির মধ্যে কালের বদলে স্থান অথবা স্থানের বদলে কাল দিয়ে বিনিময় করতে পারে। আগের ধারণামত সেই স্বাধীন পৃথক স্থান এবং স্বাধীন পৃথক কাল আর রইলোনা।

ব্যাপারটি খুব চমৎকার এক ভাবে দেখা যায়। এদিক থেকে মনে করা যায় যে সব কিছু স্থান-কালের মধ্যে আলোর গতিতে চল্‌ছে। মনে করি আমার ঘড়িটি আমার টেবিলে স্থির রয়েছে এবং যথারীতি সময় দিচ্ছে। স্থানের মাত্রায় এর কোন গতি নেই। স্থান-কালে এর যে আলোর গতির সমান গতি তার পুরোটাই চালু রয়েছে শুধু কালের মাত্রায়। এখন ধরা যাক ঘড়িটি আমার আপেক্ষিকে চলতে আরম্ভ করেছে। তা হলে এর বেগের কিছুটা এখন স্থানের মাত্রায় চলে গেছে, ফলে কালের মাত্রায় বেগ কমে গেছে– অর্থাৎ ঘড়িটি স্লো হয়েছে। স্থানে যত বেশি বেগ এভাবে চলে যাবে অর্থাৎ স্থানিক বেগ যত বাড়বে কালের মাত্রায় ঘড়িটি ততই স্লো হবে। পুরো বেগটাই যখন স্থানের মাত্রায় চলে যাবে, তখন ঘড়িটি বন্ধ হয়ে যাবে– কালের মাত্রায় এর কোন বেগ থাকবেনা। অন্যদিকে পুরো বেগ স্থানে চলে যাবার মানে হলো এর স্থানিক বেগ আলোর বেগের সমান হওয়া (এ ক্ষেত্রে যদিও সম্ভব নয়)। আমরা দেখছি এর সবই আপেক্ষিক তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এসব হবার জন্য জিনিসটিকে প্রচলিত অর্থে ঘড়িই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। জিনিসটি যদি আলো হয় তবে কী হবে? আলোকে তো সব সময় সেই সুনির্দিষ্ট আলোর বেগে চলতে হয়। তার মানে স্থান-কালে তার সব বেগ সব সময় শুধু স্থানে। কালের মাত্রায় আলো মোটেই চলতে পারেনা তাই আলো কখনো স্থির থাকতে পারেনা, আলোর বেগের চেয়ে কম বেগেও চলতে

পারেনা। কালের মাত্রায় চলতে না পারার মানে হলো আলোর বয়স কখনো বাড়েনা। সুদূর গ্যালাক্সি থেকে কোটি কোটি বছর পথ চলে যে আলো সদ্য পৃথিবীতে এসে পড়লো যাত্রাশুরুতে সে যা ছিল এখনো তাই আছে, তার বয়স বাড়েনি! এ ক্ষেত্রেও আলো অনন্য।

যা জানলাম তার সবই আমাদের ধারনার জন্য খুবই অদ্ভুত ব্যাপার বটে, তবে অবাক হবার বিষয় আরো আছে। আপেক্ষিক তত্ত্বের একই রকম যুক্তিতে দেখা যায় গতির সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর ভর বাড়ে। গতির সঙ্গে শক্তি (এনার্জি) জড়িত বলে দেখা যায় শক্তিকে ভরে পরিণত হওয়া হিসেবে। আপেক্ষিক তত্ত্ব ভর ব্যাপারটিকে এভাবে দেখিয়েছে যে শক্তি ও ভর একই জিনিস– কত ভর কত শক্তিতে পরিণত হতে পারে সেটি আইনস্টাইন প্রকাশ করেছেন তাঁর সুপরিচিত সমীকরণের মাধ্যমে: $E=mc^2$। এতে E মানে শক্তি, m মানে ভর আর c মানে আলোর গতিবেগ। যেহেতু c এর মান খুবই বড়, c^2 আরো বিশাল, তাই খুব সামান্য ভরও যদি শক্তিতে পরিণত হয় তা হলে তা প্রচণ্ড শক্তি হয়। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট হিরোশিমায় ফেলা এটম বোমে এবং পরবর্তী সব নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনে এটিই ঘটেছে। সূর্যের বা তারার অভ্যন্তরে এভাবে ভরের বিনিময়ে প্রচন্ড শক্তি তৈরি হচ্ছে– যেভাবে আপেক্ষিক তত্ত্বের সমীকরণে রয়েছে ঠিক সে ভাবে, সেই পরিমাণে। কাজেই এসব নেহাৎ তাত্ত্বিক কথা মোটেই নয়।

গতিবেগ বাড়লে ভর বাড়ে, ভর বাড়লে তার গতি আরো বাড়ানো দুরূহ হয়ে পড়ে। আলোর গতির এক্কেবারে কাছে পৌঁছানোর পর আরো বেগ বাড়ানো তাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ ভর তখন অসীমের কোঠায়। এজন্যই আলোর মত কিছু তরঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু আলোর গতিতে চলতে পারেনা। আর এটিই সর্বোচ্চ সম্ভাব্য বেগ।

মহাকর্ষ মানে স্থানের ও কালের ভাঁজঃ

ওপরে আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে যত কথা বলা হয়েছে তাতে ঘটনাগুলো ঘট্‌ছে একের আপেক্ষিকে অন্যের মসৃণ গতির ক্ষেত্রে– অর্থাৎ একই দিকে একই বেগের গতির ক্ষেত্রে। এতে ত্বরণের (বেগ পরিবর্তন বা দিক পরিবর্তন) কোন বিষয় নেই। তাই বিশেষ রকম গতির ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য বলে ১৯০৫ সালে আবিষ্কৃত এই তত্ত্বকে বলা হয় আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব (স্পেশিয়াল থিওরি)। কিন্তু আইনস্টাইনের ইচ্ছা ছিল সব রকম গতির ক্ষেত্রেই তত্ত্বটিকে সম্প্রসারিত করা – যা হবে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব (জেনারেল থিওরি)। এটি সফল

করতে আইনস্টাইনকে দীর্ঘ দশ বছর গভীর গবেষণা করতে হয়েছে, কিন্তু তার ফলশ্রুতিতে মহাবিশ্বের প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য একটি অভূতপূর্ব সুন্দর তত্ত্ব বিজ্ঞান পেয়েছে, মহাকর্ষের মত মৌলিক জিনিস যার আওতায় এসেছে।

ত্বরণকে আপেক্ষিক তত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে দেখা গেলো ত্বরণের সঙ্গে মহাকর্ষের কোন পার্থক্য নেই। বহুতল ভবনে লিফটে চড়ে দ্রুত উপরে উঠতে দেখা যায় লিফ্‌টি যখন উপরের দিকে গতি বাড়াবার ত্বরণ লাভ করে এর ভেতরে আমরা নিজেদের কিছু বাড়তি ওজন বোধ করি– ত্বরণ আর মহাকর্ষ একই জিনিস বলেই এমন হয়। লিফ্‌টি যদি মহাশূন্যের কোন অজানা জায়গায় থাকতো তাহলে ভেতরে থেকে আমরা বুঝতেই পারতামনা আমাদের ওই ওজনের অনুভবটি লিফটের নিচে থাকা কোন গ্রহের মহাকর্ষের কারণে হচ্ছে, না লিফ্‌টটি ওপরের দিকে দড়ির টানে ত্বরণ লাভ করার কারণে হচ্ছে। তাই এই দুই জিনিসের মধ্যে আসলেও কোন পার্থক্য নেই, কখনোই একটি থেকে অন্যটি আলাদা করে বলা যায়না।

আইনস্টাইন তাত্ত্বিক বিবেচনায় গণিতের মাধ্যমে বুঝতে পারলেন মহাকর্ষ অর্থাৎ ত্বরণের অদ্ভুত কিছু জ্যামিতিক প্রভাব স্থান ও কালের ওপর পড়ে। এটি সহজে বোঝার জন্য আমরা একটি সরল ও তুচ্ছ উদাহরণের মধ্যে বিষয়টি দেখি। শিশুপার্কে যে সব খেলা সাধারণত থাকে তার মধ্যে একটিকে বলা হয় টর্নাডো– একটি চাকতির আকারের বড় প্ল্যাটফরম এতে দ্রুতবেগে ঘোরে বলেই এই নাম। শিশুরা এর ওপর চড়ে এর সঙ্গে ঘুরতে মজা পায়। এই উদাহরণে আমরা একটি টর্নাডোকে সব সময় ঘুরতে দেখবো যার ওপর অন্তত একজন মানুষ আছে। টর্নাডোর বাইরে মাটিতে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ঘুরন্ত টর্নাডোটির পরিধিটি মেপে ফেলি। বাইরে থেকে মাপের ফিতাটি এর কিনারার চারিদিকে জড়িয়ে নিয়ে এটি করার সম্ভব। এর পর টর্নাডোর কেন্দ্র বিন্দুতে যে অক্ষ দন্ডের চারিদিকে এটি ঘুরছে সেখানে মাপের ফিতার এক প্রান্ত আটকিয়ে কিনারা পর্যন্ত দৈর্ঘ মেপে এর ব্যাসার্দ্ধও মেপে ফেলি ওই বাইরের দাঁড়িয়েই। মাপা পরিধি ও ব্যাসার্দ্ধের অনুপাত পাওয়া গেলো 'পাইয়ের' মানের দ্বিগুণ (আসন্ন হিসেবে ৬.২৮)। আমাদের স্কুলে পড়া জ্যামিতি অনুযায়ী এমনটিই হওয়ার কথা, যেহেতু টর্নাডো একটি নিখুঁত বৃত্তাকার চাকতি; এবং যে কোন বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসার্দ্ধের অনুপাত পাইয়ের দ্বিগুণ ('পাই' নামক গ্রীক অক্ষরটি বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাত বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যার মান আসন্ন হিসেবে ৩.১৪)।

এবার টর্নাডোর ওপরে ঘুরন্ত থাকা মানুষটিকে ওই পরিধি ও ব্যাসার্দ্ধ মাপতে দিই। এজন্য তাঁকে একটি একট ফুট রুলার ছুঁড়ে দিই যেটি দিয়ে তিনি এই দুটি জিনিস মাপবেন। পরিধি মাপার জন্য তিনি টর্নাডোর কিনারায় একটি বিন্দু থেকে শুরু করে রুলার দিয়ে এক ফুট দুই ফুট করে পুরো কিনারা ধরে বৃত্তাকারে ঘুরে আবার সেই বিন্দু পর্যন্ত মেপে ফেলবেন। আর ব্যাসার্দ্ধের মাপের জন্য কেন্দ্রীয় অক্ষটি থেকে কিনারার দিকে সরল রেখায় এগিয়ে কিনারা পর্যন্ত দূরত্ব মাপবেন সেই ফুট রুল দিয়ে। কিন্তু পরিধি মাপার পর দেখা দেলো নিচে দাঁড়িয়ে আমি যে পরিধি পেয়েছিলাম তার থেকে তিনি কিছুটা বেশি পেলেন। এর কারণ ঘুরন্ত টর্নাডোর কিনারায় যেখানেই তিনি ফুট রুলার রেখেছেন ওই জায়গায় তাৎক্ষণিক ভাবে এটি সামনের দিকে সরল রেখায় সমগতিতে এগোচ্ছে মনে হবে, এবং সে কারণে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব অনুযায়ী রুলারটি কিছুটা বেঁটে হয়ে যাবে। নিচে আমার কাছে স্থির থাকা রুলারের তুলনায় বেঁটে রুলার দিয়ে মাপার ফলে পরিধি তিনি কিছুটা বেশি পেলেন।

অবশ্য কেউ বলতে পারেন রুলার টর্নাডোর কিনারায় যেখানে রাখা হয়েছে সেটিও ওভাবে গতিমান, তাই ওটাওতো ছোট হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে নিচে থেকে মাপার ফলের সঙ্গে তুলনায়। টর্নাডো সব সময় ঘুরন্তই ছিল, নিচ থেকে যখন ফিতা দিয়ে পরিধি মাপা হয়েছে তখনো। কাজেই উভয় মাপে গতি একই ছিল বলে টর্নাডোর কিনারার দৈর্ঘে কোন কমতি হবেনা, শুধু রুলারটির দৈর্ঘ কমবে। তাই পরিধি বেশি পাওয়া গেছে। টর্নাডোর ভেতর থেকে ব্যাসার্দ্ধ মাপার সময় অবশ্য রুলারের দৈর্ঘ নিচে স্থির থাকা অবস্থার মতই থাকবে যেহেতু কেন্দ্রীয় অক্ষ থেকে কিনারার দিকে অর্থাৎ সেরকম সরলরেখায় ব্যাসার্দ্ধ মাপার দিকে টর্নাডোর কোন গতি নেই। কাজেই উভয় মাপে ব্যাসার্দ্ধ একই থাকছে। পরিধি দীর্ঘতর অথচ ব্যাসার্দ্ধ একই, তাই টর্নাডোর ভেতর থেকে মাপে উভয়ের অনুপাতটি বাইরে থেকে মাপের তুলনায় বড় হবে, অর্থাৎ পাইয়ের দ্বিগুণের কিছু বেশি। ইউক্লিডের জ্যামিতি অনুযায়ী এমন অনুপাত বৃত্তের ক্ষেত্রে হতে পারেনা। অবশ্য এটি হতে পারে কিছুটা বিকৃত বৃত্তের ক্ষেত্রে। সমতলের ওপর না এঁকে বৃত্তকে বক্রতলের ওপর আঁকলে যে রকম বিকৃত বেঢপ বৃত্ত আমরা পাব তার পরিধি ও ব্যাসার্দ্ধের অনুপাত ইউক্লিডের নিয়ম মত পাইয়ের দ্বিগুণ হবেনা। আগে যে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির কথা আমরা উল্লেখ করেছি, এরকম বিকৃত বৃত্ত সেই জ্যামিতিই অনুসরণ করে। টর্নাডোর উদাহরণটি সহজে বোঝার জন্য দিলাম। আসলে এর ঘূর্ণনের বেগ আলোর বেগের তুলনায় এতই

কম যে মাপের হেরফেরগুলো কেউ বুঝতেই পারবেনা এ ক্ষেত্রে। কিন্তু যতই ক্ষুদ্র পরিমাণে হোক হেরফেরটি ঠিকই হচ্ছে।

এর মানে দাঁড়ালো ঘুরন্ত টর্নাডোটি যেখানে রয়েছে সেখানকার তলটি বক্র বা বিকৃত অবস্থায় আছে। পরিধি ও ব্যাসার্দ্ধের অনুপাতটি সমতলে আঁকা সাধারণ বৃত্তে এই অনুপাতের চেয়ে বড় হতে গেলে বিকৃত তলটিকে হতে হবে ঘোড়ার পিঠের আসনের তলের মত বাইরের দিকে বাঁকা 'খোলা' বক্রতার। যদি অনুপাতটি সাধারণ বৃত্তে এই অনুপাতের চেয়ে ছোট হতো তা হলে বিকৃত তলটিকে হতে হতো ফুটবলের মত গোলকাকার কোন কিছুর তলের মত নিজের দিকে বাঁকা 'বদ্ধ' বক্রতার। আসলে টর্নাডোটি এবং তার কাছের স্থানটি দ্বিমাত্রিক তলের মত কিছু নয়, বরং ত্রিমাত্রিক জিনিস। তাই স্থানের বক্রতাও আসলে সেখানে তিন মাত্রায় দেখতে হবে। সেটি অপেক্ষাকৃত জটিল এবং সহজে এঁকে বোঝাবার মত না হলেও তাতেও 'খোলা' ও 'বদ্ধ' বক্রতা অথবা স্বাভাবিক 'চেপ্টা' অবস্থা থাকতে পারবে। আইনস্টাইন বল্লেন টর্নাডোর স্থানটি চেপ্টা না থেকে ত্রিমাত্রিক ঘোড়ার আসনের মত 'খোলা' বক্রতায় থাকছে টর্নাডোর ঘূর্ণনের ফলে; যাকে আমরা ত্বরণও বলতে পারি (ঘূর্ণন মানেইতো দিক পরিবর্তন অর্থাৎ ত্বরণ), মহাকর্ষও বলতে পারি, উভয়ে অভিন্ন বলে। যে কোন বস্তুই এভাবে তার মহাকর্ষের কারণে তার কাছের স্থানে বক্রতা বা বিকৃতি সৃষ্টি করে– সাধারণত যাকে বলা হয় স্থানের 'ভাঁজ'। এ অবস্থায় ত্রিমাত্রিক স্থানের ভেতরে সর্বত্র রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভাঁজের সৃষ্টি হয়। অন্য কোন জিনিস এর মধ্যে থাকলে তা এই ভাঁজের বুনোটগুলো অনুসরণ করে মূল বস্তুটির কাছে চলে যেতে চাইবে– ঠিক নিউটনীয় মহাকর্ষে যেমন এক বস্তু আরেক বস্তুকে আকর্ষণ করে। আইনস্টাইন এভাবে নিউটনীয় ব্যাখ্যার বদলে মহাকর্ষের সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা দিলেন যা স্থানের ভাঁজের ওপর নির্ভর করে– বস্তুর টানের ওপর নয়। এক্ষেত্রে শুধু বস্তু নয় আলোর মত বিকিরণও ওই ভাঁজ অনুসরণ করে মহাকর্ষের প্রভাবে আসে– যা নিউটনীয় মহাকর্ষে হতোনা।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব ভরের কারণে শুধু স্থানের ভাঁজের কথা বলেনা, কালেরও ভাঁজের কথা বলে; স্থান আর কাল তো এতে এক সূত্রে গাঁথা। কিন্তু কালের ভাঁজ আবার কী রকম জিনিস? এটি খানিকটা বোঝার জন্যও আমরা ওই ঘুরন্ত টর্নাডোর সহায়তা নিতে পারি। মনে করি এর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা আমার ঘড়ির সময়ের সঙ্গে আমি টর্নাডোর ওপরে থাকা মানুষটির ঘড়ির সময়ের তুলনা করছি। সেই মানুষটি তাঁর ঘড়ি হাতে টর্নাডোর মেঝেতে সটান শুয়ে পড়েছেন

আর একটু একটু করে এর কেন্দ্র থেকে কিনারার দিকে এগোচ্ছেন ওভাবে শোয়া অবস্থায়। একটু এগিয়েই তিনি তাঁর ঘড়ির সময় কী হারে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করছেন। যখন তিনি কেন্দ্রে অক্ষের কাছে থাকেন তখন তাঁর ঘোরার বৃত্তটি ছোট বলে ঘোরার গতিবেগও কম। তাই আপেক্ষিকতার নিয়মে নিচের স্থির ঘড়ির তুলনায় তাঁর ঘড়ির স্লো হওয়াটাও কম। যত কিনারার দিকে এগোচ্ছেন ঘোরার বৃত্ত বড় হচ্ছে, তাই ঘোরার গতিও বাড়ছে, ঘড়ি স্লো হচ্ছে বেশি। এই যে টর্নেডোর মধ্যে নানা স্থানে ঘড়ির সময় রাখাটির হার বিভিন্ন রকম এটিই 'কালের ভাঁজ'। এই ভাঁজও সৃষ্টি হচ্ছে টর্নেডোর ঘূর্ণন বা ত্বরণের ফলে, অর্থাৎ সেখানকার মহাকর্ষের ফলে। এ উদাহরণে যেমন দেখলাম যে কোন ভর নিজের কাছে স্থানের ও কালের ভাঁজ সৃষ্টি করে। এই ভাঁজের বুনোট ভরের পরিমাণ ও বন্টনের ওপর নির্ভর করে।

আইনস্টাইনের বাহাদুরিটি হলো তিনি জটিল অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি এবং খুবই উচ্চ স্তরের গণিত ব্যবহার করে ভরের সঙ্গে এই সব ভাঁজের প্রকৃতিকে তাঁর সমীকরণে ধারণ করতে পেরেছেন যেগুলোকে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের ফিল্ড ইকোয়েশন বলা হয়। এগুলো থেকে হিসেব করে মহাকর্ষের যে মান ও প্রকৃতি পাওয়া যায় তা কোন কোন ক্ষেত্রে নিউটনের মহাকর্ষের চেয়ে অনেক বেশি নিখুঁত; তাছাড়া নিউটনের মহাকর্ষের দ্বারা যে ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করা যায় না, এই নতুন তত্ত্ব সেগুলোও ব্যাখ্যা করতে পারলো। অন্যদিকে নিউটনের তত্ত্বের অধিক ভরের কারণে অধিক মহাকর্ষ বল হওয়া, দূরত্বের বর্গের সঙ্গে এই বল কমে যাওয়া, তা আইনস্টাইনের তত্ত্বেও বজায় রইলো। এখানেও যত ভর তত ভাঁজ, আর এই ভাঁজ ভরটি থেকে দূরে গেলে কমেও যায়। আরো সরাসরি এক্সপেরিমেন্টেও দেখা গেলো মহাকর্ষের আইস্টাইনের তত্ত্বটিই সঠিক।

এরকম প্রথম এক্সপেরিমেন্টটি করা হয়েছিলো একটি পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সুযোগ নিয়ে। নিউটনের মহাকর্ষে ভরবিহীন হওয়ার কারণে আলো আকৃষ্ট না হলেও আইনস্টাইনের তত্ত্বে আলোও স্থান-কালের ভাঁজের মধ্য দিয়ে গিয়ে ভরের দিকে বেঁকে যায়। ওই সূর্যগ্রহণের সময় দূর একটি তারা থেকে আসা আলো পৃথিবীতে আসতে সূর্যের খুব কিনারা ঘেঁষে আসছিলো, আর গ্রহণের কারণে রাতের মত অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় সূর্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও ওই তারাকে দেখা গিয়েছে ও তার দৃশ্যত সামান্য ভিন্ন অবস্থান থেকে আলোর এই বক্রতাটিও মাপা গেছে। দেখা গেছে বক্রতার পরিমাণ হুবহু আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ীই হয়েছে।

অবশ্য স্থান ও কালের ভাঁজটি খুব বড় ভরের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ হয় বলে অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাঁজের কথা ভুলে নিউটনের তত্ত্ব অনুযায়ীই মহাকর্ষকে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু যেখানে বড় তারা, গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সিপুঞ্জ কিংবা মহাবিশ্বের ব্যাপার সেখানে আইনস্টাইনের তত্ত্ব ছাড়া উপায় নেই– সেখানে ওই ভরের সৃষ্ট স্থান-কালের ভাঁজই যাবতীয় ফলাফল পেতে অনেক বেশি কার্যকর। মহাকর্ষের আইনস্টাইনের তত্ত্বটিই সব কিছুতে প্রযোজ্য সাধারণ তত্ত্ব, এবং অধিক সঠিক। নিউটনের তত্ত্বটি কাজ চলার মত একটি আসন্ন রূপ মাত্র। নিউটনের তত্ত্বে একটি বড় ধারণাগত দুর্বলতা ছিল– তা হলো 'দূর থেকে কার্যের' ধারণা (এ্যাকশন এ্যাট এ্যা ডিসট্যান্স)। যদি কল্পনা করি সূর্য ছিলনা, হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়েছে, তা হলে দূরের গ্রহগুলো এর আকর্ষণটি কি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করবে? নিউটনের তত্ত্ব অনুযায়ী এটি করবে, সূর্যের উপস্থিতির খবর গ্রহে তাৎক্ষণিক ভাবে পৌঁছবে; ওটি সেখানে যেতে কোন সময় লাগবেনা। পদার্থবিদ্যায় এমন তাৎক্ষণিক খবর যাবার কোন প্রক্রিয়া জানা ছিলনা, এখনো নেই। নিউটনের কাছে এর কোন ব্যাখ্যা ছিলনা, তাঁর পরবর্তী বিজ্ঞানীদের কাছেও ছিলনা। কিন্তু স্থান-কালের ভাঁজের বিষয় এনে আইনস্টাইন বলতে পারলেন সূর্য আবির্ভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার সংলগ্ন স্থান-কালে ভাঁজ সৃষ্টি হবে বটে কিন্তু সেই ভাঁজ গ্রহে পৌঁছতে সময় নেবে; তাঁর তত্ত্বের হিসেবে এই ভাঁজ সৃষ্টির ব্যাপারটি আলোর গতিতে এগোবে।

শুধু তাই নয় ভাঁজের উৎস ভরটি যদি কাঁপতে থাকে তা হলে সেই কাঁপুনির সৃষ্ট স্থান-কালের একটি তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে- যাকে বলা হয়েছে মহাকর্ষ তরঙ্গ (গ্র্যাভিটি ওয়েভ)। সুদূর মহাশূন্যে এভাবে তৈরি হওয়া তরঙ্গ পৃথিবীতেও এসে পৌঁছার কথা। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্বের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ওই তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রায় এক শ' বছর পর্যন্ত এক্সপেরিমেন্টের দ্বারা হাতেনাতে প্রমাণিত হতে পারছিলোনা, যদিও অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে পরোক্ষ ভাবে এর সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছিলো। এর কারণ পৃথিবীতে আসতে আসতে তরঙ্গটি এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে তা উদ্ঘাটনের মত সংবেদনশীল কোন যন্ত্র আমাদের কাছে ছিলনা। অবশেষে আবিষ্কারের ঠিক একশ' বছর পর ২০১৬ সালে 'লিগো' নামক অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্র ব্যবহার করে মহাকর্ষ তরঙ্গ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এর উদ্ঘাটনের জন্য যে এক্সপেরিমেন্ট তার কিছু বর্ণনা এই বইয়ে আগেই দেয়া হয়েছে। বোঝা গেছে যে এই মহাকর্ষ তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে মহাশূণ্যে দুটি ব্ল্যাকহোলের পরস্পরকে আবর্তন করার ফলে।

ব্ল্যাকহোল জিনিসটিই আবিষ্কৃত হয়েছে আইনস্টাইনের তত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমে। বড় এবং বিপুল ভরের একটি তারা যখন পুরানো হয়ে তার শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন তার বিভিন্ন রকম সম্ভাব্য পরিণতির একটি হলো নিজের ওপর নিজে ধসে পড়ে খুব ছোট আকারে চলে আসা। এত ভর অল্প জায়গাতে আসাতে তার যে অতি উচ্চ ঘনত্ব সৃষ্টি হয় তাতে স্থান-কালের ভাঁজটি হয় অত্যন্ত প্রচণ্ড, দারুণ মোচড়ে একেবারে নিজের দিকে নিয়ে আসার মত। এই চরম বক্র ভাঁজের আওতায় আসলেই যে কোন কিছু ওই তারায় গ্রাস হওয়া ছাড়া উপায় থাকেনা। এমনকি আলোও তার গ্রাস এড়াতে পারেনা, কাজেই এর কাছে থেকে কোন আলোই বাইরে যেতে পারেনা বলে এটি অদৃশ্য বা 'ব্ল্যাক,' আর গ্রাস করে বলে এটি 'হোল'। দেখা না গেলেও তার অন্যান্য আচরণে ব্ল্যাকহোলের উপস্থিতি পরে বাস্তব ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হয়েছে। ২০১৬ সালের এক্সপেরিমেন্টে যে দুটি ব্ল্যাকহোল থেকে আসা মহাকর্ষ তরঙ্গ ধরা পড়েছে সেগুলো রয়েছে মহাশূন্যে অনেক দূরে– যেখান থেকে আলোর বেগে মহাকর্ষ তরঙ্গ আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে সময় লেগেছে ১.৩ বিলিয়ন বছর! এতদূর আসতে অনেক শক্তিশালী মহাকর্ষ তরঙ্গও যে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়বে তা আর বিচিত্র কী।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব মহাবিশ্ব সম্পর্কেও আমাদের সর্বাধুনিক জ্ঞানের পথ করে দিয়েছে। এ তত্ত্বের মাধ্যমেই কোন কোন বিজ্ঞানী তাত্ত্বিক ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন যে মহাবিশ্বের আকার-আকৃতি তার মোট ভরের বন্টনের দ্বারা সুনির্ধারিত এবং এর আয়তন ক্রমে বড় হচ্ছে। ১৯৩০ এর দশকে দূর গ্যালাক্সিগুলো থেকে আসা আলোর বর্ণালী পরীক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রেও প্রমাণ করলো যে মহাবিশ্ব ক্রমে প্রসারণশীল; সব গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যেটি যতদূরে সেটি তত দ্রুত বেগে। প্রসারণের এই প্রকৃতিই বলে দিলো যে প্রায় ১৪ বিলিয়ন বছর আগের একটি মুহূর্তে একটি অত্যন্ত উত্তপ্ত ঘন বিন্দু বিস্ফোরণে (বিগ ব্যাং) স্থান আর কাল সৃষ্টি করেছিলো– ওভাবেই ওই মুহূর্তে মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিলো। তারপর থেকে এটি ক্রমে প্রসারিত হয়েছে, এবং তার ফলে ক্রমে এর ঘনত্ব কমেছে এবং উত্তাপ কমেছে। এও আমাদের নিজেদের বোধশক্তির অতীত একটি ব্যাপার– কারণ জন্মকালে ওই বিন্দুটির বাইরে কোন 'স্থান' ছিলনা, ওই মুহূর্তের আগে কোন 'কাল' ছিলনা– এমন কথা আমাদের বোধের কাছে মেনে নেয়া কঠিন হলেও গাণিতিক তত্ত্বে কঠিন নয়। তাছাড়া নানা প্রমাণে মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই তত্ত্ব এখন একেবারেই সুপ্রতিষ্ঠিত। এই

বইয়ে আগে আমরা দেখেছি মধ্যযুগের দার্শনিক-বিজ্ঞানীরা কীভাবে 'হঠাৎ নতুন ভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি' অথবা 'চিরকাল একই ভাবে বিরাজ করা মহাবিশ্ব' এই দুই তত্ত্বের পক্ষ নিয়ে বিতর্ক করেছেন। অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক ভাবে এরকম দুটি তত্ত্বই গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চালু ছিল– উভয়ের স্বপক্ষেই কিছু কিছু জোরালো বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহ। এর একটি হঠাৎ সৃষ্টির 'বিগ্ ব্যাং' তত্ত্ব এবং অন্যটি চিরকাল একই ভাবে বিরাজ করার 'স্টীডি স্টেট' তত্ত্ব। এর পর অবশ্য বিগ ব্যাং তত্ত্বেরই জিত হয়েছে।

ভরের ফলে সৃষ্টি হওয়া স্থান-কালের ভাঁজ মহাবিশ্বের আকৃতি সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিতে পারছে। শিশুপার্কের টর্নাডোর আলোচনায় আমরা দেখেছি ভরের পরিমাণ ও বন্টন অনুযায়ী স্থান (এবং কাল) ভাঁজের ফলে এক ধরনের 'বদ্ধ' আকৃতি নিতে পারে ভেতরের দিকে বেঁকে গিয়ে (দুই মাত্রায় দেখলে যা ফুটবলের তলের সঙ্গে তুলনীয়), অথবা 'খোলা' আকৃতি নিতে পারে বাইরের দিকে বেঁকে গিয়ে (দুই মাত্রায় দেখলে যা ঘোড়ার পিঠের আসনের তলের সমতুল্য) অথবা না বেঁকে চেপ্টা আকৃতি নিতে পারে। মহাবিশ্ব এই তিন আকৃতির কোন্‌টিতে রয়েছে তা নির্ভর করে তার সকল ভরের পরিমাণ আর বন্টনের ওপর। দেখা গেছে যে মহাবিশ্বের বস্তুপুঞ্জ একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণে (ক্রিটিক্যাল) থাকলে মহাবিশ্ব চেপ্টা থাকবে, তার বেশি হলে মহাকর্ষের বেশি তীব্রতার কারণে 'বদ্ধ' আকৃতির হবে, কম থাকলে মহাকর্ষের কম তীব্রতার কারণে 'খোলা' আকৃতির হবে। খোলা আকৃতির মহাবিশ্ব ভবিষ্যতেও চিরকাল প্রসারিত হওয়ার কথা, আর বদ্ধ আকৃতির মহাবিশ্ব ভবিষ্যতে এক সময় আবার ক্রমে সংকোচিত হয়ে সেই বিন্দুতে পরিণত হবার কথা। শুধু চেপ্টা থাকলেই মহাবিশ্ব স্থিতিতে থাকবে।

নানা বাস্তব পরিমাপ থেকে আমরা দেখ্‌ছি মহাবিশ্ব চেপ্টা আকৃতিতেই আছে। কিন্তু সেটি থাকতে হলে যে ক্রিটিক্যাল ভর দরকার মহাবিশ্বের জানা বস্তুপুঞ্জ তার চেয়ে অনেক কম। এই অসঙ্গতি দূর করার জন্য বিজ্ঞানীরা একটি নতুন কথা বল্‌ছেন। তাঁরা বেশ আস্থার সঙ্গে বল্‌ছেন আমাদের পরিচিত বস্তু না থাকলে কী হবে এমন অনেক 'অদৃশ্য বস্তু' (ডার্ক ম্যাটার) আছে যার প্রকৃতি আমরা এখন না জানলেও শিগ্‌গির জানতে পারবো। শুধু তাত্ত্বিক কারণে নয়, এই অদৃশ্য বস্তুর উপস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে বলেই তাঁরা এমন কথা বলতে পারছেন। এখানেও সর্বাধুনিক তত্ত্বগুলো যথেষ্ট বৈপ্লবিক– চিরায়ত পদার্থবিদ্যার বর্ণিত বস্তুর থেকেও আমরা অনেক দূর সরে গিয়েছি, আমাদের বোধ শক্তিতে বস্তু যেমন ভাবে আছে তার থেকেও। অদৃশ্য বস্তুর সম্ভাব্য প্রকৃতি

সম্পর্কে বেশ কিছু অনুমিত তত্ত্বের যুক্তি পাওয়া গেছে, কিন্তু সেগুলোর কোনটি এখনো পুরো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সম্ভাবনার তরঙ্গই সব

আরেকটি সংকট থেকেঃ

আলোর বেগ সব পরিস্থিতিতে একই থাকার ফলে যে সংকট চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় সৃষ্টি হয়েছিলো তার সমাধান করতে গিয়ে বদলে গিয়েছিলো স্থান ও কাল সম্পর্কে চির পরিচিত ধ্যান-ধারণা– এমনকি মহাবিশ্ব সম্বন্ধেও। তেমনি আরেকটি সংকট এটম, অণু ইত্যাদি পর্যায়ের ক্ষুদ্র জিনিসকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বাস্তবতায় নিয়ে গিয়েছে, যার ফলশ্রুতি আরো অদ্ভুত। পদার্থবিদ্যায় তাপরূপী বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ (প্রধানত ইনফ্রারেড ফ্রিকোয়েন্সির কোঠায়) নিয়ে কিন্তু খুব প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ছিল, আগাগোড়া চিরায়ত বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যেগুলো অপরিহার্য ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কিছু গবেষণায় এর থেকে একটি অসম্ভব ফলের ভবিষ্যদ্বাণী এলো যা বাস্তবে দেখা যাচ্ছিলোনা, বাস্তবে সম্ভবও নয়। এটি সহজে বোঝার জন্য আমরা একটি বদ্ধ ওভেনের উদাহরণ নিই যার ভেতরটা সুনির্দিষ্ট এক একটি উত্তাপে স্থির রাখা যায়। আসলে যে কোন বদ্ধ উত্তপ্ত গর্তের মতো (ক্যাভিটি) জায়গার জন্যই কথাগুলো খাটবে। ওভেনটিকে একটি নির্দিষ্ট উত্তাপে রাখলে এর ভেতরে নানা তরঙ্গ-দৈর্ঘের বিকিরণ ঘটে। কাছাকাছি কিছু তরঙ্গ-দৈর্ঘের এক একটি রেঞ্জে যত বিকিরণ ঘটে তার শক্তিকে তরঙ্গ-দৈর্ঘের বিপরীতে একটি গ্রাফে প্লট করলে দেখা যায় গ্রাফটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত উঁচু হয়ে দৃশ্য আলোর বা ইনফ্রারেডের কোন একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘে একটি উচ্চতম শক্তির চূড়ায় পৌঁছে। তারপর তরঙ্গ-দৈর্ঘ আরো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে দ্রুত আর ক্রমান্বয়ে ধীরে কমে আসে। ওভেনের উত্তাপ যত কম হবে চূড়াটি তত নিচু হবে অর্থাৎ চূড়ার শক্তি তত কম হবে। এরকম পুরো গ্রাফ থেকে মেপে এক একটি নির্দিষ্ট উত্তাপে রাখা ওভেনের ভেতরের সব বিকিরণের মোট শক্তিও বের করে ফেলা যায়। কিন্তু চিরায়ত পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী তাত্ত্বিক ভাবে এর যেই গ্রাফ পাওয়া যায় তা এই বাস্তব গ্রাফের সঙ্গে অনেকটা জায়গায় মিলছিলোনা, বরং ওভেনের সব বিকিরণের মোট শক্তি হিসেবে 'অসীম শক্তি' হবার মত একটি অদ্ভুত অবাস্তব ফল দিচ্ছিলো।

এমন তাত্ত্বিক ফলের কারণ হলো চিরায়ত পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী ওভেনের উত্তাপ অনুসারে ভেতরের সম্ভাব্য প্রত্যেক তরঙ্গ-দৈর্ঘের জন্য একটি সমান পরিমাণ শক্তি বরাদ্দ থাকার কথা। আর এরকম তরঙ্গ-দৈর্ঘের সংখ্যা কিন্তু অসীম। তাই ওই সমান-শক্তিটির মান যাই হোক অসীম সংখ্যক তরঙ্গের জন্য এই শক্তি যোগ হয়ে অসীম শক্তিতে দাঁড়ায়, যা অসম্ভব। বাস্তবের সঙ্গে এই প্রচন্ড অমিল চিরায়ত পদার্থবিদ্যার এই দিকটিকেও সংকটের সম্মূখীন করলো।

১৯০০ সালে জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এই সংকট থেকে পরিত্রাণের একটি চমকপ্রদ উপায় প্রস্তাব করলেন। যে বিকিরণ তরঙ্গকে সব সময় নিরবিচ্ছিন্ন একটি জিনিস মনে করা হচ্ছিল, যাতে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে যে কোন তরঙ্গ-দৈর্ঘ থাকতে পারে, সেই চিত্রটি তিনি বদলে দিলেন। তিনি বল্‌লেন বিকিরণ আসে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে নয়, নির্দিষ্ট কিছু আলাদা আলাদা গুচ্ছে– যেগুলোকে তিনি বল্‌লেন কোয়ান্টাম, যার মানেও আলাদা আলাদা গুচ্ছ বা প্যাকেট। তাঁর এই নতুন তত্ত্বকে বলা হলো কোয়ান্টাম তত্ত্ব। এ তত্ত্ব অনুযায়ী একটি কোয়ান্টামে ন্যুনতম যে শক্তি থাকবে তা ওই বিকিরণের ফ্রিকোয়েন্সির সমানুপাতিক হবে। কোয়ান্টাম এই ন্যুনতম শক্তির দ্বিগুণ, তিনগুণ ইত্যাদি হতে পারবে কিন্তু এর ভগ্নাংশ হতে পারবেনা। ফ্রিকোয়েন্সি যত বড়, অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ যত ছোট, সেই বিকিরণের এক একটি কোয়ান্টামের ন্যুনতম শক্তিও তত বড়। ওটি ঠিক কত শক্তি তা হবে ওই ফ্রিকোয়েন্সি এবং সমানুপাতের ধ্রুবকের গুণফলের সমান। ধ্রুবকটি সব বিকিরণের জন্য সমান অনুমান করে প্ল্যাঙ্ক এটি নির্ণয়ের চেষ্টা করলেন। তা তিনি করলেন এর সম্ভাব্য নানা মান গ্রাফে ব্যবহার করে কোন্‌টির দ্বারা তাঁর তত্ত্বে দেয়া গ্রাফের সঙ্গে ওপরে উল্লেখিত বাস্তব গ্রাফ হুবহু মিলে যায় তা লক্ষ্য করে– যা কিনা তত্ত্বে একটি কিছু বদলিয়ে বদলিয়ে বাস্তব গ্রাফের সঙ্গে তাত্ত্বিক গ্রাফকে 'ফিট' করাবার চেষ্টা করা। এভাবে তিনি ধ্রুবকটি পেয়ে গেলেন যা ওভেনের সব উত্তাপের গ্রাফের ক্ষেত্রে তত্ত্ব আর বাস্তবের চমৎকার ফিট্ সৃষ্টি করতে পেরেছে। ধ্রুবকটির মান পাওয়া গেলো অতি ক্ষুদ্র, শক্তির মাপের সাধারণ এককের যা বিলিয়ন ভাগের এক ভাগের, আবার বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ, এবং তারও বিলিয়ন ভাগের এক ভাগের সমান! এর মানে হলো বিকিরণের ফ্রিকোয়েন্সিকে একে দিয়ে গুণ করে একটি কোয়ান্টামের যে ন্যুনতম শক্তি পাওয়া যায় তা এমনিতরো অতি ক্ষুদ্র একটি শক্তি। ধ্রুবকটিকে পরে নাম দেয়া হয়েছে 'প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক'।

কিন্তু বিকিরণকে গুচ্ছ হিসেবে নিয়ে সংকট সমাধানের কী সুরাহা হলো? চিরায়ত পদার্থবিদ্যার নিয়মে প্রত্যেক তরঙ্গ-দৈর্ঘের জন্য একটি সমান-শক্তি বরাদ্দ আছে। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘের বিকিরণকে সেই সমান-শক্তিটি পেতে হবে তার কোয়ান্টামের ন্যুনতম শক্তির এক বা একাধিকের সমন্বয়ে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ যত কম অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি ন্যুনতম শক্তি তত বড় হবে। কোন বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘের বিকিরণে সেই ন্যুনতম শক্তির যোগফল যদি এমন হয় যে ওই ন্যুনতম শক্তির কোয়ান্টাম একটি বাড়ালে সমান-শক্তির বেশি হয়ে যায় কিন্তু না বাড়ালে ওই সমানশক্তি অর্জিত হয়না, তা হলে সে তার শক্তি বরাদ্দ পাবেনা– কারণ ওই ন্যুনতম শক্তি ভাংতি করার (তার ভগ্নাংশের) কোন সুযোগ নেই। ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই ন্যুনতম শক্তি এমন একটি মাত্রায় গিয়ে পৌঁছে যা সমান-শক্তির থেকে বড়। সেটি বা তার থেকে বেশি ফ্রিকোয়েন্সির সব বিকিরণকে ভাংতি ব্যবহার না করে সমান-শক্তির বরাদ্দ পাওয়া সম্ভব হয়না। কাজেই এর চেয়ে বড় ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ ওখানে থাকতেই পারেনা। এর কম ফ্রিকোয়েন্সির সব কোয়ান্টামের শক্তির যোগফল আর যাই হোক, অসীম হতে পারেনা। এখানেই হলো সংকটের অবসান।

ওই যে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের অতি ক্ষুদ্র মানের কারণে কোয়ান্টামের ন্যুনতম শক্তির অতি ক্ষুদ্র মান, কোয়ান্টামও সে কারণে ক্ষুদ্র জিনিস। কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগটি তাই ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর জগতের বিষয়। উল্লিখিত সংকটের সমাধান করতে পেরেছে এটিই ছিল তখন কোয়ান্টামের ধারণার ও প্ল্যাঙ্কের তত্ত্বের স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি। কোয়ান্টামের নিজের বাস্তবতার তার চেয়ে বড় কোন সাক্ষ্য তখন ছিলনা। কিন্তু এর মাত্র দু'তিন দশকের মধ্যে দেখা গেছে এই নতুন ধারণাটি পদার্থবিদ্যার চিরায়ত চিত্রকে একেবারে উল্‌টে পাল্‌টে দিয়েছে। এটি হয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আরো সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে। আর এই তত্ত্বই হয়ে পড়েছে আধুনিকতম বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক মৌলিক ভিত্তি।

একই সঙ্গে তরঙ্গ এবং কণিকা:

প্ল্যাঙ্কের অনুমিত শক্তির প্যাকেট কোয়ান্টামকে রীতিমত একটি কণিকা হিসেবে প্রমাণের কৃতিত্ব আইনস্টাইনের– যিনি এভাবে কোয়ান্টামকে একটি নতুন বাস্তবতা দিলেন। একটি ধাতব পাতে আলো ফেল্‌লে কিছু ইলেকট্রন আলগা হয়ে ধাতুর পাত থেকে যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায় সে কথা ফটো-ইলেকট্রন প্রক্রিয়া হিসেবে জানা ছিলো। তবে অবাক হয়ে লক্ষ্য করা গেছে যে আলোর পরিমাণ

বাড়ালে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ে বটে, কিন্তু তার উৎক্ষেপনের বেগ অর্থাৎ শক্তি বাড়েনা। ওভাবে শক্তি বাড়াতে হলে আলোর ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে হয়। একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির কম হলে তা কোন ইলেকট্রন আলগাই করতে পারেনা, উৎক্ষিপ্ত হওয়া তো দূরে থাক। এর থেকে ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি হবে আলগা হওয়া ইলেকট্রন তত বেশি শক্তিতে উৎক্ষিপ্ত হবে। এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। আইনস্টাইন প্ল্যাঙ্কের শক্তি-প্যাকেটের সূত্র ধরে এর সমাধান করলেন। তিনি দেখালেন এর ব্যাখ্যার একমাত্র উপায় হলো আলো জিনিসটাকে কণিকা মনে করা। ওই কোয়ান্টামই সেই কণিকা (এ যেন নিউটনের দেয়া এবং পরে পরিত্যক্ত হওয়া আলোর কণিকা তত্ত্বকেই তিনি অন্যভাবে ফিরিয়ে আনলেন)। আলো কণিকা হলে ধাতব পাতের ইলেকট্রনকে সে দুই কণিকার সংঘর্ষের মত করে উৎক্ষিপ্ত করতে পারবে। আলোর ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হলে এই কণিকার (কোয়ান্টামের) শক্তি বেশি হয় কাজেই এটি অপেক্ষাকৃত বেশি সজোরে অন্য কণিকা ইলেকট্রনকে আঘাত করে তাকে স্থানচ্যুত করতে পারে ও বেশি বেগে উৎক্ষিপ্ত করতে পারে। এ যেন হাতের একটি মার্বেল দিয়ে ঠুকিয়ে মাটিতে থাকা আরেকটি মার্বেলকে উৎক্ষিপ্ত করা। পরে আলোর এই কণিকার নাম দেয়া হয়েছে ফোটন। মনে রাখতে হবে যে আলো বলতে দৃশ্য আলো ছাড়াও যে কোন বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণকে বুঝতে হবে।

আলোকে কণিকা রূপে পাওয়া গেলো বটে কিন্তু আলো যে তরঙ্গ এ কথাও ভোলা গেলোনা। ওই যে বেশি ফ্রিকোয়েন্সিতে কণিকাটির শক্তি বেশি হয় সে কথাতেই তো তার পরিচয় মেলে– ফ্রিকোয়েন্সি তো তরঙ্গেরই ব্যাপার। তাছাড়া আলোকে নিয়ে টমাস ইয়াং প্রদর্শিত দুই ফাটল এক্সপেরিমেন্ট করলে সেখানে আলোর তরঙ্গ রূপটিই দেখা যাবে। দুটি ফাটলের মধ্য দিয়ে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ইন্টারফেরেন্স করে আলো-কালো-আলো-কালো এমনিতরো পরপর আলোকিত ও অনালোকিত অংশের ঝালর সৃষ্টি একমাত্র তরঙ্গই করতে পারে, কণিকা নয়। তাহলে কোয়ান্টাম তত্ত্বে মানতেই হলো যে আলো একই সঙ্গে কণিকা ও তরঙ্গ– এই দ্বৈতরূপ আলোর অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট; যা কিনা কোয়ান্টাম তত্ত্বের সেই অদ্ভুত বিষয়গুলোর একটি। তরঙ্গ রূপে যাকে এ পর্যন্ত দেখেছি সেই আলোর যখন কণিকা রূপ থাকতে পারে, তা হলে কণিকা রূপে এ পর্যন্ত যে জিনিসগুলো দেখেছি সেই কণিকাগুলোর কি তরঙ্গ রূপ থাকতে পারে? বিজ্ঞানে প্রতিসাম্য থাকার প্রচলন অনুযায়ী পদার্থবিদদের কাছে এমন প্রশ্ন জাগতেই পারে।

ফরাসী পদার্থবিদ দ্য ব্রগলী এটি শুধু অনুমান করলেন না এর একটি তাত্ত্বিক হিসেব দাঁড় করিয়ে ফেল্‌লেন। তিনি গণিতিক যুক্তিতে এরকম কণিকার যে তরঙ্গরূপ তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ বের করলেন– তা হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবককে কণিকাটির ভরবেগ দিয়ে ভাগ করলে যত হয় তত। কোন কণিকা আদৌ তরঙ্গের মত আচরণ করে কিনা, এবং করলে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ এই হিসেবমত হয় কিনা তা পরীক্ষার জন্য ১৯২৭ সালে আলোর দুই ফাটল এক্সপেরিমেন্টের অনুরূপ একটি এক্সপেরিমেন্টের আয়োজন করলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী ক্লিনটন ডেভিসন ও লেস্টার জারমার, যা ডেভিসন-জারমার এক্সপেরিমেন্ট নামে খ্যাত। তাঁরা এটি করলেন ইলেকট্রন কণিকা নিয়ে। দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ নিয়ে দুই ফাটল এক্সপেরিমেন্টে ফাটলগুলোকে বেশ সরু করতে হয় আলোর ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘের কারণে। সাধারণত কাচের ওপর খুবই ঘন ঘন খুবই সরু আঁচড় কেটে এরকম ফাটল (দুইটি নয়, বহু ফাটল) সৃষ্টি করা হয়, যাকে ডিফ্র্যাকশন গ্রেটিং বলা হয়। কিন্তু দ্য ব্রগলীর হিসেব মত ইলেকট্রন যদি তরঙ্গ হয় তার তরঙ্গ-দৈর্ঘকে হতে হবে আলোর চেয়েও অনেক গুণ ছোট, কাজেই তাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্টে যে ফাটল বা ফাঁক তাকে হতে হবে অসম্ভব রকমের সরু। এমন ফাটল বিজ্ঞানীর পক্ষে নিজে সৃষ্টি কঠিন হলেও প্রকৃতিতে কিন্তু নানা কৃস্টালের অণু-বিন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে এই অতি সরু সাইজের ফাটল রয়েছে। তারই সুযোগ নিয়ে এক্সপেরিমেন্টটি করা হলো।

ইলেকট্রন স্রোত এরকম একাধিক ফাটল পার হয়ে ওপারে ইলেকট্রন সংবেদী পর্দায় কী সৃষ্টি করে তা লক্ষ্য করা হলো। অবাক হয়ে দেখা গেলো এখানেও সেই ঝালর– ইলেকট্রন-সমৃদ্ধ অংশের পর ইলেকট্রন-ঘাটতি অংশ, আবার ইলেকট্রন-সমৃদ্ধ অংশ– এমনি ভাবে। তরঙ্গের ইন্টারফেরেন্স ছাড়া এটি তো সম্ভব নয়, তাই মানতেই হলো ইলেকট্রন কণিকা হয়েও এক্ষেত্রে তরঙ্গ। বহু ইলেকট্রন এই স্রোতে যাচ্ছে বলে ইলেকট্রন নানা জায়গায় নানা সংখ্যায় জমে এমন ঝালর তৈরি করছে এ কথাও বলা গেলোনা। কারণ ইলেকট্রনের সংখ্যা কমাতে কমাতে একটি ইলেকট্রনের অবস্থায় নিয়ে এলেও ঝালর কিন্তু থাকে, যদিও অনেক আবছা ভাবে। তবে কি এই একটি মাত্র ইলেকট্রন কণিকা অংশত এই ফাটল, অংশত ওই ফাটলের মধ্য দিয়ে গিয়ে নিজের সঙ্গে নিজে ইন্টাফেরেন্স করছে? ইলেকট্রন নিজেই তরঙ্গ না হলে তো এটি ঘটতে পারেনা। স্বীকার করতেই হলো কণিকারও তরঙ্গ রূপ আছে– এরও দ্বৈত আচরণ আছে। শুধু তাই নয় ইলেকট্রন তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ ওই এক্সপেরিমেন্টটি থেকেই মেপে পাওয়া

গেল এবং তা দ্য ব্রগলী হিসেবের সঙ্গে হুবহু মিলে গেলো। এ ভাবে বস্তুর কণিকাও তরঙ্গ প্রতিপন্ন হওয়া, এবং তারও যথারীতি তরঙ্গ-দৈর্ঘ থাকা অভাবনীয় এক ব্যাপার! ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ অবশ্য আলোর থেকেও অনেক বেশি ক্ষুদ্র।

ইলেকট্রনেই ব্যাপারটি থেমে থাকলোনা। এই ক্ষুদ্র পর্যায়েরই কিন্তু ইলেক্ট্রনের চেয়ে অনেক বড় জিনিস গোটা এটম এবং আরো বড় অণুর ক্ষেত্রে, যেখানে যেখানে সম্ভব দুই ফাটল এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে দেখা গেছে সেগুলোও তরঙ্গ, এবং সেগুলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ দ্য ব্রগলীর হিসেব অনুযায়ী আরো আরো অনেক বেশি ক্ষুদ্র। এখন যদি এটম, অণু ইত্যাদি ক্ষুদ্র জগতের জিনিসের থেকে অনেক বড় আমাদের দৃশ্য জগতের জিনিসে চলে আসি তা হলে সেগুলোও কি তরঙ্গ হবে? যেমন ধরা যাক ধূলা-বালি, পুঁতির দানা, মার্বেল, ফুটবল, এমন কি আমরাও? দুই ফাটল এক্সপেরিমেন্ট করাটি এসব ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হবেনা বটে তবে তাত্ত্বিক ভাবে তরঙ্গ ধরে নিয়ে তরঙ্গ-দৈর্ঘ হিসেব করতে তো দোষ নেই। দেখা যায় সেই তরঙ্গ-দৈর্ঘ হবে তুচ্ছ করার মতো অতি ক্ষুদ্র, এতই ক্ষুদ্র যে তাদের তরঙ্গ-চরিত্র ধর্তব্যের মধ্যে আনার মতো নয়। দ্য ব্রগলীর তরঙ্গ-দৈর্ঘের নিয়মটির দিকে তাকালেই দেখবো বড় জিনিসের এই তরঙ্গ-চরিত্রে অর্থাৎ কোয়ান্টাম তত্ত্বে ধর্তব্যে না আসার মূলে রয়েছে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের অতি ক্ষুদ্র মান। এ কারণে শুধু ক্ষুদ্র আণবিক জগতের জিনিসগুলোর ক্ষেত্রেই কোয়ান্টাম তত্ত্ব সরাসরি প্রযোজ্য। কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞানের অনেকখানিই শেষ পর্যন্ত এই আণবিক জগতের জিনিসের ওপর নির্ভর করে– বস্তু ও শক্তির গুণাগুণই বলি, কেমিস্ট্রিই বলি, ইলেকট্রনিক্সই বলি, কিংবা মহাজাগতিক বিজ্ঞানই বলি– সব ক্ষেত্রেই কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োজন হচ্ছে। কাজেই আজকের বিজ্ঞান একান্তই কোয়ান্টাম তত্ত্ব নির্ভর বিজ্ঞান।

এখন প্রশ্ন হলো বস্তু কণিকা যে তরঙ্গ তা কিসের তরঙ্গ? সমুদ্রের তরঙ্গ পানির ওঠা নামায়, সাধারণ শব্দের তরঙ্গ বাতাসের কম্পনে, তা হলে বস্তুর কোয়ান্টাম তরঙ্গ কিসের ওঠা-নামায়? এ তরঙ্গের চরিত্র নির্ধারণ করার নানা রকম চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্নের দেয়া ব্যাখ্যাটিই গৃহীত হয়েছে সেটির ব্যাপক এক্সপেরিমেন্ট সাফল্যের কারণে। এর মতে তরঙ্গটি হলো 'সম্ভাবনার তরঙ্গ' (প্রবাবিলিটি ওয়েইভ)। এক একটি জায়গায় এ তরঙ্গের উচ্চতা (এ্যামপ্লিচিউড) বলে দেয় ওইখানটিতে কণিকাটির অবস্থানের সম্ভাবনা কত? এভাবে একটি কণিকার গাণিতিক ভাবে নির্ণিত তরঙ্গের গ্রাফ অনুযায়ী যে জায়গায় তরঙ্গের উচ্চতা বেশি সেখানে কণিকাটি থাকার সম্ভাবনা বেশি, যে জায়গায় উচ্চতা কম সে জায়গায় থাকার সম্ভাবনা কম– নিশ্চিত করে একটি

জায়গায় কণিকাটি আছে তা কিন্তু এ তরঙ্গ বলেনা। আসলে আমরা উচ্চতা বলছি বটে, কিন্তু সম্ভাবনাটি নির্ধারিত হয় তরঙ্গের উচ্চতার বর্গের দ্বারা। তাহলে বাস্তবতাটি কী? গাণিতিক ভাবে বলতেই হয় যে কণিকাটি নানা জায়গায় কমবেশি ছড়িয়ে আছে অনেকটা কুয়াশার মত! যদি আমাদের পরিচিত বাস্তবতায় সত্যি সত্যি 'পর্যবেক্ষণ' করে দেখতে চাই কোন্ জায়গায় 'আসলে' কণিকাটি রয়েছে তা হলে একবার নয় অসংখ্যবার সেই পর্যবেক্ষণ করলে শতকরা যত ভাগ পর্যবেক্ষণে কণিকাটি একটি জায়গায় ধরা পড়বে ওখানেই তরঙ্গের উচ্চতা হবে শতকরা তত বেশি। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী সব পরীক্ষণে একই জায়গায় ওটি ধরা পড়বেনা, নানা পর্যবেক্ষণে নানা জায়গায় ধরা পড়বে; অবশ্য কোন জায়গায় এত বেশিবার পড়বে যে চিরায়ত দৃষ্টিতে আমরা সেখানেই এটি আছে বলে ধরে নিতে পারি। যখন এক জায়গায় বাস্তবেই ওটি পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে, তখন অন্যান্য নানা জায়গায় যে সম্ভাবনা তরঙ্গের নানা উচ্চতা সেগুলোর কী হয়? ধরে নেয়া হয় সে মুহূর্তে ওই তরঙ্গ 'চুপ্‌সে যায়'!

একটি অদ্ভুত অনিশ্চয়তাঃ

কোয়ান্টাম তত্ত্ব যে ক্ষুদ্র জগতে এক অদ্ভুত অনিশ্চয়তা তৈরি করে তা কণিকাকে কুয়াশার মত ভাবতে হবার মধ্যে আঁচ করা যায়। তবে এ অনিশ্চতয়তার আসল চরিত্রটি নির্ণয় করেছেন জার্মান বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ। ধরা যাক আমরা একটি কণিকার অবস্থানটি পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নির্ণয়ের চেষ্টা করছি। পর্যবেক্ষণের জন্য আলোর মত কিছু না কিছু প্রয়োগ করতে হবে যার শক্তির কারণে পর্যবেক্ষিত কণিকাটি কিছুটা হলেও হেলে যাবে– ফলে ওই নির্ণিত অবস্থানে কিছু অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে। এরকম শুধু অবস্থান নয়– এর বেগ ইত্যাদি সহ যা কিছুই আমরা নির্ণয় করতে চাইনা কেন তাতে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে।

এই অনিশ্চয়তা আমাদের পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার কোন দোষের কারণে হচ্ছেনা, যে কোন প্রক্রিয়ার এটি একটি অনিবার্য অংশ। হাইজেনবার্গ দেখালেন কোন কোন দুটি বিষয় এক সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে চাইলে একটির অনিশ্চয়তা কমাবার চেষ্টা করলে অন্যটির অনিশ্চয়তা অনিবার্য ভাবে বেড়ে যায়। যেমন যদি আমরা আলো ফেলে একটি ইলেকট্রনের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করি, অবস্থানকে নিখুঁত ভাবে জানার জন্য আমরা যথাসম্ভব ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘের আলো ব্যবহার করবো যাতে তরঙ্গ-দৈর্ঘের ভেতরে অবস্থানের অনিশ্চয়তা কম হয়। কিন্তু ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘের আলো মানে হলো অধিক শক্তিমান আলো; এটি কণিকাটির বেগের অনিশ্চয়তা

অবশ্যম্ভাবী ভাবে বাড়িয়ে দেবে। আর বেগের অনিশ্চয়তা কমাবার জন্য যদি কম শক্তির অর্থাৎ বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘের আলো ব্যবহার করি তা হলে ওই বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘের ভেতর অবস্থানটির অনিশ্চয়তা বেড়ে যাবে। এই উভয় সংকটের একটি গাণিতিক রূপ হাইজেনবার্গ দিয়েছিলো এভাবে:

অবস্থানের অনিশ্চয়তা×বেগের অনিশ্চয়তা= প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক

গুণফলটি যেহেতু সব সময় সমান থাকতে হচ্ছে একটির অনিশ্চয়তা কমলে অন্যটির বাড়ে। এটিই হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি, যা এড়ানোর কোন রাস্তা বিজ্ঞানের নেই। উদাহরণ স্বরূপ একটি ইলেকট্রনকে একটি বাক্সের মধ্যে রেখে বাক্সটি ক্রমেই যত ছোট করতে থাকি তার অবস্থানের অনিশ্চয়তা তত কমে বটে কিন্তু তার ফলশ্রুতিতে ইলেকট্রনটির বেগ ততই অনিশ্চিত হতে থাকবে। অনেক বাড়াকমা ঘটবে সেই বেগের, এবং ইলেকট্রনের সাইজ মত কাছাকাছি সাইজের বাক্সে ইলেকট্রনটিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে রাখার চেষ্টা করলে অসম্ভব উচ্চ বেগ (প্রায় অসীম) লাভ করবে। এ কারণেই দুই ফাটল এক্সপেরিমেন্টে ইলেকট্রনটি এই ফাটল দিয়ে যাচ্ছে (সে মুহূর্তে ওখানে নিশ্চিত ভাবে অবস্থান করছে), নাকি ওই ফাটল দিয়ে যাচ্ছে তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। অবস্থান ওভাবে নির্দিষ্ট করলে তার বেগ প্রায় অসীম হয়ে পড়ে বলে তা করা যায়না। পরমাণুর গঠনের যে চিত্রটি গত শতাব্দীর প্রথম দিকে বজায় ছিল তাতে ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট কক্ষে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে এমনটিই আমরা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু এরকম নির্দিষ্ট কক্ষে থাকা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি অনুযায়ী সম্ভব না হওয়াতে ইলেকট্রনের কয়েকটি কুয়াশা-সদৃশ ছড়ানো বলয়ই (অরবিটাল) বরং কোয়ান্টাম তত্ত্ব নির্ণয় করেছে– কিন্তু তাতেই এটমের এবং প্রকারান্তে সব বস্তুর সব আচরণ সুন্দর ব্যাখ্যা করা চলে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্য সবকিছুর মতো এই অনিশ্চয়তাটিও শুধু ক্ষুদ্র জিনিসের ক্ষেত্রে ধর্তব্য।

একই যুক্তিতে হাইজেনবার্গ দেখিয়েছেন একই রকম অনিশ্চয়তা অন্য ক্ষেত্রেও ঘটে– যেমন কণিকার শক্তির অনিশ্চয়তা এবং সেই শক্তি পরিমাপের সময়ের অনিশ্চয়তার মধ্যে একই রকম দেয়ানেয়া আছে, একটি বাড়লে অন্যটি কমে। এখানে হাইজেনবার্গের একই রকম নিয়ম হলো:

শক্তির অনিশ্চয়তা × শক্তি পরিমাপে সময়ের অনিশ্চয়তা= প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক

এর ফলেও অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে থাকে। একটি উঁচু বাধার এপারে যদি বাধা থেকে কম শক্তির একটি ইলেকট্রন থাকে তা হলে চিরায়ত নিয়মে এই

ইলেকট্রনের পক্ষে বাধাটি অতিক্রম করে ওপারে যেতে পারার কথা নয়। কিন্তু যদি খুব কম অনিশ্চয়তার ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে পারে তা হলে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি অনুযায়ী এই ইলেকট্রনের শক্তির অনিশ্চয়তা অসম্ভব রকমের বেড়ে যাবে এবং যখন এ অনিশ্চয়তা তাকে বাধা পার হবার মত শক্তিতে নিয়ে যাবে তখন সে বাধা ঠিকই পার হবে। এই ব্যাপারটির নাম দেয়া হয়েছে টানেলিং, কারণ আমাদের চিরায়ত ধারণায় মনে হবে যেন ইলেকট্রনটি বাধার তলায় সুড়ঙ্গ (টানেল) খুঁড়ে বাধা পার হয়েছে। এ সবই এক রকম অদ্ভুত রীতিমত ভৌতিক ব্যাপার মনে হতে পারে। কিন্তু মজার কথা হলো এর সবই বাস্তবে প্রমাণিত বিষয়। যেমন এই টানেলিং এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি 'টানেল ডায়োড' আমরা যে কোন ইলেকট্রনিক্স এর খুচরা দোকানে পাই এবং নিয়মিত ব্যবহার করি। শুধু তাই নয়, শক্তি ও সময়ের এই অনিশ্চয়তার লেনদেনের সুযোগেই শূন্য থেকে সৃষ্টি হতে পারে দুটি শক্তি-কণিকার যা আবার আইনস্টাইনের শক্তি-ভর সমীকরণ অনুযায়ী একটি বস্তু-কণিকা এবং তার একটি প্রতি-কণিকার যুগলে পরিণত হতে পারে। মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে শূন্য থেকে বিশ্ব সৃষ্টির পেছনে ওই অনিশ্চয়তার নীতির সুযোগই কাজ করেছে বলে মনে করা হয়।

অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী শ্রোয়েডিঙ্গার কোয়ান্টাম তত্ত্বে সম্ভাবনার তরঙ্গের, এবং সময়ের সঙ্গে তার বিকাশের, একটি চমৎকার সমীকরণ দিয়েছেন– শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ। এই সমীকরণ সমাধান করে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী বাস্তব সব জিনিসের মান নির্ণয় করা সম্ভব যা পরিমাপের সঙ্গে মিলে যায়। কোয়ান্টাম তত্ত্বের মৌলিক ধারণাগুলোকে আমাদের পরিচিত ধ্যান-ধারণার নিরিখে রীতিমত ভৌতিক মনে হয়, ক্ষুদ্র পর্যায়ে লুডুর ছক্কা ফেলার মত এক রকম অনিশ্চয়তা এর ভিত্তিমূলে কাজ করছে; কিন্তু এর সুনির্দিষ্ট গাণিতিক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো প্রকৃতির বাস্তব তথ্য ও ঘটনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। অন্য কোন ভাবে, যেমন চিরায়ত পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী, ওই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সম্ভব হয়নি। কাজেই আমাদের বোধ-শক্তির কাছে অদ্ভুত মনে হলেও কোয়ান্টাম তত্ত্বই পারছে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে।

বিবর্তনে গড়া মন

পরিস্কার স্লেট নয়, লেখা ভরা স্লেটঃ

ষাট-সত্তর বছর আগেও মনোবিজ্ঞানটি ছিল সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির। তখন জন্মকালীন মানুষের উপমা দেয়া হতো 'পরিস্কার স্লেট' হিসেবে, যেহেতু ধরে নেয়া হতো মনের দিক থেকে তাকে যে কোন দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সেই নিয়ে যাওয়াটি ঘটে সামাজিক প্রভাবে– লালনপালন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রমে সেই 'পরিস্কার স্লেটে' দাগ কাটতে কাটতে। ইতোমধ্যে এ ধারণায় বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে অতীতে বিবর্তিত ডিএনএ প্রত্যেকের মস্তিষ্ককে যেভাবে গড়েছে সেটিই সৃষ্টি করছে তার মন ও আচরণকে। ওই সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব যে তাতে নেই তা নয়, কিন্তু তাও স্থির হয় যার যার ডিএনএ'র মধ্যস্থতাতেই। কাজেই 'পরিস্কার স্লেট' নয়, মানুষ জন্মগত ভাবেই ডিএনএ'র ভাষায় লেখা একটি ভরা স্লেট– আর সেখানেই নিহিত আছে তার মনের চাবিকাঠি।

১৮ শতকে মেন্ডেলের দৈহিক-মানসিক বৈশিষ্ট বহনকারী ক্ষুদ্র কণার মতো 'জিনে'র ধারণা ও তার কিছু নিয়ম কানুন আবিষ্কার সত্ত্বেও গত শতাব্দীর শুরুতেও ব্যাপারটি নানা ভুল তত্ত্বের প্রভাবে ছিল। অবশেষে ১৯৪৪ সালে আবিষ্কৃত হয় যে প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক কোষের নিউক্লিয়াসে থাকা ক্রোমোজোমের অংশ ডিএনএই হলো মেন্ডেলের সেই জিন। আর ১৯৫৩ সালে ওয়াটসন ও ক্রিকের ডিএনএ'র গঠন উদ্ঘাটনের যুগান্তকারী ঘটনাটি (যার উল্লেখ এই বইয়ের শুরুতে আছে) বংশগতির পুরো প্রক্রিয়াটি খোলাসা করার রাস্তা খুলে দিলো। এ রাস্তা জীবন-রহস্য উদ্ঘাটনের রাস্তা।

দেখা গেলো ডিএনএ পরস্পরের চারিদিকে কুণ্ডলি আকারে পেঁচানো দুটি সর্পিল সূত্র এবং তাদের উভয়ের মধ্যে জোড়া জোড়া ধাপের সারিতে তৈরি দীর্ঘ সরু একটি অণু। ওই ধাপগুলো চারটি 'বেইস' নামক অণু-অংশে গড়া– আদ্যাক্ষর অনুযায়ী যাদের নাম A,T,C ও G। প্রত্যেক ধাপে A শুধু T এর সঙ্গে এবং C শুধু G এর সঙ্গে জোড় বাঁধতে পারে বলে A ও T কে পরস্পরের সম্পূরক বলা যায় C ও G কেও তাই। এই জোড় সহজে ভেঙ্গে গিয়ে কুণ্ডলি খুলে দুই সূত্র সহজে আলাদা হতে পারে, আবার আগের মত একত্রও হতে পারে। তখন জোড়ের একটি বেইস এই সূত্রের সঙ্গে এবং অন্য বেইসটি বাকি সূত্রটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। প্রত্যেক সূত্রের সংলগ্ন ওই চারটি বেইস A, T, C ও G কোন্‌টির

পর কোন্‌টি আছে সেই বেইস-ক্রমটিই (বেইস সিকোয়েন্স) ডিএনএ'র ভাষা– জীবের বৈশিষ্ট ওই বেইস-ক্রম অনুযায়ী কোডবদ্ধ রয়েছে। সোজা হিসেবে বলতে গেলে এই ডিএনএ'র এক একটি ছোট নির্দিষ্ট অংশের বেইস-ক্রমই এক একটি জিন এবং সেই জিন ঠিক করে দেয় জীবের এক একটি বৈশিষ্ট। সেটি গায়ের রঙের বা মুখের গড়নের মত দৈহিক বৈশিষ্ট যেমন হতে পারে তেমনি ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, সহানুভূতিশীল হবার মত আচরণগত বৈশিষ্টও হতে পারে। এভাবেই জিন বংশধারায় বৈশিষ্টগুলোকে বহন করে।

বংশধারায় জীবন-রহস্যের বাহক হতে হলে ডিএনএর কয়েকটি অপরিহার্য গুণ থাকতে হবে। একে সহজে বার বার হুবহু নকল হয়ে নতুন প্রত্যেক কোষে যাবার মত এবং সন্তানের কাছে যাবার মত প্রতিলিপি তৈরি করতে হয়। এই প্রতিলিপির বিশ্বস্থতার কারণেই কোটি কোটি বছর ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রায় একই ডিএনএ বিবর্তনে কিছু পরিবর্তন সহ নানা জীবে বজায় থাকতে পেরেছে। আরো বড় কথা ডিএনএতে জীবের দৈহিক ও আচরণগত সব বৈশিষ্টের বার্তা বহন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে, এবং সেই বার্তা জীবের জীবনে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। এর প্রত্যেকটিই জটিল কাজ; কী প্রক্রিয়ায় এগুলো সম্ভব হয় তা খুবই সুকৌশলে কিছু এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে নির্ণিত হয়েছে। জীববিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে যে রকম যুগান্তর এসেছে এগুলো তার ভাল উদাহরণ।

প্রথমে প্রতিলিপি হওয়ার বিষয়টি দেখা যাক। নকল হবার সঠিক সময়ে বিশেষ এনজাইম (শরীরে নানা রাসায়নিক কাজ করার মত প্রোটিন) কুণ্ডলি খুলে ডিএনএ'র দুটি সূত্রকে আলাদা করে দেয়। তখন প্রত্যেক সূত্রের বেইসগুলোর সম্পূরক বেইস (A এর সম্পূরক T ইত্যাদি) তাদের পাশে পাশে বসে, এবং ফলে একটি নতুন সূত্র তৈরি হয়ে যায়। এর জন্য বিপুল সংখ্যায় সব রকম বেইস তার সংলগ্ন ডিএনএ অংশ সহ কোষের নিউক্লিয়াসেই মজুদ থাকে জীবের খাওয়া খাদ্য থেকে এসে। একটি পুরানো সূত্র এবং তার পাশে সদ্য তৈরি নতুন সূত্র মিলে আবার কুণ্ডলি পাকিয়ে একটির জায়গায় দুটি ডিএনএ কীভাবে তৈরি হতে পারে তা একাধিক ভাবে সম্ভব। এর মধ্যে কোন্‌টি সঠিক তা আবিষ্কৃত হয়েছে এক অনবদ্য এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে।

এ জন্য ই-কলাই ব্যাকটেরিয়াকে সাধারণ নাইট্রোজেন গঠিত পুষ্টিদ্রব্যের বদলে ভারী নাইট্রোজেন গঠিতগুলো দেয়া হয়েছে। ফলে এদের কোষে খাদ্য থেকে যে সব নতুন ডিএনএ উপাদান যাচ্ছে সেগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ভারী। এ

অবস্থায় পুরানো দুই সূত্রের বিপরীতে নতুন যে দুটি সম্পূরক সূত্র তৈরি হয় সেগুলো পুরানো দুটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভারী। নতুন ডিএনএ তৈরি হবার পর সব ডিএনএ ব্যাকটেরিয়া থেকে নিষ্কাশন করে তাকে একটি সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে খুব দ্রুত ঘোরানো হয়। তরল মিশ্রণে ভারী অংশকে হালকা অংশ থেকে আলাদা করার জন্য এ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। একেবারে শোয়ানো অবস্থার টেস্ট টিউবে রেখে তরলটিকে দ্রুত ঘোরালে হালকা অংশ টেস্টটিউবে দূরবর্তী কিনারায় ঘূর্ণনের কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে জমে, আর যত ভারী হবে সেগুলো তত নিকটবর্তী বা কেন্দ্রের দিকে জমে। যেমন রক্তের স্যাম্পলে বিভিন্ন রক্তকোষ আলাদা করার জন্য এরকম যন্ত্রই ব্যবহার করা হয়। ওভাবে ঘোরানোর পর দেখা গেল যে ব্যাকটেরিয়ার সব ডিএনএ ঘূর্ণনের কেন্দ্র থেকে দূরেও নয় কাছেও নয়, মাঝামাঝি দূরবর্তী জায়গায় জমেছে। তাতে প্রাথমিক ভাবে মনে হলো যে সব ডিএনএতেই পুরোনো হালকা সূত্র নতুন ভারী সূত্রের সঙ্গে জোড় বেঁধে মাঝামাঝি ওজন লাভ করেছে।

ব্যাকটেরিয়া দেহে থাকা ডিএনএকে আবার প্রতিলিপি তৈরি করতে দেয়া হলো। কিন্তু তার আগে এবার তাকে খাওয়ানো হলো স্বাভাবিক হালকা নাইট্রোজেন গঠিত পুষ্টিদ্রব্য; ফলে এখন তার কোষে ডিএনএ উপাদানগুলো হালকা, এবং তাই এবার প্রতিলিপি হবার সময় নতুন সম্পূরক দুটি সূত্র হালকা। আগের বার থেকে যা মনে করা হয়েছে সে রকম নতুন সূত্র যদি পুরানো সূত্রের সঙ্গে জোড় বাঁধে তা হলে যেখানে পুরানো হালকা সূত্রের সঙ্গে নতুন হালকা সূত্র জোড় বেঁধেছে যেখানে ডিএনএ হবে হালকা, আর যেখানে পুরানো ভারী সূত্রের সঙ্গে নতুন হালকা সূত্র জোড় বেঁধেছে তা হবে আগের বারের মত মাঝারি ওজনের। এমনটিই যদি হয় তা হলে সেন্ট্রিফিউজে ডিএনএ এবার দু'জায়গায় জমবে– হালকাগুলো নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং মাঝারি ওজনেরগুলো আগের বারের মত মাঝামাঝি জায়গায়। আসলেও ঠিক তাই হয়েছে। কাজেই এই এক্সপেরিমেন্টে ভাল ভাবেই প্রমাণিত হলো একটি পুরানো সূত্র ও একটি নতুন সূত্র জোড় বাঁধে ও পরস্পর কুণ্ডলি পাকিয়ে পূর্ণ ডিএনএ হয়। এর অন্য যে বিকল্পগুলো আছে সেগুলো এই এক্সপেরিমেন্টের দ্বারা বাতিল হলো। এভাবেই একটি ডিএনএ দুটি, এই দুটি পরে চারটি, এভাবে হয়ে হয়ে ডিএনএ প্রতিলিপি হতে থাকে। আগের ডিএনএতে যে বার্তা, নতুনগুলোতেও থাকে সেই একই বার্তা।

ডিএনএ'র বার্তা কীভাবে জীবের দেহ বা আচরণ তৈরিতে বাস্তবায়িত হয় সেটি বুঝলেই জানবো ডিএনএকে সেজন্য কী করতে হয়। জীবের ওই সব বৈশিষ্টই

আসলে অনেক রকমের প্রোটিনের নানাটির সৃষ্টি। বার্তার কাজ হলো সেই প্রোটিন তৈরি করা। একটি প্রোটিন আবার মূলত ২০ রকম এমাইনো এসিড নামক অণুর কয়েকটির নানা পরম্পরায়ে গড়া শেকল থেকে তৈরি। এই শেকলে কোন্‌টির পর কোন্‌ এমাইনো এসিড থাকবে তা নির্দিষ্ট করে দেয় একটি প্রোটিনের গঠন। এক রকমের এক্সপেরিমেন্টে দেখা যায় ডিএনএ'র একটি সূত্রের মত প্রায় একই রকম গঠনের আরএনএ নামের অন্য যে অণু জীবকোষের নিউক্লিয়াসের সাধারণত থাকার কথা, তা ক্ষেত্র বিশেষে নিউক্লিয়াসের বাইরে রিবোজোম নামক অংশের আশপাশে বেশি দেখা যাচ্ছে। তার থেকে আরো বোঝা গেল ওই আরএনএগুলো ডিএনএ থেকে বার্তার ছাপ সম্পূরক বেইস-ক্রম হিসেবে ধারণ করে রিবোজোমে আসে। ওখানে এর এক একটি গুচ্ছ অর্থাৎ বেইস-ক্রমের পর পর কয়েকটি বেইসের সঙ্গে ফিট করতে পারে ২০টি এমাইনো এসিডের মধ্য থেকে বিশেষ একটি। এভাবে ওই গুচ্ছ অনুযায়ী পর পর যথাযথ এমাইনো এসিডের শেকল তৈরি হয়ে সঠিক প্রোটিনটি তৈরি হয়। এমনি করে ডিএনএ'র বার্তা এমন প্রোটিন তৈরি করে দেয় যা ঠিক সেই বৈশিষ্টটি জীবকে দিতে পারে শরীরের সেই অংশকে ওভাবে গঠন করার মাধ্যমে।

ডিএনএর বার্তার যে ভাষা তাতে বেইসকে যদি 'অক্ষর' বলি এই গুচ্ছ হবে 'শব্দ'; কিন্তু বার্তার ওই শব্দগুলো কী রকম? এ 'শব্দ' তৈরির 'অক্ষর' কিন্তু মোটে ৪টি– ওই A,T,C ও G। একটি অক্ষরেই যদি একটি শব্দ হতো তা হলে শব্দ পেতাম মাত্র ৪টি। পর পর দুটি অক্ষরে যদি তা হতো তাও পেতাম শুধু ১৬টি। কিন্তু ২০টি এমাইনো এসিডের সঙ্গে ফিট করার জন্য শব্দ দরকার অন্তত ২০টি। তাই অন্তত ৩টি অক্ষর প্রয়োজন প্রত্যেক শব্দে। একটি অদ্ভুত ব্যাপার বোঝা গেল যে এই শব্দগুলোর মাঝে কোন ফাঁক নেই– এক নাগাড়ে চলতেই থাকে। এক্সপেরিমেন্টে দেখা গেল ডিএনএ বেইস-ক্রমে শুরুর একটি বেইস নষ্ট করে দিলে এর বার্তা বাস্তবায়নের পুরোটাই গোলমাল হয়ে যায়। বোঝা যায় যে শুরুর নষ্ট বেইসের কারণে প্রোটিন তৈরির সময় বার্তা গড়া শুরু করার জায়গাটি ভুল হচ্ছে বলে সব শব্দ ও সব বার্তা গুবলেট হয়ে যাচ্ছে। শুরুর ২টি অক্ষর নষ্ট করে দিলেও একই রকম হয়। কিন্তু শুরুর ৩টি বেইস নষ্ট করে দিলে এরকম পুরো বাস্তবায়ন ভেস্তে যায়না, মোটামুটি সঠিক থাকে। অথচ ৪টি বেইস নষ্ট করলে আবার সব ভেস্তে যায়। স্পষ্টত ১ বা ২টি বেইস নষ্ট করলে পড়া শুরুটি ভুল জায়গা থেকে হয় বলে সব শব্দই গোলমাল হয়ে অর্থ হারায়। কিন্তু ৩টি বেইস নষ্ট করলে একটি পুরো শব্দ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাকি সব শব্দ ঠিক থাকে।

এতে বোঝা গেল পর পর ৩টি বেইস নিয়েই তৈরি হচ্ছে বার্তার একটি শব্দ– সব সময় শুধু ৩টি বেইসই।

৪টি বেইস তিনটি তিনটি করে ৬৪ ভাবে সাজানো যায় বলে মোট শব্দ হতে পারে ৬৪টি। কোডিং করতে পারে বলে এই 'শব্দকে' আসলে বলা হয় এক একটি কোডন। ২০টি এমাইনো এসিডের সঙ্গে ফিট করার জন্য কোডন রয়েছে ৬৪টি। তাই কোন কোন এমাইনো এসিড একাধিক কোডনকে ফিট করতে পারে– যেমন AAA এবং AAG এই দুটি কোডন লাইসিন নামের এমাইনো এসিডকে গ্রহণ করতে পারে। তারপরও যে কয়েকটি কোডন উদ্বৃত্ত থাকে সেগুলো ব্যবহৃত হয় বার্তার 'প্রারম্ভ' বোঝাতে এবং বার্তার 'সমাপ্তি' বোঝাতে। কোন্ কোডন কোন্ এমানো এসিড বোঝাবে তার যে সুনির্দিষ্ট 'অভিধান' তা খুব ছোট– মাত্র ৬৪ 'শব্দের' বা কোডনের। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হলো প্রমাণিত হয়েছে যে এই অভিধান সকল জীবের জন্য হুবহু একই– ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সবার জন্য একই। একই রকমের বার্তাগুলো একই রকমের প্রোটিন তৈরির মাধ্যমে সবার জন্য কাজ করছে। বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী সব জীব যে একটিই পূর্বসূরী জীবের থেকে বিবর্তিত হয়েছে তার এর থেকে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

জীবের দেহের প্রত্যেকটি কোষে তার বৈশিষ্টগুলো এভাবেই ডিএনএতে লেখা থাকে। সোজা হিসেবে এক একটি বৈশিষ্টের জন্য এক একটি জিন বা বার্তা– 'প্রারম্ভ' কোডন দিয়ে শুরু হয়ে পর পর বেশ কিছু কোডনে গড়া, তারপর 'সমাপ্তি' কোডন দিয়ে শেষ হয় এটি। এভাবে ডিএনএতে জিনের পর জিন তার সব বৈশিষ্ট নির্ধারিত করে দেয়। সবগুলো জিন মিলে সেই 'লেখায়' ভর্তি 'শ্লেট' নিয়ে জীব জন্ম নেয়, সবই তার পূর্বসূরীদের থেকে পাওয়া।

মানব জেনোম প্রকল্পঃ

একটি জীবের ডিএনএতে সব জিনকে এক সঙ্গে বলা হয় জেনোম। আমরা যদি জেনোমের পাঠোদ্ধার করতে চাই, অর্থাৎ দেখতে চাই কোন জীবের ডিএনএতে সব জিন কী ভাবে আছে, তার বেইস-ক্রমটি কী– সে কাজ মোটেই সহজ হবেনা। ডিএনএ জিনিসটাইতো আণবিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র, এর মধ্যে কোথায় কী আছে তা দেখার কোন উপায় নেই। কিন্তু ডিএনএ বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক উন্নয়নের মধ্যে জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে তারও বিস্তারিত উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে। শুরুতে খুবই কঠিন প্রক্রিয়ায় শুধু খুব সরল কিছু জীবের ক্ষেত্রে এটি সম্ভব হয়েছিলো।

কিন্তু পরে প্রক্রিয়া এতই এগিয়েছে এবং এতই স্বয়ংক্রিয় হয়েছে যে এর ভিত্তিতে মানুষের পুরো জেনোম উদ্ঘাটনের মত একটি উচ্চাকঙ্খী প্রকল্প নেয়া সম্ভব হয়েছে, এবং ২০০০ সালে তা প্রাথমিক ভাবে সমাপ্তও হয়েছে এই উদ্ঘাটনের মাধ্যমে। এরপর আগাগোড়া ডিএনএর বেইস-ক্রমে সব জিনগুলো চিহ্নিত করার এবং সেগুলোর কাজ জানার দুরূহ কাজটি আরো অনেক দূর এগিয়েছে।

জিন চিহ্নিত করার প্রথম পদক্ষেপ হলো বেইস-ক্রমটি উদ্ঘাটন করা– অর্থাৎ ডিএনএ'র ভাষা 'পড়তে' পারা। বেশ কিছু বছর আগে এটি করার অভূতপূর্ব কিছু কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে যার কার্যকারিতা এখন আরো অনেক বেড়েছে। এর একটি কৌশলে মূলত ডিএনএ'টির নানা অংশের অনেক প্রতিলিপি তৈরি করে সেগুলোর প্রত্যেকটিকে সম্ভাব্য সব রকম জায়গায় রাসায়নিক ভাবে কেটে ফেলা হয়। এভাবে ডিএনএটির যত রকম দৈর্ঘের টুকরা হতে পারে, এর মধ্যে সব ক'টিরই বিপুল সংখ্যক প্রতিলিপি থাকবে। এ সব টুকরার প্রত্যেকটির বেইসক্রমে শেষ বেইসটি হয় A হবে, বা T হবে, বা C হবে বা G হবে। রাসায়নিক ভাবে এমন উপায় রয়েছে যে A তে শেষ হওয়া যাবতীয় টুকরাগুলোকে একটি আলাদা টেস্টটিউবে নিয়ে আসা যায়, এমনি ভাবে T তে, G তে এবং C তে শেষ হওয়া সবগুলোকে আলাদা আলাদা টেস্ট টিউবে নিয়ে চারটি টেস্ট টিউবে টুকরাগুলো ভাগ করে রাখা হলো। প্রত্যেকটির টুকরাগুলোকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে রাখলে সব থেকে বেঁটে টুকরার প্রতিলিপিগুলো সব থেকে দূরে এবং সব থেকে দীর্ঘ টুকরার প্রতিলিপিগুলো সব থেকে কাছে– এবং মাঝখানে বাকিগুলো দৈর্ঘ অনুযায়ী একটি কলামে সাজানো হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি দৈর্ঘের টুকরার অনেক প্রতিলিপি হওয়াতে তাদেরকে কলামের নিজ নিজ স্থানে একসঙ্গে দৃশ্যমানও করে তোলা যায়।

ওই দৃশ্যমান কলাম চারটির ওপর এক সঙ্গে নজর রাখলে সব চেয়ে বেঁটে টুকরাটি কোন্ কলামে আছে সেটি খুঁজে নিয়ে দেখা যায় সেটি কোন্ টেস্টটিউব থেকে এসেছে, যদি A তে শেষ হওয়াটি থেকে আসে তাহলে ডিএনএ'র প্রথম বেইসটি হলো A। এর পরের দীর্ঘতর টুকরাটি কোন্ কলামে আছে সেখান থেকে বেইস-ক্রমের দ্বিতীয় বেইসটি পাওয়া যায়। এমনি ভাবে পর পর দীর্ঘতরগুলো খুঁজে নিয়ে পর পর বেইসগুলোও জানা যাবে– এবং পুরো বেইস-ক্রমটিই উদ্ঘাটিত হবে। এই মূল কৌশলটিই এখন অনেক উন্নত, অনেক সহজ ও অনেক স্বয়ংক্রিয় হয়েছে। কাজেই ডিএনএ'র বেইস-ক্রম এখন পড়া সম্ভব।

শুরুতে সরল জীবগুলোর ক্ষেত্রে এটি করে এখন মানব জেনোম প্রকল্পেও তা ব্যবহার করা হয়েছে।

তারপর যেটি বড় কাজ তা হলো দীর্ঘ ডিএনএ'র একটানা বেইস-ক্রমে এক একটি জিনকে চিহ্নিত করা। জিন শুরুর প্রারম্ভ কোডন, জিন শেষের সমাপ্তি কোডন এবং আরো কতগুলো আলামত দেখে খুবই কষ্টসাধ্য উপায়ে এটি করা যায়। কাজটি আরো বেশি কঠিন হয় এজন্য যে অর্থপূর্ণ বার্তা দেয়া এসব জিনের ফাঁকে অনেকখানি ডিএনএ থাকে যার কোন অর্থ নেই– যেন আবোল-তাবোল কিছু। এমনকি একটি জিনের মাঝখানেও এ রকম থাকে; আর এরকম আবোল-তাবোল অংশই অর্থপূর্ণ অংশের থেকে অনেক বেশি। এসবের মধ্য থেকেই জিনগুলো চিহ্নিত করতে হয়, নানা কৌশলে। জিন চিহ্নিত করার পরই আসল কাজটি করা যায়– সেই জিনের কাজটি উদ্ঘাটন করা, অর্থাৎ সেই জিন কোন্ বৈশিষ্টের জন্য দায়ী তা বের করা। সরল জীবগুলোতেই এটি করা হয়েছে প্রথমে। একটি জিনের একাধিক পরিবর্তিত রূপ থাকলে এবং জীবের প্রকৃত কোন্ বৈশিষ্টে এর ফলে পার্থক্য হচ্ছে তা নির্ণয় করতে পারলে এ কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। উল্টো ভাবে প্রকৃত কোন বৈশিষ্টে জীবের বিভিন্ন সদস্য আলাদা হলে যেমন কারো রঙ কালো, কারো খয়েরি হলে কোন্ জিনে তাদের সামান্য প্রভেদ তা বের করার চেষ্টা করা যায় তখন ধারণা করা যায় যে হয়তো ওই জিনটিই গায়ের রঙের জন্য দায়ী। অনেক সময় নানা রাসায়নিক পদার্থ, তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ ইত্যাদি প্রয়োগ করে ইচ্ছে করে কোন জিনে পরিবর্তন ঘটিয়ে তার বাস্তব ফল কী হয় দেখা যায়– বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্মে এই পরিবর্তিত জিন কী করে তা দেখা হয়। ওই যে একই জিনে সামান্য পরিবর্তন তা প্রায়ই ঘটে জিনটির একটি বেইস বাদ গিয়ে, নতুন একটি যোগ হয়ে বা বদল হয়ে। এভাবে যে পরিবর্তন তাকে মিউটেশন বলে– সেটি দৈবাৎ প্রাকৃতিক ভাবে হতে পারে অথবা উল্লিখিত ভাবে ইচ্ছে করে তা সৃষ্টি করা যায়। বোঝাই যাচ্ছে জিনের পরিবর্তনের সঙ্গে বাস্তব বৈশিষ্টে পরিবর্তন মিলিয়ে মিলিয়ে জিনের কাজ নির্ণয় কঠিন ও সময় সাপেক্ষ একটি চেষ্টা।

এই কঠিন কাজটি অনেক সহজ হচ্ছে সরল থেকে জটিল সব রকমের জীবের জিনগুলোর মধ্যে অদ্ভুত রকম মিল থাকার কারণে। তাই সরলতর জীবগুলোর অনেক জিনের কাজ ইতোমধ্যে উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে বলে সেটিই মানুষের মধ্যে সদৃশ জিনের কাজের খবর দিতে পারছে। অবাক কাণ্ড হলো কোন কোন কীট, অণুজীব, এমনকি রুটি তৈরিতে ব্যবহৃত ঈষ্টের মত অতি সরল জীবের কোন

বৈশিষ্টের সঙ্গে মানুষের বৈশিষ্টের একটি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় এবং তার থেকে মানুষের অনুরূপ জিনের অর্থ খুঁজে পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে সেই জিনের পরিবর্তন হলে মানুষের মধ্যে কী বৈশিষ্ট বদলায় বা অসুখ দেখা দেয় তাও খুঁজে পাওয়া যায়।

এই কাজে খুব বেশি সহায়ক হচ্ছে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিষয় বায়ো-ইনফর্মেটিক্স। আসলে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞান গবেষণার চিরায়ত রূপটিই অনেক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ভাবে বদলে দিয়েছে। তার কিছু কিছু আমরা এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখবো। বায়ো-ইনফর্মেটিক্স এক্ষেত্রে জেনোমের পাঠোদ্ধার, জিন চিহ্নিত করা, এক একটি জিনের কাজ উদ্ঘাটন করা ইত্যাদি কাজকে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে এসেছে। এতে সরল জীবের ইতোমধ্যে উদ্ঘাটিত জেনোম পাঠোদ্ধার, চিহ্নিত জিন ও তাদের কাজ ইত্যাদির তথ্য বিশেষ ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা হয়। খুবই পারদর্শী কিছু সফ্টওয়্যার সেই তথ্য ব্যবহার করে উল্লিখিত কাজগুলো অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মানব জেনোমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। যেমন মানুষের জিনের সদৃশ কোন জিন কোন্ জীবে আছে এবং সেখানে সেটি কোন্ কাজ করে তা তড়িৎ গতিতে নির্ণয় করতে পারে এই সফ্টওয়্যার। সরল জীবের ওই জিন মানুষের মধ্যে ঠিক একই কাজ না করলেও দেখা যায় যে ওখান থেকে অনুসন্ধানের জন্য একটি ইঙ্গিত প্রায়ই পাওয়া যায়। যেমন সমুদ্র তলে থাকা আইস ফিশ নামক মাছের হাড় হালকা হওয়ার জিনের সদৃশ একটি জিন মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে যার মিউটেশন মানুষের হাড়-ঝাঁঝরা রোগের জন্য দায়ী।

প্রাথমিক মানব জেনোম প্রকল্পের পর আরো গবেষণার ফলে পুরো মানব জেনোমে জিনের সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে ২২ হাজারের মত। সংখ্যাটি অন্য প্রাণীর থেকে যে খুব বেশি তা কিন্তু নয়। এসব জিনের অনেকগুলোর কাজের উদ্ঘাটন হয়েছে, বাকিগুলোর চেষ্টা চল্ছে। এই প্রকল্পের উন্নয়নের ফলে এখন অপেক্ষাকৃত অনেক সহজে ও সুলভে যে কোন মানুষের সম্পূর্ণ জেনোম উদ্ঘাটন করা সম্ভব হচ্ছে। পৃথিবীর নানা অংশে বাসকারী বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার নানা মানুষের জেনোম উদ্ঘাটন করে দেখা গেছে যে মানুষে মানুষে জিন-বৈচিত্র খুবই কম গড়পড়তা মাত্র ০.১% এর মত। আর সেই বৈচিত্রও এক একটি গোষ্ঠি বা জাতিসত্ত্বার মধ্যে যতখানি বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার মধ্যে ততটা নয়। আগে যে মনে করা হতো বিভিন্ন মানবগোষ্ঠির জেনেটিক পরিচয়ে যথেষ্ট অনন্যতা আছে, তা

ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষে মানুষে জিন পার্থক্যগুলো প্রান্তিক ধরনের। তবে পরিবেশগত নানা কারণে জিন-প্রকাশের তারতম্য একই জিনের বাস্তবায়নে পার্থক্য ঘটাতে পারে। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে জিন-পার্থক্য তুলনামূলক ভাবে বেশি। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় মানুষের সঙ্গে যেই প্রাণীর এই পার্থক্য সব চেয়ে কম সেই শিম্পাঞ্জির জেনোম আর মানুষের জেনোমে মাত্র ১.২% জিন আলাদা। আসলে প্রাণী হিসেবে শিম্পাঞ্জির সঙ্গে মানুষের যে বিশাল অমিল তা যতটা না জিন-পার্থক্যের কারণে সৃষ্টি হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে জিন-প্রকাশের তারতম্যের কারণে।

জিনের মধ্যে থাকা বার্তা যে সব সময় প্রকাশিত হয়না সেটি বোঝা যায় যখন দেখি প্রত্যেক অঙ্গের কোষে সব ডিএনএ (সব জিন) থাকা সত্ত্বেও সেই অঙ্গে তার সব বৈশিষ্ট থাকেনা। যেমন চামড়ার কোষে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণকারী জিনগুলোও আছে, কিন্তু সেখানে ওসব অপ্রয়োজনীয় বলে সেগুলো প্রকাশিত হয়না। প্রকাশিত হবার বা না হবার মাত্রা ঠিক করে দেবার জন্য একটি ব্যবস্থা ডিএনএ'র সঙ্গেই থাকে। যে পার্থক্য সরাসরি জিনের কারণে অর্থাৎ বেইস-ক্রমের কারণে ঘটেনা, বরং জিনের প্রকাশিত হবার মাত্রার ওপর নির্ভর করে সেগুলোকে 'জেনেটিক' (জিন ঘটিত) না বলে বলা হয় 'এপিজেনেটিক' (জিনের অতিরিক্ত কারণে ঘটিত)। সাধারণত জিনে ডিএনএ'র সঙ্গে থাকা কিছু রাসায়নিক সংযোগের কমবেশি হওয়াটাই প্রকাশের মাত্রা ঠিক করার কারণ হয় এবং এতে মধ্যস্থতা করে জিনের বাইরে ডিএনএর আরো কিছু অংশ যাকে বলা হয় প্রমোটার। তবে প্রক্রিয়াগুলো খুবই জটিল ও ঘোরপ্যাঁচের। এই এপিজেনেটিক প্রক্রিয়াগুলোর আবিষ্কার ডিএনএ বিজ্ঞানের সর্বশেষ অবদান। অবশ্য বৈশিষ্টের ওপর জেনেটিক প্রক্রিয়ার প্রভাব এপিজেনেটিক প্রক্রিয়ার থেকে অনেক বেশি, যদিও সূক্ষ্ম বৈচিত্র সৃষ্টিতে শেষোক্ত প্রক্রিয়াটির জুড়ি নেই। মানব আচরণের ওপর পরিবেশের যেটুকু প্রভাব সেটিও ঘটে ওই এপিজেনেটিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে– বেড়ে ওঠার বিশেষ বিশেষ সময়ের সামাজিক ও পারিবেশিক প্রতিকূলতা ওই জটিল এপিজেনেটিক প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম ভাবে কিছু প্রভাব সৃষ্টি করে।

জিনের প্রভাবে আচরণ

গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে মনোবিজ্ঞান একটি বড় মোড় নিয়েছে– বিবর্তন-নির্ভর মনোবিজ্ঞান এবং মস্তিষ্কবিদ্যা এর প্রধান ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছে,

আগেকার আচরণবাদী অথবা সমাজবিদ্যা-নির্ভর মনোবিজ্ঞানের পরিবর্তে। ডিএনএ'র ক্ষেত্রে ও মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতিই এর কারণ সৃষ্টি করেছে। এটি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে সব আচরণের উৎস যে মস্তিষ্ক, বিবর্তনের মাধ্যমে জিন সেটিকে গড়েছে। সেই অর্থে অনেকাংশে জিনই আচরণ সৃষ্টি করছে বংশ পরম্পরায়। এই ব্যাপারে বিজ্ঞান গবেষণা এতদূর এগিয়েছে যে আচরণের যেসব বিষয়কে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের ফল মনে করা হতো, দেখা গেছে মূলত সেগুলো সর্বত্র সর্বজনীন এবং অভিন্ন জিনের সৃষ্টি। এর মধ্যে যাবতীয় ভাষায় মানুষ যে রসবোধ, বাগধারা, গল্প বলতে ও শুনতে ভালবাসে, সুর ও ছন্দ সৃষ্টি ইত্যাদির পরিচয় দেয়; অথবা ভাষাহীন নানা অভিব্যক্তি দেখায়; খেলাচ্ছলে আচরণ করে; কিংবা শিশুদের সঙ্গে আধোবুলিতে কথা বলে, তাদের জন্য ঘুম পাড়ানি গান গায় বা তাদের সঙ্গে খেলতে পছন্দ করে; ইত্যাদিও রয়েছে। এগুলোর কোন কোনটির ওপর ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে যেমন মুখমণ্ডলের পেশিগুলোর সঞ্চালনের সঙ্গে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক নিয়ে সূক্ষ্ম এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে। এভাবেই জানা গেছে হাসি, বিরক্তি, রাগ, প্রভৃতি মুখের অভিব্যক্তি সব মানুষের একই রকম জিন-সৃষ্ট এবং সর্বজনীন।

বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি কাজ করে বিশেষ বিশেষ জিনের প্রসারণ ঘটিয়ে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। তাই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সব আচরণ-বৈশিষ্ট টিকে আছে তা সে বৈশিষ্টের জিন প্রসারণ ঘটেছে বলে। তাই আচরণের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় জিন প্রসারণের অধিক সুযোগের মধ্যে। যেমন প্রাণীমাত্রই যে নিকটাত্মীয়কে বাঁচার ক্ষেত্রে সহায়তা দেয়, তাদের জন্য আত্মত্যাগ করে, তার কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে ওই নিকটাত্মীয়দের অনেক জিন তাদের জিনেরই প্রতিলিপি হওয়ার কারণে; তাই ওরা বাঁচলে নিজের জিনের প্রসারণ ঘটে। অবশ্য আচরণের এই কারণটি হলো চূড়ান্ত কারণ। তাৎক্ষণিক ভাবে আচরণটি ঘটাচ্ছে মস্তিষ্ক যেমন ওই মস্তিষ্ক মা-প্রাণীর মধ্যে মাতৃস্নেহ সৃষ্টি করেই সন্তানের প্রতি সহায়তা ও আত্মত্যাগ সৃষ্টি করছে। কাজেই তাৎক্ষণিক আপাত কারণটি জিন প্রসারণ নয়, সেটি মাতৃস্নেহ। বলা যায় জিন তৈরি করেছে মস্তিষ্ক, আর মস্তিষ্ক তৈরি করেছে আচরণ।

তবে মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে বিবর্তনে সৃষ্ট বিশেষ কগ্‌নিশন বা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতাটাও জিনের কারণেই মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয়। তাই সেটি অন্য প্রাণীর মত এতটা স্বয়ংক্রিয় নয়, ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। মস্তিষ্ককে

বোঝার ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। চিন্তাকে এখন স্নায়ু উত্তেজনার জটিল প্যাটার্ন হিসেবে চেনা যাচ্ছে। শুধু তাই নয় বাইরে থেকে এমআরআই এর মত আধুনিক স্ক্যানিং যন্ত্রে সেই প্যাটার্ন দেখতে ও বুঝতে পারছি। মস্তিষ্কের যে 'কম্পিউটেশন থিওরি' এখন গুরুত্ব পাচ্ছে তাতে পঞ্চ ইন্দ্রিয় মস্তিষ্ককে 'ইনপুট' দিচ্ছে, স্নায়ু প্যাটার্ন সেগুলোকে 'প্রসেস' করছে। এবং মস্তিষ্ক তার ভিত্তিতে দেহকে 'আউটপুট' দিচ্ছে আচরণ ঠিক করে দিয়ে। পুরো ব্যাপারটি এক দিক থেকে কম্পিউটারের কাজের সঙ্গে তুলনীয় বলেই এর নাম কম্পিউটেশন থিওরি। কিন্তু কম্পিউটারে প্রসেসিং হবার জন্য মানুষ প্রোগ্রামার তার জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করে দেয়। মস্তিষ্কের জন্য এই প্রোগ্রাম কে তৈরি করছে? উত্তর হলো সেটি করেছে বিবর্তন– অতীতে যখন মস্তিষ্ক গড়ে উঠছিলো তখন। সেটি আছে বলে আমরা চিন্তা করতে পারি, আমাদের মন ও আচরণ গড়ে উঠতে পেরেছে।

মস্তিষ্কের প্রায় সবটুকু গড়ে ওঠেছিলো অতীতে আমাদের শিকারি-সংগ্রাহক বাঁচার সংগ্রামের কারণে মস্তিষ্কের বিবর্তন যখন ছিল তুঙ্গে। তাই ওসময়কার আচরণগুলোই এখন আমাদের জন্য স্বাভাবিক ও মজ্জাগত আচরণ; যেমন ওপরে উঠলে কিংবা সাপের মত কিছু দেখলে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই আধুনিক মানুষও ভয় পায়, যেখানে ভয়ের কোন কারণ নেই সেখানেও। একই ব্যাপার সুখ বা দু:খের অনুভূতি, আবেগ, পরস্পর সম্পর্ক ইত্যাদির বিষয়ে আচরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ওই প্রাচীন সময়ে বিবর্তিত মস্তিষ্ক আমাদেরকে এ সবে তাড়িত করছে; আমরা জিনের মধ্যে এগুলো বহন করছি। তাহলে যে আচরণ প্রাচীন কালে থাকার কথা নয় আধুনিক কালে দেখা দিয়েছে– যেমন উচ্চতর গণিতে মগ্ন হওয়া, কিংবা চাঁদে যাওয়া– আমাদের প্রাচীন মস্তিষ্কটি সেসব করে কেমন করে? বিজ্ঞান বলছে তখনই মস্তিষ্কের কিছু বাড়তি ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছিলো, এক কাজের জন্য তৈরি হয়ে সংশ্লিষ্ট অন্য কিছু বাড়তি কাজের। বিবর্তন কখনো একেবারে মাপমতো ফিট করিয়ে কিছু তৈরি করেনা। একটি উদাহরণ নেয়া যাক। বহু লক্ষ বছর আগে মানুষের পূর্বপুরুষ হোমো ইরেকটাসরা একেবারে খাড়া দৌড়ের অবস্থায় শিকার-প্রাণীর মাথায় বা হৃৎপিণ্ডের কাছে সঠিক জায়গায় লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপের ক্ষমতা অর্জন করেছিলো। তাদের শরীরের এই কাজের জন্য অদ্ভুত ব্যালেন্স অর্জন করতে হয়েছে কানের একেবারে ভেতরে কিছু U অক্ষরের আকৃতির টিউবে থাকা তরলের মাধ্যমে। তাদের ফসিলে এর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমরাও ঠিক সেটিই তাদের থেকে পেয়েছি। কিন্তু ওই একই ক্ষমতাকে আমরা হরিণ শিকার থেকে বিস্তৃত করেছি সমুদ্রের ঢেউয়ে চড়ে সার্ফিং

করতে কিংবা মহাশূন্যযানের প্রচণ্ড ত্বরণে ব্যালেন্স রাখতে। বিবর্তন প্রাচীন ক্ষমতাকে আধুনিক অন্য কাজে ব্যবহারের সুযোগ রেখেছে।

আমাদের আচরণের সব কিছুই কি বংশগত? না তা মোটেই নয়, পরিবেশও সেখানে প্রভাব রাখে বৈ কি, কিন্তু সেই প্রভাবও জিন থেকে একেবারে স্বাধীন নয়। এক্ষেত্রে এপিজেনেটিক প্রক্রিয়ার মধ্যস্থতাতেই অনেক কিছু ঘটে। ক্রমেই নানা এক্সপেরিমেন্টে সেগুলো আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এপিজেনেটিক পরিবর্তন সব চেয়ে বেশি ঘটে মায়ের গর্ভে থাকার সময়। গর্ভবতী মায়ের ওপর তীব্র কোন প্রতিকূল পারিবেশিক চাপ পড়লে তার ফলে গর্ভস্থ ভ্রূণ বা জন্ম-পূর্ব শিশুর ক্ষেত্রে গুরুতর নেতিবাচক এপিজেনেটিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাছাড়া প্রথম শৈশবেও এরকম পরিবর্তন কিছুটা দেখা দেয়; তবে বড় হবার পর তেমন আর ঘটেনা। গর্ভাবস্থায় মায়ের গুরুতর অপুষ্টি, আতঙ্ক, মাদকের প্রভাব, শারীরিক ও মানসিক চাপ বা নির্যাতন গর্ভস্থ শিশুর মধ্যে এপিজেনেটিক পরিবর্তন ঘটিয়ে পরবর্তী সময়ে তার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, আচরণ, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদির ওপর নেতিবাচক যে যথেষ্ট প্রভাব রাখে তা অনেকগুলো ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। একই ভাবে প্রথম শৈশবে পারিবারিক স্নেহ ও আশ্রয়ের অভাব শিশুর স্বাভাবিক জিন-বৈশিষ্টগুলোকে কিছুটা ব্যাহত করতে দেখা গেছে।

তবে ওই সময়টুকু পার হয়ে যাবার পর বাল্যকালে বা তারও পরে যথেষ্ট সুবিধা-বঞ্চিত ও প্রতিকূল অবস্থায়ও খুব একটি এপিজেনেটিক তারতম্য ঘটেনা। কাজেই মায়ের গর্ভে অথবা প্রথম শৈশবে ওরকম দুর্যোগ না ঘটলে পরের সময়ে তেমন দুর্যোগ সত্ত্বেও প্রত্যেকের আচরণে ও সক্ষমতায় তার জিন-বৈশিষ্টগুলো কোন না কোন উপায়ে বিকশিত হবার চেষ্টা করে। সেভাবেই নানা মানুষ একই পরিবেশে থেকেও বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয় তাদের জিনগত বা পূর্ববর্তী কিছু এপিজেনেটিক অবস্থার কারণে। একই কথা বুদ্ধিমত্তা, আবেগপ্রবণতা, বিশেষ অসুখের প্রবণতা ইত্যাদি নানা বিষয়েও প্রযোজ্য। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অসুখের ক্ষেত্রে, শৈশবের পরের জীবন যাপন ভঙ্গিও জিনের প্রকাশে তারতম্য ঘটায়। যেমন বক্ষ ক্যানসারের প্রবণতার একই জিন বহন করেও ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে সে জিনের প্রকাশ অধূমপায়ীদের থেকে বেশি দেখা যায়।

অভাবনীয় সব গবেষণা ও এক্সপেরিমেন্টের সুযোগ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যে নীরব বিপ্লব ঘটাচ্ছে, বলা যায় এটিই বিজ্ঞানের একটি বড় নতুন দিগন্ত।

একেবারে সাম্প্রতিক বিজ্ঞানকে বুঝতে গেলে বিজ্ঞানের এই নতুন দিগন্তের দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেয়া দরকার। মানুষের মন এবং চিন্তার প্রকৃতি ছিল বিজ্ঞানের সামনে একটি সর্বশেষ দুর্ভেদ্য দুর্গ। অন্য বিষয়গুলোর তুলনায় বিজ্ঞান এই ক্ষেত্রে সত্যিকার ভাবে আসতে পেরেছে খুবই সম্প্রতি। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হওয়া ডিএনএ বিজ্ঞানের বিপ্লব এতে বড় অনুঘটকের কাজ করেছে।

বিজ্ঞান কেন এত সফল

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তী আচরণ

খামখেয়ালী আচরণও হতে পারতোঃ

সফল হওয়াতো পরের কথা, বিজ্ঞান যে আদৌ কাজ করতে পেরেছে এবং পারছে তার মূলে রয়েছে বিজ্ঞানীদের একটি অনুমান। অনুমানই বলি আর বিশ্বাসই বলি এটি হলো– প্রকৃতি নিয়মানুবর্তী আচরণ করে, খামখেয়ালী আচরণ নয়। এর ফলে বিজ্ঞানী ওই নিয়মগুলো উদ্ঘাটনের অন্তত চেষ্টা করে দেখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। গোড়া থেকেই এই বিশ্বাসটি মানুষের মনে ছিল বলেই তখনই তারা বিজ্ঞানের দিকে পা বাড়িয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি যে আদৌ নিয়মানুবর্তী আচরণ করে তা মোটেই স্পষ্ট নয়। হ্যাঁ, চাঁদ-সূর্যের চলাচলের মত কিছু কিছু জিনিসের মধ্যে মানুষ বরাবরই এক রকম গতানুগতিকতা লক্ষ্য করেছে বটে কিন্তু ওই আকাশের অনেক ঘটনা সহ প্রকৃতির অধিকাংশ জিনিস তাদের কাছে এসেছে হঠাৎ হঠাৎ ঘটনা-দুর্ঘটনা হিসেবে– গতি, স্থিতি, বজ্র, বন্যা ইত্যাদি। তাছাড়া প্রকৃতির ঘটনাগুলো বুঝতে গিয়ে অতীত থেকে বর্তমান সব বিজ্ঞানীই দেখেছেন যে প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। এর মধ্যে কোন সরল শৃঙ্খলা বা প্যাটার্ন সহজে ধরা পড়েনা– যদিও বিজ্ঞানীদের কাজই হলো সেরকম শৃঙ্খলা খুঁজে বের করা। এরকম অবস্থায় প্রকৃতিকে বরং খামখেয়ালী আর সম্পূর্ণ অবোধ্য মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বোঝা যাচ্ছে তার মধ্যে নিয়মানুবর্তী আচরণ থাকলেও প্রকৃতি তা তুলে ধরতে ব্যগ্র নয়। বিজ্ঞানীর মধ্যে কিন্তু সব কিছুকে একটি শৃঙ্খলার প্যাটার্নে দেখার একটি আকুতি আছে, খুব সম্ভব সব মানুষেরই আছে। হয়তো নিজের সেই আকুতিই তাকে জটিল প্রকৃতির মধ্যেও নিয়মানুবর্তিতা আছে এমন ধারণা দিয়েছে। বিজ্ঞানী এই ধারণাকে পূঁজি করে এগুতে পেরেছেন, এক একটি ঘটনাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন একটি প্যাটার্ন ওখানে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায়। কখনো কখনো তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছে। যেখানে এক প্রজন্মের বিজ্ঞানীরা সফল হন্‌নি সেখানে পরের প্রজন্মের বিজ্ঞানীর আবার চেষ্টা করেছেন, হয়তো সফল হয়েছেন। কিন্তু কখনো তাঁরা একেবারে হার মানতে চাননি; ওই চেষ্টা না করে ঘরে বসে সাতপাঁচ ভেবে প্রকৃতিকে অবোধ্য ঘোষণা দিতে কখনো

তাঁর মন সায় দেয়নি। ভাবখানা এমন যে প্রকৃতি যদি শেষ পর্যন্ত খামখেয়ালী প্রতিপন্নও হয়, তবুও সেটি আগে থেকে না ভেবে আমাদের পক্ষে একে নিয়মবদ্ধ ধরে নিয়ে এগুনোই ভাল; এবং তা করে বিজ্ঞানী মোটেই ঠকেননি।

আমরা এ বইয়ে মোটা দাগে বিজ্ঞানকে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখেছি তাকে বলা যেতে পারে 'আদর্শ বাস্তববাদ'। কারণ এতে যে কোন আনুমানিক তত্ত্বকে যুক্তিবদ্ধ ভাবে এমন সব ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে যেগুলো বাস্তব এক্সপেরিমেন্টে যাচাই করা যায়। এটিই মূলস্রোতের বিজ্ঞান-দার্শনিকদের কথা। কিন্তু এর মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রমী কথা বল্‌ছেন নিকোলাস ম্যাক্সওয়েল। বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব শতকরা এক শ' ভাগ প্রকৃতির বাস্তবতার সঙ্গে মেলেনা, কিছু ফাঁক থেকে যায়। প্রকৃতির বাস্তবতা সাধারণত জটিল, কিছুটা খাপছাড়া; কিন্তু বিজ্ঞানের তত্ত্ব সে তুলনায় বেশি সুশৃঙ্খল। আসলে বিজ্ঞানীর লক্ষ্য বাস্তবের সঙ্গে শতভাগ মেলানো নয়, বরং নিজের তত্ত্বের প্রতি বাস্তবের কাছ থেকে যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া। অন্য ভাবে দেখলে এটি হলো তাঁর মনের সেই আকুতির কাছে সন্তোষজনক একটি নিয়মের প্যাটার্ন বাস্তবে খুঁজে পাওয়া। 'আদর্শ বাস্তব বাদের' পাশে একে বলা যায় 'লক্ষ্যমুখী বাস্তববাদ'। ম্যাক্সওয়েলের মতে শেষেরটি শুধু যে অধিকতর দেখা গেছে তা নয়, বরং বেশি মূল্যবানও। শুধু বাস্তবের সঙ্গে শতভাগ মেলাটাই যদি বিজ্ঞানীর লক্ষ্য হতো তা হলে বাস্তবতার ধারা-বিবরণীর মত একটি তত্ত্ব দিলেই চল্‌তো, বিজ্ঞানীর তাতে নতুন কিছু যোগ করা হতোনা। কিন্তু বিজ্ঞানীর লক্ষ্য হলো প্রকৃতির গভীরে যে প্যাটার্ন থাকতে পারে সেটির দিকে যাওয়া, শুধু যা ঘট্‌ছে তার বর্ণনা দেয়া নয়।

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা আর বিজ্ঞানের নিয়মঃ

বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছেন যে প্রকৃতি নিয়মানুবর্তী আচরণ করে; কিন্তু এই নিয়মানুবর্তিতার পেছনে কোন কারণ আছে কিনা সেটি স্পষ্ট নয়। অনেক দার্শনিকের মতে নিয়ম থাকলেই তার পেছনে কারণ থাকতে হবে এমন কথা নেই। যেমন এরিস্টোটল অনেক নিয়মের কথা কারণ ছাড়াই বলেছেন– উদাহরণ স্বরূপ তাঁর মতে ভারী জিনিস নিচের দিকে যায়, এটি ভারী জিনিসের জন্য নিয়ম যার কোন কারণ নেই। আধুনিক যুগের দার্শনিক ডেভিড হিউমের মতও অনেকটা এরকমই– তিনি প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্কের অস্থিত্বই দেখতেননা। তাঁর যুক্তিটি অনেকটা এ রকম; দুটি মার্বেল যদি মসৃণ

তলের ওপর গড়িয়ে গিয়ে একটি অপরটির সঙ্গে সংঘর্ষ করে তা হলে প্রকৃতির নিয়মে সংঘর্ষের মুহূর্তের ঠিক আগের বেগ ঠিক পরের বেগকে নির্ধারণ করে দেয়। এই সম্পর্কটি আমরা দেখতে পাই। কিন্তু যা দেখতে পাইনা তা হলো কেন একটি মার্বেলের আচরণের ফলে অন্য একটি মার্বেলের আচরণ নির্ধারিত হবে সেই রকম কোন কার্য-কারণ। হিউমের অনুসারী দার্শনিকরা মনে করেন বিজ্ঞানের নিয়ম সরাসরি প্রকৃতির নিয়মকে অনুসরণ করে, সেখানে কারণ খোঁজার কোন দায় নেই। প্রকৃতির নিয়মটির আবিষ্কারেই বিজ্ঞানের কাজ শেষ।

এরকম ভাবার একটি বড় বিপত্তি হলো এর ফলে কোন্‌টি কেন হচ্ছে না বুঝে প্রকৃতির চিরাচরিত অমোঘ নিয়মের সঙ্গে ঘটনাক্রমে কাকতালীয় ভাবে ঘটে যাওয়া একটি নিয়ম গুলিয়ে যেতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান-দার্শনিক কার্ল পপার এর একটি সুন্দর উদাহরণ দেয়েছিলেন। মরিশাস দ্বীপে থাকা মোয়া নামের একটি উড়ন-ক্ষমতাহীন পাখি শ' তিনেক বছর আগেই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এ সময় যদি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কৃত হতো যে কোন মোয়াই ৫০ বছরের বেশি বাঁচতে পারেনা তবে সেটি একটি অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়ম নাও হতে পারতো। কারণ যদি মোয়া আজ বেঁচে থাকতো তাহলে এমন মোয়াও এখন হয়তো থাকতো যেগুলো ৫০ বছরের বেশি বেঁচেছে ঘটনাক্রমে বিলুপ্ত হওয়ায় মোয়ার ওই বয়স-সীমাটাকে নিয়ম মনে হচ্ছে। কাজেই শুধু গতানুগতিক ভাবে প্রকৃতিতে ঘটছে বলেই একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম তৈরি হতে পারেনা– এর পেছনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করে তবেই– তা তৈরি হতে পারে। ধূমপানের সঙ্গে ক্যানসারের একটি সম্পর্ক আছে তা প্রকৃতিতে স্পষ্ট– যেখানেই বক্ষ ক্যানসার বেশি সেখানেই ধূমপানও বেশি। কিন্তু কারণ বিবেচনা না করে শুধু এই নিয়ম বল্‌লে বেশি ধূমপানের কারণে ক্যানসার হচ্ছে নাকি ক্যানসারের ফলে বেশি ধূমপান হচ্ছে তা আলাদা করা যায়না। কিসের আগে কী হচ্ছে, কিসের জন্য কী হচ্ছে সেটি প্রকৃতির নিয়মে স্পষ্ট না হলেও বিজ্ঞানের নিয়মে স্পষ্ট হতে হয়। তাই প্রকৃতিতে নিয়মের আভাস পাওয়া গেলেই তা বিজ্ঞানের নিয়ম হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, কারণের অনুসন্ধানে তাতে আরো কিছু থাকতে হবে।

কিন্তু প্রকৃতির নিয়মকে সরাসরি বিজ্ঞানের নিয়ম বানিয়ে ফেলার সমস্যাটি আরো ব্যাপক। প্রকৃতির নিয়ম বিজ্ঞানের নিয়ম হবার জন্য শুধু অকিঞ্চিৎকরই নয়, অপ্রয়োজনীয়ও বটে। যেমন গ্যালিলিও একটি বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে বিভিন্ন ভরের বিভিন্ন বস্তুকে ওপর থেকে ফেল্‌লে একই ত্বরণ নিয়ে ভূমিতে পড়তে থাকবে, অর্থাৎ সবগুলোর পড়ার বেগ একই হারে বাড়বে।

কিন্তু প্রকৃতিতে এরকম কোন নিয়ম দেখা যায়না যার হুবহু অনুসরণে গ্যালিলিও এরকম একটি বৈজ্ঞানিক নিয়মে আসতে পারেন। বরং দেখা যায় প্রকৃতিতে এভাবে পড়ার মধ্যে কোন স্পষ্ট নিয়মানুবর্তিতা নেই। সেখানে কোন ছোট ভারী জিনিস দ্রুত হারে পড়ে, কোন হালকা ছড়ানো জিনিস ধীরে পড়ে, গাছের পাতা ঝরার সময়ে তো বাতাসে হেলে দুলে কখনো উঠছে, কখনো নামছে, এদিক ওদিক যাচ্ছে। অবশ্য বলা যাবে যে যদি কিছু শর্ত আরোপ করা যেতো ওই সব শর্তের অধীনে প্রকৃতির মধ্যে ওরকম একটি নিয়ম দেখা যেতো। যেমন ও জায়গায় বাতাস না থাকলে সব রকম সব জিনিস একই হারে পড়তো; কাজেই সেই শর্তাধীন প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ীই গ্যালিলিওর বিজ্ঞানের নিয়মটি এসেছে। তা হলে এও মানতে হয় ওই সব শর্তের (এক্সপেরিমেন্টের পরিবেশের শর্ত) বাইরে বিজ্ঞানের নিয়মের কোন প্রয়োগ-যোগ্যতা নেই। কিন্তু তাতো হবার নয়, বিজ্ঞানের নিয়মতো শুধু এক্সপেরিমেন্টের পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা– এটি প্রকৌশলীরা ব্যবহার করেন লোহার বলিষ্ঠতার অংক কষতে ভবন নির্মাণের পরিবেশে, প্রত্নতত্ত্ববিদরা নিদর্শনের বয়স বের করতে ব্যবহার করেন খনন স্থলের পরিবেশে, ইত্যাদি আরো অসংখ্য পরিবেশে অসংখ্য ব্যবহারকারী। এই সব ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে বিজ্ঞানের নিয়মে কার্য-কারণ বিশ্লেষণের ব্যবস্থা রয়েছে বলে।

গ্যালিলিওর নিয়মটি এসেছে পৃথিবীর আকর্ষণের কারণে, এবং ঝরা পাতার ভেসে বেড়ানোর বৈজ্ঞানিক নিয়ম আসতে পেরেছে বাতাসের চাপের কারণটি বোঝা গেছে বলে। অন্য উদাহরণে মার্বেলের সংঘর্ষে আগে-পরের বেগের মধ্যে সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক নিয়মের পেছনে আছে মার্বেলের স্থিতিস্থাপকতার কারণ। এভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কার্য-কারণ উদ্ঘাটন করতে পেরেছে বলেই বিজ্ঞান সফল হয়েছে। প্রকৌশলী নির্ভয়ে বিজ্ঞানে লোহার বলিষ্ঠতার নিয়ম ব্যবহার করতে পারেন কারণ তিনি জানেন সেটি লোহার পরমাণুর বিন্যাসের মধ্যে 'ডিসলোকেশনের' (বিচ্যুতির) উপস্থিতির কারণে বলিষ্ঠ। প্রত্নতত্ত্ববিদ যথেষ্ট আস্থার সঙ্গে তার নিদর্শনের বয়স নির্ণয়ে বিজ্ঞানের কার্বন ডেইটিং এর নিয়ম ব্যবহার করতে পারেন কারণ তিনি জানেন এটি তেজস্ক্রিয় কার্বনের ক্ষয়প্রাপ্তির হার (৫,৭৩০ বছর) থেকে এসেছে এবং কী কারণে সেই ক্ষয় হয় তাও ওই নিয়মের জানা।

কার্য-কারণ সম্পর্কটি যখন তিনি ধরে ফেল্‌তে পারেন সেটিই হচ্ছে বিজ্ঞানীর সেই 'ইউরেকা' মুহূর্ত। এ নিয়ে তাঁকে মাথা খেলাতে হয় ছোট ছোট খণ্ড-চিন্তার

(মডিউল) আকারে– যেগুলো একটির সঙ্গে একটি খাপে খাপে ফিট করে যদি একটি প্যাটার্ন ফুটে ওঠে তখনই কার্য-কারণ সম্পর্কটি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়। সেটি আর্কিমিডিসের বাথটাবে বসে গোসল করার মুহূর্তের মত নাটকীয় যদি নাও হয় তবুও বিজ্ঞানী যে সেটি বুঝতে পারেন সে কথা ঠিক। শেষটুকু হঠাৎ করে মাথায় আসলেও এর পেছনে অনুমান, যৌক্তিক নির্ণয়, এক্সপেরিমেন্টের কঠিন গবেষণার পটভূমি থাকে। এভাবে বিজ্ঞানী কার্যত প্রকৃতির বাস্তব নিয়মানুবর্তিতাকে সম্ভাব্য রূপে তাঁর চিন্তা ক্ষমতার ভেতরে নিয়ে আসছেন। সেই সম্ভাব্য রূপটি কার্য-কারণের বুনোটেই তৈরি। শেষ পর্যন্ত যে তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হয় তার ভিত্তি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকলেও তার ফলপ্রসুতা থাকে ওই চিন্তার মধ্যে। ওভাবে উদ্ঘাটিত কার্য-কারণ সম্পর্কগুলো ওই তত্ত্বকে বাস্তব প্রকৃতির ভবিষ্যদ্বাণী করার একটি উচ্চতর ক্ষমতা দেয়।

বিজ্ঞানে একটি চমৎকার ব্যাপার হলো এতে ভাল একটি তত্ত্ব বাইরের সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে নিজে যা গ্রহণ করে তার থেকে অনেক বেশি সেটি ফেরৎ দেয়। এ জন্যই একটি সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে যে তত্ত্বের জন্ম হয় তা দিয়ে আরো শত সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুলে যায়। আবার আজকের একটি আবিষ্কার আগামী দিনের আরো বহু আবিষ্কারের সুযোগ সৃষ্টি করে। এই দুর্দান্ত ক্ষমতাগুলোর একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে ভাল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রাকৃতিক সত্যের খুব ভাল প্রতিফলন।

ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাটিই লক্ষ্য

তত্ত্বের মধ্যেই সাফল্যের তাগিদঃ

বিজ্ঞানে তত্ত্ব মনগড়া ভাবে দেয়া যায় না। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাস্তবের কাছাকাছি থেকেই তাকে কাজ করতে হয়। তবে যতটুকু বাস্তবতা ওভাবে সে দেখে তার চেয়ে বেশি বাস্তবতার ভবিষ্যদ্বাণী সে যৌক্তিক ভাবে করতে পারে– সেখানেই তার সার্থকতা। একেবারে মনগড়া তত্ত্ব এদিকে বেশি দূর যেতে পারেনা, কারণ বাস্তবতার ভিত্তি ছাড়া রচিত তত্ত্বের অবস্থা গার্বেজ ইন-গার্বেজ আউট (ময়লা ঢোকালে ময়লাই বের হয়) মেশিনের মতো; এর থেকে কোন কার্যকর ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হয়না। তাই বিজ্ঞান অনুমান (হাইপোথেসিস) দিয়ে শুরু হতে পারে বটে, কিন্তু সেই অনুমান আসমান থেকে পড়ে না। প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ থেকে, আগের গবেষণা থেকে, অন্য প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব থেকে, সেই অনুমানের ভিত্ রচিত হয়। এরপর তত্ত্বের বিস্তারে, যৌক্তিক নির্ণয়ের মাধ্যমে

এক্সপেরিমেন্টের বিষয়বস্তু নির্ধারণে, এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে– এসব যে কোন পর্যায়েই জানা বাস্তবতার ব্যতিক্রম দেখতে পেলে বিজ্ঞানী নড়েচড়ে বসেন। প্রত্যেক পদক্ষেপে কার্য-কারণ সম্পর্ক খোঁজার মাধ্যমে বিজ্ঞানী ওই ব্যতিক্রমের উৎস সন্ধান করেন। তত্ত্ব এভাবে এক ধরনের উর্বরতা লাভ করে বলেই অনেক সময় তা জানা বাস্তবতাকে অজানা বাস্তবতার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

গত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি চলন্ত গাড়ি থেকে সামনের দিকে বল ছুড়ে দিলে বলের বেগ বাড়ার যে জানা বাস্তবতা মাইকেলসন-মর্লি এক্সপেরিমেন্টে আলোর বেগের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখাতে বিজ্ঞানীরা কী ভাবে নড়েচড়ে বসেছেন। তারই ফলশ্রুতিতে আইনস্টাইন এই ব্যতিক্রমের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে স্থান ও কালের চরিত্রে সম্পূর্ণ নতুন বাস্তবতার সন্ধান পেয়েছেন– যা আমাদের হাজার হাজার বছরের ধ্যান-ধারণা বদলে দিয়েছে। এগুলো অভিনব হলেও এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণিত বলে বাস্তবও বটে। প্রকৃতির আরো গভীরতর বাস্তবতা বলেই একে অভিনব মনে হয়েছে। আজ পদে পদে আমরা এই নতুন বাস্তবতাগুলোর সাক্ষাৎ পাচ্ছি, যে কারণে আমাদের পুরানো হিসেবকে আপেক্ষিক তত্ত্বের নিয়মে শুদ্ধ করে নিতে হচ্ছে; নইলে আমাদের অনেক বাস্তব কাজ চল্‌ছেনা। আগের বাস্তবতাতেও দৈনন্দিন অনেক কাজ চল্‌ছে, তবে তার সঙ্গে গভীরতর নতুন বাস্তবতার যোগ তার প্রয়োগযোগ্যতা বা উর্বরতা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাকেও।

আমরা আগেই দেখেছি উভয়েই এক্সপেরিমেন্টে সফল এমন একাধিক তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানী যখন দ্বন্দ্বে পড়েন তখন সঠিক তত্ত্ব বাছাইয়ের জন্য তিনি ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাসঙ্গিক তত্ত্বগুলোর দিকে তাকান; বোঝার চেষ্টা করেন সেগুলোর সঙ্গে বেশি সঙ্গতি সম্পন্ন তত্ত্ব এই নতুনগুলোর মধ্যে কোন্‌টি। এরকম সঙ্গতি সম্পন্ন তত্ত্বই গ্রহণযোগ্য হয়। এভাবে সব তত্ত্বগুলোর মধ্যে একটি সাধারণ সঙ্গতি বিজ্ঞানের সার্বিক ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাকে জোরালো করেছে। তত্ত্ব যখন পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয় তখনো আগেরটির এই ক্ষমতা পুরোপুরি চলে যায়না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের সীমিত ক্ষেত্রে বজায় থাকে। যেমন আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বকে বদলে দিলেও মহাশূন্য ভ্রমণ সহ অনেক বাস্তবিক ক্ষেত্রে আগের নিউটনের তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী যথেষ্ট কার্যকর।

বড় কথাটি হলো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে ডিজাইনই করা হয় প্রকৃতির ব্যাপকতর বাস্তবতার সঙ্গে মিলবার জন্য। মেলাবার জন্য এর উল্‌টোটা নিশ্চয়ই কেউ আশা করবেননা যে মনগড়া একটি তত্ত্ব দিলাম আর প্রকৃতি বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে

নিজকে খাপ খাইয়ে নিলো! সে রকম পাগলামি স্বপ্ন দেখার বিলাসিতা আর যার হোক বিজ্ঞানীর পোষায়না, কারণ সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে না পারলে তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়না। তাই এই ভবিষ্যদ্বাণীও তাঁকে করতে হয় খুব উচ্চাকাঙ্খী হয়ে নয়, বাস্তববাদী হয়ে। যথেষ্ট নির্ভুলতার সঙ্গে কাজ করতে পারে এমন তত্ত্বের অনুসন্ধান তাঁর বিষয়। অতীতে বিজ্ঞান যে এরকম অসংখ্য নির্ভুল ভবিষ্যৎদ্বাণী করতে পেরেছে ভবিষ্যতের যাত্রায় এটিই তাঁর পাসপোর্ট।

বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলোর ভিত্তি নিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন ওঠে; যেমন ইনডাকশনের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে– বার বার পুনরাবৃত্তি হলেই কোন কিছুর চিরকাল পুনরাবৃত্তি হবে এমন ধরে নেবার যৌক্তিকতা কোথায়? সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান-দার্শনিক রেশের মতে এসব পদ্ধতি যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত হয়ে কখনো ব্যর্থ হয়নি, সব সময় বিজ্ঞানকে সফল করেছে। এটিই এই পদ্ধতিগুলোর ভিত্তি এনে দিয়েছে– এটি কার্যকারিতার অভিজ্ঞতার ব্যাপার, যুক্তির নয়। বিজ্ঞানের অন্য আরেকটি পদ্ধতি 'যৌক্তিক নির্ণয়ের' শুদ্ধতাটি আরো স্পষ্ট। যুক্তিবিদ্যা জিনিসটি একেবারে অকাট্য করেই তৈরি, আর মানুষের যুক্তি বিস্তারের সেরা সৃষ্টি গণিতের যে যুক্তি সেটিই বিজ্ঞানের তত্ত্বকে অত্যন্ত শাণিত ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলছে– এমনকি বাস্তবে প্রমাণিত হবার আগেই। আর এক্সপেরিমেন্ট বা অনুরূপ পদ্ধতি তো বাস্তবতার সঙ্গে সরাসরি মিলিয়ে নেয়া। এ পদ্ধতিগুলোর সবই সাফল্যের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানী নিজে কিন্তু এসবের দার্শনিক আলোচনা-সমালোচনা বেশি গ্রাহ্য করেন না; তিনিও এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করেন অতীতে এগুলো বিজ্ঞানকে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা দিয়েছে বলেই।

জটিল সমস্যাকে সরল খণ্ডে নিয়ে যাওয়ার সুযোগঃ

বিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং আমাদের দৈনন্দিন অনেক আটপৌরে কাজের পদ্ধতি প্রায় একই রকমের। আমরা সাধারণ আটপৌরে কাজেও অনুমান করে অগ্রসর হই। অনুমানটি আসে পারিপার্শ্বিকতা থেকে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। তারপর সেই অনুমানটি যদি বাস্তব ক্ষেত্রে তথ্য-প্রমাণে গ্রহণ করতে পারি তা হলে সেভাবে কাজ করি। একেবারে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে অবলীলায় যা আমরা করি সেই একই পদ্ধতি বিজ্ঞানের হাতে পড়ে এমন সফল এমন শক্তিশালী হয়ে পড়লো কেন? দৈনন্দিন কাজ আর বিজ্ঞানের কাজ এই দুই দৃশ্যপটের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য হলো বিজ্ঞানের ব্যাপকতার কারণে এর বহুতরো রূপ রয়েছে।

বিজ্ঞানের কোন কোন শাখা অন্য শাখা থেকে অধিকতর মৌলিক স্তরে ঘটনাগুলোকে দেখতে পারে।

আর বিজ্ঞান প্রয়োজন মতো তার জটিল সমস্যাকে নানা খণ্ড-সমস্যায় পরিণত করে সেই খণ্ডকে অন্য শাখায় নিয়ে যেতে পারে– যেখানে আরো মৌলিক ও আরো সরল ভাবে তাকে দেখা সম্ভব। কিছু উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভাল বোঝা যাবে। কেমিস্ট্রির সমস্যাগুলো পদার্থবিদ্যার সমস্যার থেকে জটিলতর কারণ এখানে বহুতরো পদার্থের সম্মিলিত অবস্থার আচরণ উদ্ঘাটন করতে হয়, অন্যদিকে পদার্থবিদ্যায় মৌলিক থেকে মৌলিকতর জিনিসের প্রকৃতির অনুসন্ধান করা হয়। হাজার বছর ধরে সেই মৌলিক বিষয়গুলোর সন্ধান চলছে বলে পদার্থবিদ্যা এগিয়েছেও বেশি; সবকিছুকে এটি তার মৌলিকতর 'যান্ত্রিক' ব্যাখ্যায় আনতে পারে। তাই কেমিস্ট্রির চর্চায় প্রায়ই সমস্যাটিকে পদার্থবিদ্যার সমস্যা রূপে দেখার সুযোগ আছে– যেমন কেমিকাল বন্ধনগুলো বুঝতে পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রয়োগে কিংবা জটিল প্রোটিন অণুর বা ডিএনএ'র উদ্ঘাটনে পদার্থবিদ্যার এক্স'রে কৃস্টালোগ্রাফি ব্যবহার। একই ভাবে জীববিজ্ঞানে 'প্রাণ' জিনিসটা আরো অনেক জটিল বিষয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন এখানে অনেক কিছুকে প্রাণরসায়নের আওতায় নিয়ে এসে সরাসরি তাতে কেমিস্ট্রির নিয়মগুলো প্রয়োগ করতে পারলেন তখন জীববিজ্ঞানের সমস্যাগুলো তাঁদের জন্য সহজতর হলো। গত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি ডিএনএ'র প্রতিলিপি তৈরির প্রক্রিয়া ও কোডিং করার প্রক্রিয়া জানার জন্য ডিএনএ'কে কেটে ফেলতে তার বেইসক্রম পড়ার ব্যবস্থা করতে রাসায়নিক নিয়ম ও পদার্থবিদ্যার নিয়ম কীভাবে দারুণ কাজ দিয়েছে।

জ্যোতির্বিদ্যা বা মহাজাগতিক বিজ্ঞান নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত খুবই দূরের, খুবই জটিল, এবং খুবই ব্যাপ্ত একটি বিজ্ঞান। কিন্তু তারার শক্তির উৎস এবং কালক্রমে তারার পরিণতি; বিগ ব্যাং এর মুহূর্তে এবং তার পরের ঘটনাগুলো; ইত্যাদি এর অনেক কিছু বুঝতে নিউক্লিয়ার, এটমিক এবং মৌলিক কণিকার ও মৌলিক বলের পদার্থবিদ্যাই কাজ করে গেছে ও করছে। আর এসবের অনেক গবেষণা চলেছে মহাবিশ্বের সুদূর প্রান্তে নয়, বরং আমাদের কাছের পদার্থবিদ্যা ল্যাবোরেটরিতে। এই যে সমস্যাকে খণ্ডে খণ্ডে অন্য মৌলিকতর শাখায় নিয়ে আরো কার্যকর ভাবে তাকে দেখার সুযোগ তা বিজ্ঞানকে অনেক বেশি শক্তিশালী করেছে। এভাবেই সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞান জীবন-রহস্যের উদ্ঘাটন করতে পেরেছে– যে রহস্যকে কিছুদিন আগেও বিজ্ঞানের অগম্য মনে করা হতো। আর

একই ভাবে এখন বিজ্ঞানের সামনে শেষ বড় দুর্ভেদ্য দুর্গ– মানুষের মন ও চিন্তার প্রকৃতিকে বোঝা– তারও পতন আসন্ন হয়ে উঠেছে।

এভাবে বিজ্ঞানের এক শাখার কাজকে অন্য মৌলিকতর শাখার কাজে পরিণত করাকে অনেক বিজ্ঞান-দার্শনিক সমালোচনার চোখে দেখেন। তাঁরা একে বলেন অবনমন (রিডাক্‌শন) – 'উচ্চতর' শাখার কাজকে 'নিম্নতর' শাখায় নামিয়ে আনা, যা তাঁদের মতে বৈধ নয়। তাঁদের যুক্তিটি হলো উচ্চতর বা জটিলতর সমস্যার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট আছে, নিজস্ব আবহ আছে; তার ভেতরেই তার প্রশ্নগুলোকে বিবেচনা করতে হবে। যেমন প্রাণ ও বোধশক্তির উপস্থিতি জীববিজ্ঞানকে একটি পৃথক উচ্চতর সত্ত্বা দিয়েছে। একে পদার্থবিদ্যার যান্ত্রিক উপাদানে অথবা কেমিস্ট্রির রাসায়নিক উপাদানে ভাগ করে ফেলে যদি বলা হয় এতে আর কিছু নেই তাহলে জীববিজ্ঞানের আসল স্বরূপ ধরা পড়বেনা। একই কথা মনোবিজ্ঞানকে মস্তিষ্কবিদ্যা বা ডিএনএ বিজ্ঞানে পরিণত করার ক্ষেত্রেও বলা হয়।

খন্ডে খন্ডে শুধু নয়, সামগ্রিক ভাবেও যে প্রত্যেক প্রশ্নকে দেখা দরকার বিজ্ঞানীরা তা অগ্রাহ্য করেন না। কিন্তু তাঁরা ওই 'উচ্চতর' বিজ্ঞানগুলোর অসম্ভব জটিলতায় ভড়কে গিয়ে সেগুলোকে শুধু বর্ণনামূলক বিজ্ঞান, অথবা দার্শনিক আলোচনায় রেখে দিতে কিংবা সমাজবিদ্যার কথাবার্তায় সীমাবদ্ধ করতে তাঁরা রাজি নন্। তাঁরা একে পুরাপুরি বিজ্ঞানের আওতায় আনার প্রত্যাশী তার সমস্ত জটিলতা নিয়েই। সেজন্যই তাঁরা জটিল সমস্যাকে প্রথমত খন্ডে খন্ডে ভাগ করে ইতোমধ্যে অন্য শাখার উন্নত তত্ত্ব ব্যবহার করে যতদূর যাওয়া যায় ততদূর যেতে চান। এই খন্ড-সমাধানগুলো জুড়ে যখন একটি সামগ্রিক সমাধানের কাঠামো খাড়া হয় তখন তাকে আরো সামগ্রিকতায় তার উপযুক্ত মহিমায় দেখার সুযোগ ঘটে এবং তা দেখাও হয়। যেমন কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে এবং জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এভাবেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। কেমিস্ট্রির অনেক খণ্ড-সমাধান পদার্থবিদ্যা থেকে এসেছে– কিন্তু তাই বলে কোন রসায়নবিদ বলবেন না যে কেমিস্ট্রি পদার্থবিদ্যা হয়ে গেছে। কেমিস্ট্রির নিজস্ব ভূবনের জটিল প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত তার নিজস্ব সামগ্রিক সমাধানেই চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও হতে যাচ্ছে। এভাবে অগ্রসর হবার পথ খুলেছে বলেই এই পরবর্তী বিজ্ঞানগুলোও এখন যথারীতি সফল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছে, ব্যবহারিক প্রয়োগে এবং প্রযুক্তিতেও তাদের চমৎকার

অবদান রাখতে পারছে– যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানে কিংবা সাম্প্রতিক মনোচিকিৎসায়।

আধুনিক কিছু অদ্ভুত সমালোচনা

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে আমেরিকান বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ টমাস কূন দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে বিজ্ঞানীরা যাঁর যাঁর যুগের আপেক্ষিকে কাজ করেন – অর্থাৎ সেই যুগের রীতিনীতির আবহকে (প্যারাডাইম) অগ্রাহ্য করে তিনি বস্তুনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন না, বরং সেই আবহের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কাজ করেন। তাই আদর্শ বিজ্ঞান পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরা পরীক্ষায় অকার্যকর তত্ত্বকে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করেন্না; বরং সেই তত্ত্বের মধ্যে প্রয়োজনমত ছোটখাট রদবদল করে তত্ত্বটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করে যান। তাঁর মতে এটিই এক একটি দীর্ঘ সময় ধরে ঘটে থাকে। শুধু যখন এ তত্ত্বকে আর এভাবে বাঁচানো কিছুতেই সম্ভব হয়না এবং সম্পূর্ণ নতুন ধারার একটি কার্যকর তত্ত্ব নিয়ে কেউ এগিয়ে আসেন একমাত্র এখনই এই আবহ বদলে নতুন আবহের সূচনা হয় (প্যারাডাইম শিফ্ট)। একেই কূন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক একটি 'বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন।

কূন আরো বলেছেন যে দুই ভিন্ন যুগে বিজ্ঞানের অনেক কিছুর মানেও ভিন্ন হয়– ওদেরকে আর পরস্পরের সঙ্গে মেলানো যায় না। যেমন নিউটনীয় বিজ্ঞানের আবহে 'ভর' বলতে যা বোঝাতো তা ছিল একটি অপরিবর্তনীয় গুণ, শুধু বস্তুরই যে গুণ থাকে। আইনস্টাইনীয় বিপ্লবের পরে ভরের মানে ভিন্নতর হয়ে গেছে; ভর আর শক্তির মধ্যে এখন আর কোন পার্থক্য নেই, গতির সঙ্গে সঙ্গে ভর বদলে যেতে পারে, ইত্যাদি। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে ধারণায় এসব রদবদল যে ঘটে, বা স্বাভাবিক সময়ে বিজ্ঞানী যে তাঁর যুগের প্রধান তত্ত্বগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হবেন এমন বক্তব্য তেমন অদ্ভুতও নয়, অনায্যও নয়। তবে মনে রাখতে হবে যে বিপ্লব-পূর্ববর্তী ধারণাগুলো একেবারে বাতিল হয়ে যায়না, আসন্ন তত্ত্ব হিসেব পরেও বেঁচে থাকে এবং তার যথাযথ সীমার মধ্যে তা ঠিকই ব্যবহৃত হয়– যেমন নিউটনের তত্ত্ব প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া পরীক্ষায় যে সব তত্ত্ব অকৃতকার্য হয় সাধারণত সেগুলো সে যুগের বিজ্ঞানের অবকাঠামো নির্ধারণকারী প্রধান তত্ত্ব হয়না, বরং এর সঙ্গে সম্পর্কিত শাখা-তত্ত্বেরই এই পরিণতি হয়ে থাকে। বিজ্ঞানী অকৃতকার্য এই শাখা-তত্ত্বকে ঠিকই বাতিল করেন অন্য বিকল্প শাখা-তত্ত্ব দেবার চেষ্টা করেন; মূল তত্ত্ব ঠিকই থাকে। শাখা-তত্ত্ব বাতিল হলেও

প্রধান তত্ত্ব যে অক্ষত থাকতে পারে তার উদাহরণ আমরা এই বইয়ে দেখেছি। শুধু উল্লিখিত বিপ্লবের সময়েই প্রধান তত্ত্ব বদল হতে পারে।

কূনের কথিত যে আপেক্ষিকতা সেটি ছিল যুগের আবহের আপেক্ষিকে বিজ্ঞানীরা কাজ করেন এমন মনে করা। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আরো চরম আপেক্ষিকতার অভিযোগ এলো। কোন কোন দার্শনিক এমনও বল্‌লেন যে বিজ্ঞান জিনিসটা কালচারেরও আপেক্ষিক। তাঁদের মতে আধুনিক বিজ্ঞান ইউরোপীয় কালচারের একটি অনুসঙ্গ; অন্য কালচারে যেমন ব্রাজিলের বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কাছে এর কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই– কারণ তাদের চিন্তা-ব্যবস্থাটাই ভিন্ন। আমেরিকান দার্শনিক পল ফেয়েরাবেন্ড অনেকটা এরকম মত অনুসরণ করে দেখাতে চাইলেন যে বিজ্ঞান কিছু সর্বজনীন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে– এ কথাটাই ভুল। বিজ্ঞানীরা তাঁদের কালচারের সৃষ্ট কিছু বিশ্বাস নিয়েই চলেন এবং তারই আঙ্গিকে নিজেদের তত্ত্বগুলো খাড়া করেন– সর্বজনমান্য পদ্ধতির তোয়াক্কা না করে। নিজের তত্ত্ব দিতে গিয়ে যেখানে যেমনটি করতে হয়, দেখাতে হয়, তাকেই তাঁরা পদ্ধতি হিসেবে দেখান। এদিক থেকে তিনি বিজ্ঞানকে এক ধরনের ধর্ম-বিশ্বাসের মত করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে সত্যিকার বিজ্ঞান চর্চা করতে হলে বিজ্ঞানের উচিত ছিল তাঁদের সীমিত কাঠামোর বাইরে গিয়ে অন্য ধরনের তত্ত্বকে, অন্য কালচারের ধ্যান-ধারণাকেও স্থান দেয়া। এটি তো তাঁরা করেনই না, বরং সে সবের প্রতি তাঁদের আচরণ অনেকটা 'মাফিয়া বসের' মতই জবরদস্তি ও রক্ষণশীলতায় ভরা।

অতীতে অনেক সময় বড় বড় বিজ্ঞানীদের রক্ষণশীল বাধার কারণে বহু তরুণতর এবং ভিন্ন মতের বিজ্ঞানীর নতুন তত্ত্ব সাময়িক ভাবে চাপা পড়েছে একথা ঠিক। মহাদেশগুলো ক্রমে ক্রমে পরস্পর থেকে সরে যাওয়ার ভেগেনারের তত্ত্বটি কীভাবে মূলস্রোত ভূতত্ত্ববিদের অনীহার কারণে দীর্ঘদিন গুরুত্ব পায়নি তা এই বইয়ে দেখেছি। এ রকম ঘটনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রচুর ঘটেছে। হয়তো ফেয়েরাবেন্ড সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে রক্ষণশীল বিজ্ঞানীরা সঠিক কোন তত্ত্বকে শেষ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছেন; এও নয় যে ফেয়েরাবেন্ড যেভাবে চেয়েছেন সেরকম সব রকম আইডিয়াকে বাছ-বিচার না করে বিজ্ঞানে স্থান দিতে হবে; অথবা বিজ্ঞানে আইডিয়াকে বাছ-বিচার করার ব্যবস্থা থাকবেনা। বরং আমরা দেখেছি আইডিয়া দেয়াটি যত না কঠিন তার থেকে অনেক বেশি কঠিন বিজ্ঞানে সে আইডিয়া প্রমাণ করা। তা যদি না হতো তা হলে এত দিনে বিজ্ঞানের সঠিক তত্ত্বগুলো অসংখ্য অকার্যকর তত্ত্বের

জঞ্জালে ডুবে যেতো, ভাল তত্ত্বকে খুঁজে নেয়া কঠিন হতো। গ্রহণযোগ্যতার বিচার সব সময় গুরুত্বপূর্ণ।

অতীতের যে সব তত্ত্ব পরে পরিবর্তিত হয়েছে বা বাতিল হয়েছে সেগুলোর কোনটিই ধর্মবিশ্বাসের মত আসেনি– বরং তখনকার মত গ্রহণযোগ্যতার পরীক্ষা দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। অন্য যে কোন আইডিয়া আসলেই তাদেরকে উল্টে পালটে দিতে পারবে এ সম্ভাবনা ছিলনা। শেষ পর্যন্ত উপযুক্ততর যুক্তির বিবেচনাতেই সেগুলো পরিবর্তিত বা বাতিল হয়েছে বটে কিন্তু আমরা ঠিক বুঝতে পারি কী অর্থে সেগুলো ভুল ছিল, আবার কী অর্থে এখনকার উন্নত তত্ত্বের আসন্ন রূপ ছিল। যখন বুঝতে পারি আগের সে রকম তত্ত্বে বিজ্ঞানীরা কী যুক্তিতে পৃথিবীকে চেপ্টা মনে করেছেন, কেন তাকে বিশ্বের কেন্দ্রে স্থির মনে করেছেন, কেন সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে মনে করেছেন– তখন সেই বিজ্ঞান ও আজকের বিজ্ঞানের মধ্যে কূন-কথিত সেই অসঙ্গতি আর থাকেনা। ফেয়েরাবেন্ড যে এমন আপেক্ষিকতায় আরো এক ধাপ এগিয়ে বিজ্ঞানের পদ্ধতিকেই অস্বীকার করেছেন এবং সব আইডিয়াকে এতে স্থান দেয়া যায় মনে করেছেন, সেটি একটি নৈরাজ্যেরই আহবান।

আধুনিক বিজ্ঞান যে বিশেষ কালচারের নিজস্ব মাধুরী মেশানো, এটি যে সেই কালচারের একটি সৃষ্টিকর্ম, এমন কথা রীতিমত অদ্ভুত। আর এমন ধারার কথকতা সাম্প্রতিক কালে খুব মুখর ভাবে চালু করছেন পোস্ট-মডারনিস্ট নামে পরিচিত তাত্ত্বিকরা। তাঁদের মূল মতাদর্শ সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, সাহিত্য, সুকুমার কলা ইত্যাদির ভেতরের একেবারে মৌলিক বিষয়গুলোকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা– যেমন সৌন্দর্য, নান্দনিকতা, কাব্যগুণ, সুর ইত্যাদির চিরায়ত এবং আধুনিক ধ্যান-ধারণাকে একেবারে চমকে ওঠার মত সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে দেখা। কিন্তু ফেয়েরারেন্ড প্রমুখ বিজ্ঞান দার্শনিকদের চরম আপেক্ষিকতাবাদী মতের দ্বারা উৎসহিত হয়ে তাঁরা বিজ্ঞানের সমালোচনাকেও পোস্ট-মডারনিস্ট মতবাদে টেনে এনেছেন। তাঁরা বল্লেন বিজ্ঞান যে মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ, সংস্কৃতি-নিরেপক্ষ, 'দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ', বস্তুনিষ্ঠতা দাবী করে সেটি ভুয়া। আধুনিক বিজ্ঞান ইউরোপীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি (অবশ্য ইতিহাসনিষ্ঠ হলে তাঁদের বলা উচিত ছিল ব্যবিলনীয়, মিশরীয়, গ্রীক, ভারতীয়, আরবীয় ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি)। বিজ্ঞানের তথাকথিত সাফল্য আসলে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতন্ত্রের সাফল্যের একটি অনুসঙ্গ মাত্র। এমনকি যে অত্যন্ত মৌলিক দুটি ধারণার ওপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত সেগুলোকেও তাঁরা পশ্চিমা সংস্কৃতিতেই শুধু আছে বলে দাবী

করলেন। এর একটি ধারণা হলো পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত সত্যকে গ্রহণ করতে হবে, আর অন্যটি হলো যুক্তিবিদ্যার নিয়মানুযায়ীই সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করতে হবে। পোস্ট-মডারনিস্টদের মতে এই দুটিই পশ্চিমা সংস্কৃতির নিজস্ব সৃষ্টি- অন্যদের সংস্কৃতিতে এ ধারণা নাও থাকতে পারে। এমনো দাবী করা হয়েছে যে বিশ্বকে জানার জন্য পশ্চিমারা বিজ্ঞানকে যত কার্যকর দাবী করে, কোন কোন আফ্রিকান সংস্কৃতি একই ভাবে ভুডু বা যাদু-টোনার চর্চার মাধ্যমে বিশ্বকে জানার দাবী করতে পারে– উভয় দাবীই একই মাপের ও একই ভাবে সঙ্গত। বিজ্ঞানকে প্রকৃতির উদ্ঘাটন হিসেবে না দেখে একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক গঠন হিসেবে দেখেন বলেই পোস্ট- মডারনিস্টরা এমন কথা বলতে পেরেছেন।

তবে এরকম ধারণার উৎস আরো একটু পুরানো। পোস্ট-মডারনিস্টরা গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে সোচ্চার হলেও ১৯০৬ সালে পীয়ের দ্যুহেম এবং কিছু পরে কুইন– এই দু'জন দার্শনিক যুক্তি দিয়েছেন যে এক্সপেরিমেন্টে অকার্যকর হয়ে কোন একটি তত্ত্ব বাতিল হবে সেই উপায় নেই। কারণ তত্ত্বটি যে রকমই হোক তার মধ্যে এটি-সেটি প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া যে কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব। তাঁরা বলতে চাইলেন বিজ্ঞানী তাঁর তত্ত্ব 'আবিষ্কার' করেন না বরং 'উদ্ভাবন' করেন। দ্যুহেম-কুইন থিসিস নামে পরিচিত এই মতটি সঠিক হলে যে কোন এক্সপেরিমেন্ট বা পর্যবেক্ষণের উপাত্ত থেকে বিভিন্ন রকম পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব। পশ্চিমা বিজ্ঞান সমাজ তার পছন্দ অনুযায়ী এভাবে তত্ত্বগুলো সৃষ্টি ও বাছাই করে নিয়েছে। পোস্ট-মডারনিস্টরা এভাবেই বিজ্ঞানকে একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্ম বলেন। বিজ্ঞানের সাফল্য সম্পর্কে তাঁদের মত হলো এগুলো কাকতালীয়ভাবে সফল হয়েছে। বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য সামাজিক সাংস্কৃতিক গঠনগুলোর মধ্যেও দৈবক্রমে এ রকম কিছু কিছু সাফল্য আসতে পারে। এমন কথায় বিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী?

বিজ্ঞানীরা বলেন পোস্ট-মডারনিস্ট বা দ্যুহেম-কুইন মতাবাদ অনুযায়ী একই পর্যবেক্ষণ তথ্য থেকে যেমন খুশি তেমন বহু তত্ত্ব সৃষ্টি দূরে থাক একটি তত্ত্ব খাড়া করতেই তাঁদের প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়। কারণ আরো অনেক প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে এগুলো খাপে খাপে মিলতে হয়। শেষ পর্যন্ত যদিও বা এরকম একটি তত্ত্ব খাড়া হয় তাকে অনেক সফল ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং অনেক নতুন আইডিয়ার জন্ম দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। ইচ্ছে মত যে কোন তত্ত্ব অথবা

একই উপাত্ত থেকে বহু তত্ত্ব এই অসামান্য কাজগুলো করতে পারবে এমন ধারণা একেবারেই সুদূরপরাহত।

পোস্ট-মডারনিস্টরা অনেক কিছুকে রাজনেতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন– বিজ্ঞানকেও তাঁরা সেভাবেই দেখার চেষ্টা করেন পশ্চিমা মূলস্রোত রাজনীতির একটি সৃষ্টি হিসেবে। এখানে আজকের বিজ্ঞানের কিছু কিছু প্রবণতাকে তাঁরা সাক্ষী করে থাকেন। রাজনৈতিক শক্তি এবং ব্যবসা স্বার্থ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞান গবেষণার অগ্রাধিকার অর্থ ও ক্ষমতার সাহায্যে নিজেদের স্বপক্ষে যে নিচ্ছেনা তা নয়; এমন কি কোন কোন গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতায়ও এদের হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ আছে। জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণা, পরিবেশ গবেষণা, স্বাস্থ্য গবেষণা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এমন প্রভাব বিস্তারের ঘটনা রয়েছে। কিন্তু এই সব ব্যতিক্রমের কথা মোটামুটি সব মহলের জানা এবং এগুলোর প্রতি একটি অনাস্থা প্রায় সবার মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু যখন দেখা যায় এগুলোর দৃষ্টান্ত তুলে বিজ্ঞান জিনিসটাকেই এক রকম পুঁজিবাদী, উপনিবেশবাদী মনগড়া জিনিস প্রতিপন্ন করতে অনেক তাত্ত্বিক দাঁড়িয়ে যান তখন অবাক না হয়ে উপায় থাকেনা।

মজার ব্যাপার হলো পোস্ট-মডারনিস্ট তাত্ত্বিকদের বক্তব্যে প্রায়ই আধুনিক বিজ্ঞানের সব চেয়ে জটিল ও গাণিতিক ভাবে কঠিন বিষয়গুলোর জনপ্রিয় রূপকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়– যেমন পদার্থবিদ্যার আপেক্ষিক তত্ত্ব, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ওই বিষয়গুলোর সত্যিকার কোন ধারণা ছাড়াই তাঁরা তাঁদের প্রকাশিত প্রবন্ধে সম্পূর্ণ ভুল ভাবে এগুলো উপস্থাপন করেছেন। এটি তাঁদের যুক্তিকে আরো উদ্ভট করে তোলে। মূল দ্যুহেম-কুইন থিসিসে, কিংবা ফেয়েরাবেন্ড প্রমুখের বিজ্ঞান-দর্শনে, এবং সে সবের পোস্ট-মডারনিস্ট অনুসারীদের কথায় যেটুকু সারবত্তা আছে তা আসলে অপবিজ্ঞান বা নকল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেগুলোকে লক্ষ্য করে তাঁদের যুক্তি বিস্তার ঘটলে বরং তা সার্থক হতো। তা না হয়ে বিজ্ঞান নিজেই তাঁদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ায় এবং সব ব্যাপারে তাঁদের চরম মতামতগুলো প্রথা-বিরোধিতার উদাহরণ হিসেবে অনেককে আকৃষ্ট করায় এগুলো বেশ কিছু বিভ্রান্তির সুযোগ করে দেয়। সবার কাছে বিজ্ঞানের সঠিক পরিচিতি তুলে ধরার কাজটি এর দ্বারা ঠিকই বিঘ্নিত হয়।

ফলেন পরিচয়তে

বিজ্ঞানমনস্কতা অন্যান্য ক্ষেত্রেও দৃশ্যমানঃ

বিজ্ঞানের চরিত্র নিয়ে নানা রকম সমালোচনার জবাব সাধারণত বিজ্ঞান-দার্শনিকরাই দিয়ে থাকেন; বিজ্ঞানীরা ওসব বিতর্কে নিজেদেরকে বড় একটা জড়াননা। তাঁরা তাঁদের কাজ দিয়েই সেই জবাব দিতে পছন্দ করেন। সাফল্য ছাড়া আর কিছু সফল হয়না এই নীতিতেই তাঁরা বিশ্বাস করেন। হাতেকলমে বাস্তব সাফল্য যেমন তাঁদের অসংখ্য রয়েছে তেমনি বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলোর যে জনপ্রিয়তা ও অনুকৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় সেটিও বিজ্ঞানের একটি বড় সাফল্য। সে কারণেই আমরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সব কাজের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক হবার একটি চাহিদা দেখতে পাই। সে সব ক্ষেত্রেও সবাই নিজেদের কাজকে 'বৈজ্ঞানিক' করার ও বৈজ্ঞানিক দাবী করার চেষ্টা করেন। এই যে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে নিজের প্রেরণাকে ছড়িয়ে দিতে বিজ্ঞান সমর্থ হয়েছে সেই সাফল্যকেই হাতেকলমে সাফল্যগুলোর আগে দেখা যাক।

অন্যান্য কাজকেও বিজ্ঞানের মত করার চেষ্টা না বুঝে বা ভুল বুঝে হচ্ছে তা বলা যাবেনা, সেখানেও আমরা তার দ্বারা ভাল ফল পাই বলেই তা করি। বাস্তব ভিত্তিক অনুমান করে তার থেকে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত টানা আর সে সব সিদ্ধান্তকে বাস্তবে পরখ করা এটি সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতি– যদিও এটি বিজ্ঞানেরই পদ্ধতি। বলা বাহুল্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সব সাফল্যই আমাদেরকে এ পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত করে। শুধু এসব মূল পদ্ধতি নয়, বিজ্ঞানের আরো অনেক রীতিনীতি আমরা অনুসরণ করি। বিজ্ঞানের মধ্যে প্রায়ই অভিনব ও অবিশ্বাস্য রকমের ঘটনার সাক্ষাত মেলে। কিন্তু এরকম যত জটিল ও অভাবনীয় জিনিসই আসুক বিজ্ঞানীরা দিব্যি নিশ্চিন্ত থাকেন যে এর মধ্যে কতগুলো ব্যাপার একেবারেই মৌলিক হিসেবে অপরিবর্তনীয় থাকবে। সেগুলোর নিত্যতার সুযোগ নিয়ে তাঁরা অভিনব বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ পদার্থবিদ্যার নিত্যতার নিয়মগুলোর (কনজারভেশন ল'জ) সম্পর্কে এ কথা বলা যায়– ভরবেগ, শক্তি, চার্জ ইত্যাদির নিত্যতা, যে কোন পরিস্থিতিতে এসব একই থাকে। আমাদের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিছু জিনিস অপরিবর্তনীয় থাকার ব্যাপারটিকে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে থাকি এবং সেই সত্যটিকে ব্যবহার করি। যেমন আমরা জানি যে পৃথিবীর খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও নানা দেশে তার বন্টন একটি পরিমাণে নির্দিষ্ট রয়েছে– যতই তা

ব্যবহৃত হয়ে যাবে ততই তার প্রাপ্তিতা কমবে। এ কথা মনে রেখেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা আমরা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি। অথবা অর্থনৈতিক কোন প্রস্তাবকে বিবেচনা করতে আমরা ওই নিত্যতাকে মনে রাখি।

আবার বিজ্ঞানে অনেক কিছু আমরা একেবারে সুনির্দিষ্ট ভাবে পাইনা– যেসব ক্ষেত্রে বাস্তবতার সঙ্গে এক রকম সমঝোতা করে চল্‌তে হয়। যেমন সংখ্যা-তাত্ত্বিক হিসেবের কথাই ধরা যাক। বিশাল সংখ্যায় যাদেরকে পাই তাদের প্রত্যেকের হিসেব আলাদা ভাবে পেলে বিজ্ঞানী খুশি হতেন। কিন্তু সেটি পাওয়া অবাস্তব বলে তিনি সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব পেয়েই খুশি থাকেন– তখন তাঁর প্রাপ্তি হয় গড়-হিসেব, শতকরা, সম্ভাব্যতা (প্রবাবিলিটি) ইত্যাদির নিরিখে। তিনি এতে খুশি থাকেন কারণ তিনি জানেন একেবারে এলোমেলো বা কাকতালীয় তথ্যের বদলে সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য অনেক ভাল, মন্দের ভাল হলেও। বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব এভাবে সংখ্যাতাত্ত্বিক ভিত্তিতেই শুধু পাওয়া যায়, অতি গুরুত্বপূর্ণ অনেক তত্ত্বও এর মধ্যে পড়ে। এ দিয়েই বিজ্ঞান অনেক অসাধ্য সাধন করেছে। আমরাও তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রেও ভাল সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবের ওপর আস্থা রাখি যেমন নির্বাচনের ফলাফলের পূর্বাভাষ দেয়ার ক্ষেত্রে অথবা দেশের সম্ভাব্য উৎপাদনের প্রাক্কলনে। একটু লক্ষ্য করলে দেখবো জীবনের বহু ক্ষেত্রেও আমরা খুব বিস্তারিত ভাবে না হলেও সংক্ষেপে এই পথ অনুসরণ করি।

বিজ্ঞানের যে কোন এক্সপেরিমেন্টের পাত্রের মধ্যে নানা জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বটে কিন্তু কোন্‌টি কতখানি সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তা নির্ভর করে পরিস্থিতির চাহিদার ওপর। এর ফলে এখানে যৌক্তিক ভাবে কিছু জিনিস ধরে নেবার ব্যাপার থাকে। যেমন মনে করি আমরা ভারী ও হালকা জিনিস একই সঙ্গে পড়ার গ্যালিলিওর নিয়মটি নিয়ে একটি লোহার বল ও একটি পাখির পালক এক সঙ্গে পড়ে কিনা তার এক্সপেরিমেন্ট করছি। এক্সপেরিমেন্টের পাত্রটিকে এক্ষেত্রে বায়ুশূন্য করতে হবে– কিন্তু কতটা বায়ুশূন্য করবো? খুব বেশি বায়ুশূন্য করা সহজ কাজ নয়; ভেতরে বায়ুচাপ যত কমবে সাধারণ পাম্পের কাজ তত কঠিন হয়ে যায়। তখন বিশেষ ধরনের পাম্প প্রয়োজন হয়। আরো কমার পর পাত্রের ভেতর ফাঁকা জায়গার বাতাস যখন খুব কম তখন পাত্রের দেয়ালে আটকে থাকা বাতাস ওই ফাঁকা জায়গায় যাবে, সেটি কমাতে হলে দীর্ঘ সময় ধরে পুরো পাত্র গরম করে দেয়ালের সব বাতাস আলগা করে একই সঙ্গে তা পাম্প করতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানী দেখেন ওই এক্সপেরিমেন্টের প্রয়োজনে এত কাণ্ড করে এতখানি বায়ুশূন্য করার প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা– কতখানি

বায়ুশূন্য হলে পালকের ওপর বায়ুচাপ ধর্তব্যের মধ্যে থাকবেনা শুধু সেইটুকুই এক্ষেত্রে প্রয়োজন, এবং সেই প্রয়োজনীয়তাটির সীমা যৌক্তিক ভাবে বিজ্ঞানী ধরে নেন। প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এভাবেই এসব জিনিস ধরে নিতে হবে– বায়ুশূন্য বলতে সত্যি একশ' ভাগ বায়ুশূন্য হতে হবে সে রকম চরম সিদ্ধান্ত অবাস্তব হবে। এই নীতি বিজ্ঞানের বাইরেও আমরা প্রয়োগ করতে শিখেছি। যেমন কোম্পানীর ট্যাক্স কমালে ব্যবসা বাণিজ্যে আগ্রহ বেড়ে দেশের মোট সম্পদ বাড়বে। কিন্তু তার ফলে জনহিতকর কাজের ক্ষমতা সরকারের কমে যাবে। সেই বিবেচনায় কার কতটা ট্যাক্স কমালে ব্যবসা বাণিজ্যে গতি আসবে অথচ প্রয়োজনীয় জনহিতকর কাজ কমবেনা সেই ব্যাপারে সঙ্গত মাত্রাটি খুঁজে নিতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন এই খুঁজে নেয়া সঠিক হতে হয়, অন্য ক্ষেত্রেও তাই হতে হয়।

বিজ্ঞান কার্য-কারণ খুঁজেই জটিল প্রকৃতির মধ্যে সারল্য আনে। এজন্য এক্সপেরিমেন্টে অন্য সব নিয়ামককে নিয়ন্ত্রণ করে সব পরিস্থিতিতে একই জায়গায় ধরে রাখা হয়, আর শুধু পরীক্ষণীয় নিয়ামকটিকে বদলিয়ে বদলিয়ে দেখার ফলাফলে কী ঘটে। কার্য-কারণ সম্পর্ক আপাতত অন্যগুলোর থেকে স্বাধীনভাবে শুধু এই নিয়ামকের ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়ার আশা করা যায়, বাকি নিয়ামকের ক্ষেত্রে পরে দেখা যায়। কাজটি দীর্ঘ এবং মোটেই সহজ নয়। কিন্তু অতটা না হলেও দৈনন্দিন জীবনেও আমরা কার্যকারণ খুঁজতে গিয়ে জটিলতায় জড়াই এবং তখনো অনেকটা ওই বিজ্ঞানের মত সরল সম্পর্ক পাওয়ার চেষ্টা করি। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক হঠাৎ করে আমার গাড়ির ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিন। এর পরে পরেই ধোঁয়া বেরুবার এক্সস্ট পাইপে মাফলারটি নষ্ট হয়ে ফট্ ফট্ শব্দ করতে লাগলো। আর তখনই কিনা ব্যাটারিটাও একেবারে আর কাজ করছেনা। যেভাবে পর পর ঘটনা ঘটেছে তাতে আপাত দৃষ্টিতে কার্য-কারণ সম্পর্ক নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে যে ইঞ্জিন খারাপ হওয়ার কারণে মাফলার খারাপ হয়েছে, আর মাফলার খারাপ হওয়ার কারণেই ব্যাটারি খারাপ হয়েছে। কিন্তু গাড়ি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাতে যে রকম কার্য-কারণ সম্পর্ক বুঝতে পারি তাতে ওপরের এই কারণগুলো খুব গ্রাহ্য বলে মনে হয়না; বরং একটি বিকল্প সম্পর্ক এখানে বেশি সঙ্গত মনে হবে– সেটি হলো সব ক'টি জিনিস খারাপ হওয়ার কারণ হলো গাড়িটির দীর্ঘ বয়স, অতি পুরানো গাড়িতে এই সব অংশ কাছাকাছি সময়েও খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। বিজ্ঞান যেমন কার্যকারণ ঠিক করতে 'আবশ্যিক কারণ' এবং 'যথেষ্ট কারণ' উভয়টি খোঁজ করে, এই গাড়ির

উদাহরণের মত দৈনন্দিন ক্ষেত্রেও আমরা তা করি। দেখার চেষ্টা করি ইঞ্জিন খারাপ হলে মাফলার খারাপ হওয়ার কথা কিনা (আবশ্যিক কারণ), এবং মাফলার খারাপ হওয়ার জন্য ইঞ্জিন খারাপ হওয়াটাই যথেষ্ট কিনা (যথেষ্ট কারণ)। এই উভয় ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে আমরা 'না' উত্তরটাই পেয়েছি– বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াটি দৈনন্দিন প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করেছে বৈ কি।

এই যে এসব বিজ্ঞানের রীতিনীতি অন্যান্য কাজে চলে এসেছে সেটি কি আমরা সবাই এ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছি বলে? তা ঠিক নয়, বিজ্ঞানের একটি সার্বিক প্রভাব আমাদের সব কাজের ওপর পড়েছে প্রধানত বিজ্ঞানের স্পষ্ট সাফল্যের কারণে। একেই আমরা বিজ্ঞানমনস্কতা বলি। এই মনস্কতার মধ্যে বিজ্ঞানের আরো অনেক কিছু ঢুকেছে। যেমন বিজ্ঞান কাজের সুবিধার জন্য জটিল জিনিসের সরল মডেল ব্যবহার করে– সেটি বস্তুগত মডেল হতে পারে যেমন পৃথিবীকে বোঝার জন্য মডেল হিসেবে গ্লোব। এটি আবার গাণিতিকও হতে পারে যেমন টলেমি তাঁর বিশ্ব-ছবি দেয়ার জন্য বিশ্বকে জ্যামিতিক মডেলে বিবেচনা করেছেন– সাইকেল, এপি-সাইকেল ইত্যাদির সহযোগে। উভয় ক্ষেত্রে আপাতত অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে সামনে আনাটাই মডেলের কাজ। বিজ্ঞানের বাইরে অন্য কাজেও আমরা একই কৌশল ব্যবহার করি বিজ্ঞানের অনুকরণেই। এমনকি সাধারণ যুক্তিতর্কে যখন এক টানে ছবি বা ডায়াগ্রাম এঁকে কিছু বোঝাই, কিংবা কোন সমতুল্য উপমা ব্যবহার করি, তখন সেগুলোও বাহুল্য বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সরল ভাবে দেখিয়ে মডেলের কাজই করে।

সাধারণ তর্কবিতর্কে আমরা গুণবাচক কথাই বেশি ব্যবহার করি– বড় পরিসংখ্যান বা নিখুঁত সংখ্যার বরাত দিয়ে কথা তেমন বলিনা। সমাজবিদ্যা, ইতিহাস ইত্যাদির চর্চাও একসময় অনেকটা গুণগত আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকতো। কিন্তু বিজ্ঞান মাত্রই খুবই সংখ্যাবাচক; এমনকি তা উচ্চতর গণিতের উপরও খুব নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের প্রভাবেই অধুনা আমাদের সাধারণ তর্কবিতর্কও ক্রমে বেশি সংখ্যাবাচক হয়ে উঠছে। আমরা তাই কথায় কথায় শতকরা হিসেবে তুলনা, সম্ভাবনার সংখ্যামান, কোন কিছুর সংখ্যার হিসেবে আনুমানিক পরিস্থিতি ইত্যাদি ব্যবহার করি। মানবিক অথবা সমাজবিদ্যার আলোচনাতেও তা করি। উদাহরণ স্বরূপ পাঁচ হাজার বছর পুরানো একটি প্রাচীন নগরীর কথা যদি ইতিহাসের আলোচনাতেও আমরা করি, আলোচনাটিকে আরো প্রাণবন্ত ও বস্তুনিষ্ঠ করার জন্য এর আনুমানিক লোকসংখ্যা বলি, শতকরা কতজন ইটের

বাড়িতে থাকতো তা বলি, বা নগরটি যে বন্যাতেই ধ্বংস হয়েছে তার সম্ভাবনার বিপরীতে যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছে তার সম্ভাবনা কত তারও একটি আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করি।

অবশ্য এমনো তো হতে পারে যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সব প্রক্রিয়া ও বিজ্ঞানমনস্কতা সব একই জায়গা থেকে এসেছে– মানুষের মস্তিষ্ক থেকে; বিজ্ঞানের থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে গেছে এটি হয়তো ঠিক নয়। এ কথাটির মধ্যেও এক রকম সারবত্তা থাকতে পারে। আমরা দেখেছি বিজ্ঞান জিনিসটাই মানবিক– কাজেই সেই মানুষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের মত অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই প্রেরণায় কাজ করবে এটিই তো স্বাভাবিক। তবে তেমনটি যদি হয়েও থাকে সেই প্রেরণাটি দীর্ঘদিন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা গেলেও সাধারণ অন্যান্য কাজে তেমন ভাবে দেখা যায়নি। আধুনিক বিজ্ঞানের বাঁধ-ভাঙ্গা সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার একটি সরাসরি প্রভাব অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্পষ্ট ভাবে পড়েছে। আর অতীতের সব মানুষের সাধারণ মানবিক বিজ্ঞানমনস্কতাকে সেটি যে আরো অনেক ব্যাপকতা ও উচ্চতায় নিয়ে গেছে তা স্বীকার করতে হবে। বিজ্ঞানের অন্যান্য সব অবদানের সঙ্গে এই অবদানটিকেও ছোট করে দেখার উপায় নেই।

আধুনিক প্রযুক্তির বিজ্ঞান-নির্ভরতাঃ

সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান ধরা পড়ে প্রধানত প্রযুক্তির রূপে, কারণ প্রযুক্তির মাধ্যমেই বিজ্ঞান সরাসরি মানুষকে স্পর্শ করে। তবে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি এক জিনিস নয়। বিজ্ঞান তো প্রকৃতিকে বোঝার ব্যাপার ও প্রকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপার; অন্যদিকে প্রযুক্তি হলো প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে জীবনযাত্রায় সুবিধা তৈরি করে নেবার ব্যাপার। তাই বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। তবে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সম্পর্কটি কিন্তু খুবই বাস্তব একটি ব্যাপার– এটি আগে ঘনিষ্ট ছিলনা, কিন্তু আধুনিক সময় একেবারে ওতোপ্রোতো ভাবে ঘনিষ্ঠ।

মানুষের প্রযুক্তির কাজ একেবারে গোড়া থেকেই ছিল– যেমন আগুনের ব্যবহার, পাথরের জুৎসই হাতিয়ার তৈরি, এসবই তো আদি গুহাবাহী মানুষকে প্রাণীকূলে বিশিষ্ট করেছিলো। অন্যদিকে আমরা দেখেছি খুব সম্ভব বিজ্ঞানের প্রেরণা এবং কাজও মানুষের মধ্যে আদি থেকেই ছিলো। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান আসার আগে পর্যন্ত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি এই দুটি আলাদা ভাবে বিকশিত হয়েছে একটি অন্যটির উপর খুব বড় কোন প্রভাব রাখেনি। বিজ্ঞান ছিল দার্শনিক-গোছের

মানুষের কাজ, আর প্রযুক্তি কারিগরদের। উদাহরণ স্বরূপ ধাতুযুগ আসার পর যাঁরা আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কারশন করে ছুরি-কাঁচি-হাতিয়ার-অলঙ্কার গড়েছেন, কৃষিযুগ আসার পর যাঁরা নদীতে বাঁধ দিয়ে ও পানির পাত্র লাগানো চাকা ঘুরিয়ে জমিতে সেচ দিয়েছেন, যাঁরা জলচাকা বা বায়ুকলে প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করে কল চালিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বিজ্ঞানের তেমন কোন সম্পর্ক ছিলনা।

এমনকি শিল্প বিপ্লবের শুরুতে যে উদ্ভাবকরা প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন তাঁরা এর পেছনের বৈজ্ঞানিক নীতিগুলো তেমন না বুঝেই করেছিলেন– তাঁরাও কুশলী কারিগরই ছিলেন। কিন্তু ওই সময়টিতে এসে শিল্প বিপ্লব কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উভয়ের দ্রুত উন্নয়নের সময় উভয়কেই পস্পরের খুবই কাছাকাছি চলে আসতে হয়েছে। এর পর থেকে অবস্থাটি একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে– বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রয়োগ ছাড়া প্রযুক্তির উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের এক একটি আবিষ্কার তার ফসল হিসেবে চমকপ্রদ সব প্রযুক্তি সৃষ্টি করেছে– যার ফলে এখন আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই দুটি শব্দকে এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করতে বাধ্য হচ্ছি। কাজেই মানুষ যে প্রযুক্তির মধ্যেই বিজ্ঞানকে দেখেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই, অন্যায্যও কিছু নেই।

ওই যে শিল্প বিপ্লবের প্রথম তুঙ্গে ওঠার সময়ে বাস্পীয় ইঞ্জিনের উন্নত সংস্করণগুলো এবং অন্যান্য নানা তাপ-ইঞ্জিন দুনিয়াকে বদলে দেয়া শুরু করেছিলো থার্মোডাইনামিক্স বিজ্ঞানটির দ্রুত উন্নতি ছাড়া ওটি সম্ভব হতোনা। তাছাড়া একই সময়ে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের ভেতর বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি প্রবেশে কল-কারখানায়, ঘরে ঘরে, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে বিদ্যুৎ ঢুকলো তা মাইকেল ফ্যারাডের বিদ্যুৎ ইনডাকশনকে পরবর্তী উদ্ভাবকরা নানা ব্যবহারে নিয়ে যেতে পারারই ফল। এরই পরবর্তী ধাপ ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞান। ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের গাণিতিক তাত্ত্বিক আবিষ্কারে ধরা পড়লো বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ– রেডিও তরঙ্গ, দৃশ্য আলো থেকে এক্স'রে সবই যার উদাহরণ। তাত্ত্বিক আবিষ্কার এই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গকে হাইনরিশ হার্ৎস বাস্তব তরঙ্গ হিসেবে প্রদর্শন করার পর একের পর এক রেডিয়ো, রেডার, টেলিভিশন ইত্যাদি প্রয়োগ ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞানে জোয়ার আনে এবং সাম্প্রতিক কালে ইন্টেগ্রেটেড সার্কিট ও কম্পিউটার বিপ্লবে তা পুরো বিশ্ববাসীকে এর সঙ্গে আটকিয়ে ফেলে। এর প্রত্যেকটি পর্যায়ে প্রয়োজন হয়েছে বিজ্ঞানের বড় বড় পদক্ষেপ এবং সবার ওপরে পদার্থবিদ্যার আশ্চর্য আবিষ্কার কোয়ান্টাম মেকানিক্স। উদাহরণ স্বরূপ যে লেজার আজ অস্ত্রোপচার থেকে শুরু করে তথ্য প্রযুক্তির পুরোভাগে থাকছে পদার্থবিদ্যার জটিল

কোয়ান্টাম অপটিক্স ছাড়া সেটি আলোর মুখ দেখতোনা। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বিজ্ঞানের নানা শাখার সর্বশেষ আবিষ্কারগুলোর সহায়তা ছাড়া এ যুগের কোন প্রযুক্তিই সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের ভাল বোদ্ধা না হয়ে আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা যায়না।

বিজ্ঞানকে যাঁরা যেনতেন ভাবে পছন্দের তত্ত্ব খাড়া করার ব্যাপার মনে করেন ফেয়েরাবেন্ডের মত সেই আপেক্ষিকতারাদী দার্শনিকরা আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে কী বল্‌বেন? তত্ত্বগুলো যদি খেয়ালখুশি মতো বেছে নেয়া হয় তাহলে প্রযুক্তি সৃষ্টিতে সেই তত্ত্বের এত ক্ষমতা আসলো কোথা থেকে? এ সম্বন্ধে তাঁরা একটি অদ্ভুত কথা বলেন। তাঁদের মতে প্রযুক্তি জিনিসটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসরণ করে আসেনি, তা স্বাধীন ভাবে উদ্ভাবিত হয়েছে। উদ্ভাবনকারীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে নানা ভাবে করে করে দেখে হঠাৎ হঠাৎ সফল হয়ে গিয়েছেন (ট্রায়াল এ্যান্ড এরর)। আধুনিক প্রযুক্তিগুলোর জটিলতা ও সূক্ষ্ম বিজ্ঞাননিষ্ঠতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা থাকলে এমন কথা বলা যায়না। যে সময় বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির তেমন কোন নির্ভরশীলতা ছিলনা তখন কারিগররা এই ট্রায়াল এ্যান্ড এরর পদ্ধতিতে ঠিকই অনেক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। সে সময় প্রযুক্তি সরল প্রকৃতির ছিল বলে তাতে সে কাজ অসম্ভব ছিলনা। কিন্তু নিজেরা আধুনিক প্রযুক্তির নিত্য ব্যবহারকারী হয়েও, এর বিস্তর জটিলতা সচক্ষে দেখেও, আপেক্ষিকতাবাদী দার্শনিক অথবা তাঁদের অনুসরণকারী পোস্ট-মডারনিস্ট তাত্ত্বিকরা ট্রায়াল এ্যান্ড এররের যুক্তি দেবেন এটি অবিশ্বাস্য।

সাধারণ মানুষ প্রযুক্তির মধ্যে বিজ্ঞানের সাফল্য দেখেন। ঠিক তেমনি বিজ্ঞানীরাও তাঁদের তত্ত্ব নতুন প্রযুক্তির কাজে লাগতে দেখলে নিজেদের তত্ত্বের ওপর অনেক বেশি আস্থা পান। তাই বলে বিজ্ঞানের সব তত্ত্ব প্রযুক্তির জন্ম দেয়না, বেশ কিছু বিজ্ঞানের চর্চায় অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে প্রযুক্তি সৃষ্টি থাকে না। যেমন মহাজাগতিক বিজ্ঞানের কথা বলা যায়। সেখানে মানুষের জ্ঞানের দিগন্তটি বাড়ানোই একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেক সময় সেই বিজ্ঞানেরই নানা শাখা-প্রশাখা থেকে এমন সব উপজাত আইডিয়া তৈরি হয় যার থেকে অভাবনীয় সব প্রযুক্তিরও উদ্ভব হয়। আধুনিক কালে চাঁদের বা মঙ্গল গ্রহের প্রকৃতি সম্পর্কে যে বড় বড় আবিষ্কার শুরুতে ঘটেছিলো সেগুলোর পেছনেও নেহাৎ অনুসন্ধিৎসাই কাজ করেছিলো, সেখানে যাওয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিলনা। কিন্তু মহাশূন্য ভ্রমণের যুগে এসে সেখানে যাওয়া ও বাস করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ওই বিজ্ঞানে প্রচুর উন্নয়ন ঘটেছে এবং তার থেকে ও তার শাখা-প্রশাখার থেকে

অনেক প্রযুক্তি বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। উদাহরণ স্বরূপ বস্তু-বিজ্ঞানের (ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স) বড় বড় কিছু আবিষ্কার ছাড়া কার্যক্ষম মহাশূন্যযান তৈরি এবং মহাশূন্য থেকে ফেরার সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নিরাপদে প্রবেশ কিছুতেই সম্ভব হতো না। একই সঙ্গে মহাশূন্য ভ্রমণের বিভিন্নমুখী চাহিদা আবার বস্তু-বিজ্ঞানের ওই অগ্রগতিগুলোকে উৎসাহিত করেছে।

অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সামাল দিতে বিজ্ঞানের তত্ত্বঃ

বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব আবিষ্কারের অনেক দিন পর যদি অপ্রত্যাশিত কোন ক্ষেত্রে সুন্দর কাজে লেগে যায় তখন তার সাফল্যটি আরো ভাল বোঝা যায়। এই কাজে লাগার পরিস্থিতি যখন এমন হয় যে ওই তত্ত্ব আবিষ্কারের সময় তা আবিষ্কারকারী বিজ্ঞানীদের চিন্তার বিষয় ছিলনা, এমন পরিস্থিতির কথা তখন ভাবা সম্ভবও ছিলনা, তখন সেটি আরো দারুণ সাফল্য হয়। এরকম নতুন ক্ষেত্রেও সমস্যা-সমাধানের কাজ দেয়াতে তত্ত্বটির প্রয়োগের ব্যাপ্তি সবাইকে মুগ্ধ করে। তখন বিশেষ করে মনে হয় তত্ত্বটি বিশ্ব-প্রকৃতির একটি নিয়মের প্রতিনিধিত্ব খুব ভাল ভাবেই করছে। আমরা এখানে এর দুটি উদাহরণ দেবো।

প্রথমে দেখবো সত্তরের দশকে এসে জিপিএস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শতাব্দীর প্রথম দিকে আবিষ্কৃত আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাটি। পৃথিবী পৃষ্ঠে নিজের অবস্থানটি নিখুঁত ভাবে প্রতি মুহূর্তে নির্ণয়ের জন্য জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) এর ব্যবহার এখন প্রায় সবারই হাতের মুঠোয় চলে এসেছে– স্মার্ট ফোনের সঙ্গে। যেমন দৈনন্দিন কাজ একটি উবার ট্যাক্সি ব্যবহারের কথা ধরা যাক্। উবার ট্যক্সিটি ডাকার সময়, ফোনের ম্যাপে ট্যাক্সিটিকে আসতে দেখার সময়, এবং ট্যাক্সিটি করে গন্তব্য স্থলে যাওয়ার পথে সর্বক্ষণ পথ-নির্দেশ পাওয়ার সময়, এই জিপিএস এর কাজ আমরা দেখি। বিমানের চালকও একই ভাবে তাঁর অবস্থান জেনে গন্তব্যের দিকে চলতে পারেন; অসংখ্য অন্যান্য ব্যবহারেও জিপিএস এখন অপরিহার্য জিনিস। এটি সম্ভব হচ্ছে পৃথিবী থেকে ২০ হাজার কিলোমিটার উপরে থেকে ঘন্টায় ১৪ হাজার কিলোমিটার বেগে পৃথিবীকে পরিক্রম করা ২৪টি উপগ্রহ সব সময় পৃথিবীতে প্রত্যেকটি জিপিএস গ্রাহক যন্ত্রে (যেমন জিপিএস সম্বলিত স্মার্ট ফোনে) সিগন্যাল পাঠানোর মাধ্যমে। পৃথিবীর যে কোন বিন্দু থেকে এক সঙ্গে অন্তত চারটি উপগ্রহ এক সঙ্গে দেখা যায় বলে ওখানকার গ্রাহক যন্ত্র চারটি অথবা তারো বেশি উপগ্রহ থেকে সিগন্যাল পায়। প্রত্যেক উপগ্রহে রয়েছে অত্যন্ত

সূক্ষ্মভাবে সময় দেয়া এটমিক ঘড়ি এবং তার টাইম-সিগন্যাল গ্রাহক যন্ত্রে কোন্ সময় পৌঁছলো তা হিসেব করে এক একটি উপগ্রহ থেকে তার দূরত্ব খুবই সঠিকভাবে নির্ণিত হয়ে যায়। জ্যামিতির নিয়ম অনুযায়ী ফরমুলার অংক কষে গ্রাহক যন্ত্র এরকম অন্তত তিনটি দূরত্ব ব্যবহার করেই পৃথিবীতে তার অবস্থান প্রায় নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করে ফেলতে পারে।

কিন্তু এই কাজে একটি সমস্যা দেখা যাচ্ছে তা হলো উপগ্রহের যে গতিবেগ ও পৃথিবী থেকে দূরত্ব তাতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বকে উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছেনা। আপেক্ষিক তত্ত্বের ফলে সময়ের কী পরিবর্তন হয় তা আমরা গত অধ্যায়ে দেখেছি। পৃথিবীর আপেক্ষিকে উপগ্রহের যে প্রচণ্ড গতি তাতে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব অনুযায়ী উপগ্রহের ঘড়ি পৃথিবীতে গ্রাহক যন্ত্রের ঘড়ি থেকে দিনে প্রায় ৭ মাইক্রোসেকেন্ড স্লো হয়ে যায়। আবার আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের জন্য সৃষ্ট 'সময়ের ভাঁজ' পৃথিবী পৃষ্ঠে সব চেয়ে বেশি কিন্তু অনেক দূরে থাকা উপগ্রহে তার তুলনায় অনেক কম। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে উপগ্রহের ঘড়ি পৃথিবীতে গ্রাহকযন্ত্রের ঘড়ির তুলনায় প্রতিদিন ৪৫ মাইক্রোসেকেন্ড করে ফাস্ট হতে থাকবে। এগুলোর ফলে উপগ্রহ থেকে সিগন্যাল আসার সময়ে ঘড়ির কারণেই একটি ভুল জমতে থাকবে যা দূরত্বের মাপকেও ভুল দেখাবে– ফলে গ্রাহক যন্ত্রের অবস্থান নিখুঁত হবেনা। কাজেই জিপিএস থেকে এই ভুল দূর করার জন্যে ব্যবস্থা নিতে হলো। ২৪টি উপগ্রহের সব ক'টি পৃথিবী থেকে সমান দূরত্বে ঘুরছে বলে তাদের ঘড়ির ফাস্ট হওয়ার ব্যাপারটি ওই ঘড়িতেই ঠিক করে দেয়া হলো, উৎক্ষেপনের আগে ঘড়িগুলোর সময়ের গতি সে পরিমাণে স্লো করে দিয়ে। কিন্তু যখন যে কয়েকটা উপগ্রহকে গ্রাহকযন্ত্র থেকে দেখা যাবে তাৎক্ষণিক ভাবে সেগুলোর যেইটির আপেক্ষিক গতি যেমন হবে তার তাৎক্ষণিক সংশোধনের মাত্রাও তেমন হতে হবে– একটির সঙ্গে একটি মিলবেনা। সেক্ষেত্রে গ্রাহক যন্ত্র বিশেষ উপগ্রহকে চিহ্নিত করে সে উপগ্রহের বৈশিষ্ট অনুযায়ী হিসেব করে তখনকার মত ভুলটি শুধরে নেয়। এজন্য হিসেবের সফ্টওয়্যার গ্রাহক যন্ত্রে দেয়া আছে যাতে প্রত্যেকটি উপগ্রহের কক্ষ-বৈশিষ্টগুলোও দেয়া আছে।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো আইনস্টাইন যখন আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব ও সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন তখন কৃত্রিম উপগ্রহ, জিপিএস এসবের সম্ভাবনা ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল, আইনস্টাইনের চিন্তায় এমন পরিস্থিতি থাকার বিষয় ছিলনা। এরপর ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে অন্যান্য উপায়ে যেমন ক্ষুদ্র

কণিকার আয়ুষ্কাল মেপে, বা সূর্য গ্রহণের সময় সূর্যের অবস্থানের কারণে তারার আলোর বেঁকে যাওয়া থেকে, যথাক্রমে বিশেষ ও সাধারণ তত্ত্ব বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে একথা সত্যি। কিন্তু এই সময়ে কেউ ভাবেনি যে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য কোন কিছুতে এই তত্ত্বগুলো ব্যবহার করতে হবে। অথচ সম্পূর্ণ অভিনব পরিস্থিতিতে দৈনন্দিন ব্যবহার্য পরিমাপকে শুদ্ধ করতে গিয়ে ওই আপেক্ষিক তত্ত্বের সমীকরণগুলোকেই প্রয়োগ করতে হলো– যেমন পরিস্থিতি আবিষ্কারকের কাছে বাস্তব ছিলনা, তাঁর কল্পনায় যদিও বা থাকতো। এই প্রয়োগ যে অত্যন্ত সফল ভাবে পৃথিবীর সুনির্দিষ্ট স্থানে আমাদের অবস্থান নির্ণয়কে নিখুঁত করতে পেরেছে তা আপেক্ষিক তত্ত্বের বাস্তবতাকে আমাদের কাছে আরো জোরালো ও জাজ্বল্যমান ভাবে উপস্থিত করছে।

আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণটি আরো নাটকীয়– দুর্ঘটনায় কবলিত এপলো-১৩ এর মহাশূন্যযাত্রীদের জীবনরক্ষার জন্য বিজ্ঞানের সংগ্রামের কাহিনী। ১৯৬৯ সালে এপলো-১১ এর যাত্রীরা প্রথম চাঁদের বুকে নামার পর আরো দু'জন যাত্রী এপলো-১২ তে গিয়ে সফল ভাবে চাঁদের মাটিতে নেমে তাঁদের অনুসন্ধান চালিয়ে ফিরেছিলেন। তাই ১৯৭০ সালে এপলো-১৩ যখন তিন জন যাত্রী নিয়ে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হলো তখন এ যাত্রারও সাফল্য সম্পর্কে বিশ্ববাসীর কোন সন্দেহ ছিলনা। নিয়মানুযায়ী সব কিছু চল্‌ছিলো– চাঁদে পৌঁছতে তিন দিনের যাত্রার মধ্যে ৫৬ ঘন্টা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। তখনই একটি বড় বিস্ফোরণের শব্দ পেলেন এর যাত্রীরা এবং বেশ কিছু অস্বাভাবিকতা শুরু হলো। তার পর পর এর নানা ক্ষয়ক্ষতিগুলো এপলোতে মহাশূন্যযাত্রীদের নিজেদের কাছে এবং পৃথিবীতে আমেরিকার হিউস্টনে অবস্থিত মিশন কন্ট্রোলে থাকা কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতিতে ধরা পড়তে লাগলো। বিস্ফোরণ ঘটেছে প্রধান দুটি অক্সিজেন ট্যাংকের একটিতে– তাতে অক্সিজেনের মূল উৎসটি প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছে।

এপলো যান তিনটি অংশে বিভক্ত থাকে– কম্যান্ড মড্যুল, সার্ভিস মড্যুল এবং লুনার মড্যুল। অক্সিজেন ট্যাংকগুলো সার্ভিস মড্যুলে– বিস্ফোরণ সেখানে ঘটেছে। ওখানে থাকে জীবন রক্ষাকারী সব সরঞ্জাম– অক্সিজেন, পানি, বর্জ্য কার্বন ডাই অক্সাইড সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা ইত্যাদি– সবই এখন নষ্ট। এখানেই চলাচলের প্রধান রকেট ও তার জ্বালানী– এসবও এখন সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার অযোগ্য। সৌভাগ্য ক্রমে পৃথিবীর সঙ্গে রেডিও যোগাযোগটি এখনো বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছিলো। যাত্রীরা চন্দ্র যাত্রাকালে প্রায় সর্বক্ষণেই কাটান এই সার্ভিস মড্যুল ও কম্যান্ড মড্যুলে, যেখানে রয়েছে প্রায় সব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। অন্যদিকে লুনার

মড্যুলটি একটি ছোট খেয়া তরীর মত। এপলো চাঁদের কক্ষে যাবার পর এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'জন যাত্রী নিয়ে চাঁদে অল্প সময়ের জন্য নামে, তারপর উঠে এসে মূল যানের সঙ্গে আবার সংযুক্ত হয়। তাই এখানে অল্প সময়ের জন্য সব ব্যবস্থা আছে এবং তা এখনো অক্ষত আছে। বাধ্য হয়ে এপলোর তিন জন যাত্রী কম্যান্ড মড্যুলের সব সিস্টেম সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে এই ছোট্ট লুনার মড্যুলে এসে আশ্রয় নিলেন।

এই অবস্থায় অভিযান চালু রাখার বা চাঁদে যাওয়ার বা নামার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু ওখান থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসারও উপায় নেই– লুনার মড্যুলে যে ছোট রকেট ও তার জ্বালানী রয়েছে তা দিয়ে এটি সম্ভব নয়। কিন্তু যেভাবে বায়ুঘর্ষণহীন, মাধ্যাকর্ষণহীন স্থান দিয়ে এপলো-১৩ এগিয়ে যাচ্ছিলো সেভাবে চাঁদের দিকে এগুতে অসুবিধা হচ্ছিলোনা কারণ নিউটনের প্রথম গতিসূত্র অনুযায়ী কোন জিনিস চলতে থাকলে সরল রেখায় সমবেগে চলতেই থাকবে, তার জন্য কোন বলের প্রয়োজন নেই। মিশন কন্ট্রোলে ও অন্যত্র বিজ্ঞানীরা দ্রুত নানা বিবেচনা ও হিসেব-নিকেষ করে যাত্রীদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার একটি সম্ভাব্য উপায় বের করলেন। আপাতত নিজ গতিতে এটি চাঁদের দিকে যেমনি যাচ্ছে যেতে দিতে হবে। চাঁদের একেবারে কাছে গিয়ে লুনার মড্যুলের অক্ষত ছোট রকেটটি সঠিক একটু সময় এমন ভাবে চালাতে হবে যেন এপলো চাঁদের মাধ্যাকর্ষণে একটি কক্ষপথে একে পরিক্রমণ করতে গিয়ে শুধু একবার গোত্তা খেয়ে চাঁদের ওই মাধ্যাকর্ষণের বলেই সোজা পৃথিবীর দিকে ত্বরণ লাভ করে। একবার সেভাবে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলে এপলো আবার নির্বাধভাবে সেই গতিতেই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে। যে সময় লাগবে তাতে যাত্রীরা হয়তো ওই সামান্য রসদেও বেঁচে যাবেন। এভাবে চাঁদকে গোত্তা খেয়ে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসাটি অনেকটা গুলতি দিয়ে ঢিল ছোঁড়ার মত। শুধু গুলতির টানা রাবারের শক্তির বদলে এক্ষেত্রে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে ব্যবহার করা হবে।

এই কৌশল সফল হতে হলে ঠিক কোন্ জায়গায় গিয়ে ঠিক কতক্ষণ রকেটটি চালু রাখতে হবে সেই হিসেবটি খুব সতর্কতার সঙ্গে করতে হলো– নিউটনের নিয়মগুলোই রইলো সে হিসেবের মূলে। সামান্য একটু এদিকে ওদিক হয়ে গেলে পৃথিবীমুখী এই যাত্রা সম্ভব হবেনা। এটি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেবার ব্যাপারও বটে। রকেট চালনার কাজটি করতে হবে যখন এপলো চাঁদের অদৃশ্য পিঠের দিকে থাকছে, অর্থাৎ পৃথিবী ও এপলোর মাঝখানে যখন চাঁদ থাকছে তখন। তাই

মিশন কন্ট্রোলের কম্পিউটার দূর থেকে ওই রকেট নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিতে পারবেনা কারণ তার সিগন্যাল তখন এপলোতে পৌছবেনা। কাজটি এপলোর মধ্যে থাকা কম্পিউটারকেই করতে হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ওই নতুন অপ্রত্যাশিত কম্পিউটার-প্রোগ্রামটি পৃথিবীর বিজ্ঞানীরাই লিখলেন এবং লাইনে লাইনে তা এপলোর যাত্রীদেরকে রেডিওতে পড়ে শোনালেন। তাঁরা এখান ওখান থেকে নেয়া সব কাগজের টুকরায় ওই দীর্ঘ প্রোগ্রাম শুনে শুনে দুই ঘন্টা ধরে লিখলেন এবং তাঁদের কম্পিউটারের ইনপুটে ঢোকালেন– ওই অসম্ভব উত্তেজনাকর ও দারুণ অস্বস্থিকর অবস্থার মধ্যেই। কিন্তু বিজ্ঞানীদের এই পরিকল্পনায় আস্থার কোন অভাব ছিলনা। পরিস্থিতি যতই সংকটময় হোক না কেন নিউটনের তত্ত্ব থেকে করা অংকের ওপর পূর্ণ আস্থা তাঁদের ছিল। শুধু আশংকা ছিল হিসাব মত জীবনরক্ষাকারী রসদগুলো ওই সময়টুকু পর্যন্ত টিকবে কিনা। সবকিছু খুব সাবধানী ভাবে ব্যবহার করতে হচ্ছিলো। লুনার মড্যুলে শুধু চাঁদে কাটানো সময়টুকুতে দু'জন যাত্রীর দেড় দিনের ব্যবস্থা থাকে। এখন ওইটুকু জায়গায় তিন জন যাত্রীকে চারদিন কাটাতে হবে। বিদ্যুৎ, পানি, উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে দারুণ সাশ্রয়ী হতে হলো। কার্বন ডাই অক্সাইড সরিয়ে ফেলার জন্য অদ্ভুত কৌশলের আশ্রয় নিতে হলো। তা ছাড়া ফেরার ঠিক আগে কন্ট্রোল মড্যুলের একেবারে বন্ধ করে রাখা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো ঠিক চালু হবে কিনা (এটি সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা), বায়ুমন্ডলে ঢোকার সময় অসম্ভব ঘর্ষণের উত্তাপ নিরোধী ব্যবস্থাগুলো দুর্ঘটনার পর টিকে আছে কিনা সেসব আশংকাও ছিল।

হিসেব অনুযায়ী ছোট রকেটটি সঠিক মুহূর্তে মাত্র ৩০.৭ সেকেন্ড চালু রাখলেই পৃথিবীমুখী যাত্রা শুরু হয়ে যাবে। ঠিক তাই হলো। পরে যাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে এবং অবতরণ স্থল পূর্ব নির্ধারিত ভারত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে স্থানান্তরিত করতে আরো দু'বার ছোট রকেটটি কিছু সময়ের জন্য চালানো হলো বটে কিন্তু ওই ৩০.৭ সেকেন্ডের চালনাটাই এনে দিয়েছে জীবন রক্ষাকারী সেই সাফল্য। ওতে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণকেই চাঁদ থেকে ফিরে আসার কাজে অত্যন্ত সুকৌশলে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায় তিনশ' বছর পুরানো নিউটনের তত্ত্বকে যে এভাবে একদিন ব্যবহার করতে হবে তা কেউ কখনো ভাবেনি। এপোলো-১৩ এর যাত্রীদের রক্ষা করতে সেই তত্ত্বই নাটকীয়ভাবে কাজ দিলো।

অন্যান্য চন্দ্রযাত্রার মতই এপলো-১৩ এর অভিযান সারা দুনিয়ার মানুষ টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাচ্ছিলেন– ইতোমধ্যে সম্প্রতি আন্তমহাদেশ

টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থা এবং রঙীন টেলিভিশন উভয়েই চালু হয়ে গিয়েছিলো। মিশন কন্ট্রোলের সঙ্গে এপলোর যাত্রীদের কথাবার্তা ছাড়াও এর ভেতর তাঁদের কাজ, অভিজ্ঞতা বর্ণনা সবাই দেখতে-শুনতে পারছিলো। দুর্ঘটনার পর থেকে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের খাতিরে এপলো থেকে টেলিভিশন সম্প্রচার বন্ধ রাখলেও শব্দ সম্প্রচার চালু ছিল এবং তার সঙ্গে পৃথিবী থেকে ছবি, এ্যানিমেশন, ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে ঘটমান পুরো কাহিনী প্রতি মুহূর্তে বিশ্ববাসীর কাছে চলে আসছিলো। সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলো আর মনে মনে প্রার্থনা করছিলো তিনজন মহাশূন্যচারীর জীবন রক্ষার জন্য। বিশেষ করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় ও তারপর প্যারাসুটের সাহায্যে সমুদ্রের ওপর নেমে আসতে দেখার ও তাঁদের কণ্ঠ শুনতে পাওয়ার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত ৬ মিনিট ছিল রেডিও সাইলেন্স– ওসময় এপলোকে দেখাও যাবেনা শোনাও যাবেনা; তখন মিশন কন্ট্রোলেরও ছিল অদ্ভুত নীরবতা। ওটি ছিল সব চেয়ে অজানা ও আশংকার সময়, সব চেয়ে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। তাপনিরোধী আবরণটি দুর্ঘটনার পরও পুরাপুরি কার্যকর আছে তো, প্রচণ্ড উত্তাপ এপলোকে দগ্ধ করেনি তো। মনে হচ্ছিল ওই ৬ মিনিট টেলিভিশনের সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর মানুষও নির্বাক হয়ে ছিলো– তার পরেই সাফল্যের ঝলক।

নিউটনের তত্ত্ব এমন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতেও হুবহু প্রত্যাশিত ফল দিলো। তারপরও কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠতায়, তার ভবিষ্যদ্বাণীর ফলপ্রসুতায় কোন সন্দেহ থাকতে পারে? এই তত্ত্ব যে চমৎকার কাজ করেছে, তার মধ্যে অন্তর্নিহিত সত্যতা না থাকলে সেটি এভাবে সফল হতে পারতোনা। কিন্তু বিজ্ঞানের সত্য কী রকম সত্য? এটি কি প্রকৃতিকে হুবহু ধারণ করা সত্য? নাকি তার একটি প্রতিচ্ছবি মাত্র– কার্যকর, কিন্তু ঠিক সেই সত্য নয়? এর কোন একটিকে চট্ করে বেছে নেয়া সম্ভব নয়, কারণ উভয়ের স্বপক্ষেই যথেষ্ট যুক্তি আছে। বিজ্ঞান এবং গণিতের চরিত্রকে আরো একটু ভাল করে জানতে পারলে বৈজ্ঞানিক সত্যের স্বরূপটি আমাদের কাছে কিছুটা স্পষ্ট হবে। তখন বিজ্ঞান আর গণিতকে আমরা আরো ভাল ভাবে চিনতে পারবো। এই বইয়ের দ্বিতীয় খন্ডে আমরা সেই চেষ্টাই করবো।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞান লেখক হিসেবে এবং নানা মাধ্যমে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকে এদেশের প্রথম বিজ্ঞান মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করে আজ অবধি তার সম্পাদনা করছেন। সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সি এম ই এস), এখনো তিনি যার নেতৃত্বে। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বেশ কিছু সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার প্রাপ্ত এ লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের ওপর।

ড. ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ লিবারাল আর্টস বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান।